সোনার পরমতলা

মিজানুর খান

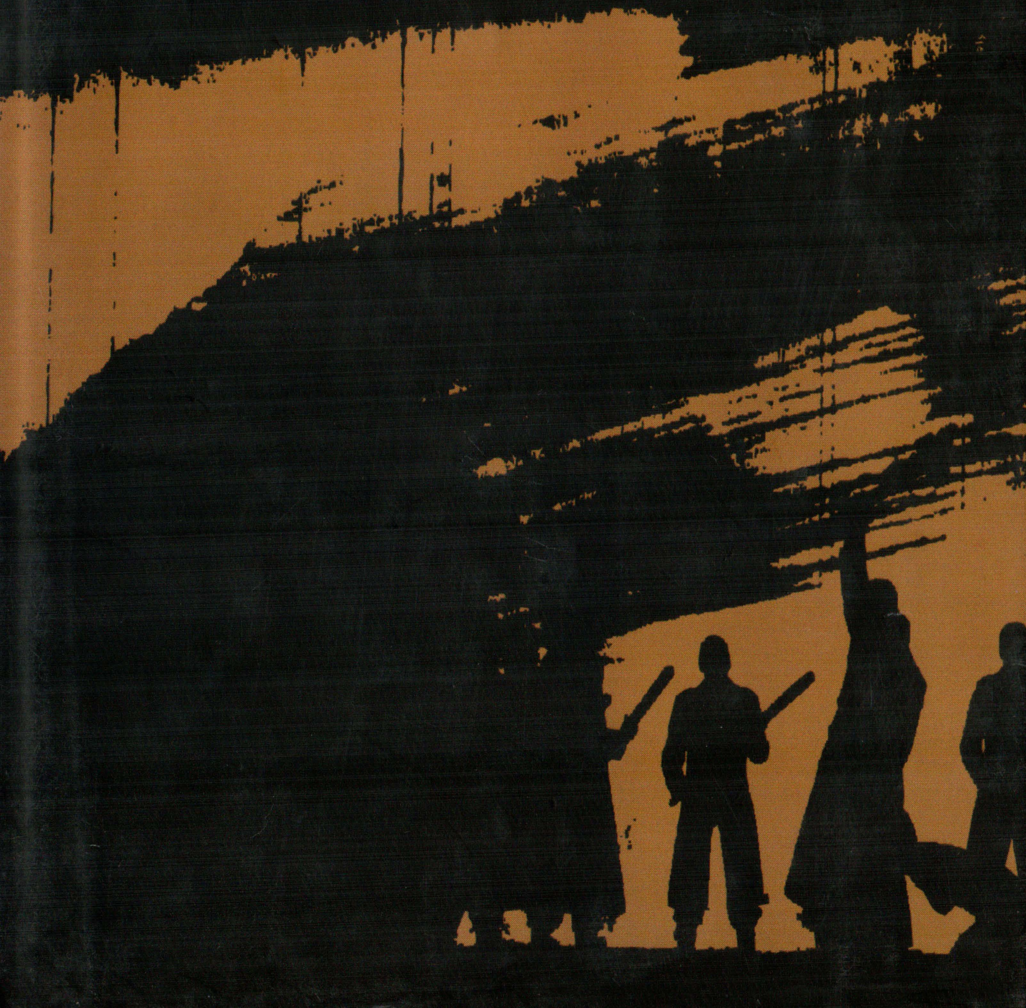

এই উপন্যাসের ভ্রূণের জন্ম হয়েছিলো আজ থেকে বছর দশেক আগে, আমি যখন জার্মান রেডিও ডয়েচে ভেলেতে কাজ করতে কোলনে গিয়েছিলাম। তখন আমি ছাব্বিশ বছরের তরুণ। মনে আছে কোনো এক সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসাধারণ এক প্রেম ও যন্ত্রণার গল্প শোনার পর ওই রাতেই লিখতে শুরু করেছিলাম আমি। শুধু কয়েকটা অধ্যায় লেখা হয়েছিলো তখন। তারপর বন্ধ ছিল বহু বছর। জীবিকার জন্যে তার পরের সময়টা আমাকে নানা শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। একটা বাক্যও লিখতে পারিনি সেসময়। বছরখানেক আগে লেখাটা আবার শুরু করি আমি। জার্মানির তখনকার সমাজ ও সময় ধরে রাখার জন্যে লেখায় আমি বেশ কিছু জার্মান শব্দ ব্যবহার করেছি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো পরিহারের চেষ্টাও ছিল। মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক। ইতিহাসের উপাদান আছে এখানে কিন্তু এটা ইতিহাস নয়। জীবিত বা প্রয়াত কারো সাথে কোনো চরিত্রের মিল পাওয়া গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। আমার জীবনের বড় দুঃখ আমি মুক্তিযুদ্ধ করিনি। কিন্তু যুদ্ধের গল্প শুনেছি। অমর এই গল্পটাই আমি তুলে দিতে চেয়েছি নবাগতদের মুখে, যাতে এই কাহিনি ওরাও ছড়িয়ে দিতে পারে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে। মুক্তিযুদ্ধের এই গল্প বলার সময় আমি যে গভীর বেদনা ও আনন্দ অনুভব করেছি পাঠকদের মধ্যে তার কিছুটা সঞ্চারিত হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মিজানুর খান
লন্ডন, জানুয়ারি ২০১০

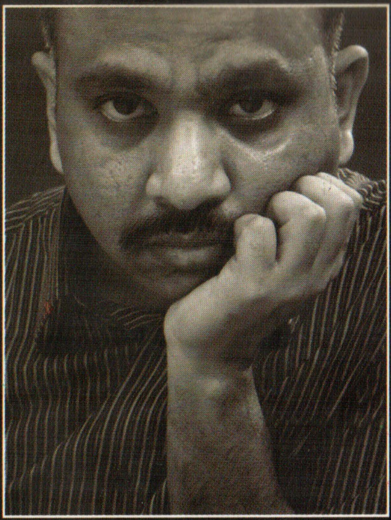

ছবি : ডেভিড বারিকদার

মিজানুর রহমান খানের জন্ম যুদ্ধের সময়। গ্রামের বাড়ি। কুমিল্লায়। ঢাকায় লেখাপড়া, শাহীন স্কুল ও বিজ্ঞান কলেজে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সাংবাদিকতা বিষয়ে। জীবিকার জন্যেও তিনি আছেন এই পেশায়। ঢাকায় বহুল প্রচারিত সাময়িকী সাপ্তাহিক বিচিত্রা, সাপ্তাহিক ২০০০ ও দৈনিক পত্রিকা ডেইলি স্টারেও কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়। পেয়েছেন নুরজাহার স্মৃতি পুরস্কার। জার্মান রেডিও ডয়েচে ভেলেতে সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। এখন বিবিসিতে কাজ করছেন প্রযোজক হিসাবে। সপরিবারে তিনি এখন লন্ডনে বসবাস করছেন। স্কুল ছাড়ার সময় লেখালেখি শুরু করেছিলেন ছড়া ও কিশোর কবিতা দিয়ে, পরে প্রবন্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর আরও দুটো বই লিখেছেন তিনি। একাত্তরের গণহত্যার ওপর তার একটি বই নিউইয়র্ক থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

সোনার পরমতলা তার প্রথম উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

সোনার পরমতলা
মিজানুর খান

প্রকাশক
আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪১৭
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ
তৌহিন হাসান

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
চারশত টাকা

SONAR PAROMTALA a novel by
Mizanur Khan.
Published by Arifur Rahman Nayeem
Oitijjhya.
Date of Publication : February 2011.

website: www.oitijjhya.com
Email: oitijjhya@gmail.com

Copyright@2011 Mizanur Khan All rights
reserved including the right of reproduction in
whole or in part in any form.

Price: Taka 400.00 US$ 25.00
ISBN 978-984-8863-84-8

শত শত কিন্তু ও যদি সত্ত্বেও
জীবনের দুই পরম আশ্রয়
আদিব ও আভাকে

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

এই উপন্যাসের ভ্রূণের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে বছর দশেক আগে আমি যখন জার্মান রেডিও ডয়েচে ভেলেতে কাজ করতে কোলনে গিয়েছিলাম। তখন আমি ছাব্বিশ বছরের তরুণ। মনে আছে, কোনো এক সন্ধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসাধারণ এক প্রেম ও যন্ত্রণার গল্প শোনার পর ওই রাতেই লিখতে শুরু করেছিলাম আমি। শুধু কয়েকটা অধ্যায় লেখা হয়েছিল তখন। তারপর বন্ধ ছিল বহু বছর। জীবিকার জন্য তার পরের সময়টা আমাকে নানা শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। একটা বাক্যও লিখতে পারিনি সে সময়। বছর খানেক আগে লেখাটা আবার শুরু করি আমি। জার্মানির তখনকার সমাজ ও সময় ধরে রাখার জন্য লেখায় আমি বেশ কিছু জার্মান শব্দ ব্যবহার করেছি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো পরিহারের চেষ্টাও ছিল। মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসের চরিত্রগুলো কাল্পনিক। ইতিহাসের উপাদান আছে এখানে কিন্তু এটা ইতিহাস নয়। জীবিত বা প্রয়াত কারও সঙ্গে কোনো চরিত্রের মিল পাওয়া গেলে, তা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। আমার জীবনের বড় দুঃখ, আমি মুক্তিযুদ্ধ করিনি। কিন্তু যুদ্ধের গল্প শুনেছি। অমর এই গল্পটাই আমি তুলে দিতে চেয়েছি নবাগতদের মুখে, যাতে এই কাহিনি ওরাও ছড়িয়ে দিতে পারে অনাগত ভবিষ্যতের কাছে। মুক্তিযুদ্ধের এই গল্প বলার সময় আমি যে গভীর বেদনা ও আনন্দ অনুভব করেছি, পাঠকদের মধ্যে তার কিছুটা সঞ্চারিত হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মিজানুর খান
লন্ডন, জানুয়ারি ২০১০

২১ নম্বর বাড়ি

আমরা যে বাড়িতে থাকি তার সামনের রাস্তাটা পিওনিয়ার স্ট্রাসে। প্রাচীন চারতলা বাড়ির তিনতলায় আমি, সজল আর রফিক। এখানে আসার কথা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, কত সালে আর কোন মাসে, কী বার ছিল এবং কত তারিখে। সেদিন জানালার কাচে রোদ ছিল না, তবে আকাশ ছিল পরিষ্কার নীল আর শহরের বাতাসে ছিল চোরা শীত। সে বছর বুন্ডেসলীগায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বায়ার্ন ম্যুইনশেন, মাত্র ছয় পয়েন্ট কম নিয়ে তার পেছনে ছিল এই শহরের ফুটবল ক্লাব এফসি ক্যোলন। সে কারণে এখানকার মানুষের মনে দুঃখ ও শোকের কমতি ছিল না, সন্ধের পর পাবের ভেতরে উঠত শোকের মাতম, বুকের মধ্যে ফুটবল জড়িয়ে ওরা হাউমাউ করে কাঁদত আর বলত ফুসবাল গট হলো একজন বায়ার্ন, হেরে যাওয়ার দায়টা ওরা ছেড়ে দিয়েছিল ঈশ্বরের ওপর। ওটা ছিল ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনো এক শনিবার, তার কয়েক দিন আগে পূর্ব ও পশ্চিম এক হলো, বন থেকে রাজধানী চলে গেল বার্লিনে, তার কয়েক দিন পর, হয়ত কপালের দোষে অথবা ভাগ্যের গুণে কিংবা অমোঘ নিয়তি হিসেবে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমাদের পুরনো আশ্রয়। আর ঠিক তখনই এই বাড়ি খুঁজে পাওয়াটা আমাদের জন্য ছিল চরম এক সৌভাগ্যের ঘটনা।

বাড়িটা ছিল রাস্তার শেষ মাথায়, নিরিবিলি, মানুষের হইচই আর গাড়ির ঘোত ঘোত আওয়াজ থেকে দূরে। ছিল দুটো ঘুমানোর ঘর, নতুন টাইলস বসানো বাথরুম, তেলতেলে আঠালো কিচেন আর একটা লাউঞ্জ। যেটুকু সময় আমরা বাড়িতে থাকতাম তার পুরোটাই কাটাতাম ওখানে, অর্থাৎ বসার ঘরে, যদিও ওখানে কোনো চেয়ার ছিল না, আমরা বসতাম কার্পেটের ওপর, বসতাম মানে এখানে ওখানে উপুর অথবা চিৎ কিংবা কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম। আমাদের সঙ্গে ছিল আরও একটা জিনিস, ধুলোর আস্তরণ জমে জমে মলিন হয়ে যাওয়া রুপালি রঙের একটা গ্রুনডিগ টেলিভিশন।

পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই বাড়িটায় শুরুতে ছিলাম আমি আর রফিক। বছর খানেক পরে শহর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে রফিকের অবস্থা

বেহাল হয়ে গিয়েছিল। টান পড়েছিল আমাদের পকেটে। তখন আমরা সজলকে নিয়ে এসেছি, একটা রেস্টুরেন্টে ব্ল্যাক জব করত সজল। মাসের শুরুতে ও আমাদের যা দিত, তাতে আমরা খুশি। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর আমাদের হাতে তখনো কিছু থাকত। ঢাকায় টাকা পাঠানোর মতো আবার স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠল আমাদের রিক্ত পকেট। এ রকম কিছু ডয়েচ মার্কের জন্যই তো দেশের মাটি ছেড়ে আজ আমরা এত দূরে !

অবশ্য বাড়ি ভাড়ার ফেট্রাগে সজলের নাম নেই। বাড়িওয়ালার কাছে ও আমাদের অতিথি। আমার আর রফিকের যৌথ স্বাক্ষরেই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম জানুয়ারি মাসের কোনো এক তুষারঘন দুপুরে। আমরা যেদিন ট্রামে করে কয়েক দফায় এই বাড়িতে বিছানা ও হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে আসি সেদিন শুরুটা ভালো ছিল, ছিল উজ্জ্বল সকাল, কিন্তু দুপুরের কাছাকাছি ছাইকালো হয়ে এল ডোমের ওপরে এক চিলতে নীল আকাশ। তারপর এক সময় বলা নেই কওয়া নেই, শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি, তারপর তুষার আর তুষার, তুলার ছিটার মতো। মনে হলো আকাশের কোথাও, কোনো এক কোনায় বসে, একজন লেপ-তোষকওয়ালা তুলা ধুনছিল। বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে গলা উঁচু করে থাকা চিমনিটাও ছেয়ে ছিল তুষারে। গাছের সবুজ পাতায় বরফ, রাস্তার মরা পাতায় বরফ, বরফ গির্জার চূড়ায়, এমনকি গাড়ির দরজার হাতলেও, আর পিওনিয়ার স্ট্রাসেকে মনে হচ্ছিল সাদা একটা রিবনের মতো। প্রচণ্ড শীতে জবুথবু আমি আর রফিক যখন বরফে ঢাকা পিওনিয়ার স্ট্রাসের উত্তর-দক্ষিণ রাস্তাটার বাঁ ধারের এই বাড়িটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তখনই রফিক মন্তব্যটা করেছিল। বলেছিল, 'মানুষের জীবন বড় অদ্ভুত। একটা মাত্র জীবন মানুষকে কত দিকে নিয়ে যায় !'

বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। ইটের পর ইট বসিয়ে চার পাশের দেয়ালগুলো যেভাবে ওপরে তোলা হয়েছে, জানালাগুলো যেমন এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ছড়ানো, তাতে খুব সহজে বোঝা যায় যে এটা বহু পুরনো বাড়ি। বাড়িটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইউগেন্ড স্টিল বা আর্ট নভ্যু ডিজাইনে তৈরি। লুকিয়ে রাখারও কোনো উপায় নেই যে বাড়িটা একসময় যে রকম ছিল, এখন আর হুবহু সে রকম নেই, এখানে-ওখানে মেরামত করা হয়েছে, ভবনের গায়ে নতুন করে এটা-ওটা লাগানো হয়েছে, প্লাস্টিক সার্জারির মতো, তবে বনেদি ভাবটা রয়ে গেছে এখনো। বাড়ির নম্বরটা যেখানে লেখা, ২১, তার পাশেই ভাড়াটেদের নেম প্লেট, নাম আছে মালিকেরও, হেরমান গ্র্যোটে। বিদেশি দুই যুবা দেখে বাড়িওয়ালা প্রথমে ইতস্তত করলেও, পরে তার সঙ্গে আমাদের একটা ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। চুক্তি হওয়ার সপ্তাহ খানেক আগে রফিক একা এসেছিল এই বাড়িতে। ব্যালকনিতে বসে কাফে খেতে খেতে ও শুনেছিল বাড়িওয়ালার সব দুঃখের কাহিনি। তারপর বাড়িটা পেতে আমাদের আর কোনো ঝামেলা হয়নি।

বাড়িওয়ালী ফ্রাউ গ্র্যোটের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরও বেশি। বাথটাবের পানি সরছে না, করিডোরে বাতিটার ফিউজ জ্বলে গেছে, এ রকম কিছু হলে আমরা দৌড়ে যাই তার কাছে। বাড়ির সামনের রাস্তায় অথবা সুপারমার্কেটে দেখা হলে তিনি এগিয়ে আসেন আমাদের কাছে, হাসতে হাসতে কথা বলেন, জড়িয়ে ধরেন, কখনো কাঁধে কখনো কোমরে। আমাদের তিনি ডাকেন, 'মাইনে ইয়্যুংগে।'

মাঝেমধ্যে বেতের ঝুড়ি ভর্তি করে তিনি আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন গ্রামের জমি থেকে তোলা টসটসে স্ট্রবেরি, ওগুলোর গায়ে লেগে থাকত কাদামাটি, বেসিনের মুখ বন্ধ করে ফলগুলো পিংপং বলের মতো পানিতে ভাসিয়ে আমি ধুয়ে দিতাম, দুই হাতের আঙুলে চিমটি মেরে সবুজ সবুজ পাতাগুলো ছিঁড়ত সজল আর রফিক কাঁচা মরিচ দিয়ে স্ট্রবেরির ভর্তা বানাত। আমাদের মুখে তার স্বাদ ছিল জাম ভর্তার মতো। ফ্রাউ গ্র্যোটে ক্রিসমাসের সময় আমাদের জন্য নিয়ে আসতেন গ্রিল করা রোস্টার, চকোলেট দিয়ে তৈরি বিশাল বিশাল কুখেন আর আস্ত বাঁধাকপি কয়েক দিন ভিনেগারে পচিয়ে তৈরি করা যাওয়ার ক্রাউট।

এসব কিছুর জন্যই এই বাড়িটা আমাদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে ঢোকার মুখে, লোহার দরজার বা পাশে, আরও সাতটা নামের পাশে টাইপ করে লেখা হলো আমার আর রফিকের নাম। গেটের দুই পাশে চারটা বড় বড় ফুলের টব। ফুলের ঠিক না, গাছের। বাড়িটার ভেতরে ঢুকে যেখানে সিঁড়ি তার গোড়ায় সামান্য একটু খোলা জায়গা। সেখানে হলুদ হয়ে আসা একটা গাছ সিঁড়ির জন্য ওপরে উঠতে না পেরে মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো কখনো সেখানে রাখা থাকে একটা কিন্ডারভাগেন । আর সিঁড়িটা পার হয়ে, দুই পাশের দুই ফ্ল্যাটের দরজার মাঝ দিয়ে সরু যে রাস্তাটা পেছনের বাগানে গিয়ে মিশেছে, তার বাম দিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাঙাচোরা পুরনো একটা হুইল চেয়ার।

করিডোরের বাম দিক দিয়ে সিঁড়ি আর ডান দিকের দেয়ালে লাগানো ছিল একটা লম্বা নোটিশ বোর্ড। কবে জানালার কাচ পরিষ্কার করা হবে, কবে ঘাস কাটার লোক আসবে, কে কবে বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, এ রকম কিছু টুকরোটাকরা খবর পিন দিয়ে সাঁটানো থাকত সেখানে। থাকত ছোট ছোট কিছু কাগজ। হলুদ রঙের কাগজে বড় একটা চাবির ছবি, তার নিচে টেলিফোন নম্বর, এরা তালাচাবিওয়ালা। কখনো কখনো জন্মদিনের শুভেচ্ছাও টাঙানো থাকতে দেখেছি। রাইনে সাঁতার কাটতে গিয়ে একবার একটা ছেলের ডুবে মরার খবরও ছিল ওখানে। ছেলেটা থাকত এক তলায়, সোমালিয়া থেকে আসা একটা পরিবারের ও ছিল বড় ছেলে। মারা যাওয়ার আগের দিনও তাকে দেখেছিলাম ট্রাম স্টেশনে, ওর হাতে ছিল লাল রঙের বাস্কেটবল আর পায়ের তলায় রং ওঠে যাওয়া একটা স্কেট বোর্ড।

সেই জানুয়ারি মাস থেকে আমরা এই বাড়িতে। এর মধ্যে আরও নতুন কিছু ছেলে এসেছে, চলেও গেছে। কেউই খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। উষ্ণ আর সংক্ষিপ্ত সামারের মতো এই গৃহে ক্ষণস্থায়ী ছিল তাদের সংগ্রামক্লান্ত জীবন। এদের কেউ সরকারের সঙ্গে মামলায় হেরে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে, আবার কেউ নিশ্চিত জীবনের সন্ধানে জার্মানি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করেছে।

আমাদের সঙ্গে একসময় মাঈনুদ্দিন নামের এ রকম একটা ছেলে ছিল চট্টগ্রামের। বহু বছর বিদেশে থাকার পরও সে কথা বলত আঞ্চলিক ভাষায়। অস্কার লাফনটাইনকে হারিয়ে হেলমুট কোল তখন বুন্ডেসকানৎসলার, সরকারের নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার কথা হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে আলোচনা চলছিল রাজনৈতিক আশ্রয়ের আইন কড়াকড়ি করার। সরকারের একজন মন্ত্রী একদিন সংসদে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জাহাজ ভরে গেছে।' এই কথার পর মাঈনুদ্দিন শুধু বলল, 'বালের টাইটানিক', তারপর ও একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। কোথায় গেল, কখন গেল...আমরা কেউই জানতে পারিনি। বহু দিন পর আকস্মিক টেলিফোন। কে ? আমাদের মাঈনুদ্দিন। কোত্থেকে ? সিসিলি। কীভাবে কীভাবে যেন সে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে প্রথমে আমস্টার্ডাম, পরে ভার্সাই হয়ে ও ইটালির এই শহরে গিয়ে উঠেছিল।

ফ্রাউ গ্র্যোটের কাছে শুনেছি মজবুত আর বিশালাকৃতির কয়েকটা ঘরের এই বাড়িটা তৈরি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে, বানিয়েছিল তার শ্বশুর। গ্র্যোটে ছিল তার শ্বশুরের একমাত্র ছেলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্র্যোটের বাবাকে ফ্রান্সে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, ছেলে আর বউকে রেখে গিয়েছিল কোলনে। কিন্তু ওখান থেকে সে আর ফেরেনি, তখন থেকেই সে নিখোঁজ। যেদিন আমরা প্রথম এসেছিলাম এখানে, সেদিন বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে ফ্রাউ গ্র্যোটে বলেছিলেন, যুদ্ধের সময় সারা পৃথিবী যখন ধ্বংসযজ্ঞে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, বোমায় বোমায় আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছিল বাড়িটা, তখন অবশ্য ছিল তিনতলা। পরে মেরামত করার সময় বাড়িটাকে আরও একতলা উঁচু করে দেওয়া হয়েছে।

আমরা থাকতাম তিনতলায়, সিঁড়ির ডান দিকে। পুব দিকের শেষ মাথায় যে ঘর তার দেয়ালজুড়ে ছিল একটা বিশাল জানালা। সামনে ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট সবুজ একটা বাগান। তার এক কোনায় বালুর পুকুর। সেখানে খেলা করত বাচ্চারা। বাগানটার চারদিকে উঁচু উঁচু গাছের বেড়া, বসন্তে হয়ে উঠত ফুলের বেষ্টনী। আর ভিন্টারে এই মাঠটা যখন বরফে বরফে সাদা হয়ে উঠত মনে হতো বাড়িটা হিমবাহে ছেয়ে থাকা সমুদ্রে বহুতল জাহাজের মতো ভাসছে।

সামারে ছুটির দিনে আমরা এই মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলি। কখনো কখনো বাইরে থেকে বন্ধুরা এলে বারবিকিউ পার্টি করি। শনিবারে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি, আমরা বিয়ারের সঙ্গে কয়লার আগুনে হেনশেন, রিভফ্লাইশ, লাল পেঁয়াজ, টমেটো আর আলু ঝলসিয়ে খাই। দূর থেকে ভেসে আসা পাখির অচেনা ডাক শুনতে পেয়ে শিহরিত হই আর 'কোকিল কোকিল' বলে চিৎকার করে উঠি।

এই পার্টির খবরও নোটিশ বোর্ডে আমাদের আগাম জানাতে হতো।

বাগানটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে একটা কিন্ডারক্রাংকেন হাউসের সীমানার শুরু। বাচ্চাদের ক্লিনিক বলে তার সামনে খেলার জন্য একটা পুকুরের মতো বানানো হয়েছে। শুধু বালি আর বালি এই পুকুরে, তার ভেতরে ছিল প্লাস্টিকের ছোট ছোট কয়েকটা বালতি ও কোদাল, কাঠ দিয়ে বানানো নানা রকম গাছের খেলনা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি কখনোই সেখানে অসুস্থ বা সুস্থ কোনো শিশুকে খেলতে দেখিনি, বরং বাড়ন্ত কিছু ছেলেমেয়েকে এখনো দেখি সন্ধ্যার পর একটা বেঞ্চিতে নিবিড় ঘন হয়ে বসে থাকতে। কখনো কখনো তাদের আমরা চুমু খেতেও দেখেছি। এই ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত আমরা দেখতাম পুব দিকের ঘরের বাতি নিভিয়ে, অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে, জানালার এ পাশে চোরের মতো ঘাপটি মেরে।

ওদের তখন শিশুর মতোই দেখাত।

পিওনিয়ার স্ট্রাসের মাথায় ঘটেছিল সেদিনের সেই ঘটনা। তখন আগস্ট মাসের শেষ সময়। গ্রীষ্ম বলছে যাই যাই। মেটামরফসিস চলছে এই শহরের। জরাগ্রস্ত গাছগুলোর শরীরে তখন যৌবন ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। কুঁচকে বুড়িয়ে যাচ্ছে ওদের গায়ের ছাল, ন্যাড়া হচ্ছে মাথা। পাতার সবুজ রং মুছে গিয়ে লাল-কমলা-হলুদ-ধূসর হয়ে ঝরে পড়ছে সবখানে। ফুটপাত, ট্রাম স্টেশন, বিয়ারগার্টেন, পার্কিং এরিয়া, বাড়ির ছাদ, সামনে ও পেছনের একচিলতে বাগান, বালুর পুকুর সব ছেয়ে আছে খয়েরি পাতায়। চারদিকে শুধু পাতার লাশ। তখন খোলস বদল করছিল ছোট্ট এই শহর।

সেদিন কোলনের বাতাসে উড়ছিল ম্যাপলের শুকনো পাতা আর সন্ধ্যার আগেই কেমন ঠান্ডা, নিস্তেজ ও হলুদ হয়ে গেল সূর্যের আলো। অমঙ্গলের আভাস ছিল শহরের হাওয়ায়।

আমার ভেতরেও তখন হু হু করে বয়ে যাচ্ছিল পালাবদলের হাওয়া। শীতে কাতর গাছগুলোর মতো আমিও কাবু হয়ে পড়েছিলাম খুব। মাঝেমধ্যেই খবর পাচ্ছিলাম, ঢাকায় শীলার বিয়ের তোড়জোর চলছে। ও আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছিল না। আজ এদিক থেকে, কাল ওখান থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। লাইন ধরে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা নাকি আসছিল, আসছিল লেফট রাইট করা

জলপাই পোশাকের ছেলেদের বাবারাও। কিন্তু আমার তখন দেশে ফেরার উপায় ছিল না। জীবন আর ভবিষ্যৎ আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ২১ নম্বর এই বাড়িটার ভেতর।

মনের এই ধাক্কা এসে লেগেছিল আমার শরীরেও।

পা দুটো তখন আমাকে বহন করতে পারছিল না। শরীরটা বিশাল ভারী একখণ্ড পাথরের মতো মনে হতো। তিনতলা পর্যন্ত যখন সিঁড়ি ভাঙতাম, দরজার কাছে গিয়ে মনে হতো, এই বুঝি এখনই আমি ধসে পড়ব। নিজেকে এত ভারী লাগত যে মনে হতো, দোতলা আর একতলার ছাদ ফুঁড়ে আমি একেবারে নিচে গিয়ে পড়ব, যেখানে আমার জন্য রাখা আছে একটা হুইল চেয়ার। ক্লান্তিতে আমার চোখ বুজে আসত আর ঘুমালেই আমি স্বপ্ন দেখতাম। রাতের পর রাত, ভোরের পর ভোর, রাতের পর ভোর, ভোরের পর রাত। একেকটা স্বপ্ন ছিল মৃত্যুর মতো কুৎসিত। কত রকমের সব স্বপ্ন–রাইনের মাঝখানে ডুবে যাচ্ছি, আমার হাত থেকে ফসকে গেছে লাল বল, আরও দূরে স্কেট বোর্ডটা নৌকার মতো দুলছে, সেখানে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে শীলা।

পানির পিপাসায় জেগে উঠতাম আমি আর ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর যখন বিছানায় উঠে বসতাম, মশারির মতো আমাকে ঘিরে থাকত একটা অচেনা স্তব্ধতা।

কারখানা থেকে বাসায় ফেরার পথে মনে হতো, আমি হয়ত জীবনেও আমাদের ফ্লোর পর্যন্ত ডিঙাতে পারব না। বাড়ির তিনতলায় পৌঁছানোর চেষ্টাকে শীলার কাছে যাওয়ার মতো অসম্ভব মনে হতো। মনে হতো, এটা এক দুর্লঙ্ঘ্য আর অজেয় পথ। কাজের জন্য যখন বের হতাম, ট্রাম স্টেশনে ঢোকার আগে হঠাৎ উড়াল দেওয়া ওভারব্রিজটা ভেঙে আসা পায়ে পার হতে গিয়ে মনে হতো, ১৬ এবং ১৫ নম্বর, সবকটা ট্রামই আজ আমাকে রেখে চলে যাবে।

আমার ওজন তখন অবিশ্বাস্য রকমের কমে গিয়েছিল। মনে আছে, ঘটনার দিন কয়েক আগে এক রাতে রফিক এসে খবর দিল যে রাস্তার মাথায় একটা সোফা কেউ একজন ফেলে গেছে। দেখতে একেবারে নতুনের মতো। এখনই না আনলে সেটা বেহাত হয়ে যেতে পারে। আমাদের বসার ঘরে তখন একটা সোফা হলে ঘরের রোশনাই বাড়ে। এটা আমরা প্রায়শ আলাপ করতাম আর থাকতাম অপেক্ষায়।

এই পিওনিয়ার স্ট্রাসে থেকে আমরা অনেক কিছু কুড়িয়ে পেয়েছি। চেরি রঙের একটা বুক শেল্ফ, একটা কিং সাইজের ম্যাট্রেস আর ওক কাঠের চারটা চেয়ারসহ কাচের একটা ডাইনিং টেবিল। ঘরের ভেতর যে টেলিভিশনটা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা চলে, ওটাও আমরা পেয়েছিলাম পিওনিয়ার স্ট্রাসের পশ্চিম কোনায়।

মনে আছে, সেদিন রাতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর সেই সোফাটা রাস্তা থেকে তুলে আনতে গিয়ে দোতলার সিঁড়ি যেখানে তিনতলার জন্য বাঁক খেয়ে ওপরের দিকে মোড় নিয়েছে, সেখানে উল্টে গিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা খুঁইয়ে ফেলেছি। খুব কাহিল বলে দাঁড়াতে পারছিলাম না আমি। আমার তখন একবার দম নিলে সেটা আর ছাড়ব না, এই দশা। ভয় হতো, শ্বাস ছেড়ে দিলে সেই দমটা যদি আবার ফিরিয়ে আনতে না পারি। ভয়ে বুড়োদের মতো কুঁচকে থাকতাম আমি। সব সময়।

আমি তখন কাজ করতাম একটা জুতা তৈরির কারখানায়। শহরের পশ্চিম দিকে, ট্রামটা বনে ঢুকে যাওয়ার কিছু আগে একটা জঙ্গলের পেছনে ছিল এই কারখানা। ব্রুল স্টেশনে নেমে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে অথবা একটা বাসে যাওয়া যেত ওখানে। পয়সা বাঁচাতে ব্রুল থেকে কারখানায় হেঁটে যেতাম আমি। কিন্তু ওই আগস্টে ওই অতটুকু পথও হেঁটে যাওয়ার কথা আমার কল্পনাতেও আসেনি।

মনে আছে, সেদিন আমি এতটা কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে কারখানায় ছুটির ঘণ্টা বাজার পর ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, প্রথমে ১৩০ নম্বর বাস, তারপর ১৫ অথবা ১৬ নম্বর ট্রাম, তারপর ওভারব্রিজ ডিঙিয়ে, ফুটপাথ মাড়িয়ে আমি হয়ত আর কখনোই পিওনিয়ার স্ট্রাসের ওই বাড়িটায় পৌঁছাতে পারব না। যেন ২১ নম্বরে পৌঁছানোর আগেই রাস্তার সব আলো নিভে যাবে। তারপর আমি তলিয়ে যাব একটা অন্ধকার কুয়ার ভেতর।

আমার ভেতর সাবানের ফেনার মতো বুদবুদ করছিল অচেনা ও অজানা একটা ভয়।

কারখানা থেকে ট্রাম স্টেশন পর্যন্ত বাসের রাস্তাটাকে একবার মনে হলো মৌচাক থেকে রামপুরা যাওয়ার খানাখন্দে ভরা এক সড়ক। আর ট্রামের লাইনটা মনে হলো তেজগাঁওয়ে। লাইনের দুই পাশে বস্তির পর বস্তি। একটা বস্তির নম্বর ২১। বস্তিটা চারতলা, তিনতলায় শীলার নতুন সংসার। তারপর মনে হলো, পিওনিয়ার স্ট্রাস আসলে কুমিল্লায়, সেফারা বাজার থেকে খাল পার হয়ে দক্ষিণে আমাদের গ্রামের বাড়ির দিকে, পরমতলায়।

একসময় বাড়ির সামনের রাস্তাটায় পৌঁছালাম ঠিকই, কিন্তু ছিটকে পড়লাম পশ্চিম দিকে, যেখানে রাস্তার এক কোনায় ছিল মিউনিসিপ্যালটির সবুজ ডাস্টবিন। সেটা উল্টে গিয়ে আমার শরীরের ওপর ডিমের খয়েরি খোসা, অরেঞ্জানযাফ্‌টের দুমড়ানো ঠোঙা, তার ভেতর থেকে পচে যাওয়া জুসের ফেনা আর শুকিয়ে যাওয়া ব্রকলির ডাটা এসে পড়েছে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি, হয়ত তখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম, তারপর আবর্জনার উৎকট গন্ধে নয়, বরং আমি

যখন ঘন ঘন দম নেওয়ার মতো বুক ভরে শ্বাস নিলাম, বেঁচে ওঠার শেষ চেষ্টা হিসেবে, কড়া পারফিউমের গন্ধে বুঝতে পেরেছিলাম অনুভূতিটা শরীরে আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে।

একজন মহিলা তার দুই হাতে আমার মাথাটা ধরে রেখেছে, চেষ্টা করছে গোটা শরীরটাকে ডাস্টবিনের নিচ থেকে টেনে বের করতে। আমার তেতো মুখটা তার ভারী বুকের মুখোমুখি। আমি অনুভব করতে পারছিলাম তার নরম স্পর্শ, অডিকোলনের গন্ধ। বুঝতে পারছিলাম না কোন দিকে তাকাব, কী করব। তার সেই স্পর্শে, অসুস্থ আর দুর্বল শরীরেও, আমার ভেতর অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি তখন চোখ বন্ধ রেখে তার বাহুর ওপর ভর দিয়ে অসাড় হয়ে পরে রইলাম, কিছুটা সময়।

মহিলা, মনে হলো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে তিনি আমাকে টেনে ফুটপাতের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। নিজেও বসেছেন আমার পাশে, গায়ে গা লাগিয়ে। আমি তাঁর শরীরে না তিনি আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, আজ আর সেটা মনে নেই। তবে গোপন করব না, তাঁর সেই স্পর্শের শিহরণ আমার এখনো মনে আছে, শুধু মনে নয়, জেগে আছে শরীরেও।

গোধূলির আলো

পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই পাশের মাথাটা ইংরেজি টি অক্ষরের মতো। তার ওপরে আড়াআড়ি সোজা দাগের মতো যে রাস্তা, ওটা হাতের ডান দিকে একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে চলে গেছে মূল শহরের দিকে। রাস্তাটার ওপাশে ঘন জঙ্গলের মতো। তার পেছনে কী, সেটা রাস্তার এপার থেকে বোঝা যায় না।

আমরা যখন ওখানে পড়েছিলাম, তখন রাস্তায় খুব একটা গাড়ি ছিল না, ফুটপাতে ছিল না কোনো পথচারীও, কোথাও কোনো শব্দও ছিল না, শুধু মাথার ওপর দিয়ে একটা বিমান উড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

বিমানটা আকাশের খুব নিচ দিয়ে উড়ছিল, ওটা ছিল লুফঠানসা, পেট পাখা আর লেজের কাছে মিটমিট করে জ্বলছিল জোনাকির মতো কয়েকটা লাল লাল বাতি, বিমানটা যাচ্ছিল শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

আমি বসে ছিলাম হাঁটু মুড়ে, দৃষ্টি তখন আনত, চোখ ছিল আমার কোলের ওপরে।

পিওনিয়ার স্ট্রাসের দুপাশের বাড়িগুলোর মাথার ওপরে ও আকাশের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল কুয়াশার মতো ফ্যাকাশে একটা আলো কিন্তু গাছগুলোর মাথায় তখনো অন্ধকার জমতে শুরু করেনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে রাস্তার নিয়ন বাতিগুলোও জ্বালানো হয়েছে, আলোটা ছিল হলুদ ও ম্যারম্যারে, আশপাশের কয়েকটা বাড়ির গেটের মুখে ঝুলন্ত বাতিগুলো জ্বলছিল কিন্তু কোনো কোনো বাড়ির জানালার আলো তখনো জ্বলেনি।

এই একইভাবে অন্ধকার নামত ফেলে আসা ঢাকায়, আমাদের যেখানে বাড়ি ছিল সেই নাখালপাড়ায়, এবং তারও আগে পরমতলায়, গ্রামের বাড়িতে। নাখালপাড়ায় সবার আগে আলো জ্বলত ছাদের ওপরে পানির ট্যাংকের মাথায়, কোনো ফ্ল্যাটে মাগরেবের আজানের আগেই বাতি জ্বালানো হতো, আবার কোনো তলায় সেটা জ্বলত চারদিক অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর। তবে পরমতলায় সব সময় রাত নামত কমবেশি এই একইভাবে, একই দিক থেকে, একই গাছ ও বাড়ির মাথার ওপরে, গ্রীষ্ম, বর্ষা অথবা বসন্তে, কখনো একটু আগে, আবার হয়ত কখনো দেরিতে।

বিমানের শব্দে মহিলা ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। আওয়াজটা একসময় খুব বিকট হয়ে উঠল, তারপর হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে। তখনই মহিলা অস্ফুট স্বরে বললেন, 'শাইসে কিড।' কথাটা বলার সময় তাঁর কপাল কুঁচকে ছিল, কপালের রেখাগুলো ছিল অনেক বেশি তীক্ষ্ণ ও গভীর, চোখ দুটো ঢুকে ছিল কোটরের ভেতর।

আমার কানে এই আওয়াজটা এখনো বাজে, গালিটা তিনি ঠিক কীভাবে দিয়েছিলেন, কোন শব্দটার ওপর কতখানি জোর ছিল, তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। এমনভাবে বলেছিলেন যে মনে হলো কথাটা তাঁর মুখ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসেনি, এসেছে বুকের ভেতর থেকে, সহজাতভাবে। ওর কথাটা শোনাচ্ছিল দীর্ঘশ্বাসের মতো। তারপর তিনি কয়েকটা ঝাঁঝাল প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, ওগুলো ছিল ধারালো পাথরের মতো। তার আগে দুবার চিৎকার করে ডাকলেন, 'এই ছেলে, এই ছেলে।'

মহিলার গলায় ছিল তাচ্ছিল্যের সুর, ছিল বিরক্তি ও শ্লেষ মাখানো, কিন্তু আমি ওসব গায়েও মাখিনি।

আমাকে চুপ করে পড়ে থাকতে দেখে আরও রেগে গেলেন তিনি। তাঁর চোখগুলো তখন ছোট হয়ে এসেছে। ভেতরের মণি দুটো তেঁতুলের বিচির মতো। হাত দুটোতে ভর করে বসলেন ফুটপাতে। বললেন, 'এই ছেলে, পথ চলতে শিখিসনি ? সিগন্যালে লাল আলো জ্বলে উঠলে কী করতে হয়, জানিস না ? তুই কি কানা, নাকি মূর্খ ?' খুব জোরে চিৎকার করছিলেন তিনি। তার কথা যখন শেষ হলো, আশপাশের কোথাও কোনো একটা গাড়ির জোরে ব্রেক কষার শব্দ শোনা গেল।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মহিলা তাকালেন আমার চোখ বরাবর। তারপর বললেন, 'জানিস না তুই, জানিস না ?' তিনি এতটা রেগে গিয়েছিলেন যে কোমর থেকে বুক পর্যন্ত তাঁর গোটা শরীর একবার ওপরে উঠছিল, আবার নামছিল। চোখ দুটো কুঁচকে রাখায় আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তাঁর কপালে বয়সের বলিরেখা।

ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমিও। কিছু বলার আগে দেখলাম, একটা ঝকঝকে নতুন সাইকেল রাস্তার পূর্ব পাশে, ফুটপাতের দিকে মুখ করে, হাতল চাকা আর প্যাডেল তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তার পেছনে আটকে আছে একটা গাড়ি, গাড়ির পেছনের জানালায় একটা বাচ্চার মুখ। তার পেছনে আরও একটা গাড়ি, লম্বা। একটা ক্যারাভ্যান।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল মাঝবয়সী একটা লোক। লোকটা ছিল ল্যাম্প পোস্টের মতো উঁচু, জুতার শব্দ হলো, মাপা মাপা, তারপর খাট করে বন্ধ হলো দরজা। ওর হাতের আঙুলে ছিল একগোছা চাবি। জানতে চাইল আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না। লোকটা যখন কথা বলছিল, তখন তিনি

আঙুলের মাথায় চাবিগুলো ঘুরাচ্ছিলেন। আমরা কেউই কোনো কথা বলিনি। লোকটা আমার দিকে এল না, গেল মহিলার কাছে, তিনি তখনো রাস্তার মাঝখান থেকে সরে গিয়ে ট্রাফিক সিগন্যালের খাম্বাটার গোড়ায়, যেখানে ট্যাবলয়েড বিল্ড এবং এক্সপ্রেসের ভেন্ডিং মেশিন, তার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছিলেন। লোকটা ওখানে হাঁটু মুড়ে বসল, তারপর কিছু একটা বলল, খুব আস্তে, তার পরও আমার কানে এসে পৌঁছাল শব্দটা, প্রথমে বলল, ক্রাংকেন হাউস তারপর আর্জট তারপর ক্রাংকেনভাগেন এবং সবশেষে পুলিৎসাই।

গত কয়েক বছরের বিদেশ জীবনে রোগ-শোক নয়, দেশ থেকে উড়ে আসা কারও মৃত্যুর খবরও নয়, শীলার বিয়ে হওয়া বা না হওয়াও নয়, এই পুলিশই ছিল আমাদের কাছে একমাত্র ভয়ের কারণ। এদের ছায়া দেখলেও আমরা পথ বদলাই, গন্ধ পেলে দৌড়ে পালাই, দম বন্ধ হয়ে আসে আমাদের, গলা শুকিয়ে যায়, ভুলে যাই আমাদের নাম ও ঠিকানা।

অথচ মনে পড়ে, ঢাকায় ফুটবল লিগের খেলা দেখতে গিয়ে, টিয়ার গ্যাসে আধকানা হয়ে, স্টেডিয়ামের ঘুচঘুচে অন্ধকারে, প্রশ্রাবে ভেসে যাওয়া সিঁড়িতে পিছলে গিয়ে পুলিশের হাতে খামোকা কতবার পিটুনি খেয়েছি। অযথা লাঠির বাড়ি খেয়েছি হরতালের দুপুরে, পল্টনের মোড়ে, সচিবালয়ের দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে যাওয়ার সময়। আবার সুযোগ পেয়ে আমরা তার বদলাও নিয়েছি। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময়, উত্তাল ক্যাম্পাসে পুলিশকে বাটে পেয়ে বেধড়ক পিটিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, পুলিশি নির্যাতনের সেসব ছবি পরে আমাকে খুব সাহায্য করেছে। পত্রিকার ছোট ছোট কাটিং আউসল্যান্ডারামেট জমা দেওয়ার পর আমার শরণার্থী পরিচয়টা তাদের কাছে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, যত নির্মম ছবি, ততটাই নিশ্চিত আশ্রয়।

আমার কাছে সেসব এখন আরও অনেক কিছুর মতোই শুধু স্মৃতি।

স্মৃতির এই রেলগাড়িতে এখন শীলাও একটা বগি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সেই বগিতে পেছনে ছুটছে রূপ-রস-বর্ণ আর গন্ধ মাখানো ফেলে আসা কয়েকটা বছর, চটের ছালা দিয়ে ঘেরাও করা খালেকের টি-স্টলে যেখানে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে শীলা আর আমি বসে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাংলা একাডেমীর কাছে, ওখানে তুমুল অভিমান তারপর কোনো একসময় চুরচুর করে ভেঙে যাওয়া কাচের চুড়ি, হাইকোর্টের সামনে বটগাছের তলায় অপেক্ষমাণ সবুজ এক শাড়ি, চোখের জলে ভেসে যাওয়া পানপাতা মুখ, কানের দুই পাশ দিয়ে নেমে আসা সঘন দুই সরল বেণি আর টিএসসির কোনায়, ঠিক রোকেয়া হলের গেটের মুখে, ইউনিভার্সিটির লাল বাস থেকে হঠাৎই নেমে আসা এক জোড়া পা।

মহিলার সঙ্গে লোকটা কথা বলল আরও কিছু সময়। দুটো লোক আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল, ওদের মাথা ওভারকোটের ভেতর গলানো, একটা লোকের

বাম হাতের দড়িতে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা কুকুর, আরেক হাতে স্যালাইনের বোতল, টিউবের মাথাটা কুকুরের বুকের কাছে লাগানো। লোকটা কুকুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছিল, কখনো খুব ধীরে, আবার কখনো খুব দ্রুত।

পুলিশের কথা শোনার পর একটু আগে পালিয়ে যাওয়া জ্ঞানটা আমার মাথার ভেতর লাফিয়ে ফিরে এল। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে আমরা পুলিশকে ভয় পেয়েছি কিন্তু পুলিশের মারের ভয় কখনো পাইনি, ভয় ছিল শুধু কিছু কাগজের, সেখানে যদি কোনো গোলমাল দেখতে পায়, ঝামেলার কোনো গন্ধ ওদের নাকে গিয়ে লাগে, আমরা জানি, তাহলেই ঘাড় ধরে আমাদের তুলে দেবে দক্ষিণ দিকে উড়াল দেওয়া বিমানে।

একদিন দুপুরে বানহফের ঘটনা। জুলাই মাসের কোনো একটা উইকেন্ড, দুপুরের খাবারের পর আমরা হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, আমি সজল আর রফিক আমরা তিনজন, হাঁটছিলাম রাইনের তীর ধরে, লোহার ব্রিজটা পার হয়ে একবার নদীর ওপারেও গিয়েছিলাম, কিছু ছেলেমেয়ে তখন কোমরে দড়ি বেঁধে রক ক্লাইম্বিং করছিল, আমরা বসে থাকলাম ওখানে, ওপাশে ছিল একটা আর্ট গ্যালারি, ঘুরে দেখলাম ছবিগুলো, ওগুলো ছিল এক্সপ্রেশনিস্ট এক শিল্পীর কাজ, এখনো মনে আছে, কিছু একটা নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ হাসাহাসিও হলো।

সেদিন শহরে ছিল অনেক মানুষ, শহর ভেঙে নেমেছিল মানুষের ঢল, যেন সবাই নদীর পারে বেড়াতে এসেছিল, কেউ হাঁটছিল, কেউ বসেছিল, শুয়েছিল আবার কেউ দৌড়াচ্ছিল, কেউ কেউ শর্টস আর চপ্পল পরে আবার কেউ এসেছিল সাইকেলে।

রেলস্টেশনের বাইরে বেশ কড়া রোদ ছিল কোলনের আকাশে। সেই খুশিতেই কি না, কে জানে, টহলরত এক পুলিশের চোখ আমাদের দেখে চকচক করে উঠল। হয়ত ভেবেছিল, তাদের অলস জীবনে জুটেছে গরম কোনো কেস। আমরা তখন ডোমের পূর্ব দিকের সিঁড়ি, যেখান থেকে রেলস্টেশনটা মাত্র দশ সেকেন্ডের পথ, সেখান দিয়ে নামছিলাম। ওদের দুজন আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল, কুকুরটাকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখল, যেন এক পা নড়লেই আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়বে। ওরা আমাদের পাসপোর্ট দেখতে চাইল। যখন বললাম 'সু হাউজে', সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল ওদের হাতের আঙুলে ধরে রাখা লোহার সরু শেকল আর শেকলের মাথায় একটা হুন্ডের হিংস্র চাহনির চেয়েও আরও তীব্র ও ধারালো হয়ে উঠল দুই জোড়া চোখের শ্যেন দৃষ্টি।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কাছের একটা পুলিশ স্টেশনে। বহু পুরনো একটা ভবন, ঘরের ছাদগুলো আকাশের মতো উঁচু, আমাদের যেখানে বসতে দেওয়া হলো, তার কাছে ছিল একটা ফায়ার প্লেস, তার দুপাশে দুটো সিংহ, যেন

পাহারা দিচ্ছে, চা না কফি, কী খাব ওরা জানতে চাইল, কম্পিউটারে খোঁজা হলো আমাদের নাম ও পরিচয়, তারপর একসময় তাদের ভেতর জমতে থাকা উত্তেজনাটা চুপসে গেল বাসি বেলুনের মতো। আমাদের ওরা নামিয়ে দিয়ে গেল স্টেশনে, বিদায় নেওয়ার আগে, সময় নষ্ট করার জন্য এনশুলডিগুং বলে ক্ষমাও চাইল।

আমার মনে নেই, নষ্ট হওয়ার মতো সময় তখন আমাদের ছিল কি না।

লম্বা মতো লোকটা একসময় চলে গেল, প্রথমে শোনা গেল ওর জুতার শব্দ, মাপা মাপা, তারপর খাট করে দরজা বন্ধ হলো, ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হলো, বাচ্চা মেয়েটা পেছনের জানালায় হাত নাড়াল, চলে গেল রাস্তার ক্যারাভ্যানও। পিওনিয়ার স্ট্রাসের মাথায় পড়ে রইল শুধু বাসাবাড়ির কিছু আবফাল আর আমরা দুজন।

হাঁটু মুড়ে দ ভঙ্গিতে বসে ছিলেন তিনি। ওর চিবুকটা ছিল দুই হাঁটুর ওপরে। হাত উঁচু করে তিনি যখন দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, দেখতে পেলাম তাঁর টি-শার্টের হাতায় ও বগলের কাছে রক্তের মতো কিছু দাগ। প্রথমে ভেবেছিলাম, গোলাপি জামায় হয়ত আঁকা কোনো লাল টিউলিপ, নয়ত কিছু একটা লেখা।পুরোপুরি বোঝার আগে আবার বসে পড়লেন তিনি, দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন মহিলা, দুলে উঠছিল তাঁর শরীর, জোর বাতাসে মাচার ওপর থেকে যেভাবে পড়ে যায় লাউ অথবা কুমড়োর লতা। ফুটপাতের ওপর আবার বসে পড়লেন মহিলা, তারপর ডান হাতের আঙুলে কপাল চেপে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন তিনি। বুঝলাম যে তাঁর মাথা বেশ ভালোভাবেই ফেটেছে, তার সঙ্গে হয়ত ফেটেছে আমার ভবিষ্যতের কপালও।

দোষ ছিল পুরোটাই আমার, আমি দেখিনি সিগন্যালের লাল বাতি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে ছাড়া সেখানে আর কোনো পথচারী ছিল না, ছিল না কোনো গাড়িও। ফাঁকা দেখে রাস্তা পার হতে গিয়েছিলাম। আর তখনই কোত্থেকে যে সাইকেলটা হুট করে গায়ের ওপর এসে পড়ল, বুঝতেও পারিনি।

রাস্তার মোড়ে, যেখানে আমি পড়ে আছি, তার উল্টো দিকে, জেব্রা ক্রসিং বরাবর একটা হেয়ার স্টুডিও, কাট অ্যান্ড গো। ভেতরে অদ্ভুত চুলের দুটো মানিকিন। কাচের ভেতর শেলফে রাখা বিচিত্র রঙের কিছু চুল, কোনোটা সোজা, কোনোটা কোঁকড়ানো। লাল চুলের লম্বা মেয়েটি তাকিয়ে আছে পিওনিয়ার স্ট্রাসে যেখানে গিয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেদিকে। অন্যটার চুল সবুজ, তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে।

ততক্ষণে আমিও উঠে বসেছি। তারপর দাঁড়ালাম সোজা হয়ে। হেঁটে গেলাম মহিলার কাছে। বসলাম হাঁটু মুড়ে। ওর মাথার যেখান থেকে রক্ত পড়ছিল,

কোথায়, কোনখানে, কতটা কেটেছে, দেখতে গিয়ে আমার হাতের আঙুলগুলোও লাল হয়ে গেল। তারপর শীলার পাঠানো ফুলতোলা সাদা রুমালটা ধরে রাখলাম কপালের ওপর, মুহূর্তেই সেটা হয়ে গেল একটুকরো লাল সালুর মতো।

মহিলার বাহুতে দুহাতে ধরলাম আমি। তারপর টেনে দাঁড় করালাম ওকে। প্রথমে আমার কাঁধ ও পরে ট্রাফিক সিগন্যালের লম্বা খাম্বাটায় ভর করে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা থেকে আমি কুড়িয়ে আনলাম সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে ছিটকে পড়া বাগেট, স্পারগেলের একটা প্যাকেট এবং ছোট্ট একটা টেডি বেয়ার। ডাস্টবিনের তলার কাছে পড়েছিল ফটো রাখার একটা খাম, মুখটা খোলা, কুড়ালাম ছবিগুলো, পাতা কুড়ানোর মতো, ওগুলো ছিল স্বাস্থ্যবান একটা ঘোড়ার সাদা-কালো ছবি, কোনো ছবিতে আস্তাবলের ভেতর বেড়ার ওপর দিয়ে লম্বা মুখটা বাইরে বের করে রেখেছে, আবার কোনো ছবিতে ওটা তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে, চোখ দুটো টলটল করছে পানিতে।

মহিলা যখন তার নিজের পায়ে নিজের শক্তিতে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সাইকেলটাও দাঁড় করিয়ে দিলাম, রাখলাম স্ট্যান্ডের ওপরে।

সাইকেলটাও তার মনিবের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। তার চোখ দুটো তখন আমার দিকে নামানো। প্রথমে ক্ষমা চাইলাম, খুব শান্ত এবং অপরাধী গলায় বললাম, 'আমি জানি না, কী হয়েছে বা কেন হয়েছে, তবে যা হয়েছে, সেটা আমার দোষেই হয়েছে,' থামলাম আমি। তারপর বললাম, 'আপনার মাথাটা ফেটে গেছে, খুব রক্ত পড়ছে ওখান থেকে, এখনই ড্রেসিং করা দরকার, সামনে কয়েকটা বাড়ির পরেই আমি থাকি...' কথাগুলো বলে ফেললাম একটানা। তারপর একটু দম নিয়ে অনুরোধ করলাম ড্রেসিংটা আমার ওখানে সেরে যেতে। হাসলেন তিনি। টের পেলাম, আমার ভেতর ঘন মেঘের মতো যে ভয় জমাট বেঁধেছিল, সেটা বুদবুদের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

তখনো রফিক ঘরে ফেরেনি। সজল রেস্টুরেন্টে চলে গেছে বিকেলের আগে। ফিরবে পরদিন ভোরে।

বাগানের ওপাশে বাচ্চাদের যে ক্লিনিক, তার মাঠে কয়েকজন ছেলে ও বুড়ো প্লাস্টিকের গোলপোস্ট বসিয়ে ফুটবল খেলছিল। বলটা ছিল আগুনের গোলার মতো লাল। বুড়ো একটা লোক গোল করল আর সবাই হই হই করে উঠল। ক্লিনিকের কয়েক গজ দূরে বাস্কেটবল মাঠটা ফাঁকা ছিল আর দূরে নিঃসঙ্গ কয়েকটা ফ্ল্যাটের জানালার পাল্লাগুলো তখনো খোলা, কোনো কোনো জানালায় জালের মতো সাদা পর্দাগুলোও উঠানো।

২১ নম্বর পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাগানে তখনো দুটো ছেলে মারামারির অভিনয় করছিল। একজন ঘুষি মারছিল। অন্যজন কখনো বাম দিকে আবার কখনো ডান দিকে শুয়ে পড়ছিল মাটিতে।

তাকে বসতে দিলাম কুড়িয়ে আনা নতুন সোফায়, এক কোণে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। তারপর অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ক্ষত জায়গাটা মুছে একটা ব্যান্ডেজের মতো করে মাথায় কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিলাম। পট্টির নিচে, যেখানে ফেটেছে, সেখানে দিয়েছিলাম শীলার রুমাল। এরপর সৌজন্যবশত যখন জিজ্ঞেস করলাম, কফি খাবেন কি না, তখন তিনি 'নাইন নাইন' বলে চিৎকার করে উঠলেন। এত জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন যে রুমালটা খুলে পড়তে পড়তেও ঝুলে রইল ওখানে।

সারা ঘরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে ডেটলের গন্ধ।

বাম পায়ের ওপরে ডান পা তুলে বসেছিলেন তিনি। ডান হাতের তালু ছিল হাঁটুর ওপর। জানালা দিয়ে একনজর বাইরে তাকালেন, তারপর সময় দেখলেন ঘড়িতে, বললেন, তাঁর কিছু তাড়া আছে। কিছু একটা ভাবছিলেন মহিলা, তারপর শুধু জানতে চাইলেন, তাঁকে আমি বাড়িতে দিয়ে আসতে পারি কি না। এ রকম একটা দুর্ঘটনার পর অতটা পথ সাইকেলে যেতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। বলতে বলতে বাম পায়ের ওপর থেকে ডান পা নামালেন। তারপর কোমরে হাত দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, আবার বসে পড়লেন ওখানে।

'কী হয়েছে', জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মাথা ঘুরছে', বললেন মহিলা।

অপরাধ বোধেই কি না, কে জানে, নাকি অন্য কিছুর টানে, আমি আজও সেটা জানিনা, নিজের দুর্বলতা সরিয়ে, সব অসুস্থতা ভুলে, সব গোপন করে, তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে আমি নেমে এলাম পিওনিয়ার স্ট্রাসের ফুটপাতে। রাস্তায় কোনো লোকজন ছিল না, মাঝেমধ্যে দু-একটা গাড়ি এদিক-ওদিকে ছুটছিল, আমরা তখন চারজন, আমার বাম দিকে মহিলা, তার কপালে বাঁধা শীলা, মাঝখানে আমি আর আমার ডান দিকে মহিলার সাইকেল। আমার পাশে ওটা ঘোড়ার মতো হাঁটছিল।

তিনি থাকেন পাঁচতলা একটা বাড়ির চার তলায়। বাল্টহাসার স্ট্রাসের মাঝামাঝি এই বাড়িটা। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, বাড়িটা নতুন উঠেছে। গেটের সামনে একটা লন্ড্রি, ছোটখাটো একটা কিয়স্কও আছে। মহিলা সেখান থেকে দুধ কিনলেন আর নিলেন কয়েকটা মোমবাতি। তারপর বেজমেন্টে সাইকেলটা রেখে তাঁকে চার তলায় পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরে আসতে চাইলাম, তিনি একবারও আমাকে বললেন না ভেতরে যেতে। আমি কিছুটা আহত হলাম।

তিনি এমনভাবে হাঁটছিলেন, তাকাচ্ছিলেন চারদিকে, মনে হচ্ছিল তিনি হয়ত কারও জন্য অপেক্ষা করছেন।

আউফভিডারজেন বলে আমি বিদায় চাইলাম। মনে আছে, বিদায় চাওয়ার আগে আরও একবার ক্ষমাও চেয়েছিলাম। বললাম, 'আসি।' আমি যখন তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন, 'এই ছেলে', জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর দেশ কোথায় ?'

'বাংলাদেশ', বললাম আমি। ততক্ষণে আমি সিঁড়ির দিকে ঘুরে কয়েকটা ধাপ নেমেও গিয়েছিলাম। সিঁড়ির ধাপগুলো খুব বেশি প্রশস্ত ছিল না। পায়ের পাতার পুরোটা পড়ত না ওখানে। তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে কচ্ছপের মতো মাথাটা তুলে বললাম, 'দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারতের পাশে, ভারত ও বার্মার মাঝখানে।' দেশটাকে চেনাতে আরও কিছু বলতে গেলাম আমি। তখন মহিলা আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'জানি জানি....তোদের দেশ একাত্তর সালে জন্মেছে।'

তিনি দাঁড়িয়েছিলেন দরজার কাছে। পাল্লাটা অর্ধেক খোলা ছিল। তাঁর শরীরের পেছনে আড়াল হয়েছিল সাদা রঙের বিশাল একটা কাপবোর্ড, পায়ের কাছে ছিল একটা শু বক্স, তার পাশে মোড়ার মতো গোলাকার একটা টুল, তার ওপর কুশন বসানো এবং টুলটার কোনায় কার্পেটের ওপরে ভাঁজ করা একটা গাঢ় নীল ছাতা। দরজার ওখান থেকে সিঁড়িটা যেদিকে নেমেছে, সে পর্যন্ত মহিলার তেরচা একটা ছায়া। সিঁড়ির প্রথম ধাপে তাঁর কাঁধ এবং তার পরের ধাপে মাথাটা সালভাদার দালির ছবির মতো গলে গলে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আমার বিস্মিত চোখ দেখে তিনি হয়ত আমাকে ভেতরে ডাকলেন।ঘরের দুই দিকে দুটো জানালা। একটার মাঝামাঝি থেকে নেটের পর্দা ঝুলছে, তার ভেতর দিয়ে দেখা যায় আরও কয়েকটা পাঁচতলা-তিনতলা-চারতলা বাড়ি। ডান দিকের একটা বাড়ির ব্যালকনিতে ফুলের বাগান। ফুলের রং এতটাই তীব্র লাল যে তার পেছনে পুরো বাড়িটাকেও লালচে লালচে মনে হয়। হঠাৎ তাকালে মনে হবে, বাড়িটায় আগুন লেগেছে। অন্য জানালাটা ন্যাংটা, তার ওপাশে পরিষ্কার নীল আকাশ।

বসার ঘরের বাঁ দিকে ছোট্ট একটা কিচেন। সোজা হেঁটে গেলে যে জানালাটার ওপাশে আরও কয়েকটা বাড়ি, সেখানেই এক চিলতে ব্যালকনি। দরজার কাছে মানুষসমান একটা গাছ। বেশ যত্নআত্তি পেয়ে পাতাগুলো বর্ষায় বৃষ্টিভেজা কচুপাতার মতো সবুজ। ঘরে খুব একটা আসবাব নেই। একটা গোল কাঠের টেবিল, তেঁতুলের বিচির মতো রং, তার ওপরে একটা ভ্যালভেটের কাপড় বিছানো, ফুলের মতো নকশা কাটা। দুটো চেয়ার, সিডি স্ট্যান্ড, একটা বিশাল

বুক শেল্ফ, আর একটা লম্বা সোফা। সোফার এক কোণে হাইনরিশ ব্যোলের একটা খোলা বই।

তখন শেষ সামারের সন্ধ্যা। রাত নয়টা বেজে গেছে কিন্তু শহরের আকাশে তখনো ছড়িয়ে আছে তুষারের মতো নরম একটা 'যাই যাই' আলো। সন্ধ্যা নামার আগে এ রকম আলো ছড়িয়ে পড়ত পরমতলার আকাশেও, পুকুরের পশ্চিম পাড়ে, শিমুল গাছটার মাথার ওপরে। গোধূলির আলো। প্রথমে সূর্যটা থাকত কমলা রঙের। তারপর লাল। তারপর কড়া লাল। এবং গাঙের ওপারে সূর্যটা টুপ করে ডুবে যাওয়ার আগে ওটা হয়ে উঠত লালচে বেগুনি।

বাল্টহাসার স্ট্রাসের চারদিকে ছিল ওরকম একটা আলো। সেই আলো ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরও। আমি যেখানে বসেছি, তার মুখোমুখি দেয়ালে ক্লদ মোনের একটা ছবি। জলের ওপরে পদ্মপাতা। কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো। গোধূলির আলোটা এই ছবির ওপরে এসে পড়েছে।

আমাকে বসতে বললেন তিনি, তারপর চলে গেলেন শোওয়ার ঘরে, ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক পর, তার হাতে ডাকটিকেটের একটা অ্যালবাম, সবুজ কাপড়ে মোড়ানো। অ্যালবামটা দেখতে হালখাতার মতো। ডান দিকের সিঙ্গেল সোফায় বসলেন তিনি। অ্যালবামটা রাখলেন হাঁটুর ওপর। তারপর আমার দিকে সরে এলেন কিছুটা। ঝুঁকলেন বুকের কাছাকাছি। চোখের সামনে মেলে ধরলেন সেই অ্যালবামের একটা পাতা। ফিনফিনে পলিথিনের মতো পাতলা-স্বচ্ছ কাগজটা সরালেন ওই পাতার ওপর থেকে। সেখানে বাংলাদেশের ছোট্ট চারকোনা স্ট্যাম্প, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের একটা আবক্ষ ছবি।

গোধূলির আলো পড়েছে শেখ মুজিবের চশমার কাচের ওপর।

একদিন রবিবার

সজল আর রফিকের কাছে পুরো ঘটনাটা আমি আগাগোড়া চেপে গিয়েছিলাম। ২১ নম্বর বাড়িতে এ রকম খুব কমই হয়ে থাকে। এখানে আমরা কেউ কারও কাছে কিছু গোপন করি না অথবা লুকিয়ে রাখি না, এই বাড়ির অলিখিত চার্টার, আমরা সবাই এই নিয়ম মেনে চলি অথবা বলব মেনে চলার চেষ্টা করি, এর অন্যথা যে হয় না, তা-ও কিন্তু নয়। যেমন শুরুর দিকে আমরা যখন এখানে জীবন শুরু করি, রফিকের ওয়ালেট থেকে একবার একশো মার্কের একটা নোট সরিয়ে নিয়েছিলাম আমি, গোপনে। রফিক তখন ছিল কিচেনে। সে সময় কী কারণে আমার খুব টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, এখন আর সেটা মনে নেই। তবে মনে আছে, রফিক কোনো দিন এই টাকার কথা জিজ্ঞেস করেনি। হয়ত ও বুঝতেও পারেনি, হয়ত বুঝতে না পারার ভান করেছে, নয়ত ঠিকই বুঝতে পেরেছে কিন্তু আমার লজ্জার কথা ভেবে কখনো জানতে চায়নি। তারপর গ্রীষ্মের পরে শরৎ এসেছে, শীতের পর বসন্ত, প্রত্যেক মাসেই ভেবেছি, বেতন পেলে টাকাটা নিঃশব্দে ওর ওয়ালেটের ভেতর রেখে দেব, কিন্তু মাস আসে মাস যায়, বেতন পাই, বেতন শেষ হয়, কিন্তু রফিকের টাকাটা দেওয়া হয় না কখনো।

সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িতে টাকা পাঠানোর পর রফিককে দেওয়ার মতো আমার বাংকে আর কিছুই থাকে না।

আমার জীবনে ছোটখাটো কিছু ঘটলেও আমি সেটা অন্তত রফিকের সঙ্গে শেয়ার করি, ওর সঙ্গে আমার সে রকমই ঘনিষ্ঠতা, রফিকও আমাকে সব বলে, আমি সে রকমই জানি। কিন্তু পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা কেন আমি তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি, সেটা নিজেও জানি না। এ জন্য একটা অস্থিরতা পুষে রাখতে হয়েছে। সেটা ছিল খুব কঠিন। শিংওয়ালা একটা বিশাল ষাঁড় আমার শরীরের ভেতর সারাক্ষণ ঘোত ঘোত করছে, দৌড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, ওটাকে বের করে দেওয়া দরকার কিন্তু পারছি না। অবশ্য এই যন্ত্রণাটা ছিল কিছু দিনের। তারপর একসময় জন্তুটা বেরিয়ে এল। যখন এল হুড়মুড় করে এল, তছনছ করে দিল সব, ব্রেক ফেল করা একটা ট্রাক যেভাবে বস্তির ভেতর

ঢুকে পড়ে, ওরকম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব বলে ফেললাম আমি। তাঁর কাঁধ পর্যন্ত এসে থমকে গেছে চুল, চুলের রং পাটের সোনালি আঁশের মতো, সে ময়ূরের মতো হাঁটে, সোফায় বসেছিল, বেড়াল যেভাবে বসে, বাংলাদেশকে ও ভালোবাসে, আবোল-তাবোল আরও কত কি। এসব কথা আমি ঘটনার আড়াই দিন পরে বলেছি, আরও পর রফিক সজলকে বলেছে। আমরা তিনজনই এখন পিওনিয়ার স্ট্রাসের মোড়ের ঘটনাটার কথা জানি এবং যখন এ নিয়ে কথা বলি, এই মহিলা এসে চুপ করে বসে থাকেন আমাদের আলোচনায়।

আমরা হয়ত বলছি, সুনামগঞ্জে বন্যার পানি বেড়ে গেছে, ২১ নম্বর বাড়িটার বাগানে পেয়ারা গাছটার তলায় পড়ে থাকা ফলগুলো পচতে লেগেছে, উবানগুলো মাটি ফুঁড়ে ক্লুডভিশপ্লাৎস স্টেশনে এখন আর আসছে না সময় মতো অথবা রুপালি পর্দার অঞ্জু ঘোষ আরও কতখানি ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনো তিনি এসে হাজির হন আমাদের মাঝখানে। আমরা তাঁকে নিয়েও কথা বলি। আমার চেয়ে বেশি বলে ওরা। আমি লুকাতে চাই, ওরা বের করে আনে, আমি গোপন করার চেষ্টা করি, ওরা প্রকাশ করে দেয়, আমার ঢেকে রাখতে মন চায়, আর ওরা সেটা মেলে ধরার জন্য উন্মুখ হয়।

রফিক আর সজল ওকে ডাকে 'সেই মহিলা' আর আমি বলি 'তিনি'। আমার ভেতর তখন অদ্ভুত একটা শিহরণ চুলবুল করে।

তার চেহারাটা এখন আর আমি পুরোপুরি মনে করতে পারি না। আলাদা করে তার চোখ মনে আসে, মনে করতে পারি তার প্রশস্ত চওড়া কপাল, সেখান থেকে মাথার চুল অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালি চুলও আলাদাভাবে মনে করতে পারি, চুলগুলো নিচের দিকে ঘাড়ের কাছে সামান্য কোঁকড়ানো, ঘোড়ার লেজের মতো। কিন্তু নাক, চোখ, চুল এসব একসঙ্গে বসিয়ে যখন তার পুরো মুখটা গড়তে চাই, তখনই মাথার মধ্যে একটা ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটে যায়। নাক আর চোখ মেলাতে পারি কিন্তু কপালটা কপালের জায়গায় বসাতে পারি না, আবার কপাল ও নাক মেলে কিন্তু চোখ কান চুল সব একসঙ্গে সাজাতে পারি না। মহিলার মুখটা তৈরি হতে হতেও হয় না। ভেঙে যায়, মুছে যায়, হারিয়ে যায়। মনে হয় কিছুক্ষণ আগে যে ছবিটা এঁকেছি, বৃষ্টির ছাঁট লেগে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। অথবা অপসৃয়মাণ একটা জাহাজ, নদীতে কল্লোল তুলে ভেসে যাচ্ছে দূরে, ভুস ভুস করে জাহাজ ছুটছে আর জানালার ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা লোকালয়, কখনো ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো ঘাট, ছোট ছোট বালুচর, কখনো একটা বাতিঘর অথবা তীরে বেঁধে রাখা ইয়াক্ট, তারপর মহিলার পুরো মুখ হারিয়ে যেত, যেমন জাহাজটা একসময় হারিয়ে যায় সমুদ্রের সঙ্গে আকাশ যেখানে মিশেছে। কখনো কখনো মনে হয়, আমার স্মৃতিতে এই মহিলা হলেন খুব পুরনো

একটা ছবি, খোদাই করা কাঠের ফ্রেমে যত্ন করে বাঁধানো, কিন্তু জায়গায় জায়গায় রং উঠে সেটা এখন অস্পষ্ট।

কখনো কখনো এমনও হয় যে প্রায় সবকিছুই মিলিয়ে ফেলেছি, পুরো মুখটা এখনই তৈরি হয়ে যাবে, শুধু কিছু একটা বাকি, ওটা বসাতে গেছি, ব্যস, বলা নেই কওয়া নেই, ক্যানভাসটা হঠাৎ শূন্য হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মাথার ভেতরটা তখন কিলবিল করে ওঠে, মনে হয় এই ছবি হয়ত আমি আর কোনো দিন সাজাতে পারব না, কখনো না। নিজেকে অস্থির ও অসহায় এক বালকের মতো মনে হয়, যার হাতের কাছে অনেকগুলো পাজল অথচ চেনা ছবিটা সে কিছুতেই বানাতে পারছে না।

এর পর থেকে প্রায় সময়েই তার কথা মনে হতে লাগল। কারখানায় চামড়ার গন্ধে যখন নাড়িভুঁড়ি গুলিয়ে আসে, যখন ঠান্ডা হাওয়ায় নদীর তীর ধরে হাঁটি, ব্রিজ পার হই, ব্যাংকে ও বাজারে যাই, তখনো তার মুখটা মনের পুকুরে ভুস করে ভেসে ওঠে, মাছ যেমন করে পানির ওপরে মুখ তুলে শ্বাস নেয় সেভাবে। শীলার চিঠি পড়ছি, তখনো এসে হাজির হন তিনি। চিঠির একেকটা শব্দকে মনে হয় তার একেকটা হাত, পা, নাক, কান, মুখ অথবা চুল। সেই একই রকম, শব্দের পর শব্দ বসিয়ে বাক্যটা শুরু করতে পারি কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই ওটা হারিয়ে যায়। মনে হয় অর্থহীন এক প্রলাপ। তারপর একসময় তিনি হানা দিতে শুরু করলেন স্বপ্নের ভেতরও। মনে হতো শুধু পিওনিয়ার স্ট্রাসের মোড়ে নয়, তাকে যেন আরও কোথাও কোথাও দেখেছি। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর যখন আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠতাম, মনে হতো ঘটনাটা পাঁচ বছর আগের, ঢাকার কোনো একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে। কিন্তু আমার সঙ্গে যে আছে, সে শীলা নয়, ওই মহিলা। চোখটা শীলার কিন্তু কপালটা মহিলার। কখনো দেখতাম সোনালি চুলের এই নারী শীলার কলাপাতা রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, র‍্যাংকিন স্ট্রিটের একটা সরু গলির ভেতর দিয়ে, টুং টাং শব্দ বাজিয়ে। স্বপ্নে মহিলাকে এক রকম দেখতাম, কিন্তু স্বপ্নের স্থানটাকে কখনোই বাস্তবতার সঙ্গে, এমনকি স্বপ্নের সঙ্গেও মেলাতে পারতাম না। কখনো তাকে মনে হতো বার্লিনে দেখেছি, কখনো মনে হতো ঢাকায়। আবার কখনো কখনো ভাবতাম, তাকে আমি আমাদের কারখানাতেও কাজ করতে দেখেছি। তার হাতে খয়েরি রঙের লম্বা একটা চামড়া, ঘষে ঘষে সমান করার চেষ্টা করছে।

আর দেখতাম তিনি আমাদের বাসায়, পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই ২১ নম্বর বাড়িতে, কিচেনে দাঁড়িয়ে ওয়ার্কটপের ওপরে স্প্রিং অনিয়ন কাটছেন, কাপড় মেলছেন বাগানের ওয়াশিং লাইনে, দাঁত দিয়ে কামড়ে আছেন হলুদ রঙের ক্লিপ, দরজায় হেলান দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার দুহাত আড়াআড়ি করে পেটের

ওপরে রাখা, ঠিক স্তন দুটোর নিচে, কখনো তিনি সোফায় বসা, একটা হাঁটুর ওপরে আরেকটা হাঁটু ক্রস করে রাখা।

এই ছবিগুলো ছিল ছায়া ছায়া, আলো ও আঁধারে মাখানো, তবে আমার স্মৃতিতে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে আছে যে তিনি দেখতে অসম্ভব রকমের সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তার সেই অপরূপ রূপ আমি পুনরায় গড়তে পারিনি।

একদিন সকালে, কাজে যাওয়ার আগে, টোস্টার থেকে সেঁকা রুটি তুলে তার ওপরে চেরির জ্যাম লাগাতে লাগাতে সজল বলল, 'তোর একদিন এই মহিলার কাছে যাওয়া উচিত।' তারপর কিছুক্ষণ ও চুপ করে থাকল। টোস্টের মাঝখানে সবকটা দাঁত বসাল কিন্তু চোখ দুটো মেলে রাখল আমার মুখ বরাবর। ওর চোখের ভেতর দুষ্টু দুষ্টু হাসি, ও এরকমই, শাইসে ছাড়া কথা বলে না, ভালোবাসে নতুন নতুন বান্ধবী, থ্রি এক্স সিনেমা আর ভালোবাসে ভদকা ভদকা এবং ভদকা। সজল বলত ডয়েচ নাকি ও বান্ধবীদের কাছ থেকে শিখেছে, শিখেছে বিছানায়। যে দুটো শব্দ ও প্রথম শিখেছে, তা হলো শ্নেলার ও স্টার্কার, যেগুলোর অর্থ আরও দ্রুত এবং জোরে জোরে।

'কেন ?' জুতার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে প্রশ্ন করলাম আমি। কালো ফিতাটা যখন জুতার মুখের ওপরে একটা ফুল হয়ে উঠল তখনই উত্তর দিল সজল। বলল, 'এই মহিলাকে তোর অন্তত ধন্যবাদ জানানো দরকার।'

সকাল বেলায় আমি থাকি দৌড়ের ওপর। এখানে যখন দিনের সূচনা ঘটে, মনে হয়, মিনিটের কাটাটা দৌড়াচ্ছে সেকেন্ডের গতিতে। আর ঘণ্টার ছোট্ট কাটাটা হয়ে উঠেছে মিনিটের কাটা। দেশ ছাড়ার পর থেকে আমি সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা বা রাত এই সময়গুলো এখানে আলাদা করে ভাগ করতে পারি না। ২৪ ঘণ্টাকেই দিনের একটা সময় বলে মনে হয়। একটা দিন মানে শুধু একটা সকাল অথবা একটা দুপুর মানে একটাই দিন-এরকম।

নাখালপাড়ায় লিচু বাগানের গলির শেষ মাথার বাড়িটায় সকাল হতো অনেক সময় নিয়ে। বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙত আমার, বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতেই জানালার ওপাশ থেকে ভেসে আসত রিকশার টুংটাং আওয়াজ, ফেরিওয়ালা চিৎকার করে জানান দিত তার ঝাঁকায় আজ কী কী মাছ, দেয়ালের ওপাশ থেকে আসত টিউবঅয়েল চাপার শব্দ, সেখানে একটা লোক ব্যাঙ ডাকার মতো করে গলা পরিষ্কার করত আর শোনা যেত কাপড় ধোয়ার শব্দ। গলির ভেতর মোটা এক মহিলা তার বাচ্চাকে স্কুলে নেওয়ার সময় চিৎকার করত, স্বামীকে গাল দিত কি না, জানি না, তবে এগুলো যে কোনো পুরুষের উদ্দেশে ছিল, সেটা খুব

পরিষ্কার বোঝা যেত। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারতাম না, স্বামীর ওপর অসন্তুষ্ট কোনো নারী এত মোটা হয় কীভাবে !

পোড়া পোড়া আলু ভাজি, তার সঙ্গে বাসি গরুর মাংস, হাতে সেঁকা রুটি আর চায়ের সঙ্গে আয়েশী ভঙ্গিতে খবরের কাগজের ভেতরের পাতায়, কোথায় কোন গ্রামে একটা সেতু বানাতে গিয়ে দুর্নীতি হয়েছে, কোথাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু, মফস্বলের এসব খবর শেষ করে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম, তখনো সেই সকালই থাকত। আর এখানে বাথরুম থেকে বেরোতেই সকাল শেষ। শীলার সঙ্গে রিকশায় আসাদগেট-মিরপুর-আসাদগেট-মিরপুর ছিল প্রত্যেক সন্ধ্যার ঘটনা। তার পরও রাত হতে বাকি থাকত অনেক সময়। আর এখানে কারখানার উদ্দেশে ট্রামের ভেতর যখন ঢুকি তখন দিন, পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িটায় ফিরে আসার জন্য যখন ট্রাম থেকে বের হই, তার আগেই সন্ধ্যা। অথচ ঢাকায় ৩০০/এ বাড়ির কোনার ঘরটায় বুকের ওপর বই রেখে বাতি না নিভিয়েও যখন ঘুমিয়ে পড়তাম, তখনো সেটা রাতই থাকত, ভোর হতো না কখনো। আর এখানে কারখানায় ছুটির ঘণ্টা বাজলেই ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয়। আবার চোখের পাতা জুড়ে আসতে না আসতেই টেবিল ঘড়িটা 'সকাল সকাল' বলে চিৎকার শুরু করে।

সময়টা এখানে শুধু হাতের কবজিতে বেঁধে রাখা কাচের একটা বাক্সের ভেতর কাটা কাটা দাগ দেওয়া একটা বৃত্ত। এর ভেতরই কি সকাল কি বিকাল আর রাত্রি দুপুর ! যখন কারখানার উদ্দেশে ২১ নম্বরের ভেতর থেকে বের হই, ওই বৃত্তটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি যে এটা সকাল। তখন দুপুর হয়, যখন কারখানায় ঝনঝন করে একটানা ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর যখন বাসায় ফিরে এসে রান্না করি, তখন রাত। এই সময় আমরা কিছুটা বুঝতে পারি ভোকেনেন্ডে। সজল সেদিন বান্ধবীকে নিয়ে হয়ত সিনেমা অথবা পাব কিংবা বান্ধবীর বাড়িতে যায়, কিন্তু রফিক ও আমি ২১ নম্বরেই থাকি। অবশ্য সেদিনও কাজের সুযোগ পেলে আমি হাতছাড়া করি না। কারণ ছুটির দিনে কাজ করলে মজুরিটা বেশি। ডাবল।

সজলের সঙ্গে এই শনি রবিবারেই আমার ভালো করে দেখা হয়। বাকি পাঁচ দিন, আমি যখন বাসায় ফিরি, তখন সে কাজের জন্য বের হয়ে যায়। আর ও যখন ফেরে, তখন আমি থাকি ঘুমিয়ে। আমার মনে আছে, সেপ্টেম্বরের কোনো এক সপ্তাহান্তে ওরা চেপে ধরল আমাকে। বলল, ওই মহিলার কাছে আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। ওদের যুক্তি হলো, যে মহিলা বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়েছে, সেটা পর্যন্ত জানেন, যার সংগ্রহে বাংলাদেশের ডাকটিকিটও আছে, তার সঙ্গে হয়ত বাংলাদেশের আরও গভীর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। এবং দুই নম্বর কারণ

হলো, সেদিন ভুল ছিল আমার, অপরাধ করেছি আমি, দুর্ঘটনায় তার মাথা পর্যন্ত ফেটেছে, কিন্তু তার পরও এই মহিলা আমার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। দ্বিতীয় কারণটা আমার কাছে মোটামুটি যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। এ জন্য তার কাছে যাওয়া যেতেই পারে, তবে প্রথম কারণটা আমার মনঃপুত হয়নি। ডাকটিকেট জমানো যাদের শখ, তাদের কাছে বাংলাদেশের একটা স্ট্যাম্পেল থাকতেই পারে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে !

মহিলা যে এলাকায় থাকেন, সে জায়গাটা আমার কাছে মোটামুটি পরিচিত ছিল। প্রায় প্রত্যেক শনিবার ওখানে যাওয়া হতো আমাদের, বাজার করতে। সবকিছু তুলনামূলকভাবে কম দামে পাওয়া যায়, সে রকম একটা সুপারমার্কেট ছিল ওখানে। আমরা বাজার করতাম লিডল অথবা আলডি এই দুটো দোকানে এবং এ জন্য আমাদের যেতে হতো অন্য কোনো পাড়ায়। আমাদের এলাকা, রিল, ছিল পশ আবাসিক এলাকা, এই শহরে তার একটা নামডাকও ছিল। শান্ত এবং স্বয়ম্ভর একটা পাড়া। ২১ নম্বর বাড়িটা থেকে একটু উত্তরে গেলেই, যেখানে পিওনিয়ার স্ট্রাসে শেষ হয়েছে, সেখানে চিড়িয়াখানার গেট, তার পাশে একটা ব্যাংক। ডানদিকে মোড় নিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলে একটা সুপারমার্কেট । তার পাশে একটা আপোথেকে, বড়সড় একটা বেকারি। উল্টো দিকে নতুন একটা স্টুডিও, মাংসের দোকান এবং একটা পোস্ট অফিস। তার সামনে ১৩৪ নম্বরের বাস স্ট্যান্ড।

চিড়িয়াখানার গেট, পিওনিয়ার স্ট্রাসের উত্তর প্রান্ত এবং রুটির দোকান–এই তিনটার মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখতে। মাঝখানে কয়েকটা গাছ, বৃত্তটার চারদিকে পেঁচানো একটা রাস্তা, সেখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। বাইরে থেকে যাঁরা এই পাড়ার বাড়িগুলোতে বেড়াতে আসেন, তাঁরা গাড়ি রাখেন এখানে।

একবার ওখানে কোনো একটা টিভি সিরিয়ালের শুটিং হতেও দেখেছি, কোথায় যেন আগুন লেগেছে আর দমকল বাহিনীর একটা গাড়ি তা নেভাতে চেষ্টা করছে, হইচই আর তীব্র হট্টগোলের ভেতরও নায়িকা একটা ট্র্যাভেল ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় হাঁটছে, ওকে যে কতবার সেদিন ওই রাস্তায় হেঁটে যেতে হয়েছিল, সেটা টিভির দর্শকেরা না জানলেও জানে এই পাড়ার বাসিন্দারা। সামারের সময় দূর-দূরান্ত থেকে আসা সার্কাসের দল তাবু ফেলত এই খোলা জায়গাটায়। হাতি আসত, ঘোড়া আসত, খাঁচার ভেতর থাকত ময়নার মতো দেখতে ছোট-বড় পাখি। ওরা এক সপ্তাহ ধরে এখানে থাকত। বাচ্চাদের নানা রকমের রাইড বসানো হতো। রোলার কোস্টার। সুইংগার জিংগার। বাম্পার বিচ। ক্রেজি বাস। টি কাপ রাইড। আরও কত কি। এই পাড়াটা তখন উৎসবে মেতে থাকত, রাতদিন সব সময়।

ব্যাংকের পূর্ব দিকে একটা সোজা রাস্তা, তার একপাশে বেশ উঁচু গির্জা। গির্জার মাথায় ছিল একটা হাওয়ামোরগ, একেক সময় ও একেক দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকত, যখন যেদিকে কোলনের বাতাস বইত। আমরা বলতাম, সুবিধাবাদী মোরগ, হাওয়া বোঝে ! রফিক লাগত সজলের পেছনে, বলত, 'ওটা আসলে সজল, যেদিকে মুরগির গন্ধ, ও তাকাবে সেদিকে।' আমরা হাসতাম, হাসত সজলও। ওর মুখটা তখন হয়ে উঠত মোরগের মতো, চামড়ার জ্যাকেটের ভেতর থেকে ওর গলাটা উঠে আসত ওপরে আর যখন হাঁটত তখন ওর পা দুটো মোরগের মতো লাফাত। কিন্তু আমার অথবা রফিকের পেছনে লাগত না সজল, গির্জার মাথায় মোরগটাকে দেখে ও বলত, 'পলিটিকার।' রাজনীতিবিদদের ও খুব ঘৃণা করত। কথাটা যখন বলত, তখন ওর চোখ দুটো মুরগির চোখের মতো ছোট হয়ে কোটরের ভেতর ঝুলে থাকত।

শনিবার সকালে এই রাস্তার মাঝখানে যে প্রশস্ত ডিভাইডার তার ওপরে এবং ডান দিকের ফুটপাতে বসত কাঁচা বাজার। ভোর থেকেই ভিড় হতো মানুষের, চাষিরা লরিতে করে নিয়ে আসত লাল লাল টমেটো, লম্বা লম্বা মুলা, এসপারাগাস, কোজেট, মাটি লেপ্টে থাকা ছোট ছোট আলু, বাসিল এবং বেগুনসহ আরও কত রকমের সবজি। টাটকা মাছও উঠত। হেরিং, মাকরেলেন, লাক্স আরও কত কি। পুরুষেরা শুধু লরি থেকে মাল ওঠাত আর নামাত। ক্রেতা ডেকে ডেকে এসব বিক্রি করত তাদের স্ত্রী ও মেয়েরা। খুব সুন্দর লাগত দেখতে। ঠেকায় না পড়লে আমরা কখনো এখানে বাজার করতাম না। কৃষকেরা তাদের ফসল সরাসরি মাঠ থেকে নিয়ে আসত বলে এই খোলাবাজারে সবকিছুর দাম ছিল খুব বেশি চড়া।

কোনো কাজ না থাকলে আমরাও যেতাম ওখানে। কিনতে নয়, দেখতে। সজল বলত ও কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, মাছ এসব দেখতে যায়। ওর মতে কাঁচা মরিচের রংটা বাংলাদেশের রং, কী গাঢ় সবুজ ! আমি আর রফিকও যেতাম ওর সঙ্গে। আমরা দেখেছি, একটা ঠেলার ওপরে সুঁই-সুতা, নানা রঙের উল আর টিপ বোতাম বিছিয়ে রঙিন স্কার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকত যে মেয়েটা, সজল ঘুরে ঘুরে তার কাছেই যেত বেশি। ঘরে ফিরে এসে আমরা হাসতাম। বলতাম, 'কিরে, তোর কাঁচা মরিচের ঝাল কেমন।' মরিচগুলো ছিল আঙুলের মতো, মধ্যমার চেয়ে একটু বড়, আসত তুরস্ক থেকে।

বাজার করার জন্য ১৩৪ নম্বর বাস ধরে আমরা চলে যেতাম এবার্টপ্লাৎসে। সেখান থেকে দশ মিনিট দূরে একটা বড় সুপারমার্কেট, আলডি।

এই দোকানে যাওয়ার পথে এবার্টপ্লাৎস মোড় থেকে কয়েকটা গলি পার হয়ে হাতের বাম দিকে ছিল বাল্টহাসার স্ট্রাসে। আগে যখন এখানে বাজার করতে আসতাম, মনে পড়ে না, এই রাস্তার দিকে কখনো ভালো করে তাকিয়েছি। শুধু মনে আছে, ওই জায়গাটা একটা ক্রস চিহ্নের মতো। বড় রাস্তাটা গেছে সোজা

আলডির দিকে, তার আড়াআড়ি ডানে-বাঁয়ে যে গলিটা গেছে, ওটাই বাল্টহাসার স্ট্রাসে। সেদিনের সেই ঘটনাটার পর বাজারে যাওয়া-আসার সময় কিছুটা ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম, রাস্তাটা যেখানে ক্রস হয়েছে, ওখানে। ভাবতাম, যদি তিনিও বাজার করতে আসেন, তাহলে হয়ত দেখা হয়ে যাবে। এর মধ্যে কয়েকটা শনিবার চলে গেছে, আমি একাই দোকানে গিয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তাকে কখনো দেখিনি।

এবার্টপ্লাৎসের সবকটা গলি, বাড়ি, দোকান আমার মুখস্থ ছিল। বাস স্ট্যান্ডের পূর্ব দিকে হঠাৎ করে একটা এসকেলেটর উঠে এসেছে বড় রাস্তায়। অধিকাংশ সময় এটা থাকত নোংরা। কি সকালের ব্যস্ত সময়ে অথবা কি গভীর রাতে, প্রায়শই এই যান্ত্রিক সিঁড়িটা অচল হয়ে পড়ে থাকত। তবে প্রত্যেক বছরে টাগ ডের ক্রিস্টফার স্ট্রাসের সকালে এই রাস্তায় যখন সমকামীরা মিছিল নিয়ে বের হতো, দেখতাম নগর কর্তৃপক্ষের লোকেরা এই সিঁড়িটাকে সচল রাখার কী চেষ্টাই না করছে।

যাত্রী ছাউনির উল্টো দিকে ছিল একটা কিনো, মেট্রোপলিস। একমাত্র এই হলটাতেই অরিজিনাল টোনে ছবি দেখাত বলে এই শহরের বিদেশি বাসিন্দারা বিশেষ করে তুর্কিরা এখানে ছবি দেখতে আসত। একবার আমি আয়েশা বা আওয়ারা নামের একটা হিন্দি ছবি দেখতে এসেছিলাম। আরেকবার একটা ইংরেজি ছবি দেখতে এসে বিরতির সময় বাতি জ্বলে ওঠার পর আবিষ্কার করলাম, পুরো হলে আমি একা। এতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে এরপর ছবির গল্পটা আর অনুসরণ করতে পারিনি।

সিনেমা হলটা পেরোলে একটা চৌরাস্তার মোড়, সাবওয়ে থেকে চারটা সিঁড়ি চারদিকে উঠে হাতের পাঁচটা আঙুলের মতো মোট সাতটা রাস্তায় ভাগ হয়ে সাত দিকে চলে গেছে। তার নিচ দিয়েও যেন কীভাবে কীভাবে বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে যাওয়া যায়, এতে সময় বাঁচে। মহিলা আমাকে সেদিন এই পথ দিয়ে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মূল সড়কটার দুই দিকেই ছিল চার-পাঁচটা ট্রাভেল এজেন্সি। প্রত্যেকটার ভেতরে, কোনো এক কোনায়, চেস্টার ড্রয়ারের ওপরে রাখা ছিল বিমানের মডেল অথবা বড় বড় গ্লোব। সন্ধ্যার পরে এই গ্লোবগুলো জ্বলে উঠত, দেয়ালে ঝুলত ইয়োরোপ-আফ্রিকার বিশাল বিশাল ম্যাপ, সেখানে লাল লাল কালিতে আঁকা থাকত বিমানের রুট। আর খুব সস্তায় ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারায় যাওয়ার বিজ্ঞাপন ঝুলত দোকানগুলোর কাচের জানালায়।

এখানকার অধিকাংশ বাড়ি নবীন। পাড়াটাকে মনে হতো নতুন, ঘন হয়ে উঠছে। রাস্তার দুই পাশে যে ধরনের দোকানপাট দেখা যেত পুরনো এলাকাতে তখনো সেসব বসেনি। বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে ঢোকার মুখে আছে একটা সান

স্টুডিও, একটা সেক্স শপ, একটা পাব। বাড়িগুলোতে বড় বড় জানালা। দেয়ালে কাচের ব্যবহার বেশি। ছিল একটা বিবলিওথেক, পুরোটাই কাচের। রাতের বেলাতেও ভেতরের বইগুলো স্পষ্ট দেখা যেত। লাইব্রেরিটা এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে মনে হতো ছোট্ট একটা ঢিল ছুড়লে চুরচুর করে ভেঙে পড়বে সব।

নতুন বাড়িগুলো পুরনোগুলোর চেয়েও উঁচু ছিল। পুরাতনগুলো পড়ে থাকত অযত্নে আর অবহেলায়। এসব ভেঙে কবে সেখানে আধুনিক নকশার বাড়ি উঠবে, তার জন্য ক্ষয়িষ্ণু ভবনগুলো অপেক্ষা করত। মহিলা যে বাড়িতে থাকতেন, অন্যান্য বাড়ির সঙ্গে তুলনা করলে ওই বাড়িটাকে সবচেয়ে দুর্বল রুগ্ন ও কৃশকায় মনে হতো। বাড়িটার বাইরের রং ছিল খুব মলিন। দেয়ালে দেয়ালে বয়সের বলিরেখা। বারান্দাগুলো হতদরিদ্র এবং ছোট ছোট। কোথাও কোথাও টানা রশির ওপরে কাপড় ঝুলত। কয়েকটা ব্যালকনির দেয়ালে লাগানো ছিল বড় বড় ডিশ। তারগুলো দেয়ালে পেঁচাতে পেঁচাতে জানালার নিচ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোনো কোনো ফ্ল্যাটের ভেতরে। জানালার পর্দাগুলো ছিল ময়লা। পর্দার ওপারে দেখা যেত কাচের বোতল, টিনের কৌটা, প্লাস্টিকের টব আর বাচ্চাদের খেলনা। আশপাশের ভবনগুলোর রূপ বাহার আর ঢং দেখলে মনে হতো এই বাড়িটা সত্যি সত্যি একসময় ধসে পড়বে।

কোনো এক রোববারের বিকেল। আকাশ পরিষ্কার। ফুরফুরে একটা বাতাস। উজ্জ্বল আলোয় পিওনিয়ার স্ট্রাসে ঝকমক করছে। সব মানুষ যেন চলে এসেছে ঘরের বাইরে। সবখানেই ভিড়। সব গাড়িও গ্যারেজের বাইরে। এ রকম এক ভিড়ের ভেতর হঠাৎ আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম বাল্টহাসার স্ট্রাসের ওই বাড়িটার সামনে। আমার বগলের নিচে একটা চকোলেটেরে প্যাকেট আর ডান হাতের মুঠোয় ফুলের তোড়াটা, ফুলগুলো বাম হাতের তালুর ওপর, আলতো করে রাখা।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আমি পায়চারি করছি। এখানে আসার আগে মহিলাকে আমি বলেও আসিনি। আমাদের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টও করা নেই। জানি না, তিনি এখন বাড়িতে আছেন কি না, বা থাকলেও তিনি কী করছেন, কিংবা বাড়িতে আর কোনো অতিথি আছে কি না। ভাবছিলাম, যদি তিনি নিজের মতো করে সময় কাটাতে থাকেন, তাহলে এখন আমাকে দেখে তিনি কী বলবেন, কী করবেন। তার ওপর আমি মহিলার নামও জানি না। দরজার কোন বেলটায় চাপ দেব, সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। এর মধ্যে একজন দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে গেলেন। আড় চোখে তাকিয়েও দেখলেন আমাকে। কাকে চাই, ধরনের প্রশ্ন করতে গিয়েও যেন এড়িয়ে গেলেন তিনি। নিজের ওপর রাগটা আরও চড়ছিল তখন। রফিক যদি ফুলের তোড়াটা এনে না দিত, আমি কখনোই পড়তাম

না এ রকম একটা পরিস্থিতির মুখে। একবার ভাবলাম, ফিরে যাই, কিন্তু আমার পা কিছুতেই পেছনে যেতে চাইছিল না।

আমার মনে আছে, মহিলাকে সেদিন আমি চারতলার একটা ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, চার নম্বর নেম প্লেটে যে নামটা লেখা আছে, সেটা হয়ত এই মহিলার। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলেই তখন আমি ফ্রাউ বাওয়ারের বেলপুশটাতে চেপে ধরেছিলাম আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুল।

লুকোচুরি

কোনো শব্দ হলো না কোথাও, কেউ সাড়া দিল না ওপারে। দরজাঘণ্টা কয়েকবার পুশ করার পরেও খুলল না ৫৬ বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িটার গেট। বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কোথায় ভুল হচ্ছে, আমি কি অন্য কারও দরজায় টোকা মারছি, ওই মহিলাই কি ফ্রাউ বাওয়ার, নাকি এই বেলপুশটা তারই কিন্তু তিনি এখন বাড়িতে নেই। আরও কতক্ষণ পায়চারি করলাম ওখানে। হাত দিয়ে ঠেলে দেখলাম মূল দরজাটা। ক্যাট ক্যাট করে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো কিন্তু খুলল না। বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকজন বাইরে বেরোলো, দুয়েকজন ভেতরেও গেল, কিন্তু ওদের কাউকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

পাশের কিয়স্কে কাটালাম কিছুটা সময়। ওখান থেকে কিনলাম টুকিটাকি কিছু জিনিস, এক প্যাকেট চুইংগাম, স্কচটেপের ছোট্ট একটা রোল আর কয়েকটা কমলা। কেনাকাটার অজুহাতে কিছুটা সময় পার করলাম ওখানে। দোকানটা মোটামুটি রকমের ব্যস্ত ছিল, তবে ক্রেতাদের বেশির ভাগই ছিল মহিলা।

দেখে মনে হয়, দোকানটা ইরাকি অথবা তুর্কি, কোথাও কোথাও আরবির মতোও লেখা, দোকানদার যেখানে দাঁড়ানো, তার পেছনে ছিল দুলদুলের বড় একটা পোস্টার, দোকানদারের মুখটা লম্বাটে-গোল, বিচিহীন আঙুরের মতো।

পুরনো ও বাতিল একটুকরো কাগজ চাইলাম দোকানির কাছে। টিলের ওপারে দোকানদার যখন আমার জন্য একটুকরো কাগজ খুঁজছিলেন, আমি মন দিয়ে সিসিটিভিতে দেখলাম নিজেকে, অপরিচিত মনে হলো কিছুটা, ফুল হাতে দাঁড়ানো এক বালক, গায়ে হালকা একটা খয়েরি জ্যাকেট, যে ওই বাড়িতে যাওয়ার জন্য উতলা।

দোকানের এক শেল্ফ থেকে আরেক শেল্ফে ঘুরে বেড়ালাম আমি। নতুন করে সাজানো হয়েছে ভেতরটা। আগেরবার যখন এসেছিলাম, তখন দোকানের পশ্চিম কোনায় ছিল ভাঙাচোরা ফটোকপির মেশিন। এখন আর ওটা নেই। সেখানে ছোট্ট একটা আলমারির মতো রাখা হয়েছে। সবচেয়ে ওপরের তাকে হলুদ রঙের একটা কাগজে লিখে রাখা হয়েছে আজিয়েন কর্নার। ওখানে ছিল চানাচুরের প্যাকেট,

আমের জুস, আদা ও জিরার মতো কিছু মসলা আর একটা ট্রে উপচানো সবুজ ধনেপাতা।

মহিলা যেখান থেকে মোমবাতি কিনেছিল, সেখানে এখন আরও কয়েকটা কাঠের তাক বসানো হয়েছে। তার ওপর বড় বড় কয়েকটা মিষ্টি কুমড়ো, তরমুজ, তরমুজের কয়েকটা ফালি আর হলুদ হয়ে আসা কয়েকটা পেঁপে।

দোকানির সঙ্গে কেউ একজন উঁচু স্বরে কথা বলল। তারপর লোকটা দ্রুত বেরিয়ে গেল রাস্তায়, দোকানদার কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলল, হাঁপাতে হাঁপাতে, তার গলায় ছিল উৎকণ্ঠার সুর। দোকানের বাইরে কয়েকটা মোটরবাইকের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ শোনা গেল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল দোকানের দরজা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলো একদল পুলিশ। জানতে চাইল আমি কোথায় থাকি। বললাম, পিওনিয়ার স্ট্রাসে। এখানে কেন ? বললাম, বেড়াতে। ওরা বলল, একটু আগে যে লোকটা হুমকি দিয়ে গেল, তাকে আমি চিনতে পারব কি না। আমি বললাম, না। ওরা জানতে চাইল, এই ঘটনার সাক্ষ্য দিতে আমি রাজি আছি কি না। আমি ওদের না করে দিলাম। তারপর আবার বাড়িটার মুখে এসে দাঁড়ালাম। এবার ওটাকে মনে হচ্ছিল, দুর্ভেদ্য এক দুর্গের মতো।

নেমপ্লেটের নামগুলো পড়লাম আবারও, ফ্রাউ বাওয়ারের একতলা ওপরে হের বালভেগ আর নিচে হের গ্রুন, আমার এখনো মনে আছে, ডান পাশের প্লেটগুলোতে ছিল ফ্রাউ শোয়েপকে, হের ক্লাইন আর সবার নিচে ছিল ফ্রাউ ব্লোম। ভাবছিলাম আর কী কী হতে পারে ওই মহিলার নাম, আমি কি আসলেই সেদিন চারতলায় গিয়েছিলাম ? ওখানেই ছিল ক্লদ মোনের আঁকা বিলের পানিতে সবুজ পদ্মপাতা, যার ওপরে এসে পড়ছিল দিনের শেষ সোনালি আলোটা !

বুঝতে পারছিলাম না, ঠিক কী করব আমি। এভাবে বাল্টহাসার স্ট্রাসেয় আসব সেটাও কখনো ভাবিনি, আর যখন এলাম তখন ভাবিনি যে মহিলা থাকবে না বাড়িতে। আরও কয়েকবার বেলটা বাজালাম। জোরে চেপে ধরে রাখলাম লম্বা সময়। ততক্ষণে আঙুলটা আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে।

দোকান থেকে নেওয়া কাগজে মোটা মোটা হরফে লিখলাম আমার আসার কথা। কাগজটা ছিল নিউজ পেপারের মতো কিন্তু পুরু, এতে উপকারই হলো, কালি চুষে নেওয়ায় মোটাসোটা হয়ে উঠল লেখাগুলো, তারপর নেমপ্লেটের কাছে দরজার ওপরে ফুলের তোড়াটা বেঁধে দিলাম স্কচটেপ পেঁচিয়ে। পাতলা ফিনফিনে একটা পলিথিনের ভেতরে ছিল কিছু ক্রিসেনথিমাম, জিনিয়া আর দুটো বড় বড় সূর্যমুখী। তোড়ার গায়ে চুইংগাম দিয়ে আটকে দিলাম নোটিশের লেখাটা :

লিবে ফ্রাউ
আমাদের কি দেখা হতে পারে
আরও একবার
যেখানে আপনার কপাল ফাটালাম
আগামী শনিবার
বেলা এগারোটা থেকে বারোটা
অপেক্ষায়
শাইসে কিড

বাড়িতে ফেরার পথে আমি কয়েকবার গুণে গুণে দেখলাম শনিবার আসতে আরও কত দিন বাকি, বেলা এগারোটা বাজতে আমাকে আরও কত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, তারপর ঘরে ঢোকার আগে ঘুরে এলাম পিওনিয়ার স্ট্রাসের ওই মোড় থেকেও, জায়গাটার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না, অনুমান করতে চেষ্টা করলাম, শনিবারে মহিলা রাস্তার ঠিক কোথায় অপেক্ষা করতে পারেন, আমি তাহলে কোথায় দাঁড়াব ইত্যাদি।

সব একই আছে। আগের মতোই। মানিকিন দুটো তাকিয়ে আছে সেদিনের মতো, একই দিকে আর একই দৃষ্টিতে। আগের জায়গাতেই আছে খবরের কাগজের ভেন্ডিং মেশিন, ওখানে এখন নতুন প্রচ্ছদ লাগানো হয়েছে, আছে নতুন খবর : বার্লিনে কার ফ্রিজারে পাওয়া গেছে মানুষের মাংস, লোকটা ক্যানিবল, কোলনে কোন মহিলার স্তন সবচেয়ে বড় এসব। এক কোনায় আছে ময়লা ফেলার ম্যুলাইমারটাও। শুধু চারপাশের গাছের পাতাগুলো আগের চেয়েও আরও বেশি ন্যাতানো। আকাশের আলোটা বিকেলের আগেই সন্ধের মতো ম্লান।

চারদিকে তখন শীতের গন্ধ।

প্রত্যেক দিন সকালে ও দুপুরে, বিকালে কিংবা রাতে দেখতে লাগলাম ক্যালেন্ডারের পাতা। ঘন ঘন। কখনো কখনো তাকিয়ে থাকতাম একটানা। পলক পড়ত না চোখের।

অবশেষে শনিবার এল কিন্তু আসতে লাগল কয়েকটা বছর।

সজল ও রফিককে বলিনি এই দিনটার কথা। সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল আমার। সত্যি কথা বলতে কি, সেই রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। ভোরের দিকে চোখ দুটো যখন লেগে আসছিল, তখনই লাফিয়ে উঠলাম আমি। শেভ করলাম। গোসল করলাম। শ্যাম্পু করলাম মাথায়। আলমারি থেকে নামিয়ে ভাঁজ খুললাম নতুন শার্টের। তারপর এগারোটারও আগে নিজেকে আবিষ্কার করলাম পিওনিয়ার স্ট্রাসের মাথায়।

মহিলা আসেননি। আসবেনও না তিনি। ল্যাম্প পোস্টের গায়ে টাঙানো একটা কাগজে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে :

শাইসে কিড
তুই তো বলেছিলি
আবার দেখা হবে
হতে পারে
যেখানে আমরা
শেষবারের মতো
বলেছিলাম, বিদায়
মঙ্গলবার
সন্ধ্যায়
ডাইনে ফ্রাউ

বৃষ্টির শব্দ

ভেতরে ঢুকে কী বলব, না বলব সে রকম কিছু কথামালা আমি মনের ভেতরে আগেভাগে গুছিয়ে রেখেছিলাম। বাল্টহাসার স্ট্রাসের এই বাড়িটাতে আসার সময়, পথে চলতে চলতে, নিজেই নিজেকে সে কথাগুলো কয়েকবার শুনিয়েছি, অনেকটা নাটকের রিহার্সেলের মতো। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে যত ওপরে উঠছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল, সেসব শব্দ ও বাক্য মনের ভেতর থেকে ক্রমশ জলীয় বাষ্পের মতো মিলিয়ে যাচ্ছিল বাতাসে।

আগেরবার যখন এসেছিলাম, এই সিঁড়িটাকে বড় বেশি সাদামাটা আর মলিন মনে হয়েছিল, ওটা ছিল কেমন একঘেয়ে, শুধু ধাপের পর ধাপ। আর এখন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর এই জায়গাটা কেমন রঙিন হয়ে উঠেছে। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে হচ্ছিল, আমি যেন আকাশের দিকে যাচ্ছি। দোতলা এবং তিনতলার মোড়ে আবিষ্কার করলাম বড় বড় কয়েকটা টব। আগে ছিল না এগুলো। টবগুলো খুব পুরনো এবং এর কিনারগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝুলে পড়ছে। গাছগুলোতেও লাগেনি পরিচর্যার ছোঁয়া। সবুজ পাতাগুলো তৃষ্ণায় কাতর আর কিছু কিছু পাতা শুকাতে শুকাতে খয়েরি হয়ে বোটার ওখানে আলতোভাবে ঝুলে আছে। দমকা বাতাস এলেই হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে পাতাগুলো। গাছগুলোর ভাগ্য ভালো যে তারা সিঁড়িঘরে আশ্রয় পেয়েছে। বাইরের মতো এখানে নেই বাতাসের গুণ্ডামি।

নিচের সিঁড়িটা অনেক বেশি প্রশস্ত। তার গোড়ায় অনেক কিছু স্তূপ করে রাখা। কিছু পুরনো খবরের কাগজ, কয়েকটা ক্যোলনার স্টাড আনসাইগার আর কিছু পুরনো ডি ভেল্ট, কাগজগুলো বৃষ্টির ছাঁট লেগে ফুলেফেঁপে আছে। তার পাশেই কয়েকটা ইয়েলো বুক আর একটা মুখছেঁড়া কম্পোস্টের বস্তা। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার জন্য যে হাতল, সেটা কাঠের, নকশা করা। ভাড়াটেদের হাতের ঘষায় ওটা হয়ে আছে পিচ্ছিল ও তেলতেলে। দেয়ালে কড়া রং, নতুন লাগানো, যেন ছুঁলেই আঙুলের ডগায় উঠে আসবে কাঁচা রং।

আজ একা একা উঠতে গিয়ে সিঁড়িটাকে বেশ দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ধাপ আর ধাপ, সিঁড়ি আর সিঁড়ি, তলার পর তলা। আমি যেন চার তলায়

নয়, উঠছিলাম চল্লিশ তলায়। সিঁড়িটা যতই ওপরের দিকে উঠছিল, সেটা ততই সরু হয়ে আসছিল। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম সিঁড়িটা হয়ত ছাদে ওঠার পর ঢুকেছে একটা চিলেকোঠার ভেতর।

ফ্রাউ বাওয়ার কেমন করে আমাকে দরজার মুখ থেকে স্বাগত জানালেন, তারপর নিয়ে গেলেন ফ্ল্যাটের ভেতর, সেটা এখন আর স্পষ্ট মনে নেই। তবে আমাকে দেখার পর তিনি যে চমকে গিয়েছিলেন, তার চোখমুখের সেই ভাষাটা আমার স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। শুরুতে তিনি উপেক্ষা করছিলেন আমাকে। আর সেটা বোঝাতে বারবার 'এই ছেলে' বা 'এই ছোঁকরা' বলে ডাকছিলেন আমাকে। ঘরের ভেতর ঢুকে তিনি আমার দিকে কড়া চোখে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খবর ?'

এসবের আমি কোনো জবাব দিইনি, বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। চাইছিলাম এই প্রশ্নের জবাব এড়াতে। ফুলের তোড়াটা তুলে দিলাম তার কোলে, সেগুলোকে তিনি রাখলেন টেবিলের ওপর একটা ফুলদানির ভেতর, গুঁজে দিলেন পুরনো চারটা হলুদ টিউলিপের পাশে। তারপর একটা সিরামিকের কেটলিতে পানি এনে ফ্লাওয়ারভাসটার কিনারায় কাত করে বললেন, 'এই ছেলে, কী ভেবে ?'

'না মানে,' কাচুমাচু করছিলাম আমি, বললাম, 'আপনার টেলিফোন নম্বরটা তো আমার কাছে ছিল না। তাই আসার আগে আপনাকে জানাতে পারিনি।'

আমার এই ইতস্তত ভাব দেখে বেশ মজা পেলেন তিনি। তার ঠোঁটের কোনায় আর চোখের তারায় ছিল চোরা হাসি। আমাকে উসকে দিতে কথার পিঠে বললেন, 'তো... এত দিন পরে...এই ছেলে...কীভাবে মনে পড়ল আমাকে ?'

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে ভুলে গেছ', কোনো অভিমান ছিল না তার কণ্ঠে, ছিল অভিনয়, হাসতে হাসতে বললেন, 'এবার কী ফাটাতে এসেছ ?'

তখনো আমি তার কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছি।

ফ্রাউ বাওয়ার যখন আমাকে সোফায় বসিয়ে তার এলোমেলো ঘরটাকে একটু মানুষ করে তোলার চেষ্টা করছিলেন, তখন আমি চেষ্টা করছিলাম তার বয়েসটা ধরতে। তার কপালের ওপর কয়েকটা হালকা বলিরেখা, এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটিতে টানা বিদ্যুতের তার মাঝখানে যে রকম নিচু হয়ে ঝুলে থাকে, সে রকম। আমি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিলাম না তার বয়স। কখনো কখনো তাকে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই নিঃসঙ্গ কোনো নারী বলে মনে হচ্ছিল, আবার কখনো মনে হচ্ছিল তিনি ক্লান্ত-বিষণ্ন এক মহিলা, পঞ্চাশের কাছাকাছি। বয়সটা ধরতে পারছিলাম না আমি, কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'মানুষ যে বয়সে এখনো পৌঁছায়নি, তার পক্ষে ওই বয়স আন্দাজ করাটা কঠিন। শুধু যে বয়সের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, কেবল ওই বয়সটাই সে অনুমান করতে পারে।'

মহিলার লম্বা মুখ। চিবুকের কাছে এসে খুব দ্রুত এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সেটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঝুলে পড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেমেছে চিকন নাক। ঠোঁট সরু এবং মসৃণ, ওপরের ঠোঁটটা খুবই পাতলা, অনেক সময় বোঝাও যায় না, শুধু যখন কথা বলেন, তখনই সেটাকে নড়তে দেখা যায়। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে তিনি ঠোঁট দুটো কামড়াতে থাকেন। তখন তার বয়স হঠাৎ করেই নেমে যায় তিরিশের নিচে।

মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর। এই মুখটা আমি ধরতে পারছিলাম না ! এত সহজ একটা মুখ আর এই সরল মুখচ্ছবিটা আমার স্মৃতিতে এত দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছিল !

সেই মুখ এখন জলের মতো পরিষ্কার, এই রকম তার গ্রীবা যে রকম তার গ্রীবাভঙ্গি, এই রকম তার চোখ আর যে রকম তার দৃষ্টি। ফ্রাউ বাওয়ার এবং শীলার মুখ নিয়ে আমার মগজের মধ্যে যে একটা স্মৃতি খিচুড়ি তৈরি হয়েছিল, সেটা কেটে গিয়ে শীলার চোখ এখন শীলার কাছে এবং মহিলার চিবুক ফের তার মুখে এসে বসেছে। স্মৃতি থেকে জটিল কুয়াশাটা কেটে যাওয়ার পর আমি এখন অনেকটাই ফুরফুরে এবং একইসঙ্গে ক্লান্ত।

ফ্রাউ বাওয়ার ততক্ষণে তার বসার ঘরটা বেশ গুছিয়ে ফেলেছেন।

কয়েকটা সিডি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এখানে-সেখানে, ছিল আধপড়া পাতা উল্টানো ড্যার স্পিগেল, রিলকের একটা কবিতার বই, না ধোওয়া কিছু ময়লা কাপড়। পলিথিনে মোড়ানো একটা ক্যাবেজ ছিল টেবিলের ওপর, তার পাশে কয়েকটা লম্বা মোমবাতি, গোলাপি রঙের। সেগুলোর মধ্য থেকে একটা ক্যান্ডেল স্ট্যান্ডে আর বাকিগুলো চালান হলো ড্রয়ারে, বাঁধাকপিটা চলে গেল কিচেনের ড্রয়ারে। লম্বা সোফাটার ওপরে পড়েছিল একটা স্কার্ট, একটা প্যান্ট এবং আঁশ উঠে যাওয়া একটা খয়েরি সোয়েটার।

সেগুলোও তিনি ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলেছেন।

আমি যে সিঙ্গেল সোফাটায় বসেছিলাম, তার হাতল থেকে ভেতরের দিকে ঝুলছিল হালকা নীল রঙের একখানা ব্রা। বসার সময় সেটা আমার চোখে পড়েনি। আগে দেখলে হয়ত অন্য কোথাও বসতে পারতাম আমি। ফ্রাউ বাওয়ার যখন লম্বা থ্রি সিটারের ওপর থেকে স্কার্ট আর প্যান্ট তুলে নিচ্ছিল, তখনই ওটা চোখে পড়ল আর আমি তখন লজ্জায় ওটাকে আরও বেশি আড়াল করে বসেছি।

ঠিক কী করব, বুঝতে পারছিলাম না আমি। একবার মনে হচ্ছিল, যেহেতু তিনি ঘরের এখান-ওখান থেকে এলোমেলো পড়ে থাকা কাপড় তুলে নিচ্ছেন, আমার উচিত তাকে এই জিনিসটাও দেখিয়ে দেওয়া। কিন্তু কীভাবে বলি, তিনি যদি কিছু মনে করেন ! আরেকবার মনে হচ্ছিল, আমি নিজেই যদি এটাকে সরিয়ে

রাখি, তাহলে কেমন হয়। বেশি কিছু না, শুধু আমার হাতের নিচে সোফার হাতল থেকে সরিয়ে বড় সোফাটায় রাখব, ব্যস। কিন্তু সেটা যদি তার দৃষ্টি না এড়ায়, তখন ? কোনো মহিলার ব্যক্তিগত কাপড় হাত দিয়ে ধরা ঠিক হবে কি না, সেটাও আমি বুঝতে পারছিলাম না, আবার তারই সামনে ! একবার ভেবেছিলাম, তিনি যখন কিচেনে যাবেন, তখন খুব দ্রুত সেটাকে আড়াল থেকে বের করে এমন একটা জায়গায় ছুড়ে দেব, যাতে তিনি খুব সহজেই ওটা দেখতে পান, অথবা ভাবছিলাম, যতক্ষণ আমি এই বাড়িতে আছি, এই সোফায় এমনভাবে গেড়ে বসে থাকব, যেন ঘুণাক্ষরেও সেটা তার চোখে না পড়ে।

লম্বায় মহিলা প্রায় আমার সমান, বেশিও হতে পারে। তার পিঠ, কাঁধ এবং বাহু শরীরের সামনের মতোই প্রশস্ত ও ভারী। তিনি একটা গাঢ় নীল রঙের জিন্স এবং সাদা পুলওভার পরেছিলেন। পুলওভারের ডান হাতাটা কনুই পর্যন্ত গুটানো। সাদা হাতটা ছিল নগ্ন এবং বিষণ্ন। মুখের মধ্যে লাল লাল ঘামাচি বা ব্রনের মতো ফুসকুড়ি। মনে হচ্ছিল, তার মুখের চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে অথবা তার হয়ত কোনো এলার্জি হয়েছে।

ঘর গোছাতে অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলেন তিনি। কথা বলছিলেন ফাঁকে ফাঁকে। আমার দিকে যখন তাকাচ্ছিলেন, দ্রুত চোখ নামিয়ে নিচ্ছিলাম আমি। তার চোখ দুটো সবুজ। কিউই ফলের মাঝখানে ছুড়ি চালিয়ে দুই ভাগ করলে কাটা জায়গাটায় যেমন একটা ছোপ ছোপ কালো কষ দেখা যায়, মহিলার চোখের মণি দুটোর ঠিক চারদিকে ওরকম কালচে ছোপ। খোলা চুল নিয়ে তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কিন্তু মিনিট দশেক পর তিনি যখন একটা কালো রঙের প্লাস্টিকের বালতি হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার কাঁধছোঁয়া চুল তখন ঘাড়ের পেছনে একটা পাঞ্চ ক্লিপে বাঁধা পড়েছে। বালতিটা মেঝের ওপর রেখে তিনি বললেন, 'এই ছেলে, তুমি একটু বসো। আমি কাজটা শেষ করে ফেলি। কাপড়গুলো মেশিনে দিতে হবে। অনেক দিন পড়ে আছে।'

তখনো আমি কিছু বলিনি, শুধু মাথা নেড়েছি।

ফ্রাউ বাওয়ার ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে একটা বেতের ঝুড়ির ভেতর থেকে ময়লা কাপড় বাছাই করছিলেন। তখন তার কাঁধটাকে আরও বেশি প্রশস্ত, ভারী এবং সুঠাম দেখাচ্ছিল। কখনো মনে হচ্ছিল, পুরুষালি শরীর, আবার কখনো মনে হচ্ছিল নারী দেহের অন্য একটা রূপ। একসময় থামলেন তিনি, কিছু একটা ভাবছিলেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ড্রয়ারের ভেতর থেকে বের করলেন সিগ্রেটের প্যাকেট, একটা ধরালেন, মনে হলো এই তৃষ্ণার কথা যেন তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ঠোঁট দিয়ে সিগ্রেটটা চেপে ধরায় ওপরের ঠোঁটটা আরও একটু প্রকাশ্য হলো। এরপর ডান হাতে পুলওভারের বাম হাতাটাকেও উঠিয়ে দিলেন

কনুই পর্যন্ত। সিগ্রেটটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিলেন তিনি, তারপর আবারও বাছাই করতে লাগলেন ময়লা কাপড়। মেরুন রঙের একটা সোয়েটার দুই হাত দিয়ে ওপরের দিকে ধরে সেটাকে মেলে ধরলেন মুখের ওপর। সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না, ঠিক কী করবেন তিনি, তাকালেন আমার চোখে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ?' আমি 'ধুতে হবে না' বলার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাউ বাওয়ার সেটাকে অদ্ভুতভাবে এত দ্রুত ভাঁজ করে আবার ঝুড়ির ভেতর রেখে দিলেন যে মনে হলো তিনি হয়ত কোনো লন্ড্রিতে কাজ করেন।

ভাঁজ করা কাপড়গুলো তিনি রাখছিলেন বড় সোফাটার ওপর, আর নোংরাগুলো প্লাস্টিকের বালতির ভেতর।

বাইরে তখন সন্ধ্যা হয়ে আসতে শুরু করেছে। জানালার ওপারে কয়েকটা পাখি উড়ছে আকাশের খুব নিচ দিয়ে। লাল একটা আভা এসে পড়ছে শেল্ফে রাখা বইগুলোর ওপর। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় আরও রক্তিম হয়ে উঠেছে ফ্রাউ বাওয়ারের মুখ। কোথাও কোনো শব্দ ছিল না, না ঘরে, না ঘরের বাইরে। মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা মৃত, চারপাশে কবরের মতো স্তব্ধতা। রাস্তার শব্দ নেই কোথাও, শব্দ নেই পাখিগুলোরও। অথচ এত কাছ দিয়ে উড়ছিল যে অন্তত ডানা ঝাপটানোরও শব্দ হতে পারত।

বালতিটাকে পায়ে ঠেলে ঘরের এক কোণে সরিয়ে ফ্রাউ বাওয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে সিগ্রেটের আগুন পৌঁছে গেছে তার ঠোঁটের কাছাকাছি। ছাইদানিতে শেষ আগুনটা চেপে তিনি তাকালেন আকাশের দিকে। বললেন, 'মনে হচ্ছে আজও বৃষ্টি হবে না।'

তার চোখে ছিল চাতক পাখির তৃষ্ণা।

'কীভাবে বুঝলেন', আমার প্রশ্ন। তারপর আমিও চোখ রাখলাম আকাশে। শুধু নীল আর নীল, কোথাও কোথাও সাদা মেঘের ভেলা, ভাসতে ভাসতে সরে যাচ্ছে দক্ষিণের বাড়িটার পেছনে। আর অবারিত নীলের ভেতর পাখিগুলো তিন দিকের তিনটা বাড়ির ছাদের ওপরে একটা বিশাল মালা রচনা করে উড়ছে।

'এই ছেলে শোনো, আমি কিন্তু গ্রামের মেয়ে, পাখিরা যখন নিচু হয়ে ওড়ে, তখন বৃষ্টি হয় না, আমি জানি...' ভেঙে ভেঙে বললেন ফ্রাউ বাওয়ার।

'বাওয়ার মানে কী, জানো ?'

জানতে চাইলাম আমি।

'এই ছেলে, বাওয়ার হলো চাষি।'

মহিলার মুখে আবারও 'এই ছেলে' শোনার পর আর ক্ষোভ পুষে রাখতে পারিনি আমি। আমার চোখেমুখে তখন কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা হয়ত ফ্রাউ বাওয়ারই ভালো বলতে পারবেন। খুব রাগ হলো আমার। কেন তিনি আমাকে

বারবার 'ছেলে ছেলে' করছেন। আমার মুখ 'শিশু শিশু' এ কথা শীলার কাছেও কোনো দিন শুনিনি, যদিও চেয়েছি শীলা বলুক। একবার লোভে লোভে খুব ঘনিষ্ঠ সময়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা শীলা, ভুলে যাও যে তুমি আমাকে ভালোবাস, তারপর নিঃসঙ্কোচে বলো, আমি দেখতে কেমন।' ওই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তটাকে আমি কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম, যেটা পরে বুমেরাং হয়ে আমার দিকে ফিরে এসেছিল। খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে শীলা বলেছিল, 'শোনো আসিফ, তোমার চেয়ে খারাপ দেখতে আরও বহু ছেলে আছে এই পৃথিবীতে।' এটা শীলার ফান ছিল না। পরে খুব অনুশোচনা হয়েছিল, কেন ওকে অতটা নিরপেক্ষ আর নির্ভীক হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম, এই দুঃখে।

চার বছরের মায়নাস টেম্পারেচার আর কে জানে হয়ত বিয়ার ও ওয়াইনের কৃপায় তখন আমার গায়ের রংটা একটু জাতে উঠেছিল। তখন চিজ, বার্গার, ক্রিম আর চকোলেট পাকস্থলির সীমান্ত ছাড়িয়ে পেটে, নিতম্বে আর গালেও এসে লাগতে শুরু করেছে। এ রকমই একটা ছবি পোস্ট করেছিলাম ঢাকায়। কার্নিভালের ছবি। মানুষের মিছিলে হাঁটছি, না দাঁড়িয়ে আছি বোঝার উপায় ছিল না। ঢাকা কলেজের সামনে ফুটপাত থেকে কেনা ওভারকোটের কারণে আমাকে দেখাচ্ছিল নৌকার ফুলে থাকা পালের মতো। আম্মা জবাবে লিখেছিলেন, 'বাবা আসিফ, জার্মানির খাবার তোমার গায়ে লাগছে, মাশাল্লাহ।' কিন্তু আমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতাম, শেভ করার সময়, চমকে উঠতাম–কে আমি ! দেশ ছাড়ার আগে, আমার শরীরে আর চুলে অথবা চোখেমুখে যে ছাত্র-ছাত্র ভাব ছিল, ততদিনে সেটাও মিলিয়ে গেছে। বঙ্গবাজার থেকে নিয়ে আসা সব প্যান্ট বাতিল করতে হয়েছিল ততদিনে। নিজেকে মনে হতো জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত শান্তিনগরের মেসে থাকা এক মধ্যবয়সী কেরানি। আর ফ্রাউ বাওয়ার এই আমাকেই কিনা 'ছেলে ছেলে' করেন !

আমার ভেতরে ভেতরে একটা ক্ষোভ তখন মোমবাতির মতো পুড়ছিল।

ফ্রাউ বাওয়ার কাপড় গুছাচ্ছিলেন আর আমার অস্থির মনের ভেতর আমি গুছিয়ে নিচ্ছিলাম তার 'এই ছেলে এই ছেলে' করার জবাবে আমি যা বলব, তার একটা সূচনা ও উপসংহার। আবার ভাবছিলাম, এই সামান্য একটা বিষয়ে আমি কেন এতটা উত্তেজিত হচ্ছি। এ জন্যই কি আমি ফ্রাউ বাওয়ারের কাছে 'এই ছেলে' হয়ে থাকতে চাইছি, না যে তার ভরাট কাঁধ, ভারী বুক এবং বাহু আমাকে অবচেতনে টানতে শুরু করেছে এবং আমি একটা নিষিদ্ধ শিহরণ অনুভব করছি ! অথবা আমার মধ্যে কি এই চিন্তাটা কাজ করছে যে আমি এখন তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরির সুযোগ পেলেও পেয়ে যেতে পারি, কিংবা ঘটনার ঠিক এ রকম একটা মোড়ে 'এই ছেলে' হয়ে থাকলে সেটা হয়ত হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে !

ততক্ষণে ফ্রাউ বাওয়ারের কাপড় গোছানো হয়ে গেছে। উপচে পড়া প্লাস্টিকের বালতিটা নিয়ে তিনি চলে গেলেন ভেতরে। বেতের ঝুড়িটা পড়ে রইল শূন্য। যখন ফিরে এলেন, তার হাতে সাবানের গুঁড়ো। পুলওভারের দুই হাতা কাঁধের প্রায় কাছে উঠে যাওয়ায় দুই হাত এখন আরও বেশি নগ্ন, বিষণ্ন। একটা শব্দ আসছিল ভেতর থেকে, বৃষ্টির শব্দ। আজ তো বৃষ্টি হওয়ার কথা না। বুঝলাম, বৃষ্টি বাইরে হচ্ছে না, হচ্ছে ভেতরে, ওয়াশিং মেশিনে।

মেশিনটা ছিল আরেকটা ঘরে, সেই ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়, সেখানে বাম দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা পুরনো বড়সড় কাঠের টেবিল, তার ওপরে কিছু বইপত্র, একটা জগ। বিশাল আয়না বসানো একটা ওয়ারড্রব এবং তার পাশেই ঝুলছে একটা গোল দেয়াল ঘড়ি, চারপাশের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো বেশ কয়েকটা সাদাকালো ছবি, মেঝেতে ছাই রঙের কার্পেট।

ফ্রাউ বাওয়ার আবারও ডাকলেন, 'এই ছেলে।' বললেন, নিচের সেলারে, যেখানে আগেরবার আমি তার সাইকেল রেখেছিলাম, সেখানে পুরনো কিছু কাপড় আছে, সেগুলো নিয়ে আসতে হবে। তারপর সেলারের চাবি খুঁজতে ডান হাত প্যান্টের একটা পকেটে ঢুকিয়ে আঙুলগুলো দিয়ে সেখানে কিছু একটা হাতড়াতে লাগলেন। হাতটা যখন পকেটের ভেতর থেকে বের করে আনলেন, চাবির সঙ্গে বেরিয়ে এল একগাদা ফেনিশ। খুচরো পয়সাগুলো গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। তিনি নিজেই সব কুড়ালেন। দশ আর পঞ্চাশ পয়সার দুটো কয়েন ঘুরতে ঘুরতে এসে থেমে গিয়েছিল আমার পায়ের সামনে। উবু হয়ে তুললাম পয়সা দুটো। আর তখনই, কোত্থেকে জানিনা, আমার ভেতরে একটা সাহস উড়ে এল, দমকা ঝোড়ো বাতাসের মতো, শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে নিল স্যাঁতসেঁতে বুকের ভেতরে কেঁচোর মতো গুটিশুটি মেরে থাকা সব জড়তা, সব দ্বিধা। বাঁধ ভেঙে ধেয়ে আসা জলের স্রোতের মতো হু হু করা একটা অনুভূতি ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে নিল আমার সব ভয়, সব লজ্জা। মনে হলো, এটাই সুযোগ। বললাম, 'দেখুন ফ্রাউ বাওয়ার, আপনি যে আমাকে 'ছোঁকরা ছোঁকরা' করছেন এটা কিন্তু আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।'

আমার দৃষ্টি তার দিকে, কিছুক্ষণ পাথর হয়েছিল চোখের পলক।

আমার দিকে ঘুরে তাকালেন মহিলা। তার চোখ দুটো এখন আরও বেশি সবুজ এবং উজ্জ্বল। দৃষ্টিতে হাসি, রাগ, বিরক্তি, উপেক্ষা না কৌতূহল–কী ছিল সেটা, এখন আর মনে নেই। তবে মনে আছে ফ্রাউ বাওয়ারের সেই চাহনি সেদিনের সেই গোধূলি বেলায় খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না। তার ওই দৃষ্টি এড়াতে আমি যখন মাথাটা নিচু করেছি, দেখতে পেলাম, একটা নগ্ন হাত আমার মুখের সামনে বাড়ানো। তার ঠোঁটে অচেনা এক হাসি। কিছু একটা বলতে যাওয়ার আগেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে ফ্রাউ বাওয়ার বললেন, 'এই ছেলে, ব্রাটা দাও তো এদিকে...'

অচেনা চাহনি

বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িটার চারদিকে একসময় ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। বসার ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিলেন ফ্রাউ বাওয়ার। আলোর উৎসটা ছিল ট্রান্সপারেন্ট কাগজের তৈরি একটা গ্লোবের ভেতর। সেখান থেকে যে আলোটা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছিল, সেটা ছিল নরম, শান্ত এবং একই সঙ্গে উজ্জ্বল। তার পরও তিনি টেবিলের ওপর রাখা একটা পেয়ালায় ছোট একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। আলোটা নেচে নেচে জ্বলছিল এবং অদ্ভুতভাবে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছিল মিষ্টি একটা গন্ধ। গন্ধটা ওক গাছের। লং প্লেয়ারে চড়ালেন মোৎসার্ট, মোমবাতির আগুনের ওপর ঝুঁকে গিয়ে ধরালেন আরও একটা সিগারেট এবং হালকা করে খুলে দিলেন ব্যালকনির দরজা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ধোঁয়া ছাড়ছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার কিন্তু মুখটা এমন কায়দা করে রাখা যেন ধোঁয়াটা ঘরের ভেতর না আসে। ভাবছিলাম, এই কৌশলটা বের করতে তাকে হয়ত অনেক কসরত করতে হয়েছে। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী কখনো সাপ আবার কখনো স্প্রিং এর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কিছুটা ওপরে উঠে সেটা মিলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারের গভীরে। অনেকখানি পুড়ে যাওয়ার পর ফ্রাউ বাওয়ার ছাইটা ফেলছিলেন বারান্দায় দরজার কাছে রাখা ন্যাংটা একটা টবের ভেতর। কোনো গাছ ছিল না ওখানে। বাদামি ফিল্টারে ফিল্টারে ভরে গেছে ওই টব। তার পাশে মাটি খোঁড়ার জন্য একটা নিড়ানি, একটা সবুজ ওয়াটারিং ক্যান এবং একজোড়া স্যান্ডেল।

সিগ্রেট শেষ হলে ফ্রাউ বাওয়ার ঢুকে গেলেন কিচেনে। কড়া লাল রঙের একটা কেতলির ভেতর পানি ফোটার শব্দ হচ্ছিল। সারা ঘরে ছিল সেদ্ধ টমেটোর গন্ধ। একসময় আমিও গেলাম কিচেনে। ঘরটা বেশ সরু কিন্তু লম্বা। ডান দিকের দেয়ালে জানালা আর কোনায় চিকন একটা দরজা এবং দরজার ওপাশে ব্যালকনির বাকিটা।

এই জানালা দিয়ে দেখা যায় অদ্ভুত একটা বাড়ি, বাম পাশে। বাড়িটার একপাশে বিশাল উঁচু উঁচু দেয়াল, আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো। দেয়ালের

কোথাও কোনো জানালা নেই, দরজা নেই। মনে হয়, ওটা একটা জেলখানা অথবা আলুর কোল্ডস্টোরেজ। জেলখানার প্রাচীরের ওপরে তা-ও স্প্রিংয়ের মতো গোল করে পেঁচানো থাকে কাঁটাতারের বেড়া কিংবা ভাঙা কাচের টুকরো, কোল্ডস্টোরেজের দেয়ালেও থাকে ফ্যান বসানো ভ্যান্টিলেটর, কিন্তু এই বাড়িটার চারদিকে ওসবের কিছু নেই, আছে শুধু দেয়াল আর দেয়াল। কিচেনের ভেতর দাঁড়িয়ে, জানালার ও পাশের এই বাড়িটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে, হাসতে হাসতে আমি ফ্রাউ বাওয়ারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো বন্দিশিবির কি না। এই প্রশ্নের জবাবে কিছুই বললেন না তিনি। শুধু এমন কড়াভাবে তাকালেন যে তার চোখ দুটো বাড়িটার দেয়ালের চেয়েও আরও বেশি দুর্ভেদ্য মনে হলো।

কিচেনের বাম দিকে একটা সাদা ফ্রিজ, তার গায়ে প্লাস্টিকের এক থোকা চেরি চুম্বক দিয়ে লাগানো। ফ্রিজের ডান পাশে ডিশ ওয়াশার। তার ওপরের দেয়ালে ওয়াইনের কর্ক দিয়ে বানানো একটা বোর্ড। সেখানে কিছু লিফলেট লাল-নীল পিন দিয়ে গাঁথা–কোথায় কবে কোন থিয়েটার, ব্রেখটের একটা নাটকের ছবি, সম্ভবত মুটার কারেজ, তার পাশে টেলিফোনের বকেয়া বিল, টেক এওয়ের ফোন নম্বর, বাজারের একটা ফর্দ আর কালো মোটা পেন্সিল দিয়ে কাঁচা কাঁচা হাতে আঁকা একটা ঘোড়ার ছবি। ঘোড়ার লেজের গোছাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। লেজটাতে মোমের রং দেওয়া, খয়েরি। রংটা কোথাও কোথাও লেজের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ঘোড়াটার নিচে লেখা 'নোভা, আমার ক্যাসানোভা।' দরজার কাছে একটা বিশাল পোস্টার, যার ওপরে লেখা উনজের গেম্যুজে এবং তার নিচে স্প্রিং অনিয়ন, স্পিনাচ, ধনেপাতা আর শালগমের মতো নানা রকমের সবজির ছবি। ছিল মেথিশাকও। এর আগে এ রকম পোস্টার শুধু চোখের ডাক্তারের চেম্বারেই দেখেছি।

শাকসবজির এই পোস্টার দেখে আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম যে ফ্রাউ বাওয়ার হয়ত একজন নিরামিষাসী। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল একটা ছবি, ফ্রাউ বাওয়ার তার কনুইয়ে বেতের ঝুড়ি ঝুলিয়ে বাল্টহাসার স্ট্রাসে ধরে হেঁটে আসছেন, সেই ঝুড়ির ভেতর থেকে উপচে পড়ছে ফুলকপির সবুজ পাতা। যখন মনে হলো, তার গায়ের রংটাও কিছুটা ফুলকপির মতো, তখন ফ্রাউ বাওয়ার কেতলির ঢাকনাটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নল দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দে বেরিয়ে আসছিল জলীয় বাষ্প। তার বাঁ পা ছিল ডান পায়ের গোড়ালির কাছে, ক্রস করা।

'এই ছেলে, তুমি কিছু পেঁয়াজ কেটে দিতে পার ?' আমার দিকে তাকিয়ে ফ্রাউ বাওয়ারের হঠাৎ প্রশ্ন। এর উত্তরের জন্য তৈরি ছিলাম না আমি।

কুকারের পাশে নিচের দিকে উবু হয়ে প্লাস্টিকের একটা শেল্ফ থেকে বড় বড় কয়েকটা পেঁয়াজ বের করলেন তিনি। লাল লাল পেঁয়াজ। ওখান থেকে একটা

রসুন আর ফ্রিজ থেকে বের করলেন কয়েকটা টমেটো। সেগুলো দিয়ে আমরা পাস্তা রান্না করলাম। মাশরুম, পাপরিকা, ব্ল্যাক অলিভ, শসা আর আইসবার্গ লেটুশ মিশিয়ে তৈরি হলো স্যালাড। সুকিনি গোল গোল করে কেটে তার সঙ্গে একগাদা রসুন দিয়ে ইটালিয়ান একটা প্রিপারেশন। পাস্তার সঙ্গে ঝুর ঝুরে মাংস দিয়ে টমেটোর একটা তরকারি।

ফ্রাউ বাওয়ার স্টোর রুমের ভেতর থেকে রেড ওয়াইনের একটা বোতল বের করলেন। কিচেন থেকে দুটো গ্লাস এনে রাখলেন টেবিলে। ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মতো দেখতে কাঠের একটা খোলের ভেতর কিছু বাদাম, আখরোট এবং তার সঙ্গে একটা ক্র্যাকার। তারপর ওয়াইন ওপেনারটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই ছেলে বোতলটা খোল।'

কর্কের ভেতরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পুরোটা পিন ঢুকিয়ে হেঁচকা টানে খুলে ফেললাম ওয়াইনের মুখ। ভেতরে রক্তের মতো লাল একটা পানীয় ছলাৎ করে উঠল। গ্লাসের কিনারে বোতলের গলাটা কাত করে ওয়াইন ঢাললাম আমি, তারপর একটা গ্লাস নাকের কাছে ধরে তার গন্ধ নিলাম। ওয়াইনটা ছিল ফরাসি।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পাস্তা খাচ্ছিলাম আমরা দুজন, সঙ্গে ছিল নানা রকমের গল্প। বেশির ভাগই নিজেদের কথা, তার কিছু প্রশ্ন আর আমার উত্তর। শহরের ট্রাম আর বাসগুলো আজকাল সময় মানছে না, শনিবার ন্যুয়মার্কেটে কী ভীষণ ভিড় হয়, কেমন শীত পড়েছে এবার, এই মওসুমে কেন এত কম তুষারপাত হলো–এ রকম কিছু কথামালা। মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ছিল রাজনীতির অলিগলির ভেতরেও। সমাজবাদীরা কেন ভোট পাচ্ছে না মানুষের, হেলমুট কোলের মতো লম্বা সময় ক্ষমতায় থাকা, এর মধ্যে ঢুকে পড়ল তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনিও, শোনা যাচ্ছে কানৎসলার কোলের সঙ্গে তার সেক্রেটারির গোপন প্রণয়ের কথা, দিনের আলোয় ফ্রাউ কোলের এলার্জি, কী নিষ্ঠুরভাবে তিনি বেঁচে আছেন গুহার ভেতর। আমি বললাম, বিয়ারমানের গানে প্রেম, সমাজ আর দিন বদলের কথা আর ফ্রাউ বাওয়ার বলছিলেন, গুন্টার গ্রাসের ঢাকায় শাঁখারীবাজার যাওয়ার কাহিনি। অতীতও আসছিল আমাদের কথায়। দুই জার্মানি এক হওয়ার আগে ও পরের সময়, পূর্বের মানুষেরা কতটা খুশি, বার্লিন দেয়াল পতনের সময় তিনি কোথায় ছিলেন আর এই দেয়ালবিহীন দেশ গত কয়েক বছরে জার্মানদের কতখানি এক করতে পেরেছে।

অতীত নিয়ে কথা হলেও ইতিহাসের খুব বেশি পেছনে যেতে পারছিলাম না আমি। সময়ের মহাসড়কে অদৃশ্য একটা দেয়াল তুলে রেখেছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই তিনি ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেন কথার মোড় আর তাকাচ্ছিলেন অদ্ভুতভাবে।

এই চাহনিটা ছিল ভীষণ অচেনা।

খেতে খেতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম অর্থনীতিবিদ কার্ল হাউজহোফারের কথা। জানতে চাইলাম, 'রাষ্ট্র একটা জীবের মতো, বায়োলজিক্যাল অর্গানিজম, প্রাণী বা উদ্ভিদের মতো রাষ্ট্রেরও জন্ম হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে, বড় হওয়ার জন্য যুদ্ধ করে এবং বড়রা ভূমি কেড়ে নেয় ছোটদের কাছ থেকে, রাষ্ট্র জন্মায় এবং তার মৃত্যু হয়,' এই তত্ত্বের বিষয়ে তার কী মত। মুখে কোনো জবাব দিলেন না তিনি। কিন্তু জবাব দিলেন চোখে। সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। সেই চাহনিতে এই প্রশ্নের কী জবাব ছিল অথবা সেখানে পাল্টা কোনো প্রশ্ন ছিল কি না, এখন আর সেটা মনে নেই। তবে চোখ বন্ধ করলে এখনো দেখতে পাই তার চোখের ভেতর সবুজাভ মণিটা মার্বেলের মতো স্থির হয়ে গিয়েছিল, তার চারদিক ঘিরে ছিল লাল ওয়াইনের মতো দেখতে ক্রোধের একটা প্রবাহ।

মোৎসার্ট তার ৪০ নম্বর সিম্ফনি বাজিয়ে যাচ্ছিলেন তখনো। ফ্রাউ বাওয়ার তার কতটা শুনছিলেন বলতে পারব না, তবে আমি এর কিছুই শুনছি না। আমার মাথার ভেতর গিজগিজ করছিল শুধু একজোড়া চোখের ক্রুদ্ধ চাহনি। খেতে পারছিলাম না আমি, হাত কাঁপছিল আমার। কাটা দিয়ে লম্বা লম্বা পাস্তা তুলতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল আমাকে। বর্শা দিয়ে মাছ মারার মতো গেঁথে, অনেক সময় নিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোনো রকমে তুলে আনছিলাম মুখের কাছে, ভাবখানা এই যে খুব মনোযোগ দিয়ে আমি তার কথা শুনছি। পাস্তার কিছুটা নিতে পারি মুখের ভেতর, বাকিটা পিছলে পড়ে যায় বাসনে। আর আমি ঠোঁটের কোনায় লেপ্টে থাকা টমেটোর সস নাক চুলকানোর ভঙ্গি করে হাতের তালুর উল্টো পিঠে মুছে নেই গোপনে।

আমার দিকে না তাকিয়েই খাচ্ছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার। তার মুখটা প্লেটের ওপর নামানো, হয়ত খুব মনোযোগ দিয়ে স্বাদ নিচ্ছিলেন খাবারের অথবা আমাকে এড়াতে মাথাটা নিচু করে রেখেছিলেন। তিনি হয়ত রেগে ছিলেন আমার ওপর। তার বাসন যখন একদফা খালি হয়ে গেছে, তখনো আমার প্লেট যা ছিল, তা-ই। নানা কসরৎ করে তখনো আমি খাওয়ার চেষ্টা করছি।

ফ্রাউ বাওয়ার দুই হাতের দুই চামচ প্লেটের দুই কিনারে রেখে হেলান দিয়ে বসলেন চেয়ারে। তারপর হাত দুটো রাখলেন কোমরে আর চোখ রাখলেন আমার চোখে। একসময় ফেটে পড়লেন হাসিতে। বললেন, 'এই ছোঁকরা দাঁড়াও, আমি আরেকটা চামচ দিচ্ছি তোমাকে।'

ফ্রাউ বাওয়ার উঠে গিয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। পেছন থেকে দুই হাত বাড়িয়ে ধরলেন আমার হাত। আমার হাত দুটো তখন ওর মুঠোর ভেতর। একহাতে একটা ফর্ক এবং আরেক হাতে একটা টেবিলস্পুন ঠিকঠাক মতো ধরিয়ে

দিলেন তিনি। তারপর উবু হয়ে ঘনিয়ে এলেন আমার ওপরে। তার ঝুলে পড়া চিবুক আমার মাথার চুলে এসে লাগছে। ফ্রাউ বাওয়ার আমার এত ঘনিষ্ঠ হলেন যে ঘাড়ের কাছে আমি তার স্তন অনুভব করতে পারছিলাম। অসাড় হয়ে আসছিল আমার শরীর। ওর গা থেকে আসছিল টমেটো ও রসুনের গন্ধ। হাতেমুখে আমাকে দেখালেন প্লেট থেকে কীভাবে পাস্তা তুলে খেতে হয়। পাস্তাগুলোকে প্রথমে কাঁটা চামচের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পেঁচিয়ে, তারপর কারি চামচের গর্তটায় চেপে দুটো চামচই নিয়ে আসতে হয় মুখের কাছে।

এরপর কেমন শিখেছি, সেটা দেখতে চাইলেন তিনি। জবাবে আমি বললাম, 'আচ্ছা, একটা বিষয়ে আমি খুবই অবাক হচ্ছি। বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়েছে, সেটা আপনি জানেন। বাংলাদেশের একটা স্ট্যাম্পও আছে আপনার সংগ্রহে। আমাদের দেশ সম্পর্কে আপনার এই আগ্রহের কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

আমি বোধ হয় পাস্তাটা এবার ঠিকমত মুখে চালান করতে পেরেছি। কথা বলছিলাম দেখে লম্বা একটা নুডলসের অর্ধেক ঠোঁট থেকে মুখের বাইরে ঝুলছিল। ফ্রাউ বাওয়ার পাতে স্যালাড নিলেন। বড় একটা কাঠের চামচ দিয়ে সবুজ লতাপাতার ভেতর লুকিয়ে থাকা অলিভ খুঁজতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। কোনো জবাব না পেয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি ইতিহাস নিয়ে পড়ালেখা করেছেন ?'

চাঁদের মতো ফালি ফালি করে কাটা সাদা মাশরুমগুলো জলপাই তেলে চুপসে কালচে হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। আকাশটাও আগের চেয়ে আরও বেশি কালো, জানালার ওপাশে অন্ধকারটা আরও জমাট, আলকাতরার মতো গাঢ়। পেয়ালায় দাঁড়িয়ে থাকা মোমবাতিটার জন্য অন্ধকারটা পারছে না ভেতরে আসতে। আলোটা নিভে গেলেই বন্যার পানির মতো ওটা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ঘরের ভেতর।

আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না তিনি। আবার যখন জিজ্ঞেস করতে গেছি, তখনই তিনি হেলান দিয়ে বসলেন পেছনে, তারপর বললেন, 'আমার কাছে বেশ কিছু দেশের স্ট্যাম্প আছে। তোমাদের দেশের স্ট্যাম্প তো আমার কাছে থাকতেই পারে। নাকি...'

জবাবে কয়েকটা প্রশ্ন এসে জড়ো হলো মনে। স্ট্যাম্পটা আপনি কোথায় পেলেন, বাংলাদেশ থেকে কে চিঠি লিখল আপনাকে, আপনি কি সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন কখনো, অথবা বাংলাদেশের কারও সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে–এ রকম কিছু কৌতূহল। কিন্তু প্রশ্নগুলো আমি করিনি, একটা স্ট্যাম্প নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কী আছে ! আছে যখন থাকুক, অসুবিধা কী !

চুপ করে রইলাম আমি, আমার দিকে ঝুঁকে এলেন ফ্রাউ বাওয়ার। বললেন, 'যেসব দেশে গণহত্যা হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে, সেসব দেশের কিছু কিছু স্পর্শ আমার সংগ্রহে আছে। হয়ত কোনো একটা দেশের পতাকা, আবার কোনো একটা দেশের যুদ্ধ নিয়ে ওই দেশের ভাষায় লেখা একটা বই, অথবা কোনো দেশের এক মুঠো মাটি...' একটু থামলেন তিনি, ওর আঙুলগুলো তখন মুঠোর ভেতর, কতক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে লাগলেন, 'এই ছেলে, ইতিহাসে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই। তবে জানতে ইচ্ছে করে, সেই সব দেশের মানুষের কথা, যেখানে গণহত্যা হয়েছে, তারা এখন কেমন আছে, যুদ্ধ তো হলো, তো এত রক্তপাতের পর দেশটা কেমন হলো, যে কারণে সবাই রক্ত দিল, জীবন দিল, যুদ্ধের পরে তারা কি সেগুলো পেয়েছে, যারা গণহত্যা লুটপাট আর ধর্ষণ করেছে বা যারা সহযোগিতা করেছে, দালাল, যুদ্ধাপরাধী, তাদের কি বিচার হয়েছে...এসব...'

একটা ঢোঁক গিললেন তিনি, গলার কাছে তার কণ্ঠাটা নীল।

ফ্রাউ বাওয়ারের কথা শুনছিলাম আমি, ভালোই লাগছিল। মোমটা জ্বলতে জ্বলতে পেয়ালার কাছাকাছি এসে আরও বেশি করে জ্বলছে। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে বেশ আগে। প্লেটের তলানিতে টমেটো কেচাপের লাল লাল ছোপ। আমি ডান হাতের একটা আঙুল রাখলাম সেখানে, শুকায়নি তখনো। আঙুলের ডগায় সেটা মাখিয়ে সিরামিকের সাদা প্লেটে আঁকিবুঁকি করার চেষ্টা করছিলাম আমি। একসময় জিজ্ঞেস করলাম, 'তো জার্মানির কোনো স্পর্শ আছে আপনার সংগ্রহে ?'

ফ্রাউ বাওয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, এটা একটা অবান্তর প্রশ্ন। তিনি নিজেই তো এই দেশের মানুষ। এই দেশের আলো, বাতাস, মাটি আর জল-হাওয়ার মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন। আর সময় নিলাম না আমি, প্রশ্ন সংশোধনের চেষ্টায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছে আপনার দেশের মানুষ, যে রকম চেয়েছিল, তারা কি সে রকম দেশ পেয়েছে ?'

এবারও তিনি হাসলেন, খুব জোরে। কাচভাঙা হাসি। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এই হাসিটা ছিল আমার বোকা বোকা প্রশ্নের জবাব। আর ঠিক তখনই যুৎসই প্রশ্নটা পেয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, আপনাদের দেশে যারা যুদ্ধাপরাধী ছিল, তাদের সবার কি বিচার হয়েছে ?'

সত্যি কথা বলতে কি, ফ্রাউ বাওয়ারের কাছে তখন এই প্রশ্নের কোনো জবাব পাইনি, তবে তার চোখে আবারও দেখতে পেয়েছিলাম সেই অচেনা চাহনি। সেখানে না আছে জবাব, না আছে পাল্টা কোনো প্রশ্ন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে যাওয়ার সময় একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। দুই জোড়া চামচ আর দুটো প্লেট বেসিনে রাখতে রাখতে ফ্রাউ বাওয়ার বললেন, 'বাকি

ওয়াইনটা আমরা পরে খাব। এখন একটু সেলারে যেতে হবে, কিছু কাপড় শুকাতে দিয়েছিলাম ওখানে।'

'এই ছোঁকরা ওঠো, তুমিও যাবে', আমি বলতে শুনলাম তাকে।

মহিলার এই আচরণে খুব অবাক হচ্ছিলাম আমি। তার কথায় কোনো অনুরোধ পর্যন্ত ছিল না, এমনকি একটু নরম করে আমার কাছে জানতেও চাইলেন না, আমি তার সঙ্গে সেলারে যেতে পারব কি না।

আমি যখন সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছিলাম, কোনো একটা ফ্ল্যাটে জোরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো, কোথাও কেউ একজন চিৎকার করছিল আর এক জোড়া ভারী জুতা হয় ওপরে উঠছিল অথবা নামছিল। কিন্তু ওই শব্দের উৎসের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি।

সেলারের দরজার সামনে চাবির গোছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমি জানি না কোন চাবিটা দিয়ে খুলব। প্রত্যেকটা দিয়ে চেষ্টা করলাম, একটার পর একটা। কৌশলের চেয়ে জোর খাটালাম বেশি। ততক্ষণে ফ্রাউ বাওয়ার চলে এসেছেন। তার হাতে কালো বালতিটা, সেখানে একগাদা ভেজা কাপড়।

আমরা যখন ভেতরে ঢুকলাম, তীব্র একটা গন্ধে আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বাতিটা জ্বলে উঠল আপনাআপনি, হয়ত সেন্সর বসানো, দেয়ালে নতুন রং, ঢুকতেই ডান পাশে চোখে পড়ল কাগজে আখটুং লেখা বড় একটা নোটিশ। সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বুঝলাম, ঝাঁঝালো এই গন্ধটা চারপাশের দেয়াল থেকেই আসছিল।

ফ্রাউ বাওয়ার একটা সুইচ টিপে দিলেন। বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হলো, শো শো ঝড়ের মতো। বাতাসটা গরম, জুতার কারখানার বাতাসের মতো, এই বাতাসে কাপড় শুকাবে। মাথার ওপরে ছাদের কাছাকাছি বেশ কয়েকটা দড়ি ঝুলছে, এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে। পেছনের একটা দড়িতে হালকা গোলাপি রঙের একটা বেডশিট, সেখানে নীল নীল ফুল। আছে কয়েকটা তোয়ালে, একটা জ্যাকেট আর কয়েক জোড়া মোজা। ফ্রাউ বাওয়ার বেডশিটের একটা প্রান্ত তার হাতের মুঠোর ভেতর নিয়ে দেখলেন শুকিয়েছে কি না। তারপর এমন একটা টান দিলেন যে পুরোটা চাদর একটা জাদুর রুমালের মতো তার মুঠোর ভেতর ভাঁজ হয়ে গেল।

দড়ি থেকে নামানো বাকি কাপড়গুলো ফ্রাউ বাওয়ার আমার হাতে দিলেন। সেগুলো কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। বালতি থেকে ভেজা কাপড়গুলো তুলে দড়ির ওপরে মেলে দিচ্ছিলেন তিনি। তার হাত দুটো উঠছিল ওপরে, সেই সঙ্গে উঠছিল বুকও, পুলওভারের নিচ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল ফুলকপি রঙের তলপেট।

ভেতরের অস্বস্তি আর নিষিদ্ধ শিহরণ আড়াল করতে আমি সরে গেলাম ওর সামনে থেকে। ঘরটার ডান পাশে ছিল কাঠের তৈরি খাঁচার মতো সারি সারি

কয়েকটা ঘর। কোনো ঘরে টেলিভিশন অথবা মাইক্রোওয়েভের বিশাল বিশাল কার্টন, কোনো ঘরে গাড়ির উইন্টার টায়ার, চুপসে যাওয়া পুরনো ম্যাট্রেস, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আবার কোথাও প্যারাম্বুলেটর, ভাঁজ করে রাখা।

ফ্রাউ বাওয়ার কথা বলতে বলতে দড়িতে কাপড় নাড়ছিলেন। তার হাঁপানোর শব্দও পাচ্ছিলাম আমি। আবারও যুদ্ধের প্রসঙ্গ এল। বলছিলেন, 'এখানে যে বাড়িটা ছিল সেটা যুদ্ধের সময় ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর এই জায়গাটা বহু দিন ফাঁকা পড়েছিল। অনেক পরে এই বাড়িটা উঠেছে।'

নীল সেই ব্রাটা একটা ক্লিপ দিয়ে দড়িতে আটকাতে আটকাতে ফ্রাউ বাওয়ার বলছিলেন, 'এই ছেলে জানো, এই যে ঘরটা, যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, বাড়ি তৈরির সময় যখন পাইলিং করা হচ্ছিল, তখন এখানে একটা আস্ত বোমা পাওয়া গিয়েছিল। মিত্র বাহিনীর ফেলা বোমা, সেটা কোনো দিন ফাটেনি।'

ব্রার পাশে তিনি ঝুলিয়ে দিলেন শীলার রুমাল, নৌকার পালের মতো, তাতে লাল লাল রক্তের ছোপ।

কথা বলার কারণে হয়ত তিনি হাঁপাচ্ছিলেন আরও বেশি। ভেজা কাপড়গুলো এখন দড়িতে, আর শুকনোগুলো আমার বুকের ওপরে। এতটাই হাঁপাচ্ছিলেন তিনি যে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে শরীরের ভরটা ছেড়ে দিলেন পুরোপুরি। হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জানো, এই বোমাটার ছবি আছে আমার কাছে। ওটা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।'

তারপর বললেন, 'ঘরে চলো, দেখাব তোমাকে।'

ফ্রাউ বাওয়ার যখন দেয়াল থেকে তার ভারী পিঠটা তুলে আনতে গেলেন, তখনই চট করে একটা শব্দ হলো। সামনে আসতে আসতেও পেছনে চলে গেল তার শরীর, যেন পেছন থেকে কেউ হেঁচকা টান দিল তাকে। ততক্ষণে কাঁচা দেয়ালে পড়ে গেছে তার শরীরের ছাপ। সেটাও তার পিঠের মতো প্রশস্ত এবং ভারী।

'এই ছেলে এই ছেলে' বলে রাগে ফেটে পড়লেন ফ্রাউ বাওয়ার। তার সেই চিৎকার সেলারের চার দেয়াল এবং বাড়ির গেট পার হয়ে বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে ছড়িয়ে পড়েছিল কি না বলতে পারব না, তবে এটা মনে আছে যে তার সেই চিৎকারের পর পুরো সেলারের ভেতর নেমে এসেছিল অদ্ভুত নীরবতা, আপনজন দাফন করে মানুষেরা চলে যাওয়ার পর গোরস্থানে যে রকম নীরবতা নেমে আসে, সে রকম স্তব্ধতা।

ঘরের ভেতর উষ্ণ বাতাস বয়ে যাওয়ার হুশ হুশ শব্দটাও শোনা যাচ্ছিল না তখন। শব্দ ছিল না মহিলার হাঁপানোরও। আমার শরীরের কোষে কোষে নিষিদ্ধ যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, সেটাও তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছিল,

একটু আগে মিত্রবাহিনী এখানে বোমা ফেলে এই ছোট্ট ঘরটার সব প্রাণ, সব কলরব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

ফ্রাউ বাওয়ার দোষ দিচ্ছিলেন আমাকে। কেন আমি তাকে সাবধান করিনি, কেন আমি তাকে দেয়ালে হেলান দিতে দেখিনি–এসব। জবাবে নির্বাক ছিলাম আমি। মহিলার চিৎকারে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার মুখ থেকে কোনো কথাই তখন ভাষা হয়ে বেরিয়ে আসেনি।

আমরা দুজনেই আবার চারতলায় উঠে এলাম, নিঃশব্দে।

এবার ফ্রাউ বাওয়ার বসলেন আমার চেয়ারে। ওয়াইনের গ্লাসটা হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরে পৃথিবী নিজে যেমন হেলতে-দুলতে বৃত্তাকারে ঘুরে সে রকম করে ঘোরাতে লাগলেন, থামালেন, আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমুকও দিলেন পেয়ালায়। আমরা কেউ তখন কারও সঙ্গে কথা বলিনি, যেন প্রতিবাদ করে আমি আগে যেখানে বসেছিলাম, সেখানে বসিনি, বসেছি সিঙ্গেল সোফাটায়, এই বাড়িতে আসার পরে যেখানে আমি প্রথম বসেছিলাম।

আমি ভাবলাম, তিনি হয়ত তার এই আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন। একটা সুযোগ দিতে চাইলাম ওকে। সোফা থেকে উঠে গিয়ে বসলাম তার চেয়ারে, মুখোমুখি। টেবিলের ওপর রাখা কাঠের খোল থেকে কয়েকটা বাদাম আর নাট ক্র্যাকারটা নিয়ে খেলতে লাগলাম আমি। ঘরটা শুনশান। মোৎসার্ট থেমে গেছে। নিভে গেছে মোমের আলোটাও। অনেক দূরে একটা বিমান উড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল। আর শোনা যাচ্ছিল বাদাম ভাঙার শব্দ।

ওয়াইনটা শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন ফ্রাউ বাওয়ার। আমি তাকিয়ে দেখলাম তার চলে যাওয়া, আমাকে কিছু বলেও গেলেন না তিনি। বুঝতে পারছিলাম না, আমি কী করব অথবা কী বলব। উঠে গিয়ে শেল্ফে রাখা বইয়ের নামগুলো পড়ার চেষ্টা করছিলাম। তাকের ওপরে ছিল রাইনার মারিয়া রিলকের বেশ কিছু কবিতার বই, কয়েকটা হাতে নিয়ে খুললাম আবার বন্ধ করে দিলাম, লেবেন ও লাইডার খুলে দেখি ভেতরে গোলাপের শুকনো পাপড়ি, গন্ধ নিলাম আমি এবং আলতো করে সেটা রেখে দিলাম ৪৬ ও ৪৭ নম্বর পাতার মাঝখানে। অনেকক্ষণ পরেও তিনি যখন ফিরে আসছিলেন না, আমি তাকালাম তার ঘরের ভেতর।

কাপড় বদলাচ্ছেন ফ্রাউ বাওয়ার। যোগাসনের মতো মাথার ওপর দিয়ে, খুব সাবধানে কসরৎ করে বের করে আনলেন পুলওভার, যেন কাঁচা রং জামায় না ছড়ায় বা গায়ে না লাগে। আমার সামনে তখন উন্মুক্ত হয়ে আছে তার নগ্ন স্তন। ফরসা পিঠে পড়েছে ঘরের নরম আলো। পুলওভারটার নিচ দিয়ে ভেতরে দুহাত ঢুকিয়ে, তারপর হাত বের করে, জামাটার ভাঁজ সোজা করলেন তিনি। দুহাত

বাড়িয়ে সেটাকে মেলে ধরলেন মুখের সামনে, দেখলেন রং আসলে কতখানি লেগেছে। রঙের গন্ধ নিলেন তিনি। ওয়াড্রোব খুলে ভেতর থেকে বের করলেন একটা স্ট্রাইপ শার্ট। ওটার রং ছিল আফ্রিকার পাকা আমের মতো সবুজ সবুজ লাল।

আমি তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে। আমার পেছনে জানালা, জানালার ওপাশে অন্ধকার, আর সামনে দরজা, দুয়ারের ওপাশে নগ্নতা। প্রবল ঝড়ে ভেঙে পড়ার আগে নারকেল গাছ যে রকম অনড়-অবিচল দাঁড়িয়ে থাকে, আমিও দাঁড়িয়ে রইলাম সেভাবে, একবার ভেবেছিলাম, যা দেখার দেখেছি, আর নয়। কিন্তু সত্য হলো, আমি তখন চোখ ফেরাতে পারিনি। আমার হতবিহ্বল দৃষ্টি গ্লুর মতো লেপ্টে ছিল ফ্রাউ বাওয়ারের নগ্ন শরীরে।

ফ্রাউ বাওয়ার তখন দরজার দিকে ঘুরে, শার্টের ভাঁজ ভেঙে, বোতাম খুলছিলেন দুহাতের আঙুলে। তারপর আমাকে হতচকিত করে দিয়ে হঠাৎই শার্টের বোতাম খোলা বন্ধ করলেন তিনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন দুয়ারের কাছে। তার শরীরের পেছনে তখন পুরো ঘরটা ঢাকা পড়ে গেছে। জানালার পর্দায় মহিলার নগ্ন ধূসর ছায়া। বাকি ঘরটায় আধো আলো আধো অন্ধকার। ওখানে দাঁড়িয়ে তিনি সোজা তাকালেন আমার চোখ বরাবর। তার চোখ দুটো তখন জ্বলছে, যেমন অন্ধকারে জ্বলে রেডিয়াম ঘড়ি।

আমি বলতে পারব না, সেটা কী রকম দৃষ্টি ছিল ফ্রাউ বাওয়ারের। একটু আগে যুদ্ধের নৃশংসতা, মৃত্যু দিয়ে সয়লাব হয়ে যাওয়া রাস্তাঘাট, মায়ের কোল থেকে বন্দুকের গুলিতে ফুলের মতো ঝরে যাওয়া শিশু আর গণহত্যার কথা বলার সময় তার চোখে যে রকম চাহনি দেখতে পেয়েছিলাম, এই দৃষ্টি সে রকম ছিল কি না, তা-ও আমি জানি না। বোমার আঘাতে একটা শহরের ধুলোয় মিশে যাওয়া আর গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কাহিনি যখন ফ্রাউ বাওয়ার বলছিলেন, তখনো তার দৃষ্টি এ রকম ছিল না। আমি জানি না, কী ছিল তার ওই চাহনিতে, তার অন্যায় আচরণের জন্য অনুশোচনা, আমার ভুলের জন্য ক্রোধ, নগ্ন নির্জন রাতের আহ্বান না অন্য কোনো কিছু ! এর কিছুই আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে হঠাৎ তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, হয়ত এক হাত দূরে, ফ্রাউ বাওয়ার তখন জোরে চিৎকার করে উঠলেন, 'শাইসে কিড।'

তারপর বিকট ওই চিৎকার থেকে রুদ্ধশ্বাসে পালাতে লাগলাম আমি। প্রথমে বসার ঘর, ক্লদ মোনে, রিলকে আর মোৎসার্ট, তারপর ফ্রাউ বাওয়ারের ফ্ল্যাট, আকাশে উঠে যাওয়া সিঁড়ি, কম্পোস্টের বস্তা আর ফুলের টব–সবকিছু পেছনে ফেলে একসময় নিজেকে আবিষ্কার করলাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে, তারপর নয়েসার স্ট্রাসে পার হয়ে, এবার্টপ্লাৎসের পাতাল স্টেশনে আমি ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি।

আর আমার হাতের মুঠোয় ফ্রাউ বাওয়ারের বাদাম ভাঙার ক্র্যাকার।

আমি যখন পিওনিয়ার স্ট্রাসের কাছে পাতাল স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন রাতের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে শহরে। বড় বড় ফোটার বৃষ্টি। দেশের বৃষ্টির মতো। চেরিগাছগুলো, রাস্তার দুই পাশের সারি সারি গাড়ি আর ছাদের চিমনিগুলো ভিজে ভিজে চুপসে গেছে তুমুল বৃষ্টিতে। চারদিকে তাকালাম আমি। কোথাও কেউ নেই। কোথাও খুঁজছিলাম দু-একটা পাখি। নাখালপাড়ায় যখন এ রকম বৃষ্টি হতো টেলিফোনের তারের ওপর বসে বসে ভিজত কাকগুলো। এখানে কাকও নেই। নেই ফ্রাউ বাওয়ারের সেই নিচ দিয়ে ওড়া কোনো পাখিও।

২১ নম্বর বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি খুঁজছি, তখন বুঝতে পারলাম হঠাৎ এই বৃষ্টি কাকের মতো ভিজিয়ে দিয়েছে আমাকে।

স্বপ্নের ডানা

আমি জানি না, ফ্রাউ বাওয়ার কেন সেদিন ওভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন, আমার কী অপরাধ ছিল, কেন আমি তার জবাব দিতে পারিনি, তার বাড়ি থেকে ওভাবে দৌড়ে পালানোর পেছনে কী কারণ ছিল। আমি কি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, অথবা লজ্জা, নাকি নিষিদ্ধ কোনো কামনা ছিল আমার ভেতর ?

আমি তার কিছুই জানি না।

আমার তো ভয় পাওয়ার বা সঙ্কোচ করার কিছু ছিল না। কারণ যা কিছু হওয়ার, তার সবটা হচ্ছিল ফ্রাউ বাওয়ারের তরফে। ওখানে আমি ছিলাম শুধুই দর্শক। তিনি আমাকে এটা-ওটা করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন আর আমি ছিলাম তার আজ্ঞাবহ। সেদিন রাতে আমি তার বাড়িতে, দরজা খোলা ছিল, এসব জেনেই তিনি নগ্ন হয়েছিলেন তার শোওয়ার ঘরে। তিনি জানতেন যে তার ঘরের ওপাশে বাতিটা জ্বালানো, অন্ধকারে মিশে থাকে না সবকিছু বরং নগ্নতা ভালো দেখা যায় অন্ধকারেই। যতই তিনি আমাকে 'এই ছেলে এই ছেলে' বলে ডাকুন, তার বেশ ভালো করে জানার কথা, আমি একজন পুরুষ। তার বাড়িতে আমার উপস্থিতিকে নিজেই উপেক্ষা করেছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার।

সেদিন আমি কেন রুদ্ধশ্বাসে পালিয়ে এসেছিলাম ? নারীর নগ্ন বুক দেখে ? কিন্তু নগ্নতা তো আমি আগেও দেখেছি। শুধু দেখা নয়, ছুঁয়েছি, ধরেছি। তাহলে ! তাহলে কি নগ্নতা কখনো পুরনো হয় না ? একেক নগ্নতা কি একেক রকমের ? এসব নিয়ে আমি বহু দিন ভেবেছি। নিজের সঙ্গে নিজে বহু তর্ক করেছি অথচ জবাব মেলেনি। আমি কি পালিয়েছিলাম ওর চিৎকারের কারণে ? কিন্তু আমি তো জানি না তার ওই চিৎকারের কারণ ? তাহলে ?

সত্যি কথা বলতে কি, সে সময় নিজেকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম ভাবনার স্রোতে, একটা ভাবনা আমাকে হুঁশ করে ডুবিয়ে দিত আবার আরেক ভাবনা দিত ভাসিয়ে, শুশুকের মতো, ভাসতে ভাসতে যখন দু-একটা খড়কুটা আঁকড়ে জেগে উঠতাম, দেখতে পেতাম অদূরে দাঁড়িয়ে ফ্রাউ বাওয়ার, তার পরনে নগ্নতা।

আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে কারখানায় কাজ করার সময় জুতার জোড়া গুলিয়ে ফেলতে শুরু করেছি। এক জোড়া থেকে ডান এবং আরেক জোড়া থেকে বাম পায়ের জুতা নিয়ে প্যাকেটে ভরার সময় টের পেয়েছি, আমার ডান-বাম দিশাহারা হয়ে সব একাকার হয়ে গেছে। জুতা দেখলে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত ফ্রাউ বাওয়ারের পা। সেই পা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। নগ্ন পা। তারপর সেই ভাবনাটা পা থেকে ওপরের দিকে উঠে আসত।

আমি চাইতাম না সেটা ওপরে আসুক, জোর করে চেপে রাখতাম ফ্রাউ বাওয়ারের পায়ের গোড়ালিতে। কিন্তু ভাবনাটা জোঁকের মতো কিলবিল করে পা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠত। একসময় ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতাম আমি। আর তখনই সেটা হুঁশ করে ওপরে উঠত, উবান যেমন শহরের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, যেমন বাতাসে ফুলে থাকা বেলুন উঠে আসে জলের ওপরে, পিঁপড়াগুলো পিলপিল করে বেরিয়ে আসে ঢিবির ভেতর থেকে, সেভাবেই বেরিয়ে আসে মনের ছবিগুলো, তারপর অজগরের মতো পেঁচিয়ে গিলে খায় আমাকে।

আমি তখন নিজেকে সমর্পণ করতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসের সেই রাতের নারীর কাছে। এটাকে মনে হতো একটা অন্যায় লড়াই। যুদ্ধটা হতো অপমানের সঙ্গে অন্ধকারের, চিৎকারের বিরুদ্ধে নীরবতার, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উত্তেজনার, ক্ষমার সঙ্গে শিহরণের এবং বয়সের বিরুদ্ধে বয়সের।

আমি তো সোফাতেই বসে থাকতে পারতাম। অথবা রিলকের কবিতা পড়াতেও কোনো বাধা ছিল না, রিলকে শেষ হলে আশ্রয় নিতে পারতাম সবচেয়ে নিচের তাকে গুছিয়ে রাখা একটার পর একটা রেকর্ডের দিকে, যেখানে থরে থরে সাজানো বেটোফেন, ভিবাল্ডি আর শোঁপে। অথবা নামিয়ে আনতে পারতাম সবচেয়ে ওপরের তাকে রাখা গ্যোয়েটের ফাউস্ট। কিংবা ফ্রাউ বাওয়ারকে দেখেও ভান করতে পারতাম না দেখার। চোখাচোখি হলে হয়েছে, তাতে কী ! আমি তো তার চোখের দিকেও তাকিয়ে থাকতে পারতাম অথবা পারতাম চোখ নামিয়ে নিতে। আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই চাহনিতে যদি আহ্বান থাকত, তাহলে আমার আমন্ত্রিত হওয়াটাই কি শোভন ছিল না ?

সাড়া দেইনি বলেই কি সে ওভাবে চিৎকার করেছিল ?

এই প্রশ্ন আমি কাউকে করিনি, শুধু আমাকেই করেছি। রফিক আর সজলকে জিজ্ঞেস করার প্রশ্ন আসে না, কারণ তাদের আমি সেই রাতের সত্যটা বলিনি। যা বলেছি, তার সবটাই গল্প বা গল্পের সঙ্গে কিছু সত্য মেশানো, যেমন ফ্রাউ বাওয়ার আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন, পাস্তা রেঁধে খাওয়ালেন, সেদিনের সেই দুর্ঘটনার বিষয়ে তিনি আমাকে কিছুই বলেননি, বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলেন মহিলা, আমি কী করি, ঢাকায় আমার কে আছে, তাদের মিস করি কি না, জার্মানির কোন জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো ও খারাপ লাগে–এসব।

বাংলাদেশে ফিরে গেলে এখান থেকে আমি কোন জিনিসটা রপ্তানি করতে চাই দেশে, অথবা বাংলাদেশ থেকে আমি কী আমদানি করতে চাই এখানে ইত্যাদি।

এসব প্রশ্নের একটার উত্তরও তখন আমার জানা ছিল না।

ফ্রাউ বাওয়ারের বাড়ির কাছে যে স্টেশন, তার একটা স্টাৎসিওন পরে বল্টেনস্ট্যার্ন স্ট্রাসে। এটা আমাদের স্টেশন, আমরা যারা পিওনিয়ার স্ট্রাসে বা তার আশপাশের রাস্তার দুই পাশে থাকি, তাদের স্টেশন। ঘরের বাইরে একমাত্র এই স্টেশনেই আমাকে দেখা যেত সবচেয়ে বেশি, সকালে এবং সন্ধ্যায়। এটাও ছিল একটা রুটিনের মতো। প্রত্যেক দিন আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াতাম, যেখানে বেঞ্চিতে বসে থাকত যাত্রীরা, তার তলায় পড়ে থাকত দুমড়ানো খবরের কাগজ আর থেঁতলে যাওয়া বিয়ারের ক্যান, প্রায় প্রত্যেক সকালে সেখানে বসে থাকত একটা বুড়ো, তার বসার ভঙ্গিটা ছিল কমা চিহ্নের মতো, লোকটার পরনে থাকত চামড়ার একটা জ্যাকেট, তার কলার ছিল গলার চেয়েও বড়, শক্ত খোলের ভেতর থেকে যেমন কচ্ছপের মাথা বেরিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সেখান থেকে বুড়োর ছাল উঠে যাওয়া লম্বা গলাটাও উঁকি দিত। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই মাটির নিচ থেকে কেঁচোর মতো কিলবিল করে উঠে আসত ১৬ অথবা ১৫ নম্বর ট্রাম এবং পেটের ভেতরে যাত্রীদের তুলে নিয়ে ডুব দিত চিড়িয়াখানার ওপারে।

পুরো দৃশ্যটাকেই মনে হতো লেগো দিয়ে বানানো একটা স্টেশন। আর আমি চাবি দেওয়া একটা বাংলাদেশি রোবট।

স্টেশনে ওঠার আগে একটা ওভারব্রিজ। ডান দিকে উঁচু একটা ইউগেন্ড হাউজ, যার ভেতর থেকে ব্যাকপ্যাক ছেলেমেয়েরা পিঁপড়ার সারির মতো খুব সকালেও এই স্টেশনে এসে উঠত। ছেলেদের চোখে অসমাপ্ত ঘুম আর বেশির ভাগ মেয়ের চুল ভেজা থাকত, হাতে থাকত পানি বা কোকের বোতল আর এই শহরের ভাঁজ করা ম্যাপ।

একমাত্র এই স্টেশনেই আমি অপেক্ষমাণ তরুণ যাত্রীদের মুখে ইংরেজি শুনতে পেতাম। এরা আসত আশপাশের দেশ থেকে আর উঠত এই ইয়্যুথ হোস্টেলে।

পরের স্টেশনটা ছিল রাইনের ওপারে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় ব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে না নেমে প্রায়শই আমি প্রতিবন্ধী আর বয়স্কদের জন্য তৈরি করা ঢাল ধরে নেমে আসতাম রাস্তায়। যারা রোলার স্কেট, স্কুটার আর সাইকেল অথবা হুইল চেয়ারে আসত, তাদের এখান দিয়েই নামতে হতো। সেখানে তখনো একটা এলিভেটর বসানোর কাজ চলছিল।

ওভারব্রিজটার পশ্চিমে ছিল একটা বিয়ারগার্টেন। বসন্তে এই পাবটা যেমন বিয়ারপ্রেমীদের ভিড়ে গমগম করত, তেমনি শীতের সময় এই বাড়িটা হয়ে উঠত জনশূন্য পরিত্যক্ত শুনশান এক ভুতুড়ে বাড়ির মতো। রোদ, তুষার আর বৃষ্টিতে ভিজত উঠোনে পেতে রাখা কাঠের দু-একটা বেঞ্চি এবং তার পাশে বড়সড় কয়েকটা পিপে। পাবের দেয়ালে বিশাল একটা ছবি আঁকা ছিল–এক মহিলা, তার হাতে বালতি, জানালা দিয়ে পানি ফেলছেন। কখনো কখনো, শনি অথবা রবিবার খুব রাতে, যখন বাড়ি ফিরতাম, মনে হতো এটা কোনো ছবি না, সত্যি সত্যি। এটা পাবের জানালা এবং একজন পুৎসফ্রাউ পাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ধোয়া-মোছার ময়লা পানি জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলছেন। কখনো কখনো মনে হতো, এই মহিলা হয়ত তা ঢেলে দিচ্ছেন আমার মাথার ওপর।

এই পথের সবকিছু আমার মুখস্থ ছিল। এখনো আছে। সেতুটার এক কোনায় ছিল শিউলি গাছের মতো একটা গাছ, তার গোড়ায় শেকল দিয়ে সব সময় বাঁধা থাকত পুরনো একটা সাইকেল। বেশির ভাগ সময় ওটা চিৎ হয়ে পড়ে থাকত, অথবা সামনের চাকাটা কাত হয়ে বসে থাকত রাস্তার পাশে, আস্তাবলে যেভাবে বসে থাকে ঘোড়াগুলো।

পায়ে চলার যে সরু পথটা স্টেশন থেকে পিওনিয়ার স্ট্রাসের দিকে চলে গেছে, তার একপাশের সারি সারি বাড়িগুলোর দরজার সামনে প্রায়শ পড়ে থাকত পুরনো কাপড় ও জুতার ব্যাগ। বাড়ির মালিকেরা এসব রাস্তায় রেখে দিত ইউনিসেফের জন্য। প্রত্যেকটা বাড়ির গেট, জানালা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। বাড়ির নম্বরগুলো লেখা ছিল দরজার ঠিক মাঝখানে, একশো সাত, একশো নয়, একশো এগারো, নম্বরগুলো কোথাও সোনালি পিতলে আবার কোনো দরজায় কাঠ খোদাই করে লেখা ছিল। কোনো কোনো জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা খুব পরিষ্কার দেখা যেত। একটা ঘরের দেয়ালজুড়ে টাঙানো ছিল ছোট ছোট অগণিত ছবি, ওগুলো নানা রকমের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। তার মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ আমার স্মৃতিতে এখনো অমলিন, কোনো ছবিতে বাচ্চাটা স্কুলের পোশাকে, কোনোটায় রোলার কোস্টারে, চোখ বড় বড়, আবার কোথাও কার্পেটে বসে এবং বাচ্চাটার কোলে তার চেয়েও বড় একটা পোলার বেয়ার।

সেদিন রাতে ফ্রাউ বাওয়ারের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার সময় আমি এসবের কিছুই চিনতে পারছিলাম না। আমি হাঁটছিলাম আর আমার পেছনে পেছনে হাঁটছিল বাল্টহাসার স্ট্রাসে থেকে বয়ে নিয়ে আসা একটা শিহরণ। একটা অপমান। একবার ভেবেছিলাম নিষিদ্ধ এই অনুভূতিটা হয়ত ব্রিজ পার হতে পারবে না অথবা রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। তাই আমি ব্রিজের ঢাল দিয়ে না নেমে নামছিলাম সিঁড়ি দিয়ে। মনে হচ্ছিল একটা নতুন রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটছি।

জানালা দিয়ে পানি ফেলছেন যে মহিলা, তাকে আমি এই প্রথম দেখছি। একবার মনে হলো, এটা ফ্রাউ বাওয়ারের ছবি, তার বুকটা খোলা, ব্রিজের গোড়ায় সাইকেলটা উধাও, রাস্তার পাশের বাড়িগুলো নতুন, আর প্রত্যেকটা ঘরের জানালা বন্ধ।

রফিক তখন চিৎ হয়ে টিভি দেখছিল। ওর মা খুব অসুস্থ। খবর পেয়েছে কয়েক দিন আগে। আমাকে দেখে হু হু করে কাঁদতে লাগল রফিক। আর তখনই মনে পড়ল ওর টাকাটা এখনো ফেরত দেওয়া হয়নি।

রোববার রাতের পর আমার চোখ থেকে ঘুম একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল। শুধু ঘুম নয়, তার সঙ্গে স্বস্তি এবং শান্তিও। আমি ভাবতেও পারিনি এ রকম একটা সন্ধ্যা মানুষের জীবন থেকে শান্তি এবং ঘুম এভাবে কেড়ে নিতে পারে। মনে আছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হওয়ার আগে আমার একবার এ রকম হয়েছিল। চোখে ঘুম ছিল না, শান্তি ছিল না মনে। ঘুমালেই স্বপ্নে দেখতাম একগাদা পরীক্ষার খাতা। তাতে লাল কালির এফোঁড়-ওফোঁড়। ঘরের বুক শেল্ফে যে কটা বই ছিল, স্বপ্নে সব হয়ে যেত পরীক্ষার খাতা। আর সব কলমে যেন শুধু লাল রঙের কালি। ওয়াড্রোব, খাট, আলমারি, আলনা–সবকিছুকে মনে হতো একেকটা মস্ত বড় পড়ার টেবিল এবং আমি সেখানে বসে পরীক্ষা দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ঘরকে মনে হতো এক একটা হল, আমি সেখানে বসে লেখার চেষ্টা করছি। আর আব্বা হয়ে উঠতেন সেই হলের গার্ড।

সেদিনের সেই সন্ধ্যার পর থেকে আমি নানা রকমের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। রাতের অন্ধকারে দেখতাম আর ভাবতাম দিনের আলোয়, আবার দেখতাম আবার ভাবতাম। একেকটা স্বপ্ন ছিল একেকটা ছোট ছোট ঘটনা, ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি। স্বপ্নগুলো হঠাৎ করে শেষ হয়ে যেত। ঘটনাগুলো জোড়া দিলেও কাহিনি হতো না। একটা ছবির পাশে আরেকটা ছবি বসিয়ে আমি একটা গল্প বানাতে চাইতাম। গল্প হতো না।

একটা খেলার মতো হয়ে উঠেছিল, এই স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন নিয়ে ভাবা। মনের রাজ্যে রূপকথার রঙিন কাহিনি বানানো আর গল্প গল্প খেলা। অথবা কল্পনার তুলিতে ইচ্ছেমত ছবি আঁকা।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই স্বপ্নের রহস্যের কথা। সেদিন জবাবে তিনি যে কথাটা বলেছিলেন, সেটা আমার এখনো মনে আছে। মুখস্থ হয়ে আছে প্রত্যেকটা বাক্য, প্রত্যেকটা শব্দ, কেমন করে বলেছিলেন কথাটা, প্রত্যেকটা নিশ্বাস, বলার সময় কী রকম ছিল তার দুচোখের ভাষা, সব। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ঘুমের ভেতরে যা দেখি, তা কিন্তু স্বপ্ন না, আসিফ, স্বপ্ন হলো, যা আমাদের ঘুমাতে দেয় না।'

পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িটায় আমি এই দুই রকমের স্বপ্নই দেখেছি, রাতে যে স্বপ্নটা দেখতাম, সেটা ছিল খেরোখাতায় পেন্সিলে আঁকা একটা স্কেচ আর দিনের বেলায় আমি রং লাগাতাম এই ছবিটাতে। ঘুমের মধ্যে আমি দেখতাম স্বপ্নের মিছিল আবার সেই স্বপ্ন আমাকে ঘুমাতে দিত না, স্বপ্নের তখন ডালপালা গজাত, হাঁসের মতো পাখা মেলত, কুৎসিত শুয়োপোকাঁা তখন গুটির ভেতর থেকে ঠুকরে বেরিয়ে উড়াল দিত রঙিন প্রজাপতির মতো, বসত বাড়িটার পেছনে, হালকা খয়েরি হয়ে আসা ঘাসের ওপরে অথবা বাগানের চারপাশে ঘিরে থাকা ঝোপঝাড় ও লতাপাতার বেষ্টনীতে, যখন শ্নি পড়ত চারপাশে, তুষারের ভারে ওখানে নত হয়ে থাকত গোলাপের ডাল।

ভাবনা শেষে আমি টের পেতাম আমার উত্তেজনা। এই উষ্ণতা আমি গোসল করার সময়ও টের পেতাম, পেতাম ঘুমের মধ্যেও। গরম পানির ঝরনা ছেড়ে স্নান করার সময় তিনি আমার সামনে এসে হাজির হতেন। সত্যি কথা বলতে কি, সেই উত্তেজনা হাত দিয়ে স্পর্শ করতাম কিন্তু নিজেকে কখনো এই শিহরণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চাইতাম না, বরং লকলকে এই আগুনের শিখা ছড়িয়ে দিতে চাইতাম শরীরের কোষে কোষে, রক্তের প্রত্যেকটা কণিকায়। তারপর অপমানের একটা বরফ শীতল চাদর একসময় জড়িয়ে ধরত আমাকে।

রাতে আমি খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম, পুরো বাড়িটায় কোনো শব্দ হতো না, সন্ধ্যার পরেই ২১ নম্বর বাড়িটার ভেতর নেমে আসত মধ্যরাতের নির্জন স্ত ব্ধতা, যখন কোনো শিশুর কান্না শোনা যায় না, গাড়ির হর্ন বাজে না, টেলিভিশনের শব্দ হয় না, দূরে কোথাও ডাকে না কোনো পাখি।

রাতের পর রাত রফিক ঘুমাত আর না হয় 'মা মা' বলে চিৎকার করে কাঁদত। আমাকে সঙ্গ দিত রফিকের এই বিরামহীন কান্না আর গির্জার ঘণ্টা। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত রফিক কিন্তু ঘণ্টাটার কোনো ক্লান্তি ছিল না। ক্লান্তি ছিল না স্বপ্নেরও। তিনটায়, সোয়া তিনটা, সাড়ে তিনটা, চারটা এবং পাঁচটায়। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার আওয়াজ যত বাড়ত তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাখা মেলত আমার স্বপ্নের ডানা। ভোরের দিকে এই ঘণ্টার শব্দটা বিরক্তিকর হয়ে উঠত। ফ্রাউ বাওয়ার তখন হয়ে উঠতেন আমার বাহুলগ্না।

তখন থেকেই আমার কারখানায় যেতে দেরি হতে লাগল। আমি যখন জুতার গুদামে গিয়ে ঢুকতাম ততক্ষণে বেজে যেত সকালের প্রথম ঘণ্টাটা, একদফা নামও ডাকা হয়ে যেত। আমার নামের পাশে লাল কালির আঁচড় পড়তে শুরু হলো, কাজের সময় কমে গেল, সেই সঙ্গে কমতে লাগল রোজগারও। কিন্তু স্বপ্নের কোনো কমতি হলো না।

আমার রাতগুলো নির্ঘুম আর দীর্ঘ ছিল কিন্তু সাদামাটা ছিল না। ঘুম না থাকলেও আমার মনে আর মগজে মিশে ছিল বিশাল বিশাল সাধ স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে অপমান ও ঘৃণা আবার কখনো কষ্ট, কখনো বেদনা।

স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত শেষ হয়ে আসত আর স্বপ্নের জাল বোনা দিয়েই পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই বাড়িটায় হতো আরও একটা দিনের সূচনা।

রাতের শেষ ট্রাম

এর মধ্যে আমরা রফিকের মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। খবরটা পেয়েছিলাম ওর মায়ের মারা যাওয়ার বহু দিন পর। ততদিনে দাফনও হয়ে গেছে, ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে আপনজন হারানোর শোক আর কবরের ওপর লাগানো ঘাসগুলো হয়েছে আরও সবুজ।

খবরটা যেদিন এল সেদিন সন্ধ্যায় রফিক প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল, কাঁদল এবং কাঁদল। তারপর রাত যখন গভীর হতে লাগল, কোনো একসময়, কাউকে না জানিয়ে সেই যে ঘর থেকে বের হলো, ফিরল পরদিন ভোরে।

সকালের উজ্জ্বল আলোটা তখন ওর দুই চোখের মধ্যে ডিমের কুসুমের মতো গাঢ় হয়ে জমে গেছে। একেবারেই স্তব্ধ রফিক, নিশ্চুপ নিশ্চল ও মূক। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে সারা রাত ও বসেছিল রাইনের তীরে। নদীর শ্লথ ঢেউ, পাহাড়ের মতো বিশাল একটা লোহার ব্রিজ, ব্রিজের এপাশে আকাশ ছোঁয়া ক্যাথিড্রালের চূড়া আর মাথার ওপরে তারাভরা আকাশের সঙ্গে রফিক তার কষ্ট ভাগ করে নিতে চেয়েছিল। ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপছিল রফিক। ওকে দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সারা রাত ও কোথায় ছিল বা কোথায় যেতে পারে, এসব ভেবে দুশ্চিন্তায় আমরা ঘুমাতে পারিনি। ও যখন সকালে ফিরল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রফিককে দেখে চেনার কোনো উপায় ছিল না। রাইনের ঢেউ ওর কষ্ট ধুয়েমুছে নিয়ে যেতে পারেনি, ব্রিজটা পারেনি ওর কষ্টটাকে ওপারে রেখে আসতে। মাথার চুলগুলো উশকোখুশকো, চোখ জবা ফুলের মতো টকটকে লাল, জবুথবু শরীর, গাল ঢুকে গেছে মুখের ভেতর। কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে পিঠ। ওকে মনে হচ্ছিল ঝড়ে বিপর্যস্ত এক বৃক্ষের মতো, ডালপালা সব দুমড়েমুচড়ে দিয়ে গেছে কিন্তু প্রাণটা নিতে পারেনি। একটা মাত্র রাতে মানুষের চেহারা যে এভাবে বদলে যেতে পারে, সেটা আমি এর আগে কখনো বুঝতে পারিনি।

কিন্তু কী আর করা, সবকিছুই আমরা কথিত ভবিষ্যৎ কিংবা নিশ্চয়তা অথবা নিয়তির কাছে সঁপে দিয়েছি। আমার মতো রফিকও এখন আর চাইলেই দেশে যেতে পারবে না। যখন বিদেশে আসার জাল কাগজপত্র তৈরি হচ্ছিল, তখন থেকেই আমরা জানি যে নিজেদের মাটিতে ফিরে যাওয়ার সেতুটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এই সেতু আবার কবে তৈরি হবে, আমরা কেউই জানি না। বিমান থেকে নামার পর কী হবে, আদৌ নামতে পারব কি না, তারপর আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কোথায় তৈরি হবে নতুন জীবন, অনিশ্চয়তার এ রকম এক ভেলাতেই আমরা ভাসিয়েছিলাম আমাদের প্রাণ। আর কখনো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব কি না, পারলেও সেটা কবে, কোথায় এবং কীভাবে, তার কোনো ধারণাই আমাদের ছিল না। তবে একটা জিনিস জানা ছিল যে কোনভাবেই দেশে ফেরা যাবে না। পরিবারের সহায়-সম্পদ সব বিক্রি করে দিয়ে আমরা এই নৌকায় উঠেছি, যে নৌকা শুধু সামনে যায়, ফিরতে পারে না।

এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিজেদের। আত্মীয়-পরিজন, সদরঘাট-গাজীপুর রুটে মুড়ির টিনের মতো ৬ নম্বর বাস, পাড়ার মোড়ে ছোট্ট পান বিড়ির টঙ, মহাখালী রেলক্রসিং, আর শীলাকে পেছনে ফেলে আমি নিজেই উঠেছি বিমানে। তবে এই উড়াল আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে বিষয়ে খুব বেশি নিশ্চিত ছিলাম না আমি। শুধু জানতাম, আমি যাচ্ছি মহাসমুদ্রের ওপারে, যেখানে আমার জন্য হয়ত শীলা নেই, নেই ৩০০/এ নাখালপাড়ার প্রিয়জনেরা, কিন্তু আছে সচ্ছল এক জীবনের হাতছানি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি দেশ ছাড়তে চাইনি কখনো, চাওয়া তো দূরের কথা, এই চিন্তাটা কখনো মাথায়ও আসেনি। বন্ধুরা যেতে চেয়েছে, পত্রিকায় ছাপা হওয়া রাশিফলের সঙ্গে জন্মের ক্ষণ দিন আর তারিখ মিলিয়ে দেখেছে, গণকের চোখের সামনে দুই হাত মেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে সম্ভাবনার কথা, পায়ের কোথাও, অন্তত আঙুলের ফাঁকেও তিলের কোনো আভা দেখা যায় কি না, হন্যে হয়ে খুঁজেছে, কিন্তু আমি কখনো ভেবেও দেখিনি যে আমার আপনজনেরা বিমানবন্দরে ঝাপসা কাচের ওপার থেকে আমাকে শেষ দেখার চেষ্টা করছে আর আমি উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে দেখছি বর্ষার জলে ডুবে যাওয়া প্রিয় শহর ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের আড়ালে।

আমার হাড়ে-মাংসে রক্তে-মজ্জায় যখন মিশে গেল রাজনীতি রাজনীতি রাজনীতি, রাতের পর রাত ঘরের বাতি জ্বলল কিন্তু আমার অপেক্ষায় শূন্য পড়ে রইল বিছানা, আমার নামে যখন হুলিয়া জারি হলো, যখন সরু রাস্তায় টেম্পু থামিয়ে পুলিশ এল বাড়ির দুয়ারে, কারখানার ফটক খোলার মতো খটাং খটাং করে খুলল কলাপসিবল গেট, ঘুম থেকে জেগে উঠল আশপাশের ফ্ল্যাটের মানুষ,

এখানে-ওখানে জন্ডিসের মতো হলুদ বাতি জ্বলল, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল পুলিশি বুটের বিক্ষিপ্ত ছাপ, মশারি উঠিয়ে উঠিয়ে ওরা তল্লাশি চালাল প্রত্যেকটা ঘরে, বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল খাটের তলায়, তারপর কোনো এক গভীর রাতে যখন আব্বাকে নিয়ে যেতে হলো কলেজগেটের কাছে হৃদরোগ হাসপাতালে, সেদিনই বুঝলাম, পালাতে হবে আমাকে।

মিথ্যা বলব না, জীবনের ভিটায় যখন একটার পর একটা ব্যর্থতার পাহাড় উঠতে থাকে, তখনই দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেই আমি। আবার সব সিদ্ধান্তই যে আমার ভাবনার মতো করে হয়েছে, তা-ও কিন্তু নয়। জীবনে অনেক কিছু ভেবেছি, পরিকল্পনা করেছি শেষ পর্যন্ত তার কয়টা হয়েছে ! যত যা চেয়েছি তার কতটা কী পেয়েছি, বহুবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, না, আর রাজনীতি নয়, এবার ফিরব ঘরে, কিন্তু ঢাকা ছেড়ে আসার শেষ দিন পর্যন্ত ফেরা হয়নি। অনেক ভেবেছি আর সিগ্রেট খাব না, এটাই শেষ স্টিক কিন্তু আবারও খেয়েছি। কতবার ভেবেছি, শীলার সঙ্গে সম্পর্কটা আর রাখব না, ওটা একসময় ভারবহনের মতো হয়ে উঠেছিল, অথচ সব সময় ওর কাছে দৌড়ে গিয়েছি। ফ্রাউ বাওয়ারের বাড়ি থেকে এভাবে পালিয়ে আসব, সেটাও কখনো ভাবিনি। তাহলে ! যা ভাবিনি, তা-ই হয়েছে, যা ভাবি না জীবনে, তাই হয়। সত্যি কথা বলতে কি, জীবনের গতিপথ বা সিদ্ধান্ত খুব কম ক্ষেত্রেই আমার ভাবনার ফলোআপ হয়েছে।

আমাদের বিদেশে থাকা নিয়েও ইতিমধ্যে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হতে শুরু করেছে। কত কত কথা শোনা যাচ্ছিল চারদিকে ! কোনটা সত্য আর কোনটা কানকথা, তা-ও বোঝার উপায় ছিল না, তবে শুনতে পাচ্ছিলাম, ছেলেরা নতুন করে ঢুকতে তো পারছেই না, বরং যারা কোনো না কোনভাবে সীমান্তের ফাঁক গলে একসময় ঢুকে পড়েছিল, তাদেরও এখন ধরে ধরে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ নাকি ইটালি বা সুইজারল্যান্ড চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কারণ ওসব দেশে কয়েক দিন পর পর আমাদের মতো ছেলেদের জন্য দেওয়া হয় বৈধ হওয়ার সুযোগ।

তখন আমরাও এসব নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি।

ট্রেনে ইটালি যাওয়ার একটা উপায় জানা আছে সজলের, চেক পয়েন্টের আগে কোথাও নেমে পড়তে হয়, তারপর সারা রাত অপেক্ষা করতে হবে, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আগে থেকে বলে দেওয়া তেলের একটা স্টেশনে, কেউ এসে তুলে নিয়ে যাবে, তারপর ভোরে সেখান থেকে ট্রাকে করে আরেকটা সীমান্তে, দালাল থেকে দালালের হাতে, তারপর আরেকটা গাড়ি আসবে, পৌঁছে দেবে গন্তব্যে, অথবা গরু আর ভেড়ার মাংস বোঝাই কোনো লরিতে, সীমান্তরক্ষীরা যখন চেক করতে এসে স্প্রে করবে তখন লরির ভেতর জবাই হওয়া গরু ও ভেড়ার মতো

পড়ে থাকতে হবে, এভাবে চালান হতে কত সময় লাগবে, সেটা কেউ জানে না, আর যখন পৌঁছাবে মানুষটা, তখন লাশও হয়ে যেতে পারে, কেউই তার গ্যারান্টি দেবে না।

এ রকম নানা কথা ও গল্পগুজবে ব্যস্ত হয়ে উঠল পিওনিয়ার স্ট্রাসের ২১ নম্বর বাড়ির তিনতলায় আমাদের অনিশ্চিত জীবন আর ফ্রাউ বাওয়ার একসময় টুপ করে চলে গেলেন আলোচনার তলানিতে।

নানা রকমের খবর নিয়ে সজল ফিরত খুব ভোরে আর আমরা ঘুম শেষ না করে হুড়মুড় করে বিছানা ছাড়তাম, নাকেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে গোল হয়ে বসতাম নতুন খবরের আশায়। নানা রকমের খবর, ভালো খারাপ। রোমাঞ্চকর। সজল যেখানে কাজ করত ওখানে আরও কয়েকজন অভিবাসী ছিল, সরকারের খাতায় তাদের অনেকেরই নাম ওঠেনি, ওরা থাকত গোপনে, দিনে ঘুমাত আর রাতে ফুল বিক্রি করত পাবে। সজলের সব খবরের উৎস ছিল দিনের আলো না দেখা এসব ছেলেরা।

শুধু সরকারের ভেতর নয়, সমাজেরও কিছু মানুষ, পিওনিয়ার স্ট্রাসের কেউ কেউও বলতে লাগল, আমরা ওদের জন্য সমস্যা হয়ে উঠেছি। কোথাও কোথাও নিউ নাৎসিরা আক্রমণও করল, শুনতে পেলাম কোথায় নাকি একটা বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে, ব্রিজের ওপর থেকে কার মাথার ওপর ছুড়ে ফেলা হয়েছে বিরাট পাথর, কার পেটের ভেতর ওয়াইনের ভাঙা বোতল ঢুকিয়ে মোচড় দেওয়ায় নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, অল্পের জন্য কার চোখ বেঁচে গেছে, চারদিকে শুধু এসব খবর। তারপর এগুলো রাজনৈতিক চেহারা নিতে শুরু করল, আর চাপ পড়তে লাগল সরকারের ওপর।

ডিসেম্বরের এক রাতে এই উত্তেজনার ঢেউ এসে লাগল আমাদের শহরেও।

বৃহস্পতিবার কি শুক্রবার রাতে, সলস্টোকের মোড়ে ১২ নম্বর ট্রাম ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। আমি ছাড়া সেখানে আর কোনো যাত্রী ছিল না। সেদিন সন্ধ্যা থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল, ঢিমে তালে, বৃষ্টির ফোঁটায় কোনো জোর ছিল না, তবে একেকটা বিন্দু ল্যাম্প পোস্টের আলোতে চকচক করে জ্বলছিল, আর হাওয়ায় উড়ছিল সাবানের বুদবুদের মতো।

ট্রামটা যেখানে এসে থামত, তার ডান দিকে ছিল কয়েকটা দোকান, একেবারে কোনার দোকানটায় বিক্রি হতো বালিশ আর ডুভে। ছোট ছোট জিনিসও বিক্রি হতো ওখানে, যেমন নকশা করা টেবিল ক্লথ, ম্যাট, কুশনের কভার, সাদা সাদা টাওয়েল, তাতে নীল-বেগুনি লাইলাক আর বিক্রি হতো শাওয়ার কার্টেন, যার একটাতে আঁকা ছিল গোলাপি সাবান, সাবানদানি আর শ্যাম্পুর বোতল।

এগুলোর গায়ে যে দাম লেখা থাকত, তা দেখে চমকে উঠতাম আমি। টাকায় গুণ করে যখন দেখতাম একেকটা বালিশের দাম দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা, তখন মনে হতো এসব মাথার নিচে দিলে সব চুল পুড়ে যাবে আগুনে। কিন্তু সেগুলো দেখতে এত সুন্দর, আরামদায়ক আর উষ্ণ ছিল যে গভীর রাতে কি ঠান্ডা, কি বৃষ্টি এমনকি ঘন তুষারপাতের মধ্যেও ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার ঘুম পেয়ে যেত। আধো ঘুমে আর আধো জাগরণে স্বপ্ন দেখতাম আমি। ভাবতাম এই লেপ-কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে আছি বিছানায়, পাশের বালিশে কখনো আমার দিকে পাশ ফিরে, কখনো ছাদের দিকে চিৎ হয়ে ফ্রাউ বাওয়ার, তাকে পাশে নিয়েই শুতে যাওয়া আর ঘুম থেকে জেগে ওঠা, কখনো তার মাথাটা আমার বাহুতে আর তার হাত আমার বুকের ওপরে, আর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো সফেদ একটা ডুভে ঢেকে রেখেছে আমাদের নগ্নতা।

তখনই একটা চিকন ঠান্ডা বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিত আমার উষ্ণ শরীর।

এই দোকানটার যেখানে দরজা, সেখানে ছিল একটা ফাঁকা চৌকোনা জায়গা। বৃষ্টি হলে আমি সব সময় আশ্রয় নিতাম ওখানে। শীতের দমকা হাওয়া এবং বৃষ্টির ছাঁট থেকে এই জায়গাটা আমাকে ছাতার মতো আড়াল করে রাখত। কোনো রকমে দুজন মানুষের জায়গা হতো ওখানে। কেউ এসে দাঁড়ালে তার মানটেলের ভেতর থেকে একটা বোঁটকা গন্ধ এসে নাকে লাগত, কারও গা থেকে আসত সেদ্ধ আলুর গন্ধ, কারও গা থেকে মাক্কারা বা বিয়ারের ঝাঁজ আবার কোনো কোনো মানুষের গা থেকে আসত আরেক মানুষের গন্ধ।

এই স্টপেজে ট্রাম আসা-যাওয়ার সময়সূচি লাগানো ছিল ছোট্ট যে বোর্ডে, সেখানে প্রথমে একটা ভালোবাসা এবং আরও পরে একটা হিংসার ঘটনা ছড়িয়ে পড়ছিল। কয়েক দিন আগে দেখেছিলাম বোর্ডের গায়ে কেউ একজন রং স্প্রে করে লিখেছে 'সুজানে + মাঠিয়াস।' আরেকজন লিখেছে, 'সূর্য উঠছে।' তারপাশে নাৎসি বাহিনীর স্বস্তিকা। একদিন দেখি, এই স্বস্তিকার নিচে কেউ লিখে রেখেছে আউসল্যান্ডার রাউস, বিদেশিরা চলে যাও। কয়েক দিন পরে দেখি, ওই স্বস্তিকার ওপর একটা স্টিকার লাগানো, সেখানে লাল রঙের ক্রস চিহ্ন, যারা স্বস্তিকা এঁকেছে, তাদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এসব দেখতাম আর ভাবতাম, যাদের নিয়ে এই চাপানউতোর আমি তো তাদেরই একজন। তখন নিজের জন্য খুব মায়া লাগত আমার।

অন্ধকারের ভেতর আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আর অপেক্ষা করতাম, কখন একটা গাড়ি এসে আমাকে এই গুহা থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যাবে।

এই চৌরাস্তার মোড়ে অপেক্ষমাণ আরও অনেক যাত্রীর সঙ্গেই আমার আলাপ হতো। একবার আলাপ হয়েছিল থুরথুরে এক বৃদ্ধের সঙ্গে। সে নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছিল জার্মান সেনা, যুদ্ধ করেছে ফ্রান্সে, যুদ্ধ করেছে, মানে করতে হয়েছে। আমি বাংলাদেশের মানুষ, শোনার পর বলেছিল, সে নাকি কয়েক বছর বার্মাতেও ছিল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এ রকম আরও যাদের সঙ্গে কথা হতো, তাদের বেশির ভাগই আমার নাম-ঠিকানা জানার পরে জিজ্ঞেস করত, আমি এই দেশে কেন এসেছি এবং কবে ফিরে যাব। এই প্রশ্নটা ছিল অবধারিত। নাম জানতে না চাইলেও এটা জিজ্ঞেস করতে ওরা ভুলত না। ওরা কি তাহলে বুঝতে পারত যে এখানে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে এবং আমার এই কষ্টের কথা ভেবে ওরা চাইত, আমি দেশে ফিরে যাই ! ওরা কি বুঝতে পারত শীলার জন্য আমার কষ্টের কথা ? ওরা চাইত আমি ওর বুকে ফিরে যাই ? আকস্মিক তীরের মতো আমার গায়ে বিঁধত এসব প্রশ্ন। আমি হাঁসফাঁস করতাম যন্ত্রণায়। অপমানে। লজ্জায়। আমার কাছে তাদের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। জবাবে শুধু গাইগুই করে কিছু একটা বলতাম বা বলার চেষ্টা করতাম। রফিক আর সজল খুব মজা পেত এসব ঘটনায়। আমার ওপর খুব রাগ হতো ওদের। বলত, 'শালা তুই কেন মিন মিন করবি ? বলবি, দেশ থেকে আসার সময় যে ট্রাংকটা নিয়ে এসেছিলি, সেটা ডয়েচ মার্কে ভরে গেলেই চলে যাব।' এসব কথার আমি কোনো আগামাথা খুঁজে পেতাম না। শুধু হাসতাম হাসতাম হাসতাম।

রাত তখন খুব গভীর। আমি যার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সেটা ছিল ওই রাতের শেষ ট্রাম। এরপর যেটা আসবে সেটা একেবারে ভোরের দিকে। টানা তিন-চার ঘণ্টার ঝামেলা।

শুয়োপোকার মতো হেলতে-দুলতে-হেলতে-দুলতে ট্রামটা এসে দাঁড়ানোর আগে একটা গাড়ি শাঁই করে ছুটে গেল। অন্ধকারে বৃষ্টি দেখা যাচ্ছিল না, দেখা গেল হেডলাইটের আলোতে। মনে হলো বৃষ্টির ছাঁট আরও বেড়েছে। ছাতাটা গুটিয়ে ঢুকলাম কম্পার্টমেন্টের ভেতর, একেবারেই ফাঁকা। আসনগুলো দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, একটু আগেও এখানে কেউ ছিল। এখন ফাঁকা। সেখানে পড়ে আছে বাসি খবরের কাগজ আর পমেস ফ্রাইটসের ঠোঙা, পাশে কেচাপ মাখানো আধ-খাওয়া আলুর টুকরা। শুধু এই বগিটাই নয়, মনে হচ্ছিল পুরো ট্রামটাই যাত্রীশূন্য। শেষ রাতের শেষ ট্রামটা বৃষ্টিভেজা নির্জন শহর চিরে একা একা ছুটছে তার শেষ গন্তব্যের দিকে। হাইৎসুংটা যেখানে লাগানো, আমি তার পাশের সিটে গিয়ে বসলাম। আইফেল প্লাৎসে এসে ট্রামটা গুহার ভেতর ঢুকে যাওয়ার আগেই শরীরটা গরম হয়ে উঠেছে।

রাস্তার দুই পাশে কোথাও কোথাও তখনো দু-একটা রেস্তোরাঁয় মোমবাতির আলো জ্বলছে। সেই আলো ঘিরে জোনাক পোকার মতো ঘুরপাক খাচ্ছে সিগারেটের আগুন, কয়েক জোড়া গোঁফ আর লাল লাল ঠোঁট। সিগারেটের আগুন ফুলকির মতো উঠছে-নামছে। ক্রিসমাস এখনো আসেনি, তবে চারদিক সেজে উঠেছে ভাইনাক্টের আলোয়, জানালায় জানালায় ঝালরের মতো বড়দিনের ছোট ছোট বাতি আর ঝাউগাছের মতো ক্রিসমাস ট্রি, সেই গাছে লাল-নীল আলোর ফুল, তার নিচে থরে থরে সাজানো শোকোলাডের বাক্স, তুষারের মতো পাউডার, কোথাও কোথাও স্নোম্যান, আর উপহারের ঝুলি কাঁধে লাল-সাদা টুপি পরে জানালা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে স্যান্টাক্লজ।

রিলার স্ট্রাসের ঘড়িটায় ছোট কাঁটাটা যখন মিনিটের কাঁটার নিচে আড়াল হয়ে আছে, তখনই একজন যাত্রী উঠে এলেন ভেতরে, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা শরীর হলুদ আর স্বচ্ছ প্লাস্টিকের রেইনকোটে মোড়ানো। আমার ছাতা থেকে তখনো চুঁইয়ে পড়ছে বৃষ্টির পানি। আর সেই জল দিয়ে আমি ট্রামের মেঝেতে শীলার নাম লেখার চেষ্টা করছি।

ন্যয়মার্ক্ট স্টেশনে হই হই করে উঠল তিন-চারজন তরুণ। তীব্র শীতেও তাদের গায়ে কোনো গরম কাপড় ছিল না কিন্তু চোখগুলো ছিল গাঢ় লাল, রাস্পবেরির মতো। মাথার চুলগুলো ওপরের দিকে, জেল দিয়ে স্পাইক করা, সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। কানের লতিতে কয়েকটা পিয়ার্স রিং। ওরা বসল আমার মুখোমুখি, সামনের দিকে পা মেলে দিয়ে, একটু হলে একজনের জুতা ছাতায় এসে লাগত। একসময় ঘোড়ামুখো লম্বা ছেলেটা ঝুঁকে এল আমার সামনে। জলের রেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, আমি কী লিখছি...

'মাইনে নামে,' বললাম আমি।

'শ্রাইবেন মিট ভাসার,' সবাই হো হো করে হাসল, পাশের ছেলেটাও ওর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকল মেঝের দিকে, তারপর বিড়ালের মতো মাথাটা উঁচু করে, উদাস চাহনি মেলে দিয়ে, দার্শনিক কণ্ঠে বলল, 'জলের লেখা থাকবে না,' রস মাখিয়ে জবাব দিলাম আমিও, 'কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হয় না।'

তারপর আর কোনো কথা বলিনি আমি, কথা বলেনি ওরাও, শুধু ছিল সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়েট্রাম ছুটে চলার শো শো একটা শব্দ,ট্রামটা যখন বেশি করে বাঁক নিত, তখন ছড় ছড় করে একটা বিকট শব্দ হতো, আর কম্পার্টমেন্টের স্পিকারে মেয়েটা যখন মুখস্থ সুরে বলত, নেস্টে হাল্টেস্টেলে তখন মনে হতো যে কোথাও কেউ আছে, পরের স্টেশনে গেলে হয়ত চোখে পড়বে ওদের।

ট্রামটা যখন শাঁই করে থামল, তখন জলে লেখা শীলার নামের ওপর ছিল ছাতার মাথাটা। ল এর শেষে আকার দিতে গিয়ে সেটা লেপ্টে গেছে। ট্রামের দুলুনিতে অক্ষরগুলো এখন আর চেনাও যায় না।

'হালো গাব্বার সিং,' একটা ছেলে আমাকে ডাকল। মুখ তুলে দেখি, ওরা হাসছে। সিদ্ধান্ত নিলাম ওদের কথার আর কোনো জবাব দেব না। আমি তখন মেঝেতে লেখা অক্ষরগুলো পড়ার চেষ্টা করছিলাম, কিছু পড়া যাচ্ছে না, একটা অক্ষর থেকে জল গড়িয়ে আরেকটা অক্ষরের গায়ে মিশেছে, মাকড়সার জালের মতো। মনে হচ্ছিল, এই জালটা আমাকে পেঁচিয়ে ধরছে। আর সেই জাল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসব বলে আমি পরের স্টেশনের জন্য অপেক্ষা করছি।স্পিকারের ভেতর মেয়েটা সাধারণত দু-এক মিনিট পরপরই বলে নেস্টে হাল্টেস্টেলে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা পরের স্টেশনটার নাম ভুলে গেছে, অথবা এই ট্রাম হয়ত আর কখনো কোথাও থামবে না।

আমার দুই পায়ের মাঝখানে মেঝের ওপর জলের অবস্থা এমন হয়েছে যে মনে হচ্ছিল, আমি প্রশ্রাব করে দিয়েছি, পেটের ভেতর সবকিছু গুলিয়ে উঠছিল, আর আমি ঢোঁক গিলে সেটা আটকাতে চাইছি।

একসময় ওরা তিনজনই উঠে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। ঘোড়ামুখো ছেলেটা তার জিপার খুলে আমার ওপরে ছুড়ে দিল প্রশ্রাবের বৃষ্টি। আমি যখন জলে লেখা শীলার নামের ওপর থেকে ছাতাটা উঠিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম, তখনই ওদের বলতে শুনলাম, 'গো ব্যাক গাব্বার সিং...'

ওরা আর কী বলেছিল আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, একজন নার্সের বাহুর ওপর মাথা রেখে আমি জানালার ওপারে তীব্র আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সে যখন পুরনো ব্যান্ডেজ খুলে পেটের ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিত, আমি দেখতাম, হাসপাতালের জানালায় একটা কবুতর ডানা ঝাপটিয়ে ভেতরে আসার চেষ্টা করছে। সাদা চাদরে মোড়ানো বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, আমি কোথায় যাব, কোথায় এসেছি, ওরা আমাকে কোথায় যেতে বলেছিল।

কবুতরটার দিকে আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম, কী প্রাণপণে ডানা ঝাপটায় পাখিটা। ওটা এক জানালা ছেড়ে আরেক জানালায় গিয়ে পাখা ঝাপটাত। নেটের গায়ে জমে থাকা ধুলো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ত কাচের ওপাশে। ধুলোর বৃষ্টি। জানালা দিয়ে আসা রোদের তেরচা আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠত জানালার ওপারের সেই বৃষ্টি। কখনো কখনো ছটফট করা পাখিটার ছায়া পড়ত ওয়ার্ডের মেঝেতে, আমার মনে হতো, আমি চিৎকার করে কাঁদি, নার্সদের ডেকে বলি, তোমরা ওকে সাহায্য করো, জানালাটা খুলে দাও, পাখিটাকে আসতে দাও ভেতরে।

একসময় ওষুধের ট্রলি নিয়ে ঘরে আসত নীল রঙের পরি। কয়েকটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর আমি তলিয়ে যেতাম গভীর এক ঘুমের সমুদ্রে।

হোয়াইট ক্রিসমাস

ক্রিসমাসের আগেই আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ডাক্তাররা আমাকে বাড়ি ফিরতে দিল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি তখন অন্য রোগীদের দেখতাম আর অপেক্ষায় থাকতাম দুপুরের জন্য। দরজার ওপরে টাঙানো চারকোনা ঘড়িটায় যখন ঠিক তিনটা বাজত, প্রথমে একজন তারপর দুজন তারপর একসময় ঢল নামত ভিজিটরদের। কত রকমের মানুষ যে আসত, কেউ আসত হাসি নিয়ে, কেউ আসত কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ঝুলিয়ে, বয়স্কদের আঙুল ধরে আসত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও, ওদের চিৎকার আর লাফালাফিতে হাসপাতালটা রাত আটটা পর্যন্ত গমগম করত। প্রথমে ওরা একটু ভয়ে ভয়ে থাকত, বাবারা ওদের ফিসফিস করে ইনজেকশনের ভয় দেখাত কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শুরু হতো ওদের অক্লান্ত ছুটোছুটি। দুরন্ত শিশুদের হইহল্লায় তখন ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেত স্যাভলন ও ডেটলের গন্ধ।

এই সময়টা খুব ভালো লাগত আমার। প্রত্যেকটা বেডের বাসি চাদর উঠিয়ে সেখানে বিছানো হতো নতুন চাদর, পাট না ভাঙা কভার লাগানো হতো দুমড়ানো বালিশে, নার্সরা যখন গাদা গাদা ফাইলের ওপরে, ত্রিভুজের মতো করে রাখা দুহাতে মাথাটা ফেলে ঝিমোত, তখন উঠে বসত সব রোগী, মহিলারা চুল আঁচড়াত আর পুরুষেরা বসত পা ঝুলিয়ে। কেউ ফুল নিয়ে আসত, কেউ নিয়ে আসত চকোলেট, নার্সরা সেই ফুল আর চকোলেট যত্ন করে গুছিয়ে রাখত রোগীর মাথার পাশে ওষুধের টেবিলে, সময়মতো জল দিত ফুলদানিতে।

দু-এক দিনেই সবকটা টেবিল ছেয়ে গেল ক্রিসমাসের উপহারে।

ক্রাংকেনহাউজে আমাকে পালা করে দেখতে আসত রফিক আর সজল, ব্লুমে আর শোকোলাডের বদলে ওরা আমার জন্য নিয়ে আসত ২১ নম্বরের কিচেনে রান্না করা তরকারি। তার গন্ধে কোনো কোনো রোগী ঘাড় তুলে আমার দিকে তাকাত।

আমাকে দেখতে একদিন এসেছিল বাড়িওয়ালা গ্র্যোটে ও তার স্ত্রী, আরেক দিন এল পুলিশ।

আমিও ভাবতাম, কত লোক আমাকে দেখতে এসেছে। এত ভাবতাম যে একসময় স্বপ্ন দেখতেও শুরু করলাম। একদিন দেখি আমার আব্বা, তিনি যখন আমার কপালে হাত রাখলেন, দেখলাম তার পাঞ্জাবির গুটানো হাতায় লেগে আছে তরকারির হলুদ, একবার দেখি আম্মা, ভেজা চোখ দুটো ঢাকা শাড়ির আঁচলে, কোনো এক রাতে দেখি হাতে মেহেদি লাগানো শীলা, মাথায় নতুন বউয়ের মতো ঘোমটা তোলা, আর যাকে আমি সবচেয়ে বেশি দেখতাম, সে হলো ফ্রাউ বাওয়ার।

সকালে ক্রাংকেনশোয়েস্টার এসে যখন ড্রেসিং করত ফ্রাউ বাওয়ারও গ্লাভস পরে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, বাড়িয়ে দিত স্যাভলনে ভেজানো তুলা, গজ, এটা-সেটা, মুখটা ওপরে তুলে খাইয়ে দিত ওষুধ, লাঞ্চের সময় খাবারের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে থাকত, ওর ভরাট কাঁধে ভর দিয়ে আমি বাথরুমে যেতাম, রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়তাম, ফ্রাউ বাওয়ারও ঘুমিয়ে পড়ত পাশের চেয়ারে, ঘুমের সময় ওর মুখটা হালকা খোলা থাকত।

আমি ভাবতাম, ফ্রাউ বাওয়ার হাসপাতালে আমাকে দেখতে এসেছেন, তার দুই হাত ফুলে ফুলে আর চোখমুখ ছেয়ে আছে উদ্বেগে। একসময় মনে হতো, তিনি বসে আছেন আমার শিয়রের কাছে আর হাত দুটো তার মুঠোর ভেতর। মিথ্যে বলব না, ভিজিটরদের ভিড়ে আমি সব সময় খুঁজতাম ফ্রাউ বাওয়ারের মুখ। একেকজন ভিজিটরকে দেখতাম আর শিউরে উঠতাম আবার কখনো কখনো আঁতকেও উঠতাম। সব মহিলাকেই আমার ফ্রাউ বাওয়ার বলে মনে হতো।

আমার বুকের ভেতরটা তখন ভয়ে ধুকপুক করত। মনে হতো, আমি দৌড়াচ্ছি আর আমার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছেন তিনিও। আমার হাতের মুঠোয় বাদাম ক্র্যাকার আর আমি শুনতে পেতাম, পেছন থেকে কেউ একজন 'এই ছেলে এএইই ছেলে' বলে চিৎকার করছে।

কয়েক দিন পর ঠিক ঠিকই ক্রিসমাস এল, তার আগের দিন সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে এল হাসপাতালের পরিচালক আর চার দিন পরে এল রিলিজ অর্ডার।

হাসপাতাল থেকে আমাকে আনতে গিয়েছিল রফিক। যখন বাড়ি ফিরছিলাম রাস্তার দুই পাশে বাড়িগুলোর জানালায় তখনো জ্বলছিল ক্রিসমাসের আলো, কিন্তু আগের মতো উজ্জ্বল নয়, ছিল শীতের সকালে জমে থাকা কুয়াশার মতো, স্তব্ধ।

আমরা যখন হাসপাতাল থেকে বেরোলাম, তখন বিকেল চারটা, সাড়ে চারটায় উঠলাম আওটোবানে, পাঁচটায় শহরে আর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার কিছু আগে পৌঁছে গেলাম বাড়িতে। মহাসড়কের ডানপাশে পড়ল গভীর জঙ্গল, গাছগুলোর মাথায় বরফের চাদর, তারপর একটা লেক, ওপরের পানির স্তর দুধের সরের মতো ঘন আর পানির রং ছিল আয়নার পেছনে লেপে রাখা পারদের মতো, একটা

কবরস্থান পার হলাম, বিস্তৃত মাঠের কোথাও পড়ে আছে ট্রাক্টর, আবার কোথাও কাত হয়ে আছে ট্রাক, কোনো কোনো জমিতে ক্যারাম বোর্ডের গুটির মতো গোল করে বেঁধে রাখা হয়েছে খড়, পলিথিনে মোড়ানো, তার পাশেই ঘোড়ার খামার।

শহরে ঢোকার মুখে রফিক বলল হোয়াইট ক্রিসমাসের কথা। চব্বিশ তারিখ সন্ধ্যায় ভাইনাক্টমান যখন বাড়ির দুয়ারে গেশেংক রেখে যেতে শুরু করল, তখন থেকেই নাকি স্নো ফল শুরু হয়েছে, বিরামহীন, টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা, সেই সাদা বরফ দুই দিন পর আর সাদা নেই, পিচ গলে যাওয়ার পর যেরকম হয়, রাস্তা এখন সে রকম, পথের কোথাও গুঁড়ি গুঁড়ি পাথর, আবার কোথাও নুন ছিটানো। কোনটা রাস্তা আর কোনটা ফুটপাত, গাড়ি থেকে বোঝার উপায় ছিল না।

রফিক বসেছিল চুপচাপ। এটা-সেটা জানতে চাইছিলাম আমি। ঢাকার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়েছে কি না, আমার এই ঘটনা আর কে কে জানে, কোনোভাবে এই খবর ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ আছে কি না, এসব। শুধু মাথা নাড়ছিল রফিক, বড়জোর হ্যাঁ হুঁ, ব্যস।

তারপর মুখ খুলল রফিক। বলল, 'তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।'

আমি জানতে চাইলাম, কিসের, রফিক শুধু হাসল, আবার যখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কী' ? ও তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

আমাদের বাম পাশে কেউ একজন বাজার নিয়ে ফিরছিল বাড়িতে, দুই হাতে দুই স্টিক নিয়ে হাঁটছিল বুড়ো এক মহিলা, ও ছিল গান শোনায় মগ্ন আর টাক মাথার একটা লোক শর্টস পরে এই শীতের মধ্যেও জগিং করছিল।

হাসপাতাল থেকে পিওনিয়ার স্ট্রাসে পর্যন্ত পুরোটা পথ আকাশ নিচু হয়ে ঝুলছিল, আরেকটু হলেই ছুঁয়ে যেত গির্জার মাথাটা। গির্জার পেছনে ছোপ ছোপ ছাই রঙা মেঘ, যেন সেখানে কেউ কালির দোয়াত উপুর করে দিয়েছে।

ঘরে ঢোকার পরেই রফিক আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল, চারকোনা প্যাকেটটা রাঙতা কাগজে মোড়ানো, মচমচে আরা সুগন্ধিযুক্ত, বাক্সটার চারপাশ লাল আর সবুজ রিবন দিয়ে পেঁচানো, মাঝখানের ফিতাগুলো এমনভাবে পেঁচানো যে মনে হলো সবুজ পাতার মাঝখানে ফুটে আছে একটা লাল গোলাপ।

জন্মদিনে শীলা আমাকে এভাবে উপহার দিত।

বাক্সটার ভেতর ছিল ছোট্ট একটা স্যান্টাক্লজ, কাপড় আর তুলা দিয়ে বানানো, ওর চোখ দুটো যেন পানিতে টলটল করছে। স্যান্টাক্লজের হাতে ছিল একখানা রুপালি গিটার। পুতুলটার পেছনে, পিঠের ঠিক নিচের দিকে একটা চাবি বসানো, দম দিয়ে ছেড়ে দিলেই গোল হয়ে ঘুরতে থাকত স্যান্টাক্লজ আর 'জিংগেল বেলস' গানটা বাজতে থাকত গিটারের ভেতর।

স্যান্টাক্লজের চারপাশে নানা রকমের চকলেট ছড়ানো, তার তলায় উঁকি দিচ্ছে রঙিন একটা ক্রিসমাস কার্ড, ওপরের পাতায় পাহাড়ের ছবি, পাহাড় ছেয়ে আছে তুষারে, ঝাউ গাছের ঘন বনের ভেতর দিয়ে ছুটছে একটা স্লেজ গাড়ি, তার লাগাম টেনে বসে আছে এক কিশোরী।

কার্ডটা যখন খুললাম, থর থর করে হাত কাঁপছিল আমার। এত জোরে জোরে কাঁপছিল, হয়ত যেকোনো সময় প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে যেতে পারত। ভাবছিলাম, কে পাঠাল এটা ? ঢাকা থেকে শীলা ? ২১ পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িওয়ালা হেরমান গ্র্যোটে ? নাকি কোলনের পুলিশ, নাকি এটা হাসপাতাল থেকে পাঠানো হয়েছে ?

কার্ড খুললাম আমি। ভেতরে খুব পরিষ্কার করে গোটা গোটা হরফে লেখা ফ্রোয়েস ভাইনক্টেন, তার নিচে বাঁকা বাঁকা হাতে নীল কালিতে লেখা ছিল, ‘এই ছেলে, এই ক্রিসমাসে তোমার জন্য আমার এই ছোট্ট উপহার...’

শীলার চিঠি

সকাল এগারোটার দিকে বেজে উঠল ডোরবেল। আমি তখন বাথরুম পরিষ্কার করছিলাম। বাথটাবের কিনারায়, যেখান থেকে তিন দিকের দেয়াল উঠেছে, সেখানে কালো কালো শ্যাওলার মতো ফাঙাস জমেছে। অনেক দিন ধরে সেসব পরিষ্কার করার কথা হচ্ছিল। কথা ছিল, এই কাজটা রফিক করবে। বাড়ির কাজ নিয়ে আমাদের একটা রুটিন আছে, রফিক বাজার করলে সজল রান্না করবে, সজল ঘর পরিষ্কার করলে আমার কাপড় ধোয়ার পালা, আমি ভ্যাকুয়াম দিলে রফিক সিঁড়িঘর ও জানালা মুছবে, আমি বাগানের বরফ ও ঝরা পাতা সরালে সজল বাথটাব, বেসিন ও কমোড পরিষ্কার করবে, আমি ঘর গুছালে রফিক বাগানের ঘাস আর গাছের ডালপালা ও পাতা ছাটবে।

এই কাজগুলো কখনো কখনো ভাগ করা হতো সপ্তাহের দিনের হিসেবেও। সবচেয়ে বড় কাজ ছিল রান্না করা, এই কাজটা আমরা সারতাম পালা করে, যেমন সোম ও মঙ্গলবার আমি, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রফিক, শুক্র ও শনি সজল আর রোববার রান্না করতাম আমরা সবাই। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মৃদু ঝগড়াঝাঁটিও হতো। তবে ঝগড়া-ফ্যাসাদের চেয়েও বোঝাপড়াটা ছিল অনেক অনেক বেশি, নজিরবিহীন এবং অনুকরণীয়।

যেমন রফিকের মায়ের মৃত্যুর পর ওর অনেক কাজ আমাদের দুজনকে করতে হয়েছে। আবার আমি যখন হাসপাতাল থেকে ফিরে আসি তারপর বেশ কয়েক দিন ওরা আমাকে বিছানা থেকেও উঠতে দেয়নি। এই বিছানায় শুয়ে থাকাটা, কয়েক দিন পর, আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। গুলিয়ে উঠত গা। গলার কাছে একটা বমি সব সময় আটকে থাকত। মনে হতো, আমার দুই হাত ও দুই পা অসুখ নামের শক্ত একটা দড়ি দিয়ে খাটের চারটা পায়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শুয়ে থাকতে থাকতে ম্যাট্রেসের মাঝখানে একটা গর্তের মতো হয়ে গেল আর নিজেকে মনে হতে লাগল অনড়-অসাড় ভারী একখণ্ড পাথর।

অবশেষে সেই পাথর বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল জানুয়ারির কোনো এক সকালে, যত দূর মনে হয় দ্বিতীয় সপ্তাহে। গা ঝাড়া দিয়ে, পুকুর থেকে ডাঙায়

ওঠার পর হাঁস যেমন ডানা ঝাপটিয়ে সব পানি ঝেড়ে ফেলে, সে রকম আমিও ছুড়ে ফেললাম সব ক্লান্তি, সব বিবমিষা, শরীরে বাসা বেঁধে থাকা যত অসুখ। প্রথমে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম বিছানায়। তারপর নেমে এলাম মেঝেতে।

সেদিনই ঢুকে গেলাম আমাদের পুরনো রুটিনে। আমার কাজ ছিল বাথরুম ক্লিন করা। একটা ছুড়ি দিয়ে বাথটাবের ফাঙাস চেছে চেছে তুলে সেখানে নতুন করে সিলিকন লাগাচ্ছিলাম আমি। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছি, খুব ক্লান্ত লাগছিল তখন, নিশ্বাস নিতে হচ্ছে জোরেসোরে। কয়েক দিন হাসপাতালে থেকে গায়ে-গতরে কিছুটা জোর ফিরে এলেও দম নিতে কষ্ট হতো তখনো। বসতে-উঠতেও তলপেটে ব্যথা হতো। যে জায়গাটায় ছুড়ি চালানো হয়েছিল, সেখানে লম্বা একটা সেলাইয়ের দাগ। ওখানে মাঝেমধ্যেই চিনচিনে একটা ব্যথা ওঠে। এখনো হচ্ছে।

কে এল এই অসময়ে ? কাটা জায়গাটা ছুঁয়ে দেখলাম আমি। রফিক গেছে ফ্রাংকফুর্টে, ওখানে ওর কিছু বন্ধুর সঙ্গে ইটালি যাওয়ার বিষয়ে শলাপরামর্শ করতে। আর সজল ঘুমিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সারা রাত কাজ করে ও ফিরেছে ভোর রাতের দিকে। তাহলে এখন কে আসবে এই বাড়িতে ! ভাগ্য খুব বেশি প্রসন্ন না হলে এখানে সাধারণত কোনো আগন্তুক আসে না। মাঝেসাঝে রফিকের বন্ধুরা আসে, আসে সজলের বান্ধবীরাও, অবশ্য ওরা আসে ফাঁকা বাড়িতে, যখন আমরা থাকি না, আমাদের ফিরে আসার একটা সময় দিয়ে দিত সজল। যখন ফিরতাম, কেউ থাকত না বাড়িতে কিন্তু চার দেয়ালের ভেতর পারফিওমের গন্ধ ভুসভুস করত, বিছানা ও বালিশের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত লম্বা লম্বা সোনালি চুল, ওর সঙ্গে যারা রেস্তোরাঁয় কাজ করত তারাও আসত, ওরা ছিল শেফ, ওয়েটার অথবা কিচেন পটার।

সাধারণত এই বাড়িতে আমি আসি, সজল আসে অথবা আসে রফিক। আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে চাবি আছে। এ রকম ঘটনা খুব কমই হয়েছে যে সজল বা রফিক এসেছে আর আমাকে নিচে গিয়ে দরজা খুলে তাদের ওপরে নিয়ে আসতে হয়েছে। নিজেদের বাইরে আরও যারা আসত, তাদের মধ্যে ছিল স্যুয়ারেজ পরিষ্কার করার লোক। মাথার চুল আর রুই ও ইলিশ মাছের আঁশে বাথটাব ও সিঙ্কের পানি আটকে গেলে লোক আসত সারাতে, আসত বিদ্যুৎ আর গ্যাসের মিটার রিডারও।

সত্যি বলতে কি, বাড়ির বেল বাজলে আমরা খুশি হতাম। শিহরিত হতাম যে আমাদের জীবনে তাহলে নতুন কেউ এসেছে। গোপন একটা উত্তেজনা তৈরি হতো আমাদের রক্তের ভেতর। তারপর আস্তে আস্তে সেটা ছড়িয়ে পড়ত আমাদের চোখেমুখে। আমরা কেউ কাউকে এ কথা বলতাম না। কিন্তু বেলের

টুংটাং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের তারাগুলো যেভাবে নেচে উঠত, সেটা দেখলেই এই উত্তেজনাটা পরিষ্কার বোঝা যেত।

দরজার ডান পাশে ভেতরের দিকের দেয়ালে ঝুলানো ছিল একটা ফোন, বাদামি রঙের, ওটা দিয়ে নিচের দরজাটা কন্ট্রোল করা যেত, ওটার বোতাম চেপে কথা বললাম আমি। আসলে ওটা ছিল চাবিফোন, তার ঠিক পাশেই লাগানো ছিল স্টেফি গ্রাফের বিশাল একখানা রঙিন পোস্টার। ওর মাথায়, কপালের ওপর দিয়ে গোল করে বাঁধা ছিল সাদা কাপড়ের একটা ব্যান্ড, তার নিচে হাসফাঁস করছিল কাঁধছোঁয়া অবাধ্য সোনালি চুল।

নিচ থেকে বলল, 'চিঠি এসেছে।'

সাধারণ চিঠি হলে পিয়ন ওটা ডাকবাক্সে ফেলে যায় নিঃশব্দে। ওগুলোর মধ্যে আছে আমাদের মামলার বিষয়ে সরকার ও আদালতের কাগজ অথবা টেলিফোন, গ্যাস ও বিদ্যুতের বিল কিংবা ব্যাংকের স্টেটম্যান্ট। শুধু রেজিস্টার্ড চিঠি হলেই সেগুলো নিচে গিয়ে সই করে আনতে হতো। বেশির ভাগ সময়েই ওগুলো ছিল ব্যাংকের ইস্যু করা চেক অথবা কোনো কার্ড।

নিচ তলায় সিঁড়ির হাতলটা যেখানে এবাউট টার্ন হয়ে বেজমেন্টের দিকে নেমে গেছে, সেখানে হেলান দিয়ে চিঠির প্রাপকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার। বিস্ময়ে আমার বাক রুদ্ধ হলো। অথচ তার চোখেমুখে কোনো ভাবান্তর ছিল না। অনেকটা ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম আমি, কিছুটা অবিশ্বাস, কিছুটা ঘটনার নাটকীয়তা অথবা খানিকটা অভিনবত্ব কিংবা আকস্মিকতা, তার সঙ্গে কিছুটা অপরাধবোধও ছিল। কেননা, এই কিছুক্ষণ আগেও, বাথটাব পরিষ্কার করার সময়, এই মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। প্রথমে আমার মস্তিষ্কে, তারপর দেহে। আর সেই মহিলা এখন দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে, সশরীরে। এই কিছুক্ষণ আগেও, আমার কল্পনায় তিনি ছিলেন নগ্ন আর এখন তার গায়ে হালকা আকাশি রঙের একটা হাফহাতা কার্ফ, ডিপ ব্লু প্যান্ট আর গলায় হলুদ ফিতের একটা মালা, ওখানে পেটের কাছে ঝুলছে একগোছা চাবি।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, নিষ্পলক আমার দৃষ্টি। ফ্রাউ বাওয়ারকে আমি এই পোশাকে, এখানে এই ২১ নম্বর বাড়িতে, এই পরিস্থিতিতে, আমার জন্য হাতে চিঠি নিয়ে কখনো দেখতে পাব, সেটা আমার প্রলয়ংকরী কল্পনাতেও কোনো দিন আসেনি।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কথা আমার প্রায়শই মনে হতো, ভাবতাম ইশ্, তিনি যদি আমাকে দেখতে আসেন, অন্তত একবার হলেও, তাকে নিয়ে আমার মনের মাটিতে তখন কল্পনার চারা গজাত, আমি তার গোড়ায় জল ও সার দিতাম, পুরনো লতাপাতা ছেটেছুটে পরিষ্কার করতাম, একসময় ফুল ও ফলে

নুয়ে পড়ত সেই স্বপ্নবৃক্ষের ডালপালা। আমি ভাবতাম, কেমন হতো ফ্রাউ বাওয়ার যদি ক্রাংকেনশোয়েস্টার হতেন, কিছুক্ষণ পর পর তিনি এসে দাঁড়াতেন বিছানার পাশে, তার পরনে থাকত হালকা নীল রঙের অ্যাপ্রোন, বুকের ওপর ঝুলত স্টেথেসকোপ, আমাকে হা করিয়ে জিভ দেখতেন, কপালে হাত রাখতেন, নরম আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখতেন, তলপেটের কাটা জায়গাটা, তারপর বিছানার ওপরে পুরোপুরি ঝুঁকে টেনেটুনে ঠিক করে দিতেন গায়ের চাদর। আবার ভাবতাম, যদি তিনি আর্জট হতেন তাহলে কী হতো, অপারেশন থিয়েটারে হয়ত থাকতেন তিনিও, তার দুহাতের গ্লাভসে ছড়িয়ে থাকত কাচা রক্ত, ক্যান্ডি অ্যাপেলের মতো লাল, অপারেশন থিয়েটারের আলোর নিচে তার কপালের রেখাগুলো আরও বেশি ফুটে উঠত।

এ রকম টুকরো টুকরো কিছু স্বপ্ন আমার ঘুমের ভেতর মিছিল করত।

কখনো আমি দেখতাম ফ্রাউ বাওয়ার রিসেপশনে কাজ করছেন, কখনো মনে হতো, তিনি হাসপাতালের একজন কর্মচারী, তার দুহাতে কতগুলো ফাইল, ছুটোছুটি করছেন করিডোরে, একবার মনে হলো তিনি পুৎসফ্রাউ, বেডশিট আর তোয়ালে ধোয়া তার কাজ, অথবা তার হাতে একটা বালতি, সেখান থেকে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে ডেটলের গন্ধ।

আমার এই আকাঙ্ক্ষার কথা আমি রফিক আর সজলকেও জানিয়েছিলাম, ওরা আমার কাছে বাড়ির নম্বর জানতে চাইল, সেটা আমি বলতে পারিনি, বাড়িটা আমি চিনতাম, শুধু জানতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে, হয়ত নম্বরটাও দেখেছিলাম; কিন্তু এখন আর মনে নেই, শুধু মনে আছে ছোটখাটো একটা কিয়স্ক, যেখান থেকে ফ্রাউ বাওয়ার সেদিন দুধ আর মোমবাতি কিনেছিলেন, তার পাশে পুরনো একটা গেট, ব্যস এতটুকুই।

ফ্রাউ বাওয়ারের এক হাতে চিঠি আর অন্য হাতে চাবির গোছাটা, সেটা তিনি ঘুরাচ্ছিলেন চরকির মতো। আমাকে দেখে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হেসে উঠল ফ্রাউ বাওয়ারের চোখ।

বিড়ালের মতো মৃদু মৃদু পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। আমার ডান হাত সিঁড়ির হাতলে, আর বাম হাতে ছুরি। জিজ্ঞেস করলাম, 'ফ্রাউ বাওয়ার, আপনি !' আমি কোনো কথা নাও বলতে পারতাম, সেদিন তিনি যেভাবে চিৎকার করে উঠেছিলেন, তাতে কথা না বলাটা স্বাভাবিক ছিল, শুধু চিঠিটা নিয়ে আমি চলে যেতে পারতাম ওপরে, আমি তা করিনি, কেন করিনি, সেটা আজ আর জানি না। হয়ত তখন জানা ছিল, হয়ত ছিল না।

আরও একটু বেশি করে হাসলেন তিনি, তার চোখ দুটো নেচে উঠল বর্ষায় পেখম মেলে দেওয়া ময়ূরের মতো, তিনি পেছনে ঘুরে দেখলেন কেউ আছে কি না। বাড়ির গেটটা তখন হা করে খোলা, তীব্র একটা আলো সরীসৃপের মতো

হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল। বাইরের ফুটপাতে সিমেন্টের বিশাল টবটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল ডয়েচে পোস্টের ঠেলাগাড়ি।

ফ্রাউ বাওয়ার ডান হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন আমার হাতে। বললেন, 'হুম আমি।' তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তো?'

বিস্ময়টা এত আচমকা আর তীব্র ছিল যে ফ্রাউ বাওয়ারের সঙ্গে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা করেনি আমার। তাকে আমি ওপরে আসতে বললাম, যদিও জানতাম, এটা অর্থহীন। ডিউটি ফেলে আসবেন কীভাবে ! ঠেলাগাড়িটার ভেতর আরও কত চিঠি, দুপুরের আগেই সেসব পৌঁছে দিতে হবে প্রাপকের কাছে।

আর কোনো কথা হলো না আমাদের। আমার আমন্ত্রণের জবাবে ফ্রাউ বাওয়ার 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বললেন না, শুধু আরও একটা হাসি দিয়ে চলে গেলেন দরজার ওপারে।

টিপ বোতাম লাগানোর মতো ক্লাচ করে গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। কাঠ ও লোহা দিয়ে বানানো গেটের মাঝখানে বসানো ছিল চার কোনা ঘষা কাচ, দুধের মতো সাদা। সেখান দিয়ে বাইরের কিছুই দেখা যেত না, কিন্তু আলোটা আসত ভেতরে। সিঁড়িঘরের মেঝের ওপর তখন তেরচা হয়ে শুয়ে আছে লম্বা একটা রোদ, ওটা ডান দিকে ফ্ল্যাটের ডোর ম্যাট পর্যন্ত ছড়ানো, মনে হলো রোদের একটা কার্পেট বিছানো। কোনো একসময় চিঠির গাড়িটা চলে যাওয়ার শব্দ হলো, কেউ একজন কোথাও কারও নাম ধরে উঁচু স্বরে ডাকল, দূর থেকে ভেসে এল গ্যারেজের শাটার নামানোর শব্দ, তারপর একটানা ঘোত ঘোত ইঞ্জিনের আওয়াজ।

তারপর নীরবতা।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠছিলাম আর ভাবছিলাম, ফ্রাউ বাওয়ারের কথা। আমার কাছে তিনি এখন আরও একটু বেশি পরিচিত, আরও একটু কাছের। আমি জানি, তিনি কী করেন। আমার কাছে এখন পিয়ন বাওয়ার এবং ফ্রাউ বাওয়ার যেন আলাদা দুই নারী।

তখনো আমি চিঠির দিকে খেয়াল করিনি। সই করার সময় নিশ্চিত হয়েছি যে এই চিঠি আমার কাছে এসেছে, কারণ, চিঠিটা আমার হাতে দেওয়ার আগে ফ্রাউ বাওয়ার আমার নামটাই বলছিলেন এবং চিঠিটা ফ্রাউ বাওয়ারের হাত থেকে নেওয়ার পরে আমাকেই একটা কাগজে সই করতে হয়েছে। তবে চিঠিটা কে লিখেছে, বা কী লিখেছে, কোত্থেকে এসেছে, সেসব নিয়ে তখনো কোনো চিন্তা মাথায় আসেনি।

খামের ওপর আমার ঠিকানা দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর কেউ না, এই চিঠি শীলা লিখেছে। আমার নিজের হাতের লেখার চেয়ে ওর হাতের

লেখাটা আমি বেশি চিনি। আমার নকল নামটা, যে নাম সরকারের শরণার্থী তালিকায়, সমাজকল্যাণ বিভাগের খাতায়, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আর জুতার কারখানায়, সেটা ও লিখেছে খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে, খামের ওপরের দিকে, ডান পাশের কোনায় লাগানো ছোট ছোট স্ট্যাম্পগুলোর নিচে। আর একেবারে নিচের দিকে বাম পাশে খামের কিনারায় লিখেছে আসিফ, যেটা আমার আসল নাম, যে নাম লেখা ছিল স্কুলের খাতায়, থানায় পুলিশের কাছে, শীলার বুকের ভেতর, নাখালপাড়ায় ৩০০/এ বাড়ির মানুষগুলোর মুখে, যে নাম আমি ঢাকায় ফেলে এসেছি।

আসিফ লিখতে যে অক্ষরগুলো লাগে, সেগুলোর ওপরে বহুবার কলম ঘুরিয়েছে শীলা। সেগুলো সোজা ছিল না, এদিক-সেদিকে বাঁকানো-পেঁচানো, বর্ণমালাগুলো কোথাও সরু, আবার কোথাও কোথাও মোটা। দন্তস্যটা ফ আর স্বরে অ'র ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

এটা ছিল শীলার অভ্যাস। আমার নাম কখনো এক আঁচড়ে লিখত না ও। একটা একটা করে অক্ষর লিখত, তার ওপর আনমনে কলম চালাত, তারপর আরেকটা অক্ষর লিখত। দুটো অক্ষর লেখা হয়ে গেলে আবার প্রথমটায় চলে যেত। শীলার কাছে এটা ছিল এক ধরনের নেশা। ওকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম। ও বলেছিল, 'আমি তোমার নাম লিখি না, আসিফ। তোমাকে স্পর্শ করি।' কিছুক্ষণ থেমে তারপর আমার দিকে মুখ তুলে বলেছিল, 'আমার ভালো লাগে।' তারপর ও আর কিছু বলেনি। বলিনি আমিও। তারপর ঘরজুড়ে ছিল শুধু নীরবতা। শীলার গাল বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। চোখ থেকে ঝরনার মতো জল পড়ার শব্দ বাজছিল আমার বুকের ভেতর।

সাধারণত নিয়মিত ডাকে চিঠি পাঠায় শীলা, কখনো রেজিস্ট্রি করে না। শুধু আমার জন্মদিনের চিঠি হলে সেটা রেজিস্ট্রি করে পাঠায়। খামটা এত পাহাড় আর এত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমার কাছে আসে যে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেটা এবড়োখেবড়ো হয়ে দলা পাকিয়ে যায়। এনভেলাপের সামনে-পেছনে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো থাকে, জোড়াতালি দিয়ে বেঁধে রাখার মতো, যেন ভেতরের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে না যায়। মানুষের হাত-পা ভেঙে গেলে যেভাবে প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে পেঁচানো থাকে, আমার কাছে আসা শীলার সেসব চিঠিও নানা ফিতেয় মোড়ানো থাকত। আর তখনই ডাকপিয়নের কাছ থেকে চিঠিটা নিতে হতো সই করে।

এবারে কোনো জন্মদিনের চিঠি ছিল না, তবে ওটা ছিল বেশ জরুরি চিঠি। জরুরি বলব না, বলব পরাজয় ও আত্মসমর্পণের চিঠি। শেষ পর্যন্ত শীলা পরাজয় মেনে নিয়েছে ওর বাবা মার কাছে, লিখেছে, ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কবে বিয়ে

হবে, সবশেষ এই প্রতিরোধ কেন টিকল না, এসব কথা। কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে বা ছেলে কী করে, কোথায় থাকে, সেসব বিষয়ে কিচ্ছু লিখেনি। একটা শব্দও না, একটা অক্ষরও না।

শীলার বিয়ের কথা সজল ও রফিক দুজনকেই বলেছি। খবরটা পাওয়ার পর কয়েকটা রাত আমি শুধু ঘরের ভেতর পায়চারি করে কাটিয়েছি। মনে হতো, আমি শুধু হাঁটছি হাঁটছি হাঁটছি আর এই হাঁটার গন্তব্য যেন শীলা। আমার মাথার ভেতর সারাক্ষণই ঘুরপাক খেত শীলার হাসি, শীলার কান্না, ওর পানপাতা মুখ।

আমি শীলাকে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম, পারিনি। ওকে আর মনেও রাখতে চাইনি, কিন্তু ও রয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আমার জীবনে শীলা সেরে যাওয়া কোনো অসুখের মতো হয়ে থাকুক। হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়া পেলে যেমন অসুখ পেছনে পড়ে থাকে, তেমনি শীলাও পড়ে থাকুক ঢাকায়। ভাবতাম, কোনো অসুখ সেরে গেলে সেই একই অসুখ কি আবার ফিরে আসে ? জন্ডিস দুবার-তিনবার হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকবারের জন্ডিস কি সেই একই জন্ডিস ? একই ভাইরাস ? ভাইরাসটা তো একই, কিন্তু যে ভাইরাসটা আগেরবার কাবু করেছিল, এবারের ভাইরাসও কি সেটাই ? আগেরটা তো মরে গেছে, নাকি মরেনি ? শীলা কি এখনো বেঁচে আছে আমার ভেতরে ? কেন বেঁচে আছে ?

শীলার জন্য গুমরে গুমরে মরত আমার হৃদয়, ডুকরে ডুকরে কাঁদতাম আমি ভেতরে ভেতরে। গভীর গোপনে। একদিন সকালে রফিক আমাকে বলেছিল, ও নাকি আমাকে ঘুমের মধ্যে 'শীলা শীলা' বলে গোঙাতেও শুনেছে।

ওরা আমাকে বলল শীলাকে ফোন করতে। বহুবার ফোনের কাছে গিয়েছি, নম্বর ডায়াল করেছি এবং শেষে একবার রিং হওয়ার পর কেটেও দিয়েছি। কী লাভ হতো এলোমেলো এসব কথায় ! আমাদের এই পরিণতি হয়ত শুধু দেশে গেলেই ঠেকানো যেত। একা একা আর কিছু করার নেই শীলার। সেটা করতে গেলে ওর আমাকে লাগবে। আমি জানি, ওর শেষ প্রতিরোধও ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বন্যার প্রবল পানি যেমন বাঁধের শেষটুকু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঝড়ের শেষ হাওয়া যেমন বাড়ির পেছনে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র গাছটা মুড়িয়ে দেয়, তেমনি শীলার সব চেষ্টাও ভেসে গেছে খড়কুটোর মতো। সেই পানিতে ওর ঘর ডুবে গেছে, ভেসে গেছে সব স্বপ্ন ও সাধ। সেই ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে ওর বুকের ভেতর বহু দিন ধরে তিলতিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নসংসার। চিঠিতে শীলা এসব কথাই লিখেছে, আর আমি সেটা বুকে নিয়ে বসে আছি পিওনিয়ার স্ট্রাসের খাঁ খাঁ করা একটা বাড়ির ভেতর।

ঢাল নেই, ধনুক-তীর নেই, কী দিয়ে যুদ্ধ করবে শীলা ! যাকে নিয়ে যুদ্ধ, সেই মানুষটাই রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে। তাহলে আর যুদ্ধটা কার জন্য, কিসের জন্য ! ইকারুস পাখির মতো মোমের ডানা লাগিয়ে আমি উড়তে উড়তে

চলে এসেছি পৃথিবীর আরেকটা গোলার্ধে। সেই ডানা গলে গেছে বাস্তবতার তীব্র রৌদ্রে। আমি এখন ডানা ভাঙা একটা পাখি, যার ঘরে ফেরার সাধ আছে, সাধ্য নেই।

শীলার বিয়ের খবর পাওয়ার সপ্তাহখানেক পর এক রাতে গায়ে কাঁপুনি দিয়ে খুব জ্বর এল আমার এবং টানা চার দিনের অসুখে একেবারে দুর্বল হয়ে গেলাম আমি। আর সেই সুযোগে আমার মগজের মধ্যে তখন শীলা আবারও ফিরে আসতে শুরু করল।

আমি খুব চেষ্টা করেছি ওর কথা একেবারেই না ভাবতে। শীলার স্মৃতি আমি কবরে পুঁতে ফেলতে চেয়েছি, চেয়েছি সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে দিতে, সুতো কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো উড়িয়ে দিতে চেয়েছি আকাশে, চেষ্টা করেছি ওকে আপাদমস্তক ভুলে যেতে। কিন্তু পারিনি। কখনো পারিনি। শীলাকে প্রতিরোধ করার মতো উঁচু ও দুর্লঙ্ঘ্য কোনো প্রাচীর আমার স্মৃতির সামনে নির্মাণ করার কোনো ক্ষমতাও আমার ছিল না। যেটাই দাঁড় করাতাম, সেটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত, আর তখনই শীলা প্রবল তোড়ে এসে ঢুকে পড়ত আমার অস্তিত্বে।

আমি তখন ডানা ভাঙা পাখির মতো ছটফট করতাম। কখনো কখনো মনে হতো, আমার সব স্মৃতি যদি নষ্ট হয়ে যেত, শীলাকে নিয়ে সেখানে যত ছবি, তার সব যদি মুছে যেত, তাহলেই বোধ হয় বেঁচে যেতাম আমি। শীলাকে ভুলে যেতে আমি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লড়াই করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সে রকম ধারালো কোনো অস্ত্র আমার সংগ্রহে ছিল না। উপায় না পেয়ে একসময় আমি ফ্রাউ বাওয়ারকে দিয়ে শীলার সামনে একটা দেয়াল তৈরির চেষ্টা করেছি। বড় নড়বড়ে ছিল সেই প্রাচীর। লড়াই করতে করতে কোনো একসময় আমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যেতাম, আর তখনই শীলা আমার সামনে এসে দাঁড়াত। তার পরনে থাকত ডয়েচে পোস্টের নীল কার্ফ, তার ওপরে হাতাকাটা হলুদ জ্যাকেট।

ডাক্তার তখনো আমাকে কাজে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। তলপেটের নিচে চিনচিনে ব্যথাটা তখনো ছিল। এত বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছিল যে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে আমি তখন হলুদ একটা মানুষ। একঘেয়ে অবরুদ্ধ এক জীবন। ঘরে যখন কোনো মানুষ থাকত না, আমাকে সঙ্গ দিত অদ্ভুত এক স্তব্ধতা, কখনো কখনো বাথরুমের কল থেকে টপ টপ করে পড়া পানির শব্দ আর মাঝেসাঝে ফ্রিজের একটা অদ্ভুত দম নেওয়ার চেষ্টা। যেসব ম্যাগাজিন আর বই ছিল, সেসবেও ততদিনে ঘেন্না ধরে গেছে। যারা আমাকে দেখতে আসত, তাদের মুখও একসময় অসহ্য লাগতে শুরু করল। আমার খুব রাগ হতো তাদের ওপর। মনে হতো, তারা সচল, আমি অচল, তারা জীব, আমি জড়।

আমার একমাত্র বন্ধু ছিল বত্রিশ ইঞ্চি গ্রুনডিগ টেলিভিশন। একসময় সেটাও অসহ্য হয়ে উঠল। টেলিভিশনের শব্দ শুনলে মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠত আর যেদিন ভেডেআর চ্যানেলে নাখ্‌টরিক্টেন দেখলাম, তারপর থেকে টিভির আলোর দিকে তাকালে গলার কাছে বমি উঠে আসত। আমার এখনো মনে আছে, ওই খবরে একজন পলিটিকার বলেছিল, 'অবৈধ ইমিগ্র্যান্টবাহী জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিতে হবে, না হলে দক্ষিণ এশিয়া থেকে আসা মানুষেরাই একদিন ইয়োরোপকে ডুবিয়ে ছাড়বে।'

হাঁটাচলা দূরের কথা, আমি তখন বিছানায় বসতেও ভয় পেতাম। নিজেকে মনে হতো, মানুষের একটা কাঠামো। কোনো শক্তি নেই ভেতরে, ফাঁপা একটা দেহ, বাতাস দিয়ে ফুলানো। একটা বিছানায় সারাক্ষণ পড়ে আছে একটা মানুষের শরীর। পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই বাসাটা যেন হয়ে উঠেছিল হাসপাতালের একটা ওয়ার্ড। কখনো কখনো আমি ক্লোরোফিনের গন্ধও পেতাম। রফিক আর সজল খুব বকাবকি করত আর সজল ওর রেস্তোরাঁ থেকে প্রতিদিন স্যুপ এনে আমাকে খাওয়াত।

তারপর ফেব্রুয়ারি এল, তার সঙ্গে সঙ্গে এল শরীরের জোর, আকাশটা একটু নিচুতে নেমে এল, হলো তুষারবৃষ্টি। একদিন উঠে দাঁড়ালাম আমি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে মানুষটাকে দেখলাম, সে ছিল আমার অপরিচিত। মুখ শুকনো, চোখ মলিন আর চুল লম্বা হয়ে দুই পাশের কান ঢেকে গেছে। বকের মতো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। শেভ করলাম, বাথরুমের মেঝেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে নিজেই চুল কাটলাম নিজের। সে এক দেখার মতো ঘটনা। ঘাড়ের ওপরে মাথাটা রোবটের মতো কখনো একশো আশি, কখনো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরিয়ে, লাফিয়ে, বসে, পেঁচিয়ে-বাঁকিয়ে যখন মনে হলো চুল বেশ ভালোই ছোট হয়েছে, ঠিক তখন একটা ভয় এসে ঢুকল বুকের ভেতরে, ঠিকমতো কাটা হয়েছে তো, কেউ বুঝবে না তো যে আমার ফ্রিজেওর ছিলাম আমি নিজেই ! ভয়টা ঝেটিয়ে বিদায় করতে খুব দ্রুত স্নান করলাম আমি, নতুন জামাকাপড় পরলাম, তারপর বেরিয়ে এলাম রাইনের তীরে, দাঁড়ালাম ডোমের সামনে খোলা জায়গাটার ওপরে।

এরপর থেকে আমি নিয়মিত বাইরে যেতে লাগলাম। শরীরে তখন আস্তে আস্তে জোর ফিরে পাচ্ছি। প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে যাই। প্রথম দিন গেলাম চিড়িয়াখানার গেট পর্যন্ত। পরদিন সেটাকে ছাড়িয়ে রিলার স্টেশনের ব্রিজ অবধি। তার পরের দিন সেই ব্রিজ পার হয়ে স্যুলগিশে গার্টেনে, যেখানে ছোট্ট একটা পুকুরের মাঝখানে ফুটে আছে গাঢ় গোলাপি রঙের শাপলা ফুল, শরতের আকাশের মতো টলটলে স্বচ্ছ পানির নিচে ছুটোছুটি করছে নানা রঙের মাছ।

পুকুরের পাশেই কাচের একটা ঘর। তার ভেতরে নানা রঙের প্রজাপতি। ভেতরে ঢুকলাম আমি। একটা শ্মেটারলিংগে এসে বসল মাথায়, কয়েকটা কাঁধে আর হাত বাড়ালেই বসল হাতের তালুতে। সারাটা বিকাল কাটালাম প্রজাপতি, খরগোশ, এক ঝাঁক মাছ, একটা বড় রাজহাঁস আর কাঠবিড়ালির সঙ্গে। দুদিন পর রবিবার সকালে রাইন পার হয়ে একটা বাগানের মাঠে হইচই করে কাটালাম বাচ্চাদের সঙ্গে। তুমুল তুষারপাতের মধ্যে আমরা সবাই মিলে বানালাম একটা স্নোম্যান। এভাবে চলল আরও কিছু দিন। যতক্ষণ না ক্লান্ত লাগত, আমি হাঁটতাম হাঁটতাম হাঁটতাম। একেক দিন চলে যেতাম একেক জায়গায়।

একদিন চলে গেলাম এবার্টপ্লাৎসে। আর যেদিন আমি ৫৬ বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে আবার ফ্রাউ বাওয়ারের ঘরে গিয়ে বসলাম, সেদিন ছিল শুক্রবার, ঢাকায় শীলার বিয়ে হচ্ছে। ফ্রাউ বাওয়ারের ঘরে তখন বেটোফেনের সিম্ফনি বাজছিল সানাইয়ের সুরে।

আরেক অধ্যায়

শীত খুব চালাক। একবার চলে গিয়েও ফিরে এল আবার। মাঝে টানা কয়েক দিন সূর্য জ্বলল মাথার ওপর। উজ্জ্বল, প্রখর কিন্তু ঠান্ডা। ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে নীল আকাশটা উঠে গেল ওপরের দিকে। শিশুরা পার্কে নেমে এল। মনে হলো শীতের কবল থেকে হয়ত আরও একটা বছরের জন্য মুক্তি পেল মানুষ। কিন্তু সেটা ছিল প্রকৃতির খেয়াল। আবার যা ছিল, তা-ই। সেই যে চিড়িয়াখানার পেছনে আগুনের লাল গোলাটা ডুব দিল, সেটা আর উঠল না। কুয়াশার মতো ঠান্ডা এবং ছাইয়ের মতো কালচে একটা আলোয় সারাটা দিন ছেয়ে থাকল কোলনের আকাশ।

তখন ফেব্রুয়ারির শেষ অথবা মার্চের শুরু। মনে আছে, সেই বছরটাকে শীতে পেয়ে বসেছিল। ঠান্ডাটা শেষ হচ্ছিল না কিছুতেই। শীতের তীক্ষ্ণ থাবার নিচে গুটিশুটি মেরে, ভয়ে কুঁকড়ে ছিল গোটা শহর। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহেও, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই, ন্যাড়া গাছগুলোর মাথায় হুপ করে নেমে আসত অন্ধকার, গহিন জঙ্গলের ভেতর থেকে যেভাবে বেরিয়ে আসে হিংস্র বাঘ। রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচল তেমন একটা চোখে পড়ত না। একটু উষ্ণতার জন্য সবাই সেঁধিয়ে যেত ঘরের ভেতর। পথচারীরাও জবুথবু, তাদের গতি শ্লথ, শামুকের মতো। প্রাণে উচ্ছ্বাস নেই, চোখ মলিন। বাড়িগুলোর ছাদের এক কোনায় চিমনি দিয়ে অনবরত ধোঁয়া বের হতো, কারখানার মতো। বাসগুলো প্রায়শই থাকত ফাঁকা, চালকেরা ঝিমুত, শহরের মানুষগুলো মাঝেমধ্যে এমনভাবে ছুটত যে মনে হতো এদের জুতার নিচে চাকা লাগানো।

সন্ধ্যার পরেও এই শহরের কিছু কিছু জায়গায় মানুষজন দেখা যেত। কিছু মানুষ পাবের ভেতর জড়ো হয়ে হইহল্লা করত আর কিছু মানুষ অপেক্ষায় থাকত ট্রামের স্টেশনগুলোতে। হাল্টস্টেলের কোনায় কোনায় যাত্রীরা অসুস্থ মানুষের মতো কুঁজো হয়ে বসে থাকত। উবানটা যখন হুঁশ হুঁশ করে স্টেশনের ভেতর এসে ঢুকত, তখনই তারা নড়েচড়ে উঠত। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারত ঢুকে যেত সাপের মতো লম্বা যানটার ভেতর। শীতকালে ট্রামের চালকদের হামলেনের

বাঁশিওয়ালার মতো মনে হতো। এরা শীতের উৎপাত থেকে মানুষদের তুলে নিয়ে পৌঁছে দিত উষ্ণ বাড়িঘরের ভেতর। যেমন ইঁদুরগুলোকে সে ওভারকোটের পকেট, রান্নার হাড়ি, আলুর বস্তা আর উকিলের ফাইল থেকে বের করে এনেছিল।

কিছুক্ষণ আগে এরকমই এক বাঁশিওয়ালা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে এবার্টপ্লাৎসে, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বাল্টহাসার স্ট্রাসে।

ফ্রাউ বাওয়ার বসেছিলেন কিচেনের দরজার কাছে, কাঠের গোল টেবিলটায়। তার ঠোঁটের কোনায় সিগারেটের আলো জ্বলছে, নিভছে। টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুলকিটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার ওপারে ছিল তীব্র অন্ধকার, সেখানে দেখা যায় না কিছু।

তার পরনে ছিল ডয়েচে পোস্টের হালকা নীল শার্ট। হলুদ জ্যাকেটটা খুলে ঝুলিয়ে দিয়েছেন চেয়ারের পেছনে। গলার ফিতাটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের হয়ে নিচের দিকে ঝুলছে, তার মাথায় চাবির গোছাটা, ওখানে একটা মাস্টার কী বাঁধা যা দিয়ে পিওনিয়ার স্ট্রাসের সবকটা বাড়ির মূল দরজা খোলা যায়। গলার কাছে টাইটা শিথিল করা এবং কণ্ঠার কাছে শার্টের বোতামটা খোলা। গাঢ় নীল স্কার্টের নিচে গমের রঙের মতো দুটো পা। হালকা বাদামি রঙের স্টকিংস ত্বকের সঙ্গে মিশে আছে, বোঝা যায় না ওর পা নগ্ন কি না। দুই পায়ের গোড়ালি হিল জুতার ভেতর থেকে বাইরে বের করা। শুধু আঙুলগুলো ছিল ভেতরে।

তিনি হয়ত অফিস থেকে ফিরেছেন। তাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছিল।

আমি গিয়ে বসলাম ওর মুখোমুখি। টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খেলছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার। বা হাতের কয়েকটা আঙুলে ধরে সেটাকে বসাচ্ছিলেন, শোওয়াচ্ছিলেন, দাঁড় করাচ্ছিলেন, আবার ঘুরাচ্ছিলেন, চরকার মতো। তিনি কি অস্থির ছিলেন, নাকি আমার ওপর রেগে ছিলেন, বোঝার উপায় ছিল না। ওই মঙ্গলবারের পর তার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো দেখা হলো আজ। মাঝখানে আরও একবার দেখা হয়েছিল কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ছিল না। তখন নিজেদের কোনো বিষয়ে কথা হয়নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফ্রাউ বাওয়ার সেদিন শুধু তার পেশাগত ভূমিকাই পালন করেছেন।

আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন তিনি আমার সঙ্গে চিৎকার করেছিলেন। আমার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড় সম্পর্কেও তাকে কিছু বলতে চেয়েছিলাম সেদিন। জানাতে চেয়েছিলাম, মৃত্যুকে ডজ দিয়ে কীভাবে আমি আবার জীবনের কাছে ফিরে এসেছি, সেই কাহিনি। এসব কথা কেন তাকে বলতে চেয়েছিলাম, জানি না। সহানুভূতি বা করুণা পেতে, নাকি সেদিন তার সামনে থেকে পালিয়ে আসার পর আমার ভেতরে জন্ম নেওয়া অপরাধবোধ ধুয়ে-মুছে ফেলার জন্য ? নাকি ওই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ? ১২ নম্বর ট্রামের ভয়ংকর

ওই অভিজ্ঞতার কথা বলতেই আমি আবার বাল্টহাসার স্ট্রাসে গিয়েছিলাম কি না, জানি না। তবে এটা জানতাম যে তার কাছে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো গন্তব্য ছিল না।

ফ্রাউ বাওয়ার এসব ঘটনার কিছুই জানতেন না। জানলে তিনি যেভাবেই হোক আমাকে দেখতে যেতেন, হাসপাতালে অথবা আমাদের বাড়িতে। শহরের কাগজগুলোতে খবরটা বেরিয়েছিল ঠিকই কিন্তু রিপোর্টে আমার নাম-ঠিকানা গোপন রাখা হয়েছিল, নিরাপত্তার কথা ভেবে। আমার মনে হয় না, এই খবর তার চোখে পড়েছে বা পড়লেও আহত ওই ছেলেটা যে আমি, তা তিনি ধরতে পেরেছিলেন।

একটা ক্যোল্‌শ এবং বিয়ারের দুটো গ্লাস এনে রাখলেন টেবিলের ওপর। তখন আমরা বিনিময় করি। ডয়েচে পোস্টের প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি শুধু ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন। এই হাসির কোনো অর্থ ছিল না। তার এই আচরণের প্রতিবাদে আমি টেবিল থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম ব্যালকনিতে। কনকনে একটা ঠান্ডা হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরের ভেতর, চেপে ধরল আমার শরীর। সাধারণত বছরের এই সময়ে শীত যাই যাই করে। অন্তত গত দুই বছর সেরকম হয়েছে। তখন রাস্তার দুই পাশের গাছগুলো চেরি ব্লসমে ছেয়ে গিয়ে রাস্তাটাকে দেখায় গোলাপি ফিতার মতো। অথচ এবার গাছগুলো এখনো রিক্ত-জীর্ণ। এবারের ঠান্ডাটা মনে হয় আরও কিছু দিন থাকবে।

সামনের বাড়িগুলোতে নানা রকমের আলো জ্বলছে। কোনো জানালায় হালকা আবার কোনো জানালায় তীব্র। একটা ঘরে টেলিভিশনের লাল-নীল-সবুজ আলো দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকানোর মতো আলোটা কখনো বাড়ছে, কখনো হারিয়ে যাচ্ছে। যে বাড়ির বারান্দা লাল লাল ফুলে ছেয়ে ছিল, সেখানে কুয়ার মতো গভীর অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ল শীলার কথা। দড়ির মাথায় বাঁধা বালতিটা ছেড়ে দিলে সেটা যেভাবে হু হু করে ভেতরে পড়তে থাকে,আমিও তখন সেভাবে একটা গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। কী করছে এখন শীলা ! এতক্ষণে নিশ্চয়ই ও শ্বশুর বাড়ি পৌঁছে গেছে, সূচনা হয়ে গেছে ওর জীবনের আরও একটা অধ্যায়ের। শীলার জীবনের বাকি কাহিনিটা তৈরি হবে ওই বাড়িটাকে ঘিরে, যেখানে আসিফের কোনো নাম নেই, গন্ধ নেই।

শীলাকে আমিও ভুলে যেতে চাই, ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে চাই শীলার সঙ্গে আমার সব স্মৃতি। আমি ওকে পেছনে ফেলে আসতে চাই। হুইসেল বাজিয়ে কোনো জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেলে যেমন একটা শহর পেছনে হারিয়ে যায়, সেরকম। নাকটা ওপরে তুলে কোনো বিমান যখন আকাশে পাখা মেলে, তখন নিচের ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, গাড়ি ও গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি, উঁচু উঁচু টাওয়ার আর

ছাদে ডিশ বসানো বহুতল দালানগুলো যেমন ম্যাচ বক্সের মতো ছোট হতে হতে একসময় কোথাও মিলিয়ে যায়, আমি চাই তেমনি হারিয়ে যাক শীলাও। গাছগুলো, বাড়িগুলো সেখানে আছে, পাইলট জানে, জানে যাত্রীরাও, রানওয়েতে নামলেই সেসব আবার দৃশ্যমান হবে, তেমনি শীলাও থাকুক, কিন্তু আমার জীবন আমি আর ঢাকায় ফেরাব না।

চারতলার হাওয়া, রাতের কালো আকাশ, ফ্রাউ বাওয়ারের নীরবতা আর শীলার অন্য জীবন- হিংস্র একটা ঠান্ডা এসে খামচে ধরল আমাকে। মনে হচ্ছিল ভেতরের হাড়গুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠছে, জমে যাচ্ছে শরীরের ভেতরে বয়ে চলা উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। আধখাওয়া সিগারেটটা ছেড়ে দিলাম আঙুলের ফাঁক থেকে। ধুমকেতুর মতো সেটা একসময় মিলিয়ে গেল নিচের অন্ধকারে।

ঘরের ভেতর ফিরে এলাম আমি। দাঁড়ালাম ক্লদ মোনের ছবিটার সামনে। পরমতলার ছোট্ট সেই বিলের মতো দেখতে। শাপলা ফুলের মতো একটা পাতা জলের ওপরে ভেসে আছে। পাতাটা শীলার মুখের মতো। আচ্ছা, পৃথিবীর সব জলাধার, সব কটা পুকুর-বিল-সমুদ্র-খাল, জলের ওপর ভেজা ভেজা পদ্মপাতা সব কি দেখতে ঠিক এই একই রকমের হয় ! কেন হয় কে জানে !

কোনো শব্দ ছিল না ঘরে। বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে একসময় থেমে গেছে বেটোফেনও। একটা কথাও বললেন না ফ্রাউ বাওয়ার। টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন তিনি। ব্যালকনির দরজাটা ওপরের দিকে একটু হা করে খুলে দিলেন, যাতে বেরিয়ে যেতে পারে সিগারেটের ধোঁয়া। ঠান্ডা বাতাসের একটা হলকা আবার এসে ঢুকল ঘরের ভেতর। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভেতরটা যে এতক্ষণ কুয়াশার মতো ঘোলাটে হয়েছিল ঠান্ডা ও ফ্রেশ বাতাসে, সেটা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

নীরবতা ভাঙলাম আমি। ফ্রাউ বাওয়ার কোনো শব্দ করলেন না কিন্তু চোখ তুলে তাকালেন। শীলার পাঠানো চিঠির খাম থেকে স্ট্যাম্পগুলো আলগোছে তুলে ওর জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। চারটা স্ট্যাম্প। একটায় কাঁঠাল, একটায় মাস্টারদা সূর্য সেন আর বাকি দুটোয় ছিল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি।

ডাক টিকেটগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ফ্রাউ বাওয়ার। কাঁঠালের ছবিটা যখন দেখলেন, কপাল কুঁচকে গেল তার। নাকের কাছে ধরে গন্ধও শুঁকলেন তিনি। আমি অপেক্ষা করছিলাম, ফ্রাউ বাওয়ার কখন আমাকে প্রশ্নগুলো করেন, তার জন্য। প্রশ্নের পর প্রশ্ন–এক. কেন আমি সেদিন ওর বাড়ি থেকে এভাবে পালিয়ে গিয়েছিলাম... দুই, কেন সেদিন দৃষ্টি দিয়েছিলাম ওর নগ্নতার দিকে...তিন, এত দিন পরে কেন গেলাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে...চার, বাদাম ক্র্যাকারটা কোথায়..কেন আর ফিরিয়ে দেইনি...এরকম আরও কিছু প্রশ্ন।

এসবের একটার উত্তরও আমার মুখে ছিল না। ছিল না মগজে কিংবা মনেও। কিন্তু ছিল ওই প্রশ্নটা–কেন তিনি চিৎকার করেছিলেন ?

তারপর আমি ওকে ট্রামের ঘটনাটা বললাম। যখন বলছিলাম, কাহিনিটা গল্পের মতো শোনাল। সেই রাতে সোলস্টোক গ্যোরটেলে ট্রামের জন্য অপেক্ষা, এখান থেকে কাহিনির শুরু আর গল্পটা ওই জায়গায় গিয়ে শেষ হলো, যেখানে ফ্রাউ বাওয়ার পিওনিয়ার স্ট্রাসেতে চিঠি বিলি করতে গিয়েছিলেন।

ফ্রাউ বাওয়ার তারপর কিচেনে গেলেন। মাইক্রোওয়েভে কিছু একটা গরম করার শব্দ হলো। যখন ফিরে এলেন, তখন তার গলায় টাইটা ছিল না, ওপরের দিকে কয়েকটা বোতাম খোলা ছিল, দ্বিতীয় বোতামটার নিচে ছিল কালচে খয়েরি রঙের একটা আঁচিল। আকাশি শার্টের অর্ধেকটা ছিল কোমরের কাছে, গাঢ় নীল রঙের স্কার্টের ভেতর, আর বাকিটা ঝুলছিল বাইরে, বেল্টের ওপরে।

কেউ একজন ফোন করল। ফ্রাউ বাওয়ার তাকে বলল, ঘোড়াটাকে ডাক্তার দেখাতে। তারপর ইয়া ইয়া, গেনাও করে কয়েকবার মাথাও নাড়ল। বলল, ছুটি পেলেই নাকি সে যেতে পারবে এবং আগামীকাল সে ছুটির জন্য আবেদন করবে। ছুটি না পেলে সে নাকি চাকরিটাও ছেড়ে দেবে। তারপর সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তখন সে বকের মতো একপায়ে দাঁড়ানো। বাম পা-টা মেঝেতে আর ডান পা-টা বাম পায়ের পেছনে ছোট্ট একটা টুলের ওপর, ও কয়েকবার পা বদল করল। মনে হলো ফোনের ওপাশে কেউ কাঁদছিল। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিল ফ্রাউ বাওয়ার। কান ও ঘাড়ের মাঝখানে রিসিভারটা চেপে ধরে ডান হাতে খুলে ফেলল মাথার ক্লিপ। তারপর যখন ঝাঁকুনি দিল রেশমের মতো চুলগুলো ছড়ছড় করে আছড়ে পড়ল ঝরনার মতো। কিছু চুল ছড়িয়ে পড়ল সামনে আর কিছু পড়ল কাঁধের এপাশে, পিঠের ওপরে।

আমার স্মৃতিতে ফ্রাউ বাওয়ারের এই ছবিটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে।

টেলিফোনটা রেখে একটা প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে এল ফ্রাউ বাওয়ার। সাদা চিনামাটির বাসন। তার কিনার ঘেঁষে গোল করে স্পাগেটি, পিতসা, রাইস এসব লেখা। প্লেটের মাঝখানে আঙুলের সমান দুটো সসেজ, কয়েক টুকরা শসা আর গাজর, ছোট্ট একটা বাটিতে সামান্য কেচাপ আর দুই গ্লাসে ফেনা উপচানো বিয়ার।

খাওয়া শেষ হলে কয়েকটা ঘটনা ঘটল বাল্টহাসার স্ট্রাসের এই বাড়িতে, খুব দ্রুত। ফ্রাউ বাওয়ার তলপেটের কাছে আমার কাটা জায়গাটা দেখতে চাইলেন। আমি সাবধানে দেখালাম। হাত দিয়ে তিনি স্পর্শ করলেন সেখানে। কেঁপে উঠলাম আমি। তারপর দুই হাতে ধরে টেনে টেনে বিছানায় নিয়ে বসালেন আমাকে। পা দুটো উঠিয়ে দিলেন আলগোছে। তিনিও বসলেন সেখানে। মুখোমুখি। পদ্মাসনে। আমার চিবুক ধরে ফিসফিস করে ডাকলেন, 'এই ছেলে।' তারপর হাত দুটো ওপরে তুলে একটানে খুলে ফেললেন জামাটা।

সত্যি কথা বলতে কি, পরের মিনিট দশেকের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেল, তার কোনোটার ওপরেই আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই বাড়ির চারতলায় ফ্রাউ বাওয়ারই আমাকে চালিত করেন। আমাকে যা করতে বলা হয়, আমি তা করি, যা করতে না করা হয়, সেটা করি না। এটা একটা খেলাঘর। ফ্রাউ বাওয়ারের কাছে আমি একটা পাপেট। আমার হাত-পা-আঙুল সুতা দিয়ে ফ্রাউ বাওয়ারের আঙুলে বাঁধা। সেগুলো নেড়েচেড়ে তিনি খেলা দেখান অথবা খেলেন।

তারপর...তারপর নতুন এক ফ্রাউ বাওয়ারকে আবিষ্কার করলাম আমি। আমার জীবনের এ এক নতুন অধ্যায়। নতুন ভাইরাসে নতুন অসুখ। কোনো একসময় আমার ওপরে সওয়ার হলেন ফ্রাউ বাওয়ার। চোখ বন্ধ করে মাথাটা ফেলে দিলেন পেছনে। চুলগুলো ঝুলতে লাগল পিঠের ওপাশে, বারান্দায় ঝুলন্ত টব থেকে যেভাবে ঝুলতে থাকে মানিপ্ল্যান্টের লতা।

ফ্রাউ বাওয়ারের দুই হাত আমার বুকের ওপরে। আমাকে খামচে ধরল ওর ধারালো নখ। কয়েকবার 'আমার ঘোড়া আমার ঘোড়া' বলে ককিয়ে উঠলেন তিনি। কখনো মনে হলো এটা তার সুখের প্রকাশ, আবার কখনো মনে হলো একটু আগে তিনি যে ঘোড়ার কথা বলছিলেন, এটা ছিল তার জন্য শোকগাথা।

যতক্ষণ না আমি নিথর হলাম, তিনি বসে রইলেন আমার ওপর, তাকিয়ে রইলেন চোখ বরাবর। একসময় চোখ বন্ধ করে, কপাল কুঁচকে নিজেকে ধরে রাখতে চাইলাম আমি এবং তখনই এত জোরে শীৎকার দিয়ে উঠলাম যে ফ্রাউ বাওয়ার তার এক হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরেছিলেন।

তারপর আমরা শুয়ে রইলাম পাশাপাশি। কখনো তার মাথাটা আমার বাহুর ওপর, আমার চিবুক ওর চুলের ভেতর, কখনো আমার বাম হাত ওর গলার নিচে, ডান হাত স্তনের ওপর, আমার মুখ ওর তলপেটের কাছে, ওর পা পেঁচানো আমার কোমরে। কখনো ও, কখনো আমি, আবার কখনো চার হাত চার পা দিয়ে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছি। আমি গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিয়েছি, ফ্রাউ বাওয়ার পায়ের আঙুলে সেটা ছুড়ে ফেলেছে।

একসময় আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল ফ্রাউ বাওয়ার। ঝড়ের পর যেমন শান্ত হয়ে আসে পুকুরের পানি, সেরকম শান্ত-নির্মল ওর মুখ, স্নিগ্ধ কোমল ওর নগ্ন শরীর। কখন যেন ও কাঁদছিলও। জলের স্পষ্ট ছাপ ওর গালে। চোখের কোণ থেকে নাকের কাছ পর্যন্ত ছিল শুকনো জলের রেখা।

ঘুম ভাঙলে ফ্রাউ বাওয়ার আমাকে নিয়ে গেল বাথরুমে। বলল, 'এই ছেলে, চলো, ধুইয়ে দিই তোমাকে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ছেলে না, এই ঘোড়া ?'

আমার দিকে খুব শীতের মতো ঠান্ডা চোখ তুলে তাকাল ফ্রাউ বাওয়ার।

ঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করলাম আমরা দুজন। তারপর বাথটাবের কুসুম গরম পানিতে তিনি ডুবিয়ে দিলেন আমাকে। সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে ধুয়ে দিলেন আমার শরীর। চুলে শ্যাম্পু করে দিলেন। তখন ফেনা ছুড়ে দিলাম ফ্রাউ বাওয়ারের মুখে। চোখ বন্ধ রেখে শিশুর মতো খলবল করে হাসতে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, ওর শরীর ধুয়ে দিতে। ঘাড় থেকে কোমর, জঙ্ঘা থেকে পায়ের পাতায় সাবান ঘষে দিলাম আমি। বুকের আঁচিলটায় যখন ঘষছিলাম, ফ্রাউ বাওয়ার মাথা উঁচু করে তাকালেন। চোখের হাসি আমার বুকে গুচ্ছ বোমার মতো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই ছেলে, এটা তো সাবানে উঠবে না।'

ওকে ধরতে পারছিলাম না আমি। ও ধরতে পারছিল না আমাকে। আমরা পিছলে যাচ্ছিলাম একে অপরের বাহুর ভেতর। মনে হচ্ছিল আমরা দুজন সাবান দিয়ে বানানো দুই নগ্ন শরীর।

তারপর ঝরনার তুমুল জলে, সাঁতার কাটতে কাটতে, শরীরে সাবানের শেষ বিন্দু ফেনা মুছে ফেলার আগে, ফ্রাউ বাওয়ার আরও একবার ঘোড়া বানালেন আমাকে। সেই ঘোড়া দাবড়ে বেড়াল সাবানের সমুদ্রে। ফ্রাউ বাওয়ার যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন, তখন গির্জার ঘণ্টাটা শনিবারকে স্বাগত জানাচ্ছে।

আমাদের জলকেলি

এরপর থেকে ফ্রাউ বাওয়ারের বাসায় আমি খুব ঘন ঘন যাওয়া-আসা শুরু করি। কিসের টানে যেতাম, নিজের কাছেই সেটা খুব বেশি পরিষ্কার ছিল না। হতে পারে শরীর, তাহলে কি যেতাম ঘোড়া হতে ? হতে পারে প্রেম, তাহলে কি শীলা মুছে গেছে ? অথবা হতে পারে অন্য কোনো কিছু। এত দিন আমি সেটা স্বীকার করিনি। তবে এখন মনে হয় বাল্টহাসার স্ট্রাসের ওই বাড়িটাতে ছুটে যাওয়ার জন্য সেখানে কিছু একটা ছিল। কিন্তু কী ছিল ?

শীতের সময় অরণ্যে গেলে প্রথম দিকে যেমন সেটাকে খালি খালি মনে হয়, আমার কাছে বাল্টহাসার স্ট্রাসে যাওয়াটাও ছিল সেরকম। শুরুতে বনের ভেতরে শুধু পায়ে চলার সরু একটা রাস্তা, সেটা চলে গেছে ভেতরের দিকে। রাস্তার দুই পাশে উঁচু উঁচু গাছপালা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আকাশের দিকে উঠে গেছে সারি সারি গাছ। তার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে আসে সূর্যের আলো। নিচে শুকনো পাতার ওপর শাদা বরফ, জংলি ফুল কিংবা অপরিচিত লতাগুল্ম। কিন্তু একটু একটু করে ভেতরে গেলে দেখা যাবে, রাস্তাটা কোথাও মিলিয়ে গেছে। ওপাশে গা ছমছম করা রহস্যময় অচেনা এক জগৎ। আরও একটু গহিনে চোখে পড়বে একটা কোকিল, নরম আলোতে লেজ নাড়ছে। কোথাও একটু ঝরনার মতো, ছোট্ট একটা ছড়া। অথবা হরিণের পায়ের শব্দ।

ফ্রাউ বাওয়ারের বাড়িতে যাওয়াও ছিল এই অরণ্যে যাওয়ার মতো। প্রথমে মনে হয়েছিল রাস্তার পাশে শুধুই একটা দালান, একটা দরজা, কয়েকটা জানালা, এদিকে-সেদিকে কয়েকটা ঘর, একটা ব্যালকনি ও কিচেন আর কিছু চেয়ার-টেবিল, যাকে ঘিরে শুধু একজন মানুষের জীবন ও বসবাস। একজন ডাকপিওনের দিন ও রাত। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে চোখে পড়ল আরও কিছু মানুষ। প্রথমে দেখেছিলাম নার্সের পোশাক পরিহিত অপরূপ এক তরুণীকে। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল, চকচক করে জ্বলছে, চোখগুলো গাঢ় সবুজ, বসন্তে যেমন সবুজ গাছের কচি পাতা, অথবা দূষণহীন সমুদ্রের পানি যতটা সহতে পারে, চোখগুলো ঠিক ততটাই সবুজ। তারপর দেখলাম ছোট্ট একটা ভিলা, সেই ভিলার সামনে রঙিন

স্কার্ট পরে গমের ক্ষেতের মধ্যে ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার পেছনে একটা বিশাল ট্রাক্টর। তারপর চোখে পড়ল সেই নার্সকে ঘিরে বাড়ন্ত কয়েকটি শিশু আর একজন পুরুষ। তার মাথায় খড়ের তৈরি বিশাল একটা টুপি, রোদের আলো থেকে চোখ দুটো আড়াল করে রেখেছে।

এই মানুষগুলো আর ভিলাটা ছিল বড় একটা অ্যালবামের ভেতর। ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত কিছু বাড়িঘর। হাতে লেখা কিছু চিঠি। পুরনো কিছু কাপড়। একদিন দেখলাম, একটা ক্ষয়ে যাওয়া ডায়েরি। ডায়েরির পাতায় পাতায় যুদ্ধের কাহিনি। বুকশেল্ফজুড়ে বেশ কয়েকটা মোটা মোটা ফাইল। একেকটা ফাইলের গায়ে গাঢ় নীল কালিতে লেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেকটা বন্দিশিবিরের নাম–স্পান্ডাউ, আউশভিৎস, জাকসেনহাউজেন, বিরকেনাউ...সেখানে বেশ কিছু নামের তালিকা। এর মধ্যে কয়েকটা নাম আমার এখনো মনে আছে। হেরমান গ্যুয়েরিং, আডল্ফ আইখমান, রুডল্ফ হেস, হেরমান ব্রাউনস্টাইনার, কার্ল ইউসেফ জিলবারবাওয়ার এবং আরিবের্ট হাইম, এই নামটার পাশে দুটো ব্র্যাকেট দিয়ে তার ভেতরে লেখা ছিল ডক্টর ডেথ।

গ্যুয়েরিং এর পাশে লেখা ছিল লুফ্‌টভাফে, বিমান বাহিনীর কমান্ডার, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসির আগের রাতে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা, ১৯৪৬। তার পাশে লাল কালিতে ক্রস চিহ্ন দেওয়া। রুডল্ফ হেস, শীর্ষ নাৎসি নেতা, হিটলারের সহকারী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, স্পান্ডাউ জেলে আত্মহত্যা, গলায় বিদ্যুতের তার জড়িয়ে, ১৯৮৭। তার পাশেও লাল কালির ক্রস আঁকা। আর সবুজ কালিতে টিকচিহ্ন দেওয়া ছিল জিলবারবাওয়ারের পাশে। সেখানে কোনো শাস্তির কথা লেখা ছিল না। আরিবের্ট হাইমের পাশে লেখা ছিল ব্রাজিল, কায়রো, স্পেন তারপর অনেকগুলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

আমি যখন বাল্টহাসার স্ট্রাসের এই বাড়ির চারতলায় যেতাম, তখন যে ছবিটা ওখানে প্রায়শই দেখতে পেতাম, তাহলো ফ্রাউ বাওয়ার এই ফাইলগুলোকে চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তার মাঝখানে বসে আছেন। তার কোলের ওপরে থাকত ডায়েরিটা। তিনি কী যেন খুঁজতেন ওখানে। মনে হতো, কিছু একটা মেলাতে চাইছেন। ফাইলগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে কখনো কখনো অস্থির হয়ে যেতেন ফ্রাউ বাওয়ার।

ফাইলগুলোর ভেতর ছিল নানা ধরনের কাগজ–পেপার কাটিং, হাতে লেখা ঠিকানা, টাইপ করা দলিল দস্তাবেজ, ছবি, ম্যাপ আরও কত কি ! কোনো কোনো কাগজ ছিল খুবই পুরনো, লেখাগুলো প্রায় মুছে যাচ্ছে, কাগজগুলো হলুদ, আঁশ উঠে উঠে টিস্যু পেপারের মতো নরম, স্ট্যাপলার পিনের মরচেও ছড়িয়ে পড়ছে কাগজের চারপাশে। আবার ছিল একেবারে আনকোরা নতুন কাগজও। আমি

দেখেছি এই কাগজগুলোর সঙ্গে সব সময় নতুন কিছু যোগ হতো। আর থাকত লাল-নীল কালিতে বিস্তর আঁকিবুঁকি।

এই কাজ তিনি করতেন তার শোয়ার ঘরে, মেঝের ওপরে বসে। তখন হালকা একটা আলো জ্বলত পড়ার টেবিলে, সেই আলো ছড়িয়ে থাকত কার্পেটের মেঝেতে। খুব কম সময়ই আমি সেখানে গিয়েছি বা যেতে পেরেছি। আমার কাছে ওটা ছিল নিষিদ্ধ একটা জগতের মতো, যখন তার বাসায় যেতাম, দরজাটা ভিড়িয়ে তিনি চলে আসতেন বসার ঘরে। ফাইলগুলো যেভাবে ছিল, সেভাবেই পড়ে থাকত। ওসবের ধারেকাছে গেলে তিনি চিৎকার করে উঠতেন। ফ্রাউ বাওয়ার চাইতেন না, আমি এসব স্পর্শ করি বা এগুলো নেড়ে চেড়ে দেখি। ফাইলগুলোও আমার কাছে ছিল নিষিদ্ধ জিনিস। ফ্রাউ বাওয়ারের চোখ এড়িয়ে বেশ কয়েকবারই আমি এসব জগতে অনুপ্রবেশ করেছি।

ফ্রাউ বাওয়ারের বাড়িতে যাওয়ার কথা আমি কাউকে বলিনি। রফিক ওর মায়ের মৃত্যুর পর কথা বলত খুব কম। যেহেতু ও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, আমরাও তার সামনে হাসিঠাট্টা করতে ভয় পেতাম। ওকে দেখলে আমরা চুপ হয়ে যেতাম। ওর উপস্থিতি এখন আমাদের বাবা-মায়ের কথা মনে করিয়ে দিতে শুরু করল। ৩০০/এ নাখালপাড়ায় ছিল আমার অধ্যাপক আব্বা, গৃহিণী আম্মা আর কলেজ পড়ুয়া একটা ভাই ও বোন। আব্বার কথাই মনে পড়ত বেশি। আম্মা ছিলেন আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী। আমি যখন পাঁচ বছরের শিশু, তখন আমার মা মারা যান। মায়ের মুখটা আমার মনে নেই। পরে ছবি দেখে দেখে জেনেছি তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। আমার কাছে আমার মা ছিলেন দেড় বাই এক ফুটের একটা ফ্রেমে বাঁধানো একজন মহিলা।

বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাথটাবে ঘোড়াস্নানের পর বদলে যেতে শুরু করল আমার জীবন। আমূল বদলে গেল প্রাত্যহিক রুটিন। আমি পুরোপুরি সুস্থ হইনি এখনো, ডাক্তারও কাজে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন, অথচ মালিকের কাছে প্রেসক্রিপশন গোপন করে প্রতিদিনই কাজে যেতে লাগলাম। আর সন্ধের পর বাড়ি না ফিরে সোজা চলে যেতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসের চারতলায়। প্রথমে বসার ঘরে, তারপর ওর বিছানায় আর সবশেষে বাথটাবে, ঝরনার নিচে।

ফ্রাউ বাওয়ারের যেদিন সকালে ডিউটি থাকত, আমি শিফ্‌ট চেঞ্জ করে অনেক সময় দুপুরের দিকে একটা ব্রেক নিয়ে আবার কারখানায় চলে যেতাম। তারপর ছুটি হলে সরাসরি চলে যেতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে। আমাদের যখন দেখা হতো, তখন সন্ধ্যা আর রাতের মাঝামাঝি একটা সময়। আর যদি বিকেলে ডিউটি থাকত, দুপুরের পরে যুগল স্নান সেরে আমি সন্ধের আগেই পৌঁছে যেতাম

পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িতে। কাজের দিনগুলোতে সময় মেলানোর এরকম একটা ঝামেলা ছিল কিন্তু ভোকেনেন্ডে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। ওই দুটো দিন, জামসটাগ ও জোনটাগ, বাথটাবের পানিটা থাকত খুব সুখকর, ফ্রাউ বাওয়ার থাকতেন উষ্ণতায় ভরা। আমার জন্য অপেক্ষা করতেন তিনি। তার কাছে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতাম আমি। বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে আমি দু-তিনবার ঘোড়া হতাম। তারপর যখন পিওনিয়ার স্ট্রাসে ফিরে আসতাম, তখন শরীরটা ফুরফুরে লাগত। আমি তখন উড়ছি উড়ছি। উড়তে উড়তেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম রাতের কোলে। ওরা ভাবত ওভারটাইম করে করে আমি ক্লান্ত ক্লান্ত এবং ক্লান্ত।

সন্ধ্যার অভিসারেও আমার স্নান করতে খারাপ লাগত না। ফ্রাউ বাওয়ার যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে গায়ে সাবান মেখে দিতেন, তার হাত থেকে চিঠির গন্ধ পেতাম। খামের ভেতরে করে কতশত দেশ থেকে আসা কত মানুষের গন্ধ। কালির গন্ধ, কাগজের আর স্ট্যাম্পের ওপরে মারা সিলের গন্ধ। ফোর সেভেন সেভেন ওয়ান সাবানের ফেনায় সেসব গন্ধ মুছে যেত। খামের ভেতর সুখ-দুঃখের যেসব খবর ভরে দেওয়া হতো, সেসবের অনুভূতিও টের পেতাম আমি, কল্পনায় দেখতে পেতাম প্রেরক ও প্রাপকের মুখ।

গোসলের সময় ফ্রাউ বাওয়ারকে একবার বলেছিলাম, আনন্দটা লাল স্ট্রবেরির মতো দেখতে আর কষ্টটা হচ্ছে নীল রাস্পবেরির মতো। হাসতে হাসতে বাথটাব থেকে তার পড়ে যাওয়ার মতো দশা হয়েছিল।

তার সংগ্রহে ছিল নানা রং ও গন্ধের সাবান। ডুশ জেলও ছিল কিন্তু সেসব কখনো ওকে লাগাতে দেখিনি। কোনো কোনো সাবানের পিঠ ছিল কচ্ছপের মতো উঁচু, কোনোটা ভাপা পিঠার মতো গোল ও ঝাঝড়া ঝাঝড়া, কোনোটা ইটের মতো চারকোনা আবার কোনোটা ছিল ওভাল, ডিমের কুসুমের মতো তার রং। খুব কায়দা করে সাবান ধরত ফ্রাউ বাওয়ার। কুলি করার সময় হাতের তালুতে যেভাবে পানি নেয় সেভাবে। চুম্বকের মতো সেটা ঝুলে থাকত তালুর ভেতর। সাবানটা দেখা যেত না কিন্তু তার পিচ্ছিল ছোঁয়া ছড়িয়ে পড়ত ভেজা শরীরে।

শুরুর দিকে আমি স্নান করতে চাইতাম না। ভালোবাসার পরেই আমি সেখান থেকে চলে আসতে চাইতাম। তবে গোসলের সব আয়োজন ছিল ফ্রাউ বাওয়ারের। বাথটাবের মুখ বন্ধ করে কল ছাড়ার সময় কয়েক ফোঁটা কী যে দিত, তারপর সারা পানিতে ছড়িয়ে পড়ত ফুলের গন্ধ। দরজার কাছে কাঠের একটা তাকে থরে থরে সাজানো থাকত এক রঙা তোয়ালে, ছিল ফুলতোলাও। ফ্রাউ বাওয়ার যে তোয়ালে দিয়ে বেশির ভাগ সময় আমার গা মুছত, তার গায়ে ছিল হলুদ হলুদ ফুলের ছবি, ডালিয়ার মতো।

গোসলের পুরোটা শেষ হতে অনেক সময় লাগত। কত যে আয়োজন ছিল ওর। কখনো কখনো নিভিয়ে দিত সবকটা আলো, বেসিনের এক কোনায় মিটমিট করে জ্বলত ছোট ছোট মোমবাতি। তার নরোম আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ত বাথটাবের পানিতেও।

বাথটাবে আমাকে উঠিয়ে দিত আগে, তারপর আসত ও। সেখানে শুয়ে শুয়ে গল্প করতাম আমরা। আধা বসে আর আধা শুয়ে আমরা থাকতাম মুখোমুখি। ওর গলা পর্যন্ত ডুবে থাকত পানিতে আর আমার দুই পা ছড়ানো থাকত ওর কোমরের দুই পাশে। তারপর ও উঠে আসত, আমার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে থাকত, জানতে চাইত আমার ফেলে আসা জীবনের কথা, কেন ফেলে এসেছি, শুনতে চাইত সেই কাহিনিও।

তারপর কোনো একসময় আমরা দাঁড়াতাম বাথটাবে। হাঁটু ছুঁয়ে থাকত কুসুম গরম জল। আমরা সাবান মাখতাম আমাদের গায়ে। আমি ওর ও আমার। তারপর হঠাৎ ঘোড়া হয়ে যেতাম আমি। তুমুল বৃষ্টির মতো ঝরনার পানি যখন গায়ে এসে পড়ত, তখনই বুঝতাম শেষ হয়ে এসেছে আজকের জলকেলি।

বাথটাব থেকে আগে নামতেন ফ্রাউ বাওয়ার। তারপর ঢুকে যেতেন সাদা রঙের একটা শাওয়ার রোবের ভেতর। পাতলা একটা তোয়ালে দিয়ে খোপা করতেন চুলে। তারপর আমার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে বলতেন, 'এই ছেলে, নামো।'

তোয়ালেগুলো এতটাই ফ্রেশ আর ঝরঝরে ছিল যে তার আঁশগুলো ব্রাশের মতো গায়ে লাগত। তারপর ও লোশন মেখে দিত হাতে ও পায়ে, আঁচড়ে দিত চুল। তখন ও গুন গুন করে গান গাইত। চুল আঁচড়ানো শেষ হলে আমাকে জামাও পরাত ফ্রাউ বাওয়ার। আর সবশেষে কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে বলত, 'মাইন ফের্ড।'

আসলে আমি ওর ঘোড়া ছিলাম না, ছিলাম একটা পুতুল, অথবা ঘোড়াপুতুল।

মনে আছে, একটা পর্যায়ে এমন হয়ে উঠল যে এই স্নান ছাড়া আমাদের রদেভ্যু অপূর্ণ থেকে যেত। একসময় ওটা হয়ে উঠল রিচ্যুয়ালের মতো।

কারখানায় দিনের শেষে এরকম একটা মুহূর্ত একসময় আমার কাছে নেশা হয়ে দাঁড়াল। আমি দৌড়ে যেতাম সেই নেশার কাছে। দুই হাতে জড়িয়ে ধরতাম ওই নেশা। চাইতাম সর্বনাশা ওই নেশা অজগরের মতো গিলে খাক আমাকে। বাল্টহাসার স্ট্রাসের ওই বাথটাবে হোক আমার সলিলসমাধি।

ওখানে ওই কিছুটা সময় ভালোবাসার সাবান ধুয়ে মুছে নিয়ে যেত আমার সব অনিশ্চয়তা, রাগ-ক্ষোভ-ক্রোধ আর হাহাকার। সেখানে আসিফকে ডুবিয়ে আরও একটা দিনের জন্য সেলিমকে প্রস্তুত করতাম আমি। পরদিন সকালে সেলিম আবার কারখানায় যেত। আবার ওর শীলার কথা মনে পড়ত। মনে হতো, ফেলে আসা দেশের কথা। আব্বার কথা। ঢাকায় আম্মা ও ভাইবোনের কথা। মার কথা। তখন ও আবার আসিফ হয়ে যেত। তারপর আবার ছুটে যেত বাল্টহাসার স্ট্রাসে। ঝড় তুলত, তুফান উঠত, ফেনাময় পানিতে ওর সলিলসমাধি হতো। আবার সেলিম হয়ে ফিরে আসত পিওনিয়ার স্ট্রাসে। পিংপং বলের মতো এদিক-ওদিক ছুটতাম আমি। আমি তখন কখনো সেলিম আবার কখনো আসিফ। আসিফের স্মৃতিজুড়ে শুধু শীলা কিন্তু ফ্রাউ বাওয়ার ডুবে আছে সেলিমের শরীরে।

একসময় বাল্টহাসার স্ট্রাসে হয়ে উঠল আমার নিয়মিত গন্তব্য। তার একেবারে কেন্দ্রে ছিল স্নানের সেই মুহূর্ত। পিওনিয়ার ও বাল্টহাসার স্ট্রাসের মধ্যে এরকম আরও কয়েকটা মাস আমি দুলতে থাকলাম পেন্ডুলামের মতো।

পেছনে ফেলে আসি

আমার ফেলে আসা জীবনের কথা জানতে চাইতেন ফ্রাউ বাওয়ার, শুনতে চাইতেন আব্বা ও মায়ের কথা। মায়ের কথা তো অত মনে নেই, বলারও কিছু ছিল না, আব্বার যেসব কথা তার সবটাই ছিল আনুষ্ঠানিক ও প্রয়োজনের কথা। হ্যাঁ হুঁ অথবা না, ব্যস এটুকুই। ওকে আমি অনেক বেশি বলতে পারতাম শীলার কথা। কিন্তু শীলার কথা তো ওকে আমি কিছুই বলিনি। কী বলব ওকে ? শীলা আমার কে আর আমি ওর কী হই ? কীভাবে শুরু করব ওর কথা, শেষই বা করব কীভাবে ?

শীলাকে ভালোবাসার কথা আমি ফ্রাউ বাওয়ারকে বলতে চাইনি। বললে যদি ক্ষতি হয় ? যদি ওকে হারিয়ে ফেলি ? যদি আমাকে আর ঘোড়া না বানায় ? যদি শুকিয়ে যায় বাথটাবের পানি ! যদি হারিয়ে ফেলি বাল্টহাসার স্ট্রাসের ঠিকানা ? মনে আছে, একদিন স্নানের ঠিক আগে, দুপুরের দিকে, শীলার রুমালটা দেখিয়ে ফ্রাউ বাওয়ার একবার আমাকে বলেছিল, 'এই ছেলে, এটা তুমি কোথায় পেয়েছ ?'

আমি বলেছি, 'বাংলাদেশে।' ও বলল, 'এই ফুলগুলোর নাম কী ?' আমি বললাম, 'লাউ ফুল।' তারপর জানতে চাইল, 'কী লেখা কিনারে ?' উত্তর দিলাম, 'ভালোবাসি তোমাকে।' 'কাকে ভালোবাসা ?' আমি বললাম, 'আমাকে।' ওর প্রশ্ন, 'কার ভালোবাসা ?' মিথ্যা বললাম আমি, 'আমার মায়ের।'

এই রুমালটার কথা শুধু রুমানা জানত, আমার ছোট বোন, আমার অনেক গোপন অপরাধের সাক্ষী ছিল ও, আমার যেদিন ফ্লাইট তার আগের রাতে শীলার দেওয়া সবকিছু আমি তুলে দিয়েছিলাম রুমানার হাতে, ও কিছু বলেনি, শুধু প্যাকেটটার দিকে তাকিয়েছিল কয়েক সেকেন্ড, কিছু বলতে হয়নি আমাকেও, প্যাকেটের ভেতর ছিল সোনার একটা চেইন, নেইল কাটার, শীলার কয়েকটা ছবি, আর হয়ত কয়েক ডজন চিঠি।

শীলার দেওয়া দুটো জিনিস আমি নিয়ে এসেছিলাম বিদেশে। তার একটা এখনো আছে আমার পকেটে। ছোট্ট একটা চিরুনি। আজ কতগুলো বছর পার হয়ে গেল, হারিয়ে গেল শীলা, হারিয়েছি মাথার অনেক চুলও, কিন্তু অক্ষত রয়ে গেছে চিরুনিটা, তার একটা দাঁতও ভাঙেনি।

রিটা বলল, 'তাহলে রুমালটা তোমার মা দিয়েছিল।' আমি রইলাম চুপ হয়ে। আর মিথ্যে বলতে সাহস হলো না।

আমার মাকে আমি ভালোবাসি কিন্তু সেই ভালোবাসা কেমন, তা আমি কোনো দিন দেখিনি। প্রত্যেকটা জিনিসের, যেমন নদী ও পাহাড়ের, মেঘ ও বৃষ্টির, যেমন গ্রীষ্ম ও বসন্তের একটা ছবি থাকে, তেমনি দৃশ্যরূপ থাকে মায়া ও মমতার, সুখ ও কষ্টের, দুখ ও হাসির, আনন্দ ও বেদনার এবং ভালোবাসা ও ঘৃণার। কিন্তু মায়ের জন্য আমার যে ভালোবাসা, তার কোনো রূপক ছিল না। কোনো কিছু দিয়েই এই ভালোবাসাকে আমি বোঝাতে পারব না। শীলার জন্য ভালোবাসার ছবি আঁকতে বললে আমি আঁকব সালভাদার দালির গলিত ঘড়ির মতো আমার দ্রবীভূত হৃদয়, আব্বার জন্য ভালোবাসার ছবি হবে বিশাল একটা বটগাছের গাঢ় ছায়া, আর উত্তাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে টগবগ করে ছুটন্ত এক ঘোড়া হলো ফ্রাউ বাওয়ারের জন্য আমার প্রেমের প্রতীক ।

শৈশবের যেসব স্মৃতি এখনো আমার মনের মধ্যে সতেজ হয়ে আছে, তার একটা হলো মা আমাকে সকালে কীভাবে স্নান করাতেন, সেই ছবিটা। পুকুরের ঘাটে একটা গাছের গুড়ির ওপর বসিয়ে চড়-থাপ্পড় মেরে গোসল করাতেন তিনি। আমি কাঁদতাম কাঁদতাম কাঁদতাম আর মা আমার মাথায় অনবরত পানি ঢেলে যেতেন। আমার সেই কান্নার কারণ ছিল সাবানের ফেনা, না মায়ের সেই চড়, সেটা এখনো বুঝতে পারি না। শীতের সময় মা আমাকে বাড়ির সামনের উঠানে, যেখানে রোদ আসত, লেবু গাছটার কাছে, সেখানে বড় একটা প্লাস্টিকের ডালার মধ্যে বসিয়ে স্নান করাতেন। আমি খুশিতে পানি ছুড়ে মারতাম মায়ের চোখেমুখে, মাথায়। তার কালো কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে বিন্দু বিন্দু পানি শিশিরের মতো দেখাত। সূর্যের কিরণ লেগে সাবানের ওই ফেনায় চিকচিক করত রংধনু।

হঠাৎ একদিন সেই মায়ের লাশ আনা হলো বাড়ির উঠোনে। রক্তের একটা স্রোতের ওপর শুয়ে ছিলেন আমার মা, ওই লেবু গাছটার কাছে। মা মারা যাওয়ার পর আব্বা আমাকে গ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে আমার বাবা ও মা। আব্বা ছিলেন খুব চুপচাপ মানুষ। একটা কলেজে দর্শন পড়াতেন। সারাটা দিন তার কাটত কলেজে, তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। যখন বাড়িতে ফিরতেন, তখনো তিনি ডুবে থাকতেন বইয়ের ভুবনে। তার ছিল একটা পড়ার ঘর। ছোট্ট। আব্বার সঙ্গে আমার যেটুকু সময় দেখা হয়েছে, তার আশি শতাংশ হয়েছে ওই পড়ার ঘরে। তিনি বিশ্বাস করতেন, তার জীবন হচ্ছে চিন্তা, লেখা, পড়া ও পড়ানো।

আব্বার যুক্তি ছিল হলিডে আসবে-যাবে, একসময় মলিন হয়ে যাবে পুরনো কাপড়, ফুরিয়ে যাবে পানীয় কিন্তু চিন্তার মৃত্যু হবে না কখনো, চিন্তা অমর। সত্যি

কথা বলতে কি, আমাদের দর্শন ছিলেন তিনি কিন্তু আমরা কখনো আব্বার দর্শন হতে পারিনি।

আম্মা যখন কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নিয়ে আব্বার পড়ার ঘরে যেতেন, আমাদের নামে নালিশ করতেন, খোলা বইটাকে তিনি ভাঁজ করে রাখতেন কোলের ওপরে। বইটা রাখার একটা নিজস্ব কায়দা ছিল তার। চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে শুনতেন আম্মার কথা। আমার সন্দেহ হতো, তিনি তখন আম্মার কথা শুনতেন, না এই পরিবারের কথা ভাবতেন, নাকি ঘুরপাক খেতেন বইয়ের পাতাগুলোর ভেতর। আমার মনে হয় না, আব্বা কখনো মন দিয়ে আম্মার কথা শুনতেন। তিনি হু হা করে একটা কিছু বলে দিতেন। আর আম্মা এতেই ছিলেন খুশি।

কখনো কখনো ভাবতাম যে আমরা, এই পরিবারের সদস্যরা, আব্বার কাছে হয়ত ছিলাম তার ছাদ সমান উঁচু আলমারিতে সাজিয়ে রাখা বইগুলোর মতো। তিনি যেভাবে চাইতেন, আমরা সেভাবেই বেড়ে উঠতাম। বইগুলো যেভাবে গুছিয়ে রাখতেন, তেমনি সাজিয়ে রাখতেন আমাদেরও। বইয়ে যেমন করে মলাট দেয়, তেমনি করে তিনি আমাদের জামাকাপড় পরাতেন।

মায়ের কথা তিনি আমাকে ভুলতে দেননি আবার আমরা যে মাকে মনে রাখব, তার জন্য রাখেননি কোনো অভাবও। আব্বা আমাদের খাবার দিতেন, কাপড় দিতেন, পেন্সিল-খাতা ও শার্পনার কিনে দিতেন, অসুখ হলে নিয়ে যেতেন হাসপাতালে। এর সবটাই ছিল দায়িত্ব পালনের মতো। পিতার করণীয় বিষয়ে যদি কোনো গাইড বই থাকত, আমাদের আব্বা হতে পারতেন তার আদর্শ মডেল, বইয়ের সবচেয়ে মানানসই প্রচ্ছদ।

আমাদের প্রতি তার এই যে ভালোবাসা, আদর ও মায়া, স্নেহ ও প্রহরা, সেটা ছিল তার প্রিয় বইগুলোকে যত্নআত্তি করার মতো। বইয়ের মলাট যেমন পরিষ্কার করতে হয়, কোনো পাতা ছিঁড়ে গেলে জোড়া দিতে হয় আঠা লাগিয়ে, বর্ষার পরে বইগুলো মেলে ধরতে হয় রোদের তলায়, বারান্দায় অথবা ছাদে মাদুর বিছিয়ে, এখানে-ওখানে রাখতে হয় ন্যাপথলিন, বইয়ের ওপরে পড়ে থাকা ধুলোবালি ঝাড়তে হয়, তেলাপোকা, ইঁদুর আর উই পোকায় যাতে বইয়ের পাতা না খায়, সেজন্য যেমন লুকিয়ে লুকিয়ে আলমারির আনাচেকানাচে বিষ ছড়াতে হয়, তেমনি আব্বাও করতেন আমাদের জন্য। আব্বার পাশে আম্মা থাকতেন। মায়ের অভাব ভুলিয়ে দিতে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন তিনি।

আব্বা ও আম্মা, এরা দুজনেই আমাকে বড় করেছেন কিন্তু তারা কখনোই আমার জীবনের মূল প্রবাহ হয়ে উঠতে পারেননি।

আমি নিজেও কখনো আব্বার জীবনের মূল কেন্দ্র হতে চাইনি। হয়ত আব্বাও সেটা চাননি। তার নিস্পৃহ বইনির্ভর জীবন আমাকে কখনো তার দিকে টানেনি। আমার সব সময় মনে হয়েছে আমাদের এই পরিবার কখনোই দার্শনিক

এই লোকটার জীবন হতে পারেনি। সংসারটা ছিল তার ছবি আঁকার ক্যানভাস আর আমরা ছিলাম তার একেকটা খেয়ালি আঁচড়। আমরা ছিলাম তার শখের গ্রন্থ, ইচ্ছে হলে আলমারির তাক থেকে নামাতেন, পাতা উল্টাতেন, ঝাড়তেন-মুছতেন, প্রয়োজনে ঘুমানোর সময় রাখতেন বালিশের নিচে, আবার ফুরিয়ে গেলে বন্ধ করে তুলে রাখতেন আলগোছে।

একটা সময়ে তিনি চাইতে লাগলেন, আমি বিদেশে চলে যাই। তখন আমি সবে কলেজে উঠেছি, আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়েছি রাজনীতির জালে। ওই জাল যেমন আমাকে পেঁচিয়ে ধরছে, তেমনি আমি নিজেও আরও বেশি করে ঢুকে পড়েছি সেই জালের ভেতর। সুযোগ পেয়ে ওই জাল আমাকে পেঁচিয়ে ধরেছে অক্টোপাসের মতো। পরমতলার উঠোনে পড়ে থাকা রক্তাক্ত মায়ের স্মৃতিটাই আমাকে এই রাজনীতির দিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসছিল। প্রতিশোধের একটা জন্তু, আহত ব্যাঘ্রের মতো আমার বুকের ভেতর, গুহার মতো ঘর বানিয়ে, সেখানে গো ধরে বসেছিল, মাঝেমধ্যে গোপনে হুংকার দিয়ে উঠত ওই হিংস্র বাঘ। তারপর একসময় আমার পেছনে পুলিশ লাগল। ফেউ লাগল, লাগল টিকটিকি। তারপর মামলা হলো। ঝুলল হুলিয়া।

আব্বা সব বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন প্রতিশোধের একটা নেশা আমার রক্তের মধ্যে তখন আগ্নেয়গিরির লাভার মতো টগবগ করে ফুটছে। এই আগুন এখনই নেভাতে হবে এবং তার একটাই উপায় আর সেটা হলো দেশ থেকে পালানো, সবকিছু পেছনে ফেলে আমার অন্য কোথাও চলে যাওয়া।

আমি যেদিন চলে আসি, অনেক রাতে ফ্লাইট ছিল আমার, সেদিন রাতের খাবার আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেয়েছিলাম। সেই সময়টার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেটা ছিল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির দ্য লাস্ট সাপারের মতো। আব্বা, আমরা তিন ভাই বোন আর আম্মা বসেছি টেবিলের চারদিকে। আব্বার জন্য ছিল নির্দিষ্ট একটা চেয়ার। সব সময় তিনি সেখানে বসেই খেতেন। তিনি বাড়িতে না থাকলেও আমরা কখনো সেই চেয়ারে বসিনি। ওই চেয়ারে হয় আব্বা থাকত অথবা ওটা খালি থাকত। ওখানে আমরা কখনো কাউকে বসতে দেখিনি। আমরা নিজেরাও বসিনি। আব্বা বসতেন ওখানে। তিনি নীরবে খেতেন। নীরবে উঠে যেতেন।

মনে আছে, সেই রাতে আমি বসেছিলাম আব্বার কাছে, তার ডান দিকের চেয়ারে। তিনি খাচ্ছিলেন মাথা নিচু করে। খাচ্ছিলেন না ঠিক, খাওয়ার অভিনয় করছিলেন। তার চশমার কাচে ছিল বাষ্প বাষ্প পানি। বারবার চশমা খুলছিলেন তিনি। আব্বার হাতের আঙুলগুলোর নিচে ভাত ও তরকারি কাদার মতো কেমন প্যাঁচপ্যাঁচে হয়েছিল। ওই মুহূর্তে আব্বাকে খুব বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমি। তার মুখে দেখতে পেয়েছিলাম মায়ের মুখ। আমার ভালোবাসার কেন্দ্রে ছিলেন আমার মা। তাকে ঘিরে বৃত্তের ব্যাসার্ধের মতো ছিলাম আমি, আমার

ভাইবোন এবং আব্বা। সেই বৃত্তটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বছর চারেকের মাথায়।

তারপর আম্মা এলেন আমাদের জীবনে। সবাইকে টেনে নিলেন তার বুকের ভেতর। মুরগির ছানার মতো আমরাও তার পাখার নিচে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বুক দিয়ে আমাদের আগলে রাখতেন তিনি। ঠোঁটে তুলে দিতেন খুঁদকুড়ো। তখন আমাদের সব হলো। আব্বা তো ছিলই। ছিল রুমানা ও সজীব, আমার দুই ভাই ও বোন, তারপর একসময় আম্মা এলেন, তখন সবই হলো আমাদের। কিন্তু সেই বৃত্তটা আর কখনো রচিত হলো না। মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের যে জায়গাটায় শূন্য একটা গর্তের মতো হয়েছিল, সেটা আর কোনো দিন ভরাট হলো না।

বিদেশে চলে আসার রাতে, বাড়ির সবার জন্য আমার বুকের ভেতরটা কাচের গ্লাসের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই প্রথম আমি মাকে ফেলে অজানা কোথাও চলে যাচ্ছি, যেখান থেকে আর কোনো দিন তার কাছে ফেরা হবে না। যেন শৈশবে মা আমাকে ছেড়ে যাননি বরং এখন আমার মাকে ফেলে আমি চলে যাচ্ছি বিদেশে।

রাতের খাবারের সময় মনে হয়েছিল, ডাইনিং টেবিলে যেন মা-ও বসে আছেন। খাচ্ছেন না কিছুই। চীনা মাটির প্লেটের কিনার ঘেঁষে যে সবুজ আঙুরলতার ছবি, তিনি নীরবে আঙুল বুলিয়ে চলেছেন সেই লতার ওপরে। আমিও পারছিলাম না খেতে। শুধু মনে হচ্ছিল মায়ের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। মাকে ফেলে আমি যেন একটা শূন্যের মধ্যে চলে যাচ্ছি। তীব্র একটা কষ্ট বুকের মধ্যে তৈরি হয়ে সেটা গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে ছিল। কষ্টটা বাষ্প হয়ে বেরিয়ে এল আম্মার হাতের স্পর্শে।

খাওয়ার টেবিলে বসে সেদিন আমি হু হু করে কেঁদে উঠেছিলাম। দরজার ওপরে দেয়ালে ঝুলে থাকা ফ্রেমবন্দী মা ওখান থেকে দেখছিলেন আমাকে। আমি তাকাতে পারছিলাম না তার চোখে। মাকে ভালোবাসার সেই লতাটা একসময় সবাইকে পেঁচিয়ে ধরল, যা ছিঁড়েখুঁড়ে সবার জীবন থেকে আমি আজ এখানে পালিয়ে এসেছি।

তারপর শুরু হলো নতুন জীবন। নাখালপাড়া, না পিওনিয়ার স্ট্রাসের জীবন। আমি এখন আসিফ না। আমি সেলিম। আবদুস সেলিম। এখানে আব্বা নেই। নেই সেই খাওয়ার টেবিল। এখানে মা নেই। নেই সেই দেয়ালে ঝুলে থাকা ফ্রেম। ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া নেই। নেই পরমতলায় গ্রামের বাড়িটা। কিন্তু মনে হয়, কোথায় যেন মা আছেন। আছেন আব্বাও। কখনো কখনো স্বপ্নের ভেতর আমি পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িটাতে আব্বাকে বই হাতে জানালার দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখেছি। মাকে দেখেছি একটা কালো ওভারকোট পরে জায়নামাজে বসে আছেন। হাতে একটা খয়েরি তসবি। তার মাথার ওপরে তুষার ঝরছে।

ছোট্ট মৃত্যু

পরের এক সপ্তাহ ফ্রাউ বাওয়ারের ছিল ইভিনিং শিফ্‌ট। তখন তিনি অফিসে যেতেন দুপুরের পর। যখন বাড়ি ফিরতেন, পুরো শহর তখন ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিত। আমাদের অভিসারের জন্য সময় ছিল শুধু সকালের দিকে। কারখানা বন্ধ হয়ে যেত সন্ধের আগেই। আগে রাতভর কাজ হতো। ব্যবসায় মন্দা বলে আপাতত সেটাও স্থগিত। কাজ করলে আমাকে তা করতে হতো সকালে। অথচ তখনই আমাকে দেখা যেত বাল্টহাসার স্ট্রাসের ফুটপাতে কিংবা ফ্রাউ বাওয়ারের চারতলায় অথবা স্নান করছি দুধের মতো ফেননিভ বাথটাবে।

আবার কাজে ফাঁকি দিতে শুরু করলাম আমি। লুকিয়ে রাখা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বের করে আনলাম পকেট থেকে। জমা দিলাম কারখানায়।

আমার ঠিকানা এখন দুটো। দিনের কিছুটা সময় ফ্রাউ বাওয়ারের বাড়ি। বাল্টহাসার স্ট্রাসে। আর বাকিটা সময় ২১ পিওনিয়ার স্ট্রাসে।

একটা গোপন উত্তেজনায় ঘুম ভাঙত সকালে, খুব ভোরে। তখনো রাস্তায় কোনো গাড়ি নামত না, আলো নিভত না ক্রাংকেনহাউসের গাড়ি বারান্দায়। তারপর শুয়ে থাকতাম আরও কিছুটা সময়। একটু বেলা করে বিছানা ছাড়তাম আর সকাল দশটার দিকে চলে যেতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে। রাস্তাঘাট তখন মোটামুটি ফাঁকা থাকত। যে কয়েকজন মানুষ দেখা যেত, ওরা ছুটত সুপারমার্কেটের দিকে। বেশির ভাগই ছিল বয়স্ক মানুষ। পেনশনে যাওয়া বুড়োবুড়িরা চাকাওয়ালা ট্র্যাগারে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়ত রাস্তায়। বাজার করত। এই সময়ে ঘরে থাকতাম শুধু আমি আর ফ্রাউ বাওয়ার।

কুসুম কুসুম গরম পানির একটা পুকুরে আমরা হাঁসের মতো সাঁতার কাটতাম। কখনো কখনো ঝরনা ছেড়ে দিয়ে, বৃষ্টিতে ভেজার মতো, জড়াজড়ি করে, লেপ্টালেপ্টি হয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতাম নগ্ন দুই মানুষ। গির্জার চূড়া থেকে ঘণ্টাটা যখন এগারোবার-বারোবার তারপর তেরোবার বেজে উঠত, হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াতাম আমি। কোনোরকমে শার্ট আর প্যান্টের ভেতর নিজেকে গলিয়ে দৌড়ে চলে আসতাম পিওনিয়ার স্ট্রাসে। সজল তখন ঘুম থেকে উঠত। ওদের

বলেছিলাম, আমি শুধু সকালের দিকে কাজ করছি। আধা বেলা। সারা দিনের পরিশ্রম শরীর নিতে পারছে না। কখনো কখনো শার্ট খুলে ওদের তলপেটের কাটা দাগটাও দেখাতাম। সেলাইয়ের দাগটা তখনো স্পষ্ট বোঝা যেত। দাগটা ছিল গাঢ় বাদামি, মনে হতো তলপেটের ওপর শুয়ে আছে একটা শুয়োপোকা।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার শরীর তখন আর অতটা দুর্বল ছিল না। আমার সমস্ত শক্তির উৎস আর আধার হয়ে উঠেছিল চারতলার সেই বাড়িটা। বাড়ির বাথরুমটা। বাথরুমের বাথটাবটা। বাথটাবের কুসুম গরম পানিটা। পানিতে দাবড়ানো ঘোড়াটা। ঘোড়ার পেটে বসে থাকা সওয়ারিটা। ওই বাড়িতে দুপুরের যৌথ স্নানের পর অদ্ভুত একটা জ্বালানি আমার কোষে কোষে জমা হতো। সেই জ্বালানি পুড়ত দিনভর। আর বাকিটা সময় আমি কাটিয়ে দিতাম আগামী কালের অপেক্ষায়।

সকালে ফ্রাউ বাওয়ারকে খুব ফ্রেশ দেখাত। তিনি বেশ গোছানো, পরিচ্ছন্ন আর টিপটপ থাকতে পছন্দ করতেন। পারফিউমের সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এসে লাগত তার কাছাকাছি হলে। সব সময় ভাঁজ ভাঙা কাপড় পরতেন তিনি। শরীরটাকে যখন সাদা একটা রোবে পেঁচিয়ে আমার চুল আঁচড়ে দিতেন, নিজেকে স্বামী স্বামী মনে হতো। মনে হতো আমি শীলার স্বামী। ভূতের গলিতে আমাদের ছোট্ট নতুন সংসার। আমি অফিস করছি, শীলা ঘর করছে। গল্পে গল্পে কাটছে সারা রাত আর ছুটির সময় আমরা সারা দিন টিভি দেখছি। আদর করছি। এসব ভাবনা আমার বুকের ভেতর রেলগাড়ির মতো এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করত আর দাম্পত্য সুখের এক পশলা হাওয়া দোলা দিয়ে যেত আমার মনে ও শরীরে।

ফ্রাউ বাওয়ারের প্রিয় যে কয়েকটা সাবান ছিল, তার একটার গন্ধ ছিল হলিহক ফুলের গন্ধের মতো। সেই সাবানের ফেনা রাতের টক টক গন্ধটাকে মুছে দিয়ে আমার বাসি মনে ও বাসি শরীরে এনে দিত ফুরফুরে অনুভূতি। আমার হৃদয় তখন নাচত ময়ূরের মতো।

সাবানের ফেনা যখন ফ্রাউ বাওয়ারের শরীরের ওপর সাদা একটা আস্তরণের মতো তৈরি করত, তাকে শুভ্র ফেনা দিয়ে তৈরি এক দেবীর মতো লাগত। এই সাবান আমরা মেখে দিতাম পরস্পরের গায়ে। তিনি আমাকে শেখালেন কীভাবে সাবানটাকে ধরতে হয়, কীভাবে মাখাতে হয় শরীরে। আমি ঘষতাম জোরে জোরে। তিনি শেখালেন গায়ের জোরে নয় বরং নরম করেও কীভাবে শরীরের ওপরে আধিপত্য বজায় রাখা যায়।

গোসল শেষে উঠে যাওয়ার সময় ফ্রাউ বাওয়ার তার ডান হাত দিয়ে আলতো করে ধরে রাখতেন আমার বাঁ হাতের সবকটা আঙুল। তার নগ্ন পিঠের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতাম আমি। পুকুর থেকে উঠে আসা হাঁসের ডানায় যেমন

লেগে থাকে বিন্দু বিন্দু পানি, তেমনি তার ভেজা শরীরেও লেগে থাকত ফোঁটা ফোঁটা জল। তাকে দেখাত অপ্সরার মতো, যেন উঠে এসেছে সমুদ্রের গভীর তল থেকে। বাথটাবের ভেতর দিয়ে ও উঠে আসত মারমেইডের মতো।

তারপর আমরা দুজন যখন একজন হতাম তিনি আমাকে পুরোপুরি দখলে নিতেন। যেন ঘোড়ার সবকটা লাগাম থাকত তার হাতে। থামাতে চাইলে তিনি টেনে থামাতেন, ডানে-বাঁয়ে যেতে চাইলে ঘুরাতেন সেভাবে। তিনি আমাকে শেখালেন, কীভাবে মিশে যেতে হয় আরেকজনের শরীরে, ভেতরে ঢুকে গিয়েও কীভাবে বাইরে থাকা যায়, মোমের মতো গলে গিয়েও থাকা যায় দৃঢ়, নরম হয়েও শক্ত।

ফ্রাউ বাওয়ারকে আমি শিশুর মতো অনুসরণ করতাম। তিনি সামনে সামনে দৌড়াতেন আর আমি ছুটতাম তার পেছন পেছন। এটা এমন একটা খেলা ছিল, যেখানে তিনিই সব করতেন। তিনি দেখাতেন, আমি দেখতাম। তিনি শেখাতেন, আমি শিখতাম। তিনি করাতেন, আমি করতাম। তিনি নাচাতেন আর নামি নাচতাম। তারপর একসময় আমিও জেনে গেলাম, কীভাবে দখল করতে হয় সবকিছু, কীভাবে চড়তে হয় ঘোড়ায়। তখন থেকে খেলাটা আর একতরফা থাকল না, ড্র হতে লাগল।

এই দখল নিতে একটু সময় লেগেছিল। শিখে ফেলার পর আমি আর সেটা কখনো ছাড়িনি। মনে হতো, আমি প্রভু। ও আমার প্রজা। জমি, গাড়ি আর বাড়ির মালিক হওয়ার মতো। আমার মালিকানা এই শরীরেও। মনে হতো এটা আমার, আমি কিনেছি।

শেষের দিকে ফ্রাউ বাওয়ার উঠে আসতেন ওপরে। তখন তার পুরো শরীরটা দেখতে পেতাম। পেটের চামড়া কীভাবে নড়ে উঠত, নাভি সংকুচিত আর প্রসারিত হতো। দেখতাম কীভাবে আন্দোলিত হচ্ছে তার স্তন, কুঁচকে আসছে চোখ, ভাঁজ পড়ছে কপালে এবং সবশেষে হা করা মুখ। শেষের দিকে তিনি তার দুই হাত রাখতেন আমার বুকের ওপর এবং একসময় পেছনের দিকে হেলে গিয়ে এমন একটা নীরব চিৎকার দিতেন যে শুরুর দিকে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে আমি তার এই চিৎকারের জন্যই অপেক্ষা করতাম।

প্রায় সময়ে তিনি আমার বুকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আমি নিস্তব্ধতার শব্দ শুনতাম, শুনতাম ফ্রাউ বাওয়ারের নিশ্বাসের আওয়াজ, কখনো কখনো মনে হতো নাক ডাকার মতো। আর অপেক্ষা করতাম গির্জার সেই ঘণ্টাধ্বনির। দুপুরের দিকে বাল্টহাসার স্ট্রাসের ফুটপাতে একদল স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ের কোলাহল শুনতে পেতাম। তারা তখন স্কুল থেকে ফিরত। কেউ একজন এই বাড়ির কোনো এক তলার বারান্দা থেকে চিৎকার করে কিছু বলত, তার জবাব ভেসে আসত নিচ থেকে, সেই চিৎকারে ঘুম ভাঙত ফ্রাউ বাওয়ারের।

মার্চ মাসের কোনো এক দুপুরে ঘটনা। বিড়ালের মতো গুটিশুটি মেরে আমার বুকের কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন ফ্রাউ বাওয়ার। আমি যখন ওর বাহুর ওপর হাত রাখলাম, তখন সে চোখ খুলল। মাথাটা চিবুকের নিচ থেকে সরিয়ে শরীরটা তুলল ওপরে। ঘাড়ের নিচে দুমড়ে ছিল বালিশ। তিনি ছিলেন বাম পাশে, আমার দিকে কাত হয়ে। ঘুম ভেঙেছে কিন্তু রেশটা আছে তখনো। চোখ আধা বন্ধ, আধা খোলা। মাথাটা কচ্ছপের মতো একটু উঁচু করে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কী ?'

তার চোখ কুঁচকানো। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম কী ?'

'ওমা ! আমার নাম জানো না তুমি ?' তার মুখে হাসি। ঠোঁটের কোনায় লুকানো দুষ্টুমি।

'এই ছেলে, আমি তো তোমার নাম জানি, জেলিম।'

আমি তাকে সংশোধন করে দিতে উদগ্রীব হলাম। বললাম, 'জেলিম না, সেলিম। আপনি তো আমার নাম চিঠির এনভেলাপে দেখেছেন।'

তারপর কয়েকবার 'জেলিম...যেলিম' বলার পর শেষে 'ছেলিমে' এসে থামলেন ফ্রাউ বাওয়ার। বোজা বোজা চোখে হাসছিলেন তিনি। মাথাটা তুললেন খরগোশের মতো। কয়েক গোছা সোনালি চুল তার ফরসা কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপরে এসে পড়ছিল। তারপর ঠোঁটটা কামড়ে বললেন, 'আমি রিটা।'

তার কণ্ঠে ছিল নিদ্রার শিথিলতা। তাকে শোনাচ্ছিল কিশোরীর মতো। নামটা বলেই তিনি তার শরীর আবার বিছানায় ঢেলে দিলেন। জলের মতো সেটা একপাশে গড়িয়ে পড়ল। আমার কোমরের ওপর ডান পা তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এই যে তুমি প্রতিদিন সকালে এখানে আসো, তোমার কি কোনো কাজ নেই। কী করো তুমি ?'

'একটা কারখানায় কাজ করি। জুতার কারখানা' তিনি তখন আমার নাকে আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করছিলেন।

'এই ছেলে, এখন কি কোনো কাজ নেই তোমার ? তোমার কি ছুটি ? উরলাউবে আছ ?' একটানা কয়েকটা প্রশ্ন।

রিটা বাওয়ারের জন্য আমার ভালোবাসার গভীরতা অথবা তার শরীরের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা বোঝাতে আমি তার পাশে শুয়ে শুয়ে সবকিছু খুলে বললাম। কারখানায় কাজের সময়ের কথাও বললাম তাকে। একসময় তার আঙুল আমার নাকের ডগায় এসে থেমে গেল। খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উঠে গেলেন তিনি। আমি তখনো বলে চলেছি তাকে এবং তার ভালোবাসা আমি কতখানি চাই, সবকিছু ফেলে কেন আমি তার কাছে ছুটে আসি, তিনি আমার কে এবং আমি কী হই।

রিটা বাওয়ার তখনো দাঁড়িয়ে, বিছানা থেকে এক হাত দূরে। আমার কথা শুনছিলেন কি না, জানি না। ভাবলাম, আমার এই সরল স্বীকারোক্তি শুনে হয়ত

তিনি আমার দিকে আরও একটু ঝুঁকে আসবেন, কিন্তু তার মুখে কোনো ভাবান্তর হলো না।

'এই ছেলে, তোমার টাকার দরকার নেই !' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। কতক্ষণ চুপ থেকে একই প্রশ্ন আবার করলেন আমাকে। 'তোমার টাকার দরকার নেই, জেলিম !'

আমি বললাম, 'আছে, কিন্তু...'

'কিন্তু কী, এই ছেলে কিন্তু কী বলো...'

'অর্থ তো সুখের মূল চাবি নয়, রিটা।' বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'কে বলল তোমাকে ?' চিৎকার করে উঠল রিটা। তারপর বলল, 'অর্থ থাকলে ওই চাবিটা বানানো যায়, সেলিম।'

টাকার কথা কেন এল আমি তখন বুঝতে পারিনি। টাকার দরকার থাকবে না কেন ? এই টাকার জন্যই তো এতো দূরে আসা। অধ্যাপক পিতার আজীবনের সঞ্চয় ফকিরাপুলের এক দালালের হাতে তুলে দিয়েছিলাম তো এই টাকার জন্যই। এই অর্থের জন্য চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আবদুস সেলিমের পাসপোর্টে আমার ছবি লাগিয়ে আসিফ চালান হয়ে গেল এই দেশে। এই অর্থের জন্য আমি এখানে ভুল নাম নিয়ে বেঁচে আছি। পাসপোর্টের সবকটা পাতা কুচি কুচি করে বিমানের কমোডে ফ্ল্যাশ করেও আবদুস সেলিমের হাত থেকে মুক্তি হলো না আমার। ওপরের শক্ত সবুজ পাতাটা ছিঁড়তে পারছিলাম না কিছুতেই। ওটা আটকে ছিল কমোডের মুখে। টয়লেট টিস্যু দুই হাতে পেঁচিয়ে কমোডের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কভারটা চালান করে দেই টয়লেটের ভেতর। পুরো কাজটা সারতে আধঘণ্টারও বেশি সময় আমাকে বসে থাকতে হয়েছিল টয়লেটে। বেরিয়ে আসার পর বিব্রত হয়েছিলাম দরজার সামনে আরও অনেক মানুষের ভিড় দেখে। তবে শান্তি পেয়েছিলাম এই ভেবে যে পাসপোর্টটাকে শেষ পর্যন্ত পেছনে রেখে আসতে পেরেছি। কিন্তু আবদুস সেলিমকে, যাকে আমি ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে তোতা পাখির মতো, আমার ঠোঁটে ঠোঁটে আকাশের এতটা পথ বয়ে নিয়ে এসেছি, পারলাম না তাকে ছুড়ে ফেলতে। ফ্রাংকফুর্টের ইমিগ্রেশন পুলিশ যখন আমার নাম জানতে চাইল মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'আমি আবদুস সেলিম।' এই টাকার জন্যই তো আজ আমি অন্যের নাম বহন করে চলেছি।

রিটা বাওয়ার কথা বলছিলেন একটানা। 'তুমি কেন কাজে যাচ্ছ না ? কারখানায় না গেলে তুমি টাকা পাবে কোত্থেকে ? কে টাকা দেবে তোমাকে ? তোমার কি বাড়িতে টাকা পাঠানোর দরকার নেই ? তুমি কী মনে করো তোমার

বাবা-মাকে ? কী মনে করো তুমি আমাকে, নিজেকে ?' হাঁপিয়ে উঠেছিলেন রিটা বাওয়ার। তার চোখ টকটকে লাল, গলার রগটা স্পষ্ট। পিঠছোঁয়া এলমেলো চুল দুই হাতে পেঁচিয়ে সেগুলোকে রাখলেন মাথার পেছনে। বললেন, 'যাও, বেরিয়ে যাও। এখনই তুমি এই বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও। সেলিম, আর কোনো দিন দুপুরে তোমাকে দেখতে চাই না এখানে।'

আমার গায়ে তখনো আপেল, কমলা আর থোকা থোকা আঙুর ফলের ছবি আঁকা যে কম্বলটা ছড়িয়ে ছিল, সেটা তিনি টান মেরে ফেলে দিলেন মেঝেতে। বাল্টহাসার স্ট্রাসের দিকে মুখ করে যে জানালা, কম্বলটা সেখানে গিয়ে পড়ল।

শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রিটা বাওয়ার। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি। কী এমন হলো ? কী আমার অপরাধ ? কেন তিনি এভাবে চিৎকার করলেন ? আমি শুনতে পেলাম, কিচেনে কল ছাড়ার শব্দ। একবার ফ্রিজের দরজা খোলা হলো। আবার সেটা খুব জোরে বন্ধও হলো। আমি তখন বিছানায় হাঁটু ভাঁজ করে বসে ভাবছিলাম কী ভুল আমার হয়েছে। কেন তিনি আমাকে এভাবে অপমান করছেন। এটা কি আমার সঙ্গে তার শরীরী সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার কোনো অনুশোচনা, নাকি অন্য কোনো কিছু !

এর আগেও তো তিনি আমার সঙ্গে চিৎকার করেছেন, এই একইভাবে, বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িতেই, বুঝতে পারছিলাম না সমস্যাটা আসলে কোথায় !

কিচেনে তখন কফি বানানোর শব্দ হচ্ছে। আর কোনো শব্দ ছিল না বাড়িটার কোথাও। মনে হচ্ছিল, খুব ছন্দোময় গতিতে কফি বানাচ্ছিল ওই মেশিন।

একসময় আমিও বেরিয়ে এলাম রিটা বাওয়ারের শোয়ার ঘর থেকে। তখনো তিনি কিচেনের দেয়ালে হেলান দিয়ে আধা নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শীলার চিঠিটা দেওয়ার সময় তিনি যেভাবে সিঁড়ির হাতলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে।

আমি গিয়ে বসলাম সোফার এক কোনায়। জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে। যাই যাই শীতের আলোয় চারদিকের বাড়িগুলো ম্লান। বেলকনির মাঝখানে ঝুলন্ত একটা বেল বাতাসে টিং টিং করে বাজছে। শহরের বাতাস আজ বইছে দক্ষিণ-পূর্বে।

গির্জার ঘণ্টাটা এখনো বাজেনি। গত চার পাঁচটা দিন আমি ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেতাম বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সুখের মগজে সেই শব্দ বাড়ি খেত হাতুড়ির মতো। বিছানা ছেড়ে উঠার সময় একটা আলসেমি এসে ভর করত শরীরে। মনে হতো ভেঙে পড়ব আমি, আমার শরীর কাপুট, কিন্তু এখন আমি সেই ঘণ্টার অপেক্ষায় বসে আছি, যেন সেটা বাজলেই আমার ছুটি।

তখনো আমার বিস্ময় কাটেনি, স্তম্ভিত আমি খুব অবাক কণ্ঠে বললাম, 'সরি।' কিছুক্ষণ থেমে লম্বা একটা দম নিয়ে স্কুলে শাস্তি পাওয়া শিশুর মতো চোখ করে ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগলাম, 'আর কখনো কাজে ফাঁকি দেব না আমি, কাল থেকে নিয়মিত কারখানায় যাব।' আমি থামলাম। তাকালাম ওর চোখের দিকে। ঠান্ডা এবং শান্ত দুচোখ। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন। গত কয়েক দিনের ভালোবাসায় ও স্নানে আমি তার সঙ্গে আরও বেশি জড়িয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছিল আজ এই দুপুরে তার সঙ্গে আমার বিদায় হয়ে যাচ্ছে। মহাকবি গ্যোয়েটের মতো আমারও মনে হচ্ছিল যে প্রত্যেকটা বিদায় হলো ছোট ছোট মৃত্যুর মতো। এখন সেই ছোট্ট মৃত্যু হচ্ছে আমারও।

ঘন্টাটা বেজে উঠল তখনই। তিনি বললেন, 'তোমার যাওয়ার সময় হয়েছে, সেলিম।' তারপর একটা মগে কফি ঢাললেন। কুণ্ডলী পাকানো গরম একটা ধোঁয়া তার মাথা ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠছিল।

আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম কিছুটা সময়। তখনো বুঝতে পারছিলাম না যে আসলে ঠিক কী হয়েছে। আমার কাজে যাওয়া না যাওয়ায় তার কী যায় আসে। আমি যখন শার্ট-প্যান্ট পরার পর সোয়েটারের দুই হাতার ভেতর আমার দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি তখনো পেছন ফিরে তাকালাম। চাইছিলাম সে কিছু একটা বলুক। অথবা আসুক এগিয়ে। অথচ তিনি নিশ্চুপ তখনো। দরজার কাছে রাখা শু বক্সটার ওপরে বসে জুতার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে আমি অপেক্ষা করছিলাম রিটা বাওয়ারের ডাক শোনার। কয়েক দফা চেষ্টার পরেও জুতার মুখে ফিতেটা ফুল হলো না। গোলমাল হচ্ছিল কোথাও। স্ট্যান্ড থেকে ওভারকোটটা নামিয়ে নিজেই চাপালাম শরীরে। অথচ সব সময় আমাকে কোট পরিয়ে দিত রিটা। আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম কাকতাড়ুয়ার মতো। সে আমার পেছনে এসে দাঁড়াত। তারপর দুই গালে চুমু দিয়ে বিদায় জানাত। দরজার মুখে ও ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে যতক্ষণ না আমি অদৃশ্য হতাম।

আমি আশা করছিলাম, সে আমাকে চুস বা আউফভিডারজেন বলে বিদায় জানাবে। কিছুই বলল না সে। এগিয়ে এল না দরজার কাছেও। বেরিয়ে যাওয়ার আগে উঁকি দিলাম কিচেনের দিকে। তখনো সে সেখানে। অনড়। নিজেই গেলাম তার কাছে। বিদায় চুম্বন এঁকে দিলাম রিটা বাওয়ারের ঠোঁটে। বলালম, 'বিস মরগেন রিটা...'

বাল্টহাসার স্ট্রাসের ফুটপাতে তখন কোলাহল বাড়তে শুরু করেছে।

যুদ্ধের কথা

একদিন আমি জানতে চাইলাম রিটার জীবনকথা। খুব বেশি কিছু বলতে সে আগ্রহী হলো না। এমন একটা ভাব করল, যেন প্রশ্নটা ও বুঝতে পারেনি বা শোনেনি। আমরা তখন পাশাপাশি শুয়ে আছি। আমি রিটার দিকে ফিরে আর রিটা আমার দিকে কাত হয়ে। তার কনুই বিছানায় আর ডান গাল হাতের তালুতে। জানালার পর্দাটা টানা থাকায় ঘরের ভেতর ছিল ছাইরঙের একটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারেও দেখা গেল তার কপালে বিরক্তির রেখা। আমি বললাম, 'তোমার নিজের বিষয়ে কিছু বলো, তোমার মেয়েবেলা, তোমার বাবা-মা, পরিবার, নিজের সংসার এসব, আমি শুনি।' রিটার বাম হাতের আঙুল তখন আমার চুলের ভেতর কিলবিল করে বিলি কাটছে, চষে বেড়াচ্ছে লাঙলের মতো। তুমুল এক ভালোবাসার পর রিটার এই আদরে চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল আমার।

ও তাকিয়েছিল আমার চোখ বরাবর। একসময় আঙুল থামিয়ে চুল টানতে টানতে বলল, 'কী হবে এসব শুনে !' আমি যখন জোর করতে যাব ঠিক তার আগেই সে বলতে শুরু করল। ওর গলাটা ছিল ঠান্ডা ও নিষ্প্রাণ। শুধু বলার জন্য বলা। রিটার জন্ম টেরনোপল শহরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, সেটা ছিল পশ্চিম পোল্যান্ড। ওর জন্মের কয়েক মাস আগে সোভিয়েত বাহিনী আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল পোল্যান্ডের পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ফুয়েরার হিটলারের নাৎসিওনাল সোৎসিয়ালিস্টিশে ডয়েচে আরবাইটপার্টাই বা নাৎসি বাহিনী তখন পিছু হটছে। তারপর একসময় অবসান হলো কেয়ামতের। তার কয়েক মাস পর জন্ম হলো ওর, যুদ্ধের পরে তারা চলে আসে পূর্ব জার্মানি। বছরখানেক ওরা ছিল পূর্ব বার্লিনে। ওখান থেকে পালিয়ে আসে পশ্চিমে, তারপর চলে যায় আমেরিকায়।

লেখাপড়া খুব বেশি দূর করেনি রিটা। আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পর স্টুটগার্টের কাছে ও সরকারি একটা বিভাগে কাজ করত। রিটা ছিল সমাজকল্যাণের কর্মী। ওর কাজ ছিল একটা এতিমখানায়। অনাথ শিশুদের সঙ্গে সময় বেশ ভালোই কাটছিল ওর। একসময় এই জীবনও আর ভালো লাগছিল না

ওর। মনে হতো জেলখানার মতো। উত্তরের শহর ব্রেমেনেও ছিল কিছু দিন। সেখানে একটা শিপে কাজ করত। তারপর আরও কয়েকটা শহরে ঘুরেছে রিটা। ফ্রাংকফুর্ট, ডুসেলডর্ফ আর বন হয়ে গত চার বছর হলো এই শহরে স্থায়ী হয়েছে ও...কয়েক বছর সে নাকি হল্যান্ডের দ্য হেগ এবং আর্জেন্টিনার বুয়েনেস আয়ার্সেও ছিল। এটুকুই বলল রিটা। নিজের জীবনকাহিনি সে এমনভাবে বর্ণনা করছিল, যেন এটা তার নিজের জীবন ছিল না। এই কাহিনি ছিল এমন এক মহিলার, যাকে সে খুব ভালো করে চেনেও না।

'এই মহিলাকে আমি ঘৃণা করি', রিটা বলল। আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'কেন।' কিন্তু এই প্রশ্নের কোনো উত্তর সে আমাকে দেয়নি। কিছুক্ষণ চুপ করে চিৎ হয়ে শুয়েছিল শুধু। তার দৃষ্টি ছিল ছাদের দিকে। কথা বলিনি আমিও। জানালা দিয়ে ভেসে এল শুধু কিছু কোলাহল। নিচের তলার বারান্দায় একটা শিশু তার মাকে ডাকছিল। মা জবাব দিল। শোনা গেল একটা কুকুরের ডাক। কোথাও কেউ হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছিল লোহা। আর ছিল খোলা জানালা দিয়ে বাতাস আসার হু হু একটা শব্দ।

রিটা তার জীবন সম্পর্কে আমাকে এর বেশি আর এগোতে দেয়নি। ও চাইত না আমি এ নিয়ে কোনো কথা বলি। যখনই আমি সেদিকে যেতে চেয়েছি, অন্য প্রসঙ্গ এনে সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ওখানে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিল রিটা, ঠিক ওই জায়গাটায় যেন তোলা উঁচু একটা প্রাচীর, আমি জানি যে ওপারে কিছু একটা আছে কিন্তু কী আছে জানি না, জানার জন্য কৌতূহল ছিল, দেখার জন্য শরীর ও মন ছমছম করত, অথচ ওই দেয়াল টপকে উঁকি দেওয়ার অনুমতি ছিল না। মনে মনে আমি যা খুব বেশি জানতে চেয়েছিলাম, তা হলো সে বিয়ে করেছে কি না, করলে স্বামী কোথায়, কী করে, কোনো ছেলেমেয়ে হয়েছে কি না, তার বাবা-মার খবর, তারা কয় ভাইবোন, এরকম কিছু বিষয়। এসবের সে কিছুই বলল না। এই বিষয়গুলোর অস্তিত্ব যেন তার জীবনে নেই অথবা সেগুলো আমূল উধাও হয়ে গেছে কোথাও, কে জানে। এরকম অনেক সাদামাটা কৌতূহলের কোনো জবাব রিটা আমাকে কখনো দেয়নি।

আর বলেনি ও কেন রিটাকে ঘৃণা করে।

আমি বললাম, ওকে আমি ভালোবাসি।

ওর অতীত জানতে চাওয়াটা ঠিক হয়েছিল কি না, জানি না। তার পরেও অতীতের পাশাপাশি জিজ্ঞেস করেছিলাম ভবিষ্যতের কথাও। এটা শুধু ওর বা আমার একার ভবিষ্যৎ নয়, আমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ, এরকমটা ভেবেই আমি ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম। রিটার নিজের পরিবারের বিষয়ে আমার আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। সত্যি বলতে কি, আমি ধরে নিয়েছিলাম ও বিবাহিত এবং

স্বামীর সঙ্গে হয়ত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তবে বাল্টহাসার স্ট্রাসের এই বাড়িটাতে আমি কোনো পুরুষ তো দূরের কথা কোনো দিন কোনো পুরুষের ছায়াও দেখিনি। শুধু বাথরুমের আয়নায় নগ্ন এক পুরুষকে দেখতাম এবং সেটা ছিলাম আমি।

একটা বাড়িতে পুরুষের কত রকমের চিহ্ন থাকে, হয়ত থাকে ঘামের বোঁটকা গন্ধ কিংবা আফটার শেভ লোশনের কোনো বোতল, কিন্তু ৫৬ বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িটায় এসবের কিছুই ছিল না।

এর মধ্যে আমি রিটাকে ওর প্রতি আমার ভালোবাসার কথা বলেছি। জবাবে রিটাও আমাকে জড়িয়ে দীর্ঘ চুম্বন করেছে। প্রায়শই আমি কল্পনার চোখে দেখতাম, কী হতে পারে আমাদের ভালোবাসার পরিণতি। এমনকি আমি ওর সঙ্গে বিয়ের কথাও ভাবতে শুরু করেছি। ভাবতাম, এরপর আমরা কী করব, কোথায় থাকব। অনেক চেষ্টা করেও আমাদের একটা সংসারের ছবি আঁকতে পারতাম না আমি। বাথরুমে, বেসিনের ওপর, একটা গ্লাসের ভেতর দুই রকমের দুটো ব্রাশ অথবা একটা ওয়াড্রোবের দুই তাকে আমার আর রিটার কাপড় অথবা দেয়ালে ঝুলানো কোনো ফ্রেমে আমাদের যুগল ছবি, এসব অনেক চেষ্টা করেও মেলাতে পারিনি। বিয়ের পোশাকে রিটা আর ওর পেছনে টাই-স্যুট পরে আমি ওর কাঁধের ওপর মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছি, মনের ক্যামেরায় এরকম একটা ছবি ক্লিক করতে গেলেই সেটা আউট অফ ফোকাস হয়ে যেত, অথবা ঝলসে যেত রিটার চোখের আলোর তীব্রতায়।

রিটাকে একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও কি ভাবছে আমাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে। জবাবে ওর পাল্টা প্রশ্ন ছিল, 'ভবিষ্যৎ মানে কী, কার ভবিষ্যৎ, কেন ভবিষ্যৎ এবং সেই ভবিষ্যৎ কত দূরে ?' আমি খুলে বললাম, 'ধরো, আজ থেকে চার-পাঁচ বছর পর আমাদের কী হবে, তুমি আমি এখন যেরকম আছি, আমরা কি সেরকমই থেকে যাব, নাকি সেটাকে সমাজের সুতায় বাঁধব।' রিটা খুব হাসল। বলল, 'কেন, তুমি তো আমারই থাকবে। আমিও থাকব তোমারই। বাঁধাবাঁধির কী !' ও এসব বলত আর খুব হাসত। হাসতে হাসতে গলে পড়ত, ছোট্ট টেবিলটার ওপরে রাখা গোল গোল মোমদানির ভেতর যেভাবে বাতিগুলো গলে পড়ত, ঠিক সেভাবে। তার চোখের ভেতর দুষ্টুমি খেলা করত। চার বছর তো দূরের কথা, আগামী ক্রিসমাসের পর আমাদের সম্পর্ক কী হবে, তা নিয়ে ভাবতেও ও রাজি ছিল না কখনো। হলে হবে, না হলে না হবে, ঘটলে ঘটে যাবে, না থাকলে না থাকবে, এই ছিল তার জীবনের দর্শন। রিটার কথা হচ্ছে 'আছি, আছি।' ব্যস। 'এর বেশি এখন আর কিছু ভাবতে চাই না', 'পরেরটা পরে', 'তখন দেখা যাবে', এরকম।

এভাবে চলল আরও কিছু দিন। প্রতিদিন দুপুরে বা সন্ধ্যায় আমরা একসঙ্গে থাকি। ওখানেই আমাদের দেখা হয়, ওখানেই আমাদের অভিসার, ওখানেই বিদায় হয় আমাদের। আমার আর রিটার, আমাদের দুজনের পৃথিবী বাল্টহাসার স্ট্রাসে। আমার আরও একটা জগৎ আছে, পিওনিয়ার স্ট্রাসে অথবা ঢাকায়, রিটারও হয়ত আছে, কিন্তু আমাদের দুজনের জগৎ-সংসার-পৃথিবী সব ছিল এই চারতলায়। এই বাড়ির বাইরে আমি ওর সঙ্গে কখনো কোথাও দেখাও করিনি। একসঙ্গে কোথাও ঘুরতেও যাইনি। আমার মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হতো রিটাকে পাশে বসিয়ে, সিনেমা হলের অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকি। অথবা কোনো একটা পাবে বিয়ার খেয়ে গভীর রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরি। এবং এই বাড়ি পিওনিয়ার বা বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়ি না, আলাদা কোনো বাড়ি, অন্য কোথাও, অন্য একটা রাস্তায়, অন্য কোনো দালানে এবং অন্য কোনো তলায়।

আমাদের বাড়িতে।

একই শহরের মানুষের মধ্যে কীভাবে কীভাবে যেন দেখা হয়। হয়ত রুটির দোকানে, সিনেমা হলে কিংবা শপিং মলে আর খুব বেশি নাটকীয় হলে বাসের টিকেট কাটার কাউন্টারে। তসবির দানার মতো সবাই যেন একটা লম্বা সুতা দিয়ে বাঁধা থাকে। কিন্তু রিটার সঙ্গে আমার কখনো বাল্টহাসার বা পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়ির বাইরে দেখা হয়নি, কখনো না, কোথাও না। ট্রামে বা বাসে না, সুপারমার্কেটে বা ব্যাংকে না, কোথাও না। কোনো কোনো রবিবার রৌদ্রময় বিকেলে সজল, আমি আর রফিক রাইনের তীরে বেড়াতে যাই, যেমন যায় এই শহরের আর সবাই, নিশ্চয়ই রিটাও যায়, কিন্তু আমাদের দেখা হয় না কখনো।

এরকম একটা স্বপ্ন দেখতাম আমি—আমরা দুজনে ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেছি, একসঙ্গে। মাইওরকা, আমস্টার্ডাম অথবা অন্য কোনো শহরে। আমরা উঠেছি হোটেলে। রিসেপশনের খাতায় নাম ঠিকানা লেখার সময় এমন একটা ভাব করছি, যেন রিটা আমার স্ত্রী, আমরা বেড়াতে এসেছি। বিদেশি স্বামী দেখে হোটেলের লোকেরা কী ভাবছে, সেটাও ভেবে ফেলতাম আমি। রিটাকে নিয়ে এই ভাবনাটা আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। ওটা ছিল একটা খেলা। ওই জগৎ আমার নিজের। সেখানে ছিল শুধু রিটা এবং সেই জগতে ওর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

শহরের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ভাবনাটা আসত রফিক ও সজলের কারণে। কেননা এই দুজনের কাছ থেকে আমি সব সময় রিটাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি। লুকিয়ে রাখতে চেয়েছি আমাদের সম্পর্কটাকেও। রিটা আমার চেয়ে বয়সে খুব বড়, হয়ত সেই লজ্জাতেই আমি পুরো ঘটনাটা ওদের কাছে গোপন করতে চেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই যে রিটা

আমার জীবন ভাবনায় অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আজ যখন চল্লিশ বছরের কোনো মহিলাকে দেখি, তাকে মনে হয় তরুণী। আর ত্রিশ বছরের কোনো তরুণকে মনে হয় শিশু। রিটা আমাকে একটা শিশু করে তুলেছিল। সে আমাকে খাওয়াত, পড়াত, শাসন করত, আদর করত, স্নান করাত, স্নানের পর শরীর মুছিয়ে কাপড় পরাত। আবার নগ্নও করত।

আমি ছিলাম রিটার একটা ছেলে পুতুল।

একসময় আমার জীবনের রুটিন হলো এরকম: সকালে টোস্টারে রুটি ছ্যাঁকা, অথবা দুধের ভেতর মুসলি ভিজিয়ে গিলে খাওয়া, তারপর ট্রামের জন্য দে ছুট, কারখানায় চামড়ার গন্ধে ডুবে থাকা, তারপর বাল্টহাসার স্ট্রাসে, তারপর ঘুম। জীবনের এই রুটিনটা বাইরে থেকে দেখা যেত। কিন্তু যেটা দেখা যেত না, সেখানে ছিল শুধু রিটা রিটা আর রিটা।

এই রিটাই একদিন আমার সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেল। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ। সেটা ছিল এপ্রিলের শুরুর দিকে, ইস্টারের ছুটির সময়। কয়েকবার বেল টেপার পরেও দরজা খুলল না রিটা। এবার্টপ্লাৎসে গিয়ে বুথ থেকে ফোন করলাম ওর বাসায়। একটানা রিং বাজল। জবাব দিল না কেউ। আবার ফিরে এলাম ওর বাড়ির সামনে। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলাম আধঘণ্টার মতো। এর মধ্যে কয়েকজন ভেতরে ঢুকল। প্যারাম্বুলেটরে মোটাসোটা এক ছেলেকে বসিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে গেলেন হিজাব পরা একজন মহিলা। আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলেন না তিনি। ডান দিকের কিয়স্কে দুধ কেনার অজুহাতে দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম রিটার কথা। ওরাও কিছু জানে না। অনেক রাত অবধি হাঁটাহাঁটি করলাম ওখানে। একসময় হিজাব পরা মহিলাও বাড়িতে ফিরে এলেন। তার ছেলেটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারপর সন্ধ্যা নামল। রাত হলো। এক এক করে বাড়িটার সবগুলো ঘরের বাতি জ্বলল। তারপর নিভেও গেল কিন্তু রিটা আর এল না।

এক অস্থিরতায় সাঁতার কেটে কেটে রাত পার হলাম আমি। সেই রাত ছিল বিশাল এক সমুদ্রের মতো। উত্তাল। খুব ভোরে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত শরীরে ছুটে গেলাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে। না, রিটা নেই। কোথাও নেই। কী হতে পারে ওর ? রিটাকে আমি আর কোথায় খুঁজব ? ওর আর কোনো ঠিকানা আমার জানা ছিল না। আমাদের পাড়ার পোস্ট অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম দুপুর অবদি। একসময় ভেতরে গিয়ে এক অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম রিটা বাওয়ারের কথা। তিনি জানালেন রিটা এখন ছুটিতে। এর বেশি কিছু বললেন না তিনি, কারণ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা।

প্রত্যেক দিনই আমি গিয়েছিলাম রিটার বাড়িতে। সকালে-সন্ধ্যায়-দুপুরে এমনকি রাতের গভীরেও। বারবার আমার আঙুল চলে যেত রিটার ডোরবেল বোতামে। বাকি সময় আমি শহর চষে বেড়াতাম আর খুঁজতাম রিটাকে। অবশেষে দরজাটা খুলল শুক্রবার রাতে।

'রি...টা,' চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?' আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। বুকের গভীর থেকে আমার কষ্টটা ঝড়ের মতো বেরিয়ে এল কান্না হয়ে। এত দিন সেটা অবরুদ্ধ ছিল, খাঁচায় আটকে থাকা পাখির মতো, ওকে দেখে সেটা উড়াল দিয়েছে, মনের দরজা খুলে বের করে দিলাম পাখিটাকে, গেল না, বেলকনিতে গিয়ে বসে থাকল রিটার দেওয়া খুঁদকুড়ার অপেক্ষায়।

ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ওর পরনে ছিল গাঢ় নীল রঙের জিন্স আর বিট রঙের পুলওভার। মনে হলো, দূরে কোথাও গিয়েছিল রিটা। ট্রাভেল ব্যাগটা তখনো পড়েছিল মেঝের ওপরে। সেটা খোলা। তার ভেতর থেকে উপচে পড়ছে নানা রকমের কাগজ আর বই। কিছু বইখাতা বের করা। এলমেলো হয়ে ওগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেঝের ওপর।

'রিটা, তুমি কি জানো, কেমন ছিলাম আমি ?' আমার প্রশ্ন।

'কখন ?' সেই হাসি। দুষ্টুমি করে ও হালকা করতে চাইছিল আমাকে। বেলকনিতে পাখিটা তখন ওর ডানা ঝাপটাচ্ছে।

'গত দুই সপ্তাহ। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?'

'মেজর শোয়ামব্যার্গারের খোঁজে।'

'কোথায় ?'

'টেরনোপল।' তারপর বললেন, 'জানো তুমি টেরনোপল কোথায় ?' আমার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই বললেন, 'যুদ্ধের সময় ছিল পোল্যান্ডে আর এখন ইউক্রেনে।'

'কে এই শোয়ামব্যার্গার ?'

'চিনবে না তুমি, সেলিম।'

'আমাকে বলে গেলে না কেন', আমার চোখ দুটো তাক করা ওর চোখে।

'সময় পাইনি।'

'লিবে রিটা', আমি ডাকলাম ওকে। ও মুখ তুলে আমার কাছে এল। 'মাইন শাৎস, তুমি কি জানো এই কদিন আমি কীভাবে বেঁচে ছিলাম ?' কান্নাটা বেরিয়ে এল আবার। সোফায় বসে ডান হাতের তালুতে লুকালাম চোখের পানি। রিটা বলল, 'জানি।' তারপর জড়িয়ে ধরল আমাকে। নগ্ন করল ওর ছেলে পুতুলের মতো। কান্নাটা আমি তখন আর চাপা রাখতে পারিনি।

বেলকনির পাখিটা তখন আকাশে উড়ছে। একসময় সেটা হারিয়ে গেল কোল্ডস্টোরেজের মতো দেখতে বাড়িটার পেছনে।

বাল্টহাসার স্ট্রাসে থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে রিটার ব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছিলাম আমি। সেখানে দেখলাম মেজর শোয়ামব্যার্গারের কিছু ছবি। বিশাল একটা ডাইনিং হলে বসে আছেন শোয়ামব্যার্গার। তার পরনে ভেরমাক্ট সেনাদের পোশাক। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল। শোয়ামব্যার্গারের পেছনে, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দেয়ালে ঝুলছে ডের ফুয়েরার। আরেকটা ছবিতে দেখা গেল একটা আরবাইটসলাগারের সামনে মেজর শোয়ামব্যার্গার ওভারকোট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওর হাতে একটা লাঠি। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা ঘোড়ার সামনে। গেটে লেখা আরবাইট মাক্ট ফ্রাই। এই শিবিরে ইহুদি ছাড়াও কিছু পোল, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক মানুষকে দাস হিসেবে আটকে রাখা হয়েছিল। সেখানে মুক্তির মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ছিল দাসত্ব আর শ্রম। অথবা মৃত্যু।

টেরনোপল আরবাইটসলাগারের প্রধান ছিলেন জার্মান সেনাবাহিনী ভেরমাক্টের কর্মকর্তা এই মেজর শোয়ামব্যার্গার। রিটা বলল, 'এই ছবিগুলো যুদ্ধের শেষ দিকে তোলা, হয়ত চুয়াল্লিশের শেষে অথবা পয়তাল্লিশের শুরুতে।' ছবিগুলো সে এবার টেরনোপল থেকে সংগ্রহ করেছে।

ব্যাগ গোছাতে গোছাতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শোয়ামব্যার্গারকে কি তাহলে তুমি চেনো ?'

'না, চিনি না।' অনেকক্ষণ চুপ থেকে রিটা বলল।

'তাহলে ?' আমার বিস্ময়। 'ওর পেছনে তুমি কেন লেগেছ ?'

এই প্রশ্নের উত্তর এল না কিন্তু আবারও পাওয়া গেল তার শীতল চাহনি।

তারপর এল জুন মাস। ফেরিওয়ালারা টুং টাং ঘণ্টা বাজিয়ে আইসক্রিম বিক্রি করতে শুরু করল রাইনের তীরে। নদীতে ভাসল পাল তোলা নৌকা। সাইকেলের এক চাকায় ভর দিয়ে ডোমের সামনে খেলা দেখাতে লাগল কৃষ্ণাঙ্গ এক তরুণ। আর রিটা বাওয়ার আরও বেশি করে ঢুকে গেল সেলিমের জীবনের ভেতরে। তখন আমার জীবন যেরকম গভীর আর তীব্র হয়ে উঠেছিল, সেটা পরে আর কখনোই হয়নি। আজ যখন সেসব দিনের কথা ভাবি, বিদেশে আমার গোটা জীবনটাই হারিয়ে যায় রিটার পেছনে। দিনগুলো এত রঙিন আর কখনোই ছিল না, জীবন এত অপেক্ষার, সময় এত আদিম, শরীর এত সুখের কখনো বুঝিনি।

৫৬ বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িটায় গিয়ে আমি প্রথমে সোফায় বসতাম। রিটা কিচেনে দাঁড়িয়ে কফি বানাত। কফি খেতে খেতে গল্প হতো আমাদের। ও কখনো মগের হাতল ধরত না, ধরত চারপাশে, দুহাতের তালুতে। যখন কথা বলত কফির

গরমটা ছোঁয়াত চিবুকে আবার কখনো কপালের পাশে, কান আর চোখের মাঝখানে।

বেশির ভাগ সময় ও আমাকে বকাঝকা করত। তারপর একসময় আমরা এক হতাম, স্নান করতাম। বিছানায় শুয়ে থাকতাম পাশাপাশি। কয়েক দিন পর আমি এই স্নানটাকে এড়াতে চাইতাম। না হলে আমার বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হয়ে যেত। আর এই দেরিটা হতো রিটাকে যুদ্ধের গল্প বলতে গিয়ে।

আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে চাইত রিটা। যেকোনো দেশের যুদ্ধের গল্প। আমি ওকে শোনাতাম একাত্তরের যুদ্ধের কথা। একেক দিন শোনাতাম একেক গল্প। কখনো মিথুন-মিত্রের আগে আবার কখনো পরে আমার কাছে সে বাংলাদেশের জন্মের কথা জানতে চাইত। এ নিয়ে তার ছিল হাজারো প্রশ্ন–কেন যুদ্ধ হলো ? যুদ্ধটা নয় মাসেই শেষ হয়ে গেল কীভাবে ? মোট কত মানুষ নিহত হয়েছে ? কারা ছিল যুদ্ধের শত্রু আর কারা মিত্র ছিল–এরকম আরও কত কিছু। একদিন গল্প বলার আগে রিটার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, ও কেন যুদ্ধের কথা শুনতে চায়। ও বলেছিল, 'ভালো লাগে।' কেন ভালো লাগে, সেটা ও বলেনি। শুধু বলেছিল, 'একেকটা যুদ্ধের কাহিনির ভেতর আমি খুঁজি মেজর শোয়ামব্যার্গারকে।'

সেই থেকে যুদ্ধের গল্প বলা শুরু।

আমি তাকে কাদের সিদ্দিকীর কথা বলেছি। বলেছি শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন আর পঁচিশে মার্চের সেই কালরাত্রির কথা। সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কেও বলেছি। রেসকোর্সের ময়দানে লাখ লাখ মানুষের জনসভা সেদিন কীভাবে উত্তাল এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, সেই গল্পটাও রিটা শুনেছে।

যুদ্ধের বীর নায়কদের কথা শুনতে ও খুব একটা আগ্রহী ছিল না। বঙ্গবন্ধু অথবা ইন্দিরা গান্ধীর কথা যখন বলেছি, তখন ওর চোখেমুখে তেমন একটা উৎসাহ ছিল না। রিটা জনযুদ্ধের কথা শুনতে চাইত–যুদ্ধে কত সহজে প্রিয়জন হারিয়ে যায়, অচেনা মানুষ স্বজন হয়। জানতে চাইত সাধারণ মানুষ কীভাবে নির্যাতিত হয়েছে, জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, আবার কীভাবে বেঁচে উঠেছে–সেসব কাহিনি। শুনত নারীর সম্ভ্রম হারানোর কথা। ওদের পুনর্বাসনের কথা। আরও শুনতে চাইত রাজাকারদের কাহিনি। ওদের পরিণতি কী হয়েছে, ওরা কী শাস্তি পেয়েছে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলো না কেন, যুদ্ধের সময় জন্ম নেওয়া শিশুরা এখন কোথায় এসব।

শেখ মুজিব না জেনারেল জিয়া–কে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেই বিতর্কেও তার তেমন আগ্রহ ছিল না। বঙ্গবন্ধু পরে সরকারের প্রধান না হয়ে জাতীয় এক নেতা হয়ে উঠতে পারতেন কি না, এই প্রশ্নও আমি রিটাকে করেছিলাম; কিন্তু ওর মুখে তার কোনো জবাব ছিল না। এরকম বীরত্বগাথা রিটা

শুধু শুনত কিন্তু প্রশ্ন করত না। আর জাহানারা ইমাম নিজে গাড়ি চালিয়ে কীভাবে নিজের ছোট ছেলে রুমিকে রণক্ষেত্রে পৌঁছে দিতেন, এই কাহিনি যখন শোনালাম, বললাম, জিসি দেবকে পাকিস্তানি সেনারা কীভাবে হত্যা করেছে; তখন ও আমার দিকে আরও বেশি ঘন হয়ে আসত। দুহাতে জড়িয়ে ধরত আমার গলা। সোনালি পাটের মতো ওর চুল এসে ছুঁয়ে থাকত আমার চিবুক। আর আমি টের পেতাম, ওর শরীর কীভাবে কেঁপে কেঁপে উঠত। তখন রিটা আমাকে ছাড়ত না সহজে। একটার পর একটা প্রশ্নে রাত বাড়াত। আমার আর স্নানের সময় থাকত না।

রিটা জানতে চাইল জাহানারা ইমামের কী হয়েছে, রুমি তার মার কাছে ফিরে এসেছিল কি না। ওকে বললাম, 'একাত্তরের দিনগুলো আমার মুখস্থ নাই।' এ ছাড়া গল্প বলতে বলতে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। একটা ঘটনা শেষ করতে করতে অনেক সময় খুব বেশি রাত হয়ে যেত আমার। কোনো কোনো গল্পের মাঝপথে উঠে যেতাম আমি। পরদিন যখন যেতাম গল্পটা কোথায় শেষ করেছিলাম, সেটা ধরিয়ে দিত রিটাই।

'এই সেলিম, ওখান থেকে বলো, রুমির বাবা যে একটা ব্রিজের ম্যাপ নিয়ে এল...'

আমি বলতে না চাইলেও রিটা আমাকে ছাড়ত না কখনো। বলতেই হতো। পরদিন সন্ধ্যায় চুমু খেতে চাইলে সে নিজেকে সরিয়ে নিত। আমাকে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে বলত, 'আগে রুমির কথাটা শেষ করো, তারপর...'

আমি ওকে আলতাফ মাহমুদের কথা বললাম। বললাম পাকসেনারা ওকে কীভাবে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। বেয়নেট দিয়ে তাকে এমনভাবে মেরেছিল যে তার চোখ কোটর থেকে বের হয়ে গালের ওপরে ঝুলছিল। রিটা তখন 'উফ' বলে একটা চিৎকার দিয়ে দুই চোখ দুই হাতে চেপে ধরেছিল।

রিটাকে যুদ্ধের ইতিহাস শোনানো, একসঙ্গে স্নান করা, ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা তারপর পাশাপাশি কিছু সময় শুয়ে থাকা–এসবই হয়ে উঠল আমাদের প্রাত্যহিক সন্ধ্যার ঘটনা।

আমি বলছি আর রিটা শুনছে।

রিটার শর্ত ছিল তাকে কোনো বানানো গল্প বলা যাবে না। একসময় আমার ভান্ডার ফুরিয়ে এল। আবিষ্কার করলাম, আমার জানা ইতিহাসের সবটাই ওকে বলা হয়ে গেছে। বাকি ছিল শুধু একটা কাহিনি, যা আমি কখনো কাউকে বলিনি, বলতে চাইনি। একদিন সন্ধ্যায় আমাকে বলতে হলো যুদ্ধের সেই বিভীষিকার কথাও। কাহিনিটা সেই যে শুরু হলো, রাত শেষ হয়ে ভোর হওয়ার পরেও সেই গল্পের শেষ হলো না। সেদিন রাতভর অঝোরে বৃষ্টি হলো শহরে। ভেসে গেল বাল্টহাসার স্ট্রাসে আর রিটার চোখের জলে স্নান সারা হলো আমাদের।

সেদিন আমি ওকে আমার মায়ের গল্প বলেছিলাম।

মায়ের মুখ

পাকিস্তানি সেনারা মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখ রাতে আক্রমণ শুরু করল ঢাকায়। এ জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। ক্র্যাক ডাউনের এই খবর প্রথম নিয়ে এল আব্বার এক ছাত্র। বলল, শত্রুরা সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে যাকে পেয়েছে, তাকেই মেরে ফেলেছে। ঢাকার রাস্তায় শুধু লাশ আর লাশ। রক্ত জমাট বেঁধে বেঁধে আটকে গেছে পাড়ার নর্দমা। রক্তের ওপরে ভাসছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। জগন্নাথ হলেও নাকি হামলা করেছে। লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে মেরে ফেলা হয়েছে নিরীহ ছাত্রদের। সাধারণ মানুষও রেহাই পাচ্ছে না মেশিনগান, মর্টার আর ট্যাংকের আক্রমণ থেকে।

নানা ধরনের গুজবে ঠাসা হয়ে থাকল অপারেশন সার্চ লাইটের রাত, শেখ মুজিবকে মেরে ফেলা হয়েছে, গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। ভোর থেকে কারফিউ। মাঝখানে সেটা তুলে নেওয়া হলো দুই ঘণ্টার জন্য। তখন থেকেই মানুষের পালিয়ে আসা শুরু। হায়েনাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বাঁচার জন্য শহর থেকে দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল মানুষ। ঢাকা থেকে যত দূর যাওয়া যায়। নদী পার হলেই যেন শান্তির অববাহিকা।

শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা ভেঙে গেছে ইয়াহিয়া খানের। গোপনে দেশ ছাড়ার আগে সেনাবাহিনীকে হত্যাযজ্ঞ চালানোর নির্দেশ দিয়ে গেল ইয়াহিয়া। আব্বা বললেন, ‘সবশেষ রুকু। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।’ আর সেই যুদ্ধের ঢেউ আমাদের বাড়িতে প্রথম এসে লাগল সাতাশ তারিখে। দুপুরের দিকে এল একটা পরিবার। বিকেলের দিকে এলেন আব্বার এক বন্ধু। তার সঙ্গে ছিলেন চাচি এবং তাদের তিন ছেলেমেয়ে। রাতে যখন আরও একটা পরিবার এসে আশ্রয় নিল তখন পুরো বাড়িটা হয়ে উঠল একটা শরণার্থী শিবির।

সব পরিবারের মুখে একই গল্প।

অচেনা এই মানুষগুলো কয়েক দিনেই হয়ে উঠল কাছের মানুষ। এদের দেখভাল করতেন আমার মা। রান্নাবান্না, কে গোসল করল আর কে করল না, কার কী লাগবে, কে কোথায় ঘুমাবে, সব। আব্বা আর সব পুরুষেরা রুমাল চোর খেলার

মতো গোল হয়ে রেডিওতে খবর শুনতেন। অভিনেতার মতো করে কে একজন খবর পড়ত। আকাশবাণী। আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এই পরিবারগুলোর কাছে মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ চমকের মতো খবর আসত। বেশির ভাগই আসত ঢাকা থেকে। কারও ভাই যুদ্ধে গেছে, কারও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কারও আত্মীয়স্বজন মারা গেছে। এসব খবর নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়ির এক দুধওয়ালা।

তার দুধের কলসিতে ভাসত সবুজ কচুরিপানা। তার নিচে থাকত চিরকুট। আব্বার কাছে লেখা।

দুধওয়ালা আসত মাঝেমধ্যে, সকালের দিকে। তার জন্য অপেক্ষা করত সবাই। কেন করত, জানি না। তার একেকটা খবরে বাড়ির সবাই ভেঙে পড়ত। কখনো কখনো উঠত কান্নার রোল। প্রথমে শোনা যেত গগনবিদারি চিৎকার এবং পরে সেটা শান্ত হয়ে আসত। জোরে কান্নার অনুমতি ছিল না তখন। দুধওয়ালা যেসব খবর নিয়ে আসত তার সবকটাই ছিল খারাপ খবর। মৃত্যু, অগ্নিকাণ্ড, লুটতরাজ আর ধ্বংসযজ্ঞের। কিন্তু আব্বা যেটাকে যুদ্ধ বলতেন সেই যুদ্ধের কোনো খবর আসত না। এটা আসলে কোনো যুদ্ধ ছিল না। যুদ্ধ হলে তো পাল্টা পক্ষ লাগে। এখানে কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। সব খবরই ছিল একতরফা, শুধু বাঙালিদের মার খাওয়ার গল্প। রুখে দাঁড়ানো বা পাল্টা আক্রমণের কোনো খবর ছিল না দুধওয়ালার কলসিতে।

মাসখানেক পর এই তিনটা পরিবার এক এক করে চলে গেল আমাদের বাড়ি ছেড়ে। এরা চলে গেল কিন্তু আসতে লাগল আব্বার ছাত্ররা। ঘন ঘন। একসময় ছাত্ররা এল রাইফেল কাঁধে। রাতের অন্ধকারে। চাদরের নিচে লুকিয়ে। ওরা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। আসত দুধওয়ালা, তখন শুধু সকালে না, আসত দুপুরে ও রাতে। সে খবর নিয়ে আসত ওরা কবে কোন দিক দিয়ে কোথায় যাবে, কার কী লাগবে। খবর আসত মুক্তিরা ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ওরা কোথায় অ্যাম্বুশ করেছে, বোমা মেরে কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে ব্রিজ আর কোন রুটে আজকাল বেশি চেক হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধারা আসত আব্বার কাছে কিন্তু তাদের পরম আশ্রয় ছিলেন আমার মা। রুখসানা বেগম, আব্বার রুকু। তাদের তিনি খাওয়াতেন, ঘুমানোর জায়গা করে দিতেন। স্যাভলন ডেটলে ধুয়ে পট্টি বেঁধে দিতেন ক্ষতস্থানে। দোয়া-দরুদ পড়ে ওদের মাথায় ফুঁ দিতেন। দুহাত তুলে দোয়া করতেন জায়নামাজে বসে। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত আমার মা রাত জেগে বাড়ি পাহারা দিতেন। কোলের মধ্যে বন্দুক নিয়ে বসে থাকতেন জানালার পাশে।

একদিন আব্বাও চলে গেলেন তার ছাত্রদের সঙ্গে। আব্বা চলে যাওয়ার পর দুধওয়ালা খবর নিয়ে আসত মার কাছে। ও যখন দাওয়ায় এসে বসত, মাও বসত

মোড়া টেনে। টিনের জগটায় যখন দুধ ঢালত, ও তখন মায়ের আরও কাছে চলে আসত। বসত উবু হয়ে। এমনভাবে বসত যেন ও মাটির নিচে ঢুকে যাবে। কলসির মুখের কাছে টিনের ছোট্ট একটা কৌটা আলগোছে ধরত দুধওয়ালা। কচুরিপানা আটকে থাকত ওখানে। ফিসফিস করে দুধওয়ালা মায়ের কানের কাছে বলত আব্বারা এখন কোথায়, বাড়ি থেকে কিছু লাগবে কি না, এসব। তারপর উঠে যেত মা। যখন টাকা নিয়ে ফিরে আসত তার ভেতরে লুকানো থাকত চিরকুট, আব্বার কাছে লেখা।

দুধওয়ালা একদিন বাড়িতে এল খুব ভোরে, তার কলসিতে তখন দুধ ছিল না, কচুরিপানার নিচে ছিল টলটলে পানি। ও বলল যে আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে মিলিটারিরা বাজারে এসেছে। ওরা বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করছে। মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে অল্প বয়সী ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ না পেলে নিয়ে যাচ্ছে হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল।

একদিন ও খবর আনল বাড়ি থেকে সোমত্ত মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়ার।

তখন জুলাই মাস। জমিজমা ডুবে গেছে বর্ষার পানিতে। আমাদের বাড়িটা তখন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো। রেডিওতে শোনা গেল তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে কুমিল্লায়। শত্রুরা ক্রমশ আরও ভেতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পারছে না শুধু পানির কারণে। একটা জায়গা পর্যন্ত এসে ওরা ক্যাম্প করেছে। দুধওয়ালা একদিন তার জগের ভেতর, কচুরিপানার নিচে যে কাগজ রেখে গেল, তাতে খবর ছিল মুক্তিযোদ্ধারা জাফরগঞ্জের কাছে একদল পাকিস্তানি সেনাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ওরা আসছিল আমাদের গ্রামের দিকে। আব্বার খোঁজে।

তখন মুক্তিযোদ্ধারা আসত নৌকায় করে। ছইওয়ালা নাও। আব্বা আসতেন খুব কম। তবে আব্বার খবর থাকত ওদের কাছে। আব্বা ছিলেন একটা বাহিনীর কমান্ডার। দুধওয়ালার কাছে মা খবর পেত আব্বার দল এখন কোথায়, কবে আসবে এদিকে, এরপর কোথায় যাবে। বাড়ি থেকে একদল যেত, আরেকদল আসত। আমার মা এদের কাছে খবর পাচার করতেন। আর অপেক্ষা করতেন আব্বার জন্য।

কখনো কখনো ওরা অস্ত্র জমা রাখত মার কাছে। নৌকার গলুই ভর্তি করে আসত গোলাবারুদ। মা একটা গর্ত করলেন ঘরের এক কোনায়। গর্তটা করতে তার কয়েক দিন লাগল। গর্তের মুখটা তিনি ঢেকে দিলেন কাঠের কয়েকটা তক্তা দিয়ে। তারপর পুকুর থেকে মাটি তোলা হলো, কাঠের তক্তাগুলো লেপে দেওয়া হলো পুকুরের মাটিতে। গর্তের ওপরে তিনি রাখলেন একটা ধানচালের ঢোল। তারপাশে পানির কলসি আর একটা কাঠের মিটসেফ। দেখে বোঝার কোনো উপায় ছিল না যে সেখানে অস্ত্রের পাশাপাশি লুকিয়ে থাকতে পারে মানুষও।

তখন অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। জানোয়ারেরা খবর পেয়ে গেছে আব্বার নেতৃত্বে কলেজের ছেলেরা মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে। আব্বা যোগ দিয়েছেন মেজর হায়দারের সঙ্গে, সেক্টর টুতে। স্বাধীনতার কিছু আগে আব্বা একবার এসেছিলেন বাড়িতে। মাকে দেখতে। সারা রাত পায়ে হেঁটে ভোরের দিকে বাড়ি এলেন তিনি। বুট খুলে আব্বা পা দিলেন পুকুরের ঠান্ডা পানিতে। পা জমাট বেঁধে গেল তার। ভোরবেলা গরম পানিতে লবণ দিয়ে সেক দিল মা। এক গ্লাস গরম দুধ সুরা পড়ে ফুঁ দিয়ে রাখলেন আব্বার শিয়রের কাছে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে দূরত্ব যখন একটামাত্র বুলেট, তখন মা ভাবলেন তার ফুঁ দেওয়া দুধ আব্বাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

একসময় আব্বার গন্ধে গন্ধে বাড়িতে এল চেয়ারম্যান মতিউর রহমান। তারপর মিলিটারিরা হানা দিল পুরো গ্রামে। আব্বাকে খোঁজা হলো চিরুনি চালানোর মতো। কেউ কিচ্ছু বলল না। খোঁজা হলো পুকুরে, খড়ের গাদায়, বাঁশঝাড়ে। আব্বাকে তিন দিন লুকিয়ে রাখা হলো ঘরের ভেতর মায়ের করা সেই গর্তে। তাকে না পেয়ে হানাদারেরা বাড়িঘরে আগুন লাগাতে লাগাতে ফিরে গেল শহরের দিকে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ক্ষেতের ফসল, গোয়ালঘর, খালের সেতু। পাকিস্তানি সেনারা সারি সারি জিপ নিয়ে এগিয়ে গেল বাজারের দিকে। পিপড়ার মতো। যাওয়ার পথে বাঁশের পুলে আগুন ধরিয়ে দিল, গুলি চালাল গোরস্থানেও। কবরের নীরবতা খান খান হয়ে গেল মর্টারের শব্দে। মানুষের আর্তনাদে যখন ভেঙে পড়ছিল পরমতলার আকাশ শত্রুরা তখন কবর খুঁড়তে শুরু করল। ওরা সন্দেহ করল, সেখানে নাকি পালিয়ে আছে মুক্তিরা। মরা লাশ তুলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে আবারও গর্তে ছুড়ে দিল। তারপর ছুটল বাজারের দিকে। পেছনে পরে রইল একটা পোড়া গ্রাম। ছাই হয়ে যাওয়া পরমতলা।

মিলিটারিরা চলে গেল কিন্তু গেল না শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মতিউর রহমান। তাকে সবাই বলত মতি চাচা। প্রায়ই আসত সে বাড়িতে। মার কাছে আব্বার খবরাখবর জানতে চাইত। শুরুর দিকে সে বলত আব্বাকে বাঁচিয়ে দেবে। তার সঙ্গে নাকি পাকিস্তানি নেতাদের যোগাযোগ আছে। পরের দিকে সে আব্বাকে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাত। একবার বলত যুদ্ধে নাকি আব্বা মারা গেছে, শেয়ালে খাওয়া তার লাশ নাকি পাওয়া গেছে ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়কের ঢালে। আরেকবার বলত তাকে পাঞ্জাবিরা ধরে নিয়ে গেছে, আটকে রেখেছে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে। এ ছাড়া আব্বার আর কোনো খবর আসত না পরমতলায়।

খবর আসার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল একদিন বিকেলে। মতিউর রহমান মিলিটারিদের দেখিয়ে দিলেন বাড়ির দুধওয়ালাকে। পাকিস্তানি সেনারা যখন তাকে ধরে নিয়ে যায়, তখন সে ছিল তার গোয়ালঘরে, দুধ দোয়াচ্ছিল ও। চোখ

বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো বাজারে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের সামনে তার হাত গরুর দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো। তারপর দাঁড় করানো হলো লবণের দোকানটার সামনে, বটগাছটার ঠিক নিচে। হাঁটুমুড়ে বসতে বলা হলো তাকে। বলল, মাথা নোওয়াতে। ওর গা থেকে লুঙ্গি খুলে নেওয়া হলো। লাথি দিয়ে ফেলা হলো মাটিতে। তারপর বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো হলো তার শরীর। গলাকাটা মুরগির মতো বাজারের মাটিতে তড়পাতে লাগল দুধওয়ালার রক্তাক্ত দেহ। কালো মাটি লাল হলো দুধওয়ালার রক্তে। ও যখন নিথর হয়ে পড়ে রইল, তখন মিলিটারিরা বাজার ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে ওর শরীরে গুলি করল। একটা না দুটো না, বৃষ্টির মতো গুলি চালানো হলো মেশিনগান থেকে। চালুনের মতো ঝাঁঝরা হয়ে গেল তার বুক। তারপর দুধওয়ালার লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হলো বাজারের পেছন দিয়ে বয়ে চলা খালের পানিতে।

খালের ময়লা পানি লাল হয়ে গেল আমাদের খবরওয়ালার রক্তে। দুধওয়ালার লাশের সঙ্গে ভেসে গেল ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে যাওয়া মুণ্ডহীন একটা মরা গরু। ঘোলা স্রোতের ভেতর গরুটা একবার তলিয়ে যাচ্ছিল আবার ভেসে উঠছিল দুধওয়ালার লাশের পেছনে। কখনো সামনে।

কয়েক দিন পর পরমতলায় আবার খবর আসা শুরু হলো। এবার রেডিওতে। পাকিস্তানিরা পালিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে শত্রুমুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। গেরিলারা অগ্রসর হচ্ছে ঢাকার দিকে। মুক্তি খুব কাছে। রাজধানীর পতন হলেই স্বাধীনতা।

আটাশ কি ঊনত্রিশ তারিখে মতিউর রহমান আবার এল আমাদের বাড়িতে। এবার সদলবলে। তখন রাত পেরিয়ে ভোর হয় হয়। আমি আর আমার ছোট ভাই ঘুমিয়ে ছিলাম মায়ের আঁচলের নিচে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। টিনের ঘরের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল উঠোনে জোনাক পোকার মতো আলো। নাচানাচি করছে। ওরা প্রথমে আব্বার নাম ধরে ডাকল। তারপর মায়ের। সাড়া না পেয়ে আমার নাম ধরেও নাকি ডেকেছিল জানোয়ারেরা।

প্রথমে মনে হয়েছিল, হয়ত আব্বা এবং তার দলবল। নতুন কোনো অপারেশনে যাওয়ার পথে বাড়িতে এসেছে। পরে আওয়াজ শুনে বোঝা গেল মতিউর রহমান এবং তার বাহিনী। উঠোন থেকে কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ হলো। সেই আওয়াজ হারিয়ে গেল রাতের বিরান চরাচরে। গুলির শব্দে থেমে গেল ঝিঁঝি পোকাগুলোও। আমাদের দুই ভাইকে বুকে জড়িয়ে মা ইঁদুরের মতো ঢুকে গেলেন গর্তের ভেতর।

একটা শেয়াল কয়েকবার ডাকল পুকুরের পশ্চিম পারে। ঝড়ের মতো একটা বাতাস বয়ে গেল টিনের চালার ওপর দিয়ে। তারপর হায়েনারা ঘরের দরজা

ভাঙল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল সারা ঘর। চালের ডোল, ঘরের মাচা, খাটের বাক্স শুয়োরেরা তছনছ করল। তারপর একসময় খোঁজ পেল লুকানো সেই গর্তের। একটা টর্চ নিয়ে সেখানে নামল মতিউর রহমান। তার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আকাশ ভেঙে নেমে এল নরকও।

আমার বয়স তখন দুই। সঙ্গে ছিল এক বছরের ভাই। দুই শিশুকে মা আগলে রাখতে চাইলেন তার দুই ডানার নিচে।

মাটির নিচে, গর্তের অন্ধকারে মায়ের সেই ডানা ভেঙে দিল মতিউর রহমান, আমাদের মতি চাচা। ফজরের আজানের চেয়েও আরও তীব্র হয়ে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল মায়ের চিৎকার। জানোয়ারটার পর গর্তে নেমেছিল আরও কিছু পাকিস্তানি সেনা। মা আর কোনো চিৎকার করেনি। জন্তুরা ছিঁড়েখুড়ে খেল মার শরীর। তারপর নিঃশব্দে ভোর হলো। মতিউর রহমানকে একটা জলপাই রঙের জিপে উঠিয়ে মিলিটারিরা চলে গেল গ্রাম ছেড়ে।

আমার ধারণা ছিল, কোথাও বিপর্যয় নেমে এলে সেটা টের প্রায় প্রকৃতি। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও স্তব্ধ হয়ে যায়, ডাক ভুলে যায় পাখিরা, নদীর স্রোত মরে যায় অথবা বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায় গাছের ফুল-পাতা। কিন্তু সেদিন সকালে সেরকম কিছু হলো না আমাদের বাড়িতে। গাছটার মাথার ওপর দিয়ে পরদিন সকালে উঠল পরিচিত লাল সূর্যটা, একইরকম সুবাস ছড়াল লেবু গাছটা আর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে রাস্তা, তার মুখে কলাগাছের সবুজ পাতাগুলো দুলতে লাগল বাতাসে।

তারপর একদিন ডিসেম্বর এল, সেই সঙ্গে এল লাল সবুজ পতাকা। নতুন বছর এল, শেখ মুজিব ফিরে এলেন স্বাধীন দেশের মাটিতে। একসময় বাবাও ফিরলেন আমাদের পোড়া বাড়িটায়। কিন্তু মা ফিরলেন না তার স্বাভাবিক জীবনে। ফিরলেন না অথবা ফিরতে পারলেন না। কেমন অপ্রকৃতস্থ হয়ে গেলেন তিনি। একসময় আব্বাও জানতে পারলেন সব ঘটনা। মাকে বলতে হলো না কিছু। জানা-অজানা মানুষেরা মার হয়ে সেই কাজটা করে দিল। জবাবে কিছুই করলেন না তিনি। শুধু নীরব হয়ে গেলেন। আবার যোগ দিলেন কলেজে। এবং ডুব দিলেন বইয়ের ভেতর।

মাকে মেনে নিতে পারল না আব্বার চাচা-চাচিরা, মামা ও খালারা। তাদের কাছে কলঙ্ক হয়ে উঠলেন আমার মা। সমাজের মানুষেরাও কৌতূহলী হয়ে উঠল মাকে নিয়ে। তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠল ঘৃণা। হঠাৎ করে তিনি হয়ে উঠলেন চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো। চারদিকে কানাঘুষা। মানুষের মুখে মুখে নানান কথা। ঘর থেকে একেবারেই বের হতেন না মা। সারা দিন শুয়ে বসে থাকতেন বিছানায়। আর দুহাতে জড়িয়ে রাখতেন তার দুই শিশুকে।

মা যেদিন বাইরে যেতেন, সেদিন আর ফিরতেন না বাড়িতে। বাজারে গিয়ে বসে থাকতেন তিনি। তার হাতে থাকত টিনের একটা জগ। দুধওয়ালাকে যেখানে হাঁটুমুড়ে বসানো হয়েছিল, সেই বটগাছটার নিচে, লবণের দোকানগুলোর মুখে বসে থাকতেন মা। সকাল গড়িয়ে দুপুর হতো, সন্ধ্যা নামত বটগাছের মাথায়, রাতে গাঢ় অন্ধকার নামত পরমতলার জমিনে ও আকাশে কিন্তু মা বাড়ি ফিরতেন না। খোলা আকাশের নিচে সারা রাত বসে থাকতেন মা।

আব্বা তাকে আনতে গেলে চিৎকার করে গ্রাম মাথায় তুলতেন রুখসানা বেগম। কুয়াশায় কালো হয়ে উঠত তার মুখ। একসময় আব্বাও আশ্রয় নিতেন নুনের দোকানে। ওখানেই থাকতেন তিনি। মাকে পাহারা দিতেন আব্বা। একসময় মা নিজেই ফিরতেন বাড়িতে।

সব সময় মায়ের হাতে থাকত টিনের জগটা। তিনি সেটা হাতছাড়া করতেন না কখনো। ওটা কোলে নিয়ে বসে থাকতেন আর মাঝেমধ্যে সামনে মেলে ধরে বলতেন, 'রক্ত দে আমাকে, তোর রক্ত চাই এখানে, এই জগে।'

এভাবেই কোনোমতে মা বেঁচে রইলেন পরিবারে, সমাজে, তার সন্তান ও দুধের জগটাকে ঢাল বানিয়ে। যুদ্ধের পর সবাই ত্যাগ করল মাকে। আমার নানা-নানি, মামা-খালারাও এলেন না বাড়িতে। শুধু আব্বাই তাকে রেখে দিলেন পুরনো একটা কাপড়ের মতো। পুরনো কাপড় পরতে আরাম, হয়ত সে কারণে।

আমার মা আসলে ছিলেন একজন মৃত মানুষ। জীবন্ত একটা ফসিলের মতো। বিছানায় শুয়ে সারাক্ষণ বিড়বিড় করতেন আর তাকিয়ে থাকতেন ঘরের সেই কোনার দিকে, যেখানে তিনি বাংকারের মতো একটা গর্ত তৈরি করেছিলেন। এখন মনে হয়, আমার মা আসলে সেখানে অস্ত্রের গুদাম নয়, রচনা করেছিলেন তার নিজের কবর।

স্বাধীন দেশে গঠিত হলো নতুন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট হলেন, অস্ত্র ফেলে দিয়ে মানুষ কাজেকর্মে ফিরে গেল আর আমার মা আরও বেশি করে সেঁধিয়ে যেতে লাগলেন গর্তের ভেতর। ছোট গর্ত থেকে এবার একটা বড় গহ্বরে। এই গর্ত মাটির নিচে নয়, এটা ছিল সমাজের ভেতর। এর মধ্যে দুবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রথমবার গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে। তখন আব্বা নির্দেশ দিলেন, মাকে কোনো শাড়ি দেওয়া যাবে না। তাকে দেওয়া হতো শুধু ব্লাউজ, পেটিকোট আর ওড়না। পরেরবার মরতে চাইলেন ওড়না পেঁচিয়ে। তারপর সেটা দেওয়াও বন্ধ করা হলো। তারপর থেকে অন্ধকার একটা ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন রুখসানা বেগম।

ঘরের দরজা খোলা হতো না কখনো। দরজার ওপারে মা আর এপাশে ঝুলত তালা। জানালা দিয়ে তাকে খাবার দেওয়া হতো। মা দাঁড়িয়ে থাকতেন জানালার শিক ধরে। এপার থেকে লোকেরা তাকে ডাকত রুকা পাগলি। আমাকেও যেতে দেওয়া হতো না তার কাছে। দুই ছেলেকে দেখলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন মা। তার মুখে লেগে থাকত আশ্চর্য রকমের সুন্দর একটা হাসি। মায়ের সেই মুখ দেখে তার কোলে যাওয়ার জন্য ছটফট করতাম আমি। কাঁদতাম গলা ফাটিয়ে। জাফরগঞ্জ বাজার থেকে শোনা যেত আমার কান্নার আওয়াজ।

সরকার দালাল আইন করল বায়াত্তর সালের দিকে। আর মতিউর রহমান গ্রেপ্তার হলো পরের বছরের জানুয়ারি মাসে।

এই খবর পাওয়ার পর অবিশ্বাস্য রকমের একটা ঘটনা ঘটল আমাদের বাড়িতে। পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন আমার মা। আবার শাড়ি পরলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। রান্না ঘরে জগটা রেখে দিলেন মিটসেফের ওপর। আমাকে কোলে নিলেন। উঠোনে বসিয়ে গোসল করাতেন আমার মা। মুখে লোকমা তুলে খাইয়ে দিতেন। আঁচড়িয়ে দিতেন মাথার চুল। আব্বার জন্য কাপড় ইস্ত্রি করে রাখতেন। গুছিয়ে রাখতেন খোলা বই। পরের বছর আমাদের ছোট বোনের জন্ম হলো। সংসার নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে গেলেন আমাদের মা।

বেশির ভাগ সময়ই তিনি থাকতেন রান্না ঘরে।

একদিন সন্ধের পর সেই রান্না ঘর থেকে আমার মা সোজা চলে গেলেন মতিউর রহমানের বাড়িতে। সাধারণ ক্ষমায় মতিউর রহমানের জেল থেকে বেরিয়ে আসার সপ্তাহখানেক পর। মার হাতে ছিল একটা দা। মতিউর রহমান তখন বসেছিল ঘরের দাওয়ায়। হুকো টানছিল সে। রাতের অন্ধকারে হুকোর মাথায় জ্বলছিল টিকাটা। আর ধারালো দাওটা জ্বলছিল রুখসানা বেগমের হাতের মুঠোয়।

মায়ের কোপে সেদিন মতিউর রহমানের হাত থেকে শুধু কয়েকটা আঙুল পড়ে গিয়েছিল কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল মায়ের শরীর। মতিউর রহমান, আমাদের মতি চাচা, এলোপাতাড়ি কুপিয়েছিল মায়ের শরীর। তার দুই হাত নাকি ঝুলছিল কনুইয়ের কাছে। বুকটা ফেঁড়ে গিয়েছিল সামনে-পেছনে, ডান পায়ের গোড়ালি থেকে নিচের অংশটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল মায়ের। কসাইয়ের দোকানের সামনে, রক্তের স্রোতের ওপরে চামড়া তুলে নেওয়া, রান কেটে ফেলা গরু যেভাবে পড়ে থাকে, সেভাবে পড়েছিল মা, কিন্তু রাতের আঁধারে আমার মায়ের লাল রক্ত কারও চোখেও পড়েনি।

ওয়াইনের গ্রামে

মায়ের গল্পের পর রিটা সপ্তাহ দেড়েক একাত্তরের আর কোনো গল্প শুনতে চায়নি। জানতে চায়নি আমার আব্বার কথাও। একবার কি দুবার আমরা শরীরের খেলায়ও মেতে উঠেছিলাম কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। শেষ কয়েক দিন আমরা স্নানও করিনি। আমাকে ঘোড়া বানায়নি রিটা। শোওয়ার ঘরের মেঝেতে আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম। কখনো মুখোমুখি আবার কখনো পাশাপাশি। রিটা রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজাত। একটা শেষ হলে আরেকটা। কখনো ভিভাল্ডি, কখনো শোপে। নরম আলোর নিচে শুয়ে শুয়ে আমরা খেলতাম শাপলুডু। রিটা যখন মই বেয়ে তরতর করে নব্বইয়ের ঘর পার হয়ে যেত আমি সাপ হয়ে ওকে গিলে খেতাম। রিটা আবার নিচ থেকে কুট কুট করে ওপরে উঠত।

রিটা যখন মেঝেতে বসত ওর পা দুটো তখন হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে ওপরের দিকে উঠানো থাকত। ওর পায়ের পাতা নাচত গানের সঙ্গে সঙ্গে। আঙুলগুলো চাঁপা কলার মতো ছোট্ট লম্বা ও সরু সরু হলেও বুড়ো আঙুলটা ছিল কচ্ছপের মাথার মতো। চিবুকটা থাকত বাম হাঁটুর ওপরে আর ওপরের দাঁত দিয়ে ও নিচের ঠোঁটটা কামড়াত।

শনিবার বিকেলে আমরা বেরিয়ে গেলাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে থেকে। চলে গেলাম বহু দূর। সোজা রাইনের তীর ধরে। আমি আর রিটা, সাইকেলে। চালাতে চালাতে একসময় চলে গেলাম দূরের একটা গ্রামে, যেখানে পাহাড়ের ঢালে ওয়াইনের চাষ হয় সেই ভাইনডর্ফে। পাতা রঙের জামা পরা কয়েকটা মেয়ে আঙুর তুলছিল ঝুড়িতে। যেতে যেতে পথের এক পাশে কখনো পড়ল নৌকার ঘাট, রেলস্টেশন, পাহাড়ের মতো উঁচু প্রাচীর, গাড়ির ডিপো, আইসক্রিমওয়ালার বাহারি লরি, কখনো ব্রাটভোস্টের ছোট ছোট দোকান। কোথাও পাকা আবার কোথাও কাঁচা রাস্তা। চাকার নিচে পড়ছিল সবুজ ঘাস, জংলি ফুল আর ঝরা ম্যাপলের পাতা।

সাইকেল চালিয়ে আবার ফিরে এলাম শহরে, নদীর যেখানটায় সবচেয়ে বড় ব্রিজ, সেখানে। আসার সময় কখনো রিটা আমার সামনে, আমি পেছনে। পেছন থেকে আমি দেখছি ওর সাইকেল চালানো। কী ছন্দোময় গতিতে সাইকেল চালায় রিটা ! সামনের চাকাটা যখন এগোয়, অজগরের মতো ডানে-বাঁয়ে দুলতে থাকে ওর শরীর। কখনো জোরে, কখনো খুব আস্তে চালায় রিটা। যখন জোরে চালায়, তখন নিমেষে উধাও হয়ে যায় আমার সামনে থেকে, কিছুক্ষণ পরে ভুস করে ভেসে ওঠে পাহাড়ের পেছনে। আর যখন ঢালু পথে সাইকেলটা নিচে নামে, একটা পেডেলের ওপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে ও। তারপর পেডেলটা যখন ওপরে ওঠে তখন স্কার্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ওর নগ্ন ফরসা পা।

সন্ধের দিকে আমরা ফিরে এলাম বাড়িতে। এবার আর চারতলায় না, তিন তলায়। বাল্টহাসার স্ট্রাসে না, পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িটায়। ঘরে ঢুকেই রিটা দেখতে চাইলো আমার মায়ের ছবি। দেখালাম। একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শাদাকালো, মার মুখে দুর্দান্ত এক হাসি। আরেকটা ছবিতে আব্বার সঙ্গে। যুগল ছবিটার দিকে তার খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। একসময় সেটা ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। মায়ের একক ছবিটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখল খুটিয়ে খুটিয়ে। তখন ওর মুখের ভঙ্গিটা যা হয়েছিল, সেটা আমি কোনো দিন ভুলিনি। ওই মুখটা আমার এখনো মনে আছে।

আমার স্মৃতিতে রিটার কতগুলো মুখ জমানো আছে। যখনই আমি ওর কথা ভাবি, তখনই সেই মুখগুলো ঘুরেফিরে চলমান হয়ে উঠে মনের আয়নায়। খুব বেশি না, হাতেগোনা কয়েকটা ছবি। এসব মুখ আমি খুব যত্ন করে মগজের কোষে কোষে জমিয়ে রেখেছি। যখন ইচ্ছে হয়, মনের পর্দায় আলো ফেলে আমি রিটার সেই মুখগুলো দেখি। সেই রিটা। ওর ছবি কোথাও বিবর্ণ হয়নি। অবিকল একই রয়ে গেছে। ধুলো জমেনি ওর মুখের ওপর। একটা লম্বা সময় গেছে, আমি রিটাকে ভুলে গিয়েছিলাম। তখন ওর কথা তেমন একটা মনেও আসেনি। অনেক পরে রিটা আবার ফিরে এসেছে। এসে কোনো উৎপাত করেনি। বরং আমাকে স্মৃতিকাতর করেছে। তখন আমি রিটার সেই মুখ মনের প্রোজেক্টরে চালাতাম এবং দেখতাম। একটা ছবিতে রিটা অন্ধকার ঘরের ভেতর, রং লেগে যাওয়া পুলওভার মাথার ওপর দিয়ে টেনে খুলছে। আরেকটা ছবিতে কিচেনের দরজার কাছে রিটা পা ক্রস করে দাঁড়িয়ে আছে। আরও একটা ছবি, যেখানে রিটা বাথটাবের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে, ওর হাতের মধ্যে ভাঁজ করা তোয়ালে। তারপর যে ছবিটা খুব বেশি জীবন্ত সেটা হচ্ছে, রিটা আমার ওপরে বসে আছে, তার মুখটা হা করে খোলা, সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে একটা নীরব শীৎকার।

আর আছে মায়ের ছবি দেখার পরে রিটার এই রক্তশূন্য মুখটা। এই ছবিতে ওকে আরও বেশি মায়াময় মনে হয়।

একসময় রিটা মায়ের এই ছবিটাও ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। বলল, আমার কপালটা নাকি রুখসানার কপালের মতো। আমি যখন সেটা গুছিয়ে রাখছি তখনই প্রশ্নটা করল রিটা। মার কথা জানতে চাইল না ও। জানতে চাইল না আর কোনো যুদ্ধের কথাও। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'মতিউর রহমান এখন কোথায় ? ওর কি কখনো বিচার হয়েছে ?'

পরমতলা '৭১

আমার মনের ক্যামেরায় পরমতলা গ্রামের যে ছবি, তার প্রায় সবগুলো তোলা কিশোর বয়সে। ছবিগুলো খুব তরতাজা, ফুরফুরে, মনে হয় এই কয়েক দিন আগে ছাপা হয়েছে। কোথাও কিছু বিবর্ণ হয়নি, ভাঁজও পড়েনি কোনোখানে। মনের ক্যানভাসে আলো ফেলে সেগুলো যখন দেখি, মনে হয় আমি গাঁয়ের মেঠো পথে হাঁটছি, আমার সামনে শিমের একটা মাচা, সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে গাঢ় বেগুনি ফুল। নাড়ায় পোড়ানো মটরশুটির গন্ধ যখন নাকে এসে লাগে, আমি টের পাই এই পরমতলা আমি বহু আগেই হারিয়ে ফেলেছি।

গ্রামের কোন দিকে রাস্তা, কোথায় বাঁশের সাঁকো, তার কোন পাশে বাজার, বড় জাঙ্গালটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে কোন দিক থেকে কোথায় হারিয়ে গেছে, সরু খাল কোথায় কোন গাঙে গিয়ে পড়েছে, আর আকাশ ছুঁয়ে যাওয়া তিনটা তাল গাছের কয়টা বাড়ির পরে আমাদের ভিটা, তার সবই আমার সামনে জীবন্ত।

কখনো কখনো রাইনের পশ্চিম তীরে, যেখানে ছোট্ট ছোট্ট নৌকাগুলো নোঙর করত, সেখানে কাঠের একটা বেঞ্চে বসে আমি ফিরে যেতাম আমাদের পরমতলা গ্রামে। মনে হতো, এটা গ্রামের সেই খাল, যে পথ দিয়ে আব্বা ও তার সঙ্গীরা বাড়ি আসত মুক্তিযুদ্ধের সময়। গ্রীষ্মের দুপুরে জাহাজগুলোর ডেকে গমগম করত খালি গায়ের নারী-পুরুষ, রোদে পুড়ে ওদের চামড়াগুলো হয়ে উঠত বিয়ারের রঙের মতো। মাথায় ঝুঁটি করা বাচ্চা মেয়েগুলো যখন মায়ের হাত ধরে জাহাজের ভেতর থেকে তীরে নেমে আসত, মনে হতো নৌকাটা পরমতলার ঘাটে গিয়ে ভিড়েছে, আর মা কোমরে ধরে গলুইয়ের ওপর থেকে আমাদের নামাচ্ছেন।

পরমতলা থেকে আজ আমি অনেক দূরে, প্রথমে সেফারা বাজার, তারপর মুরাদনগর টাউন, সেখান থেকে সায়েদাবাদ বাস ডিপো, তারপর নাবিস্কো মোড় হয়ে ৩০০/এ নাখালপাড়া, সেখান থেকে মহাখালী, তারপর এয়ারপোর্ট, এরপর তো আর হিসেব নেই, কত দেশ, কত পাহাড়, কত, মরুভূমি কতশত বাড়িঘর-খাল-বিল-বন-জঙ্গল আর সাগর-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফ্রাংকফুর্ট হয়ে প্রথমে কোলন, তারপর ২১ নম্বর পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই বাড়িটায়।

পরমতলার সঙ্গে আমার যতটুকু মমতা আর যেটুকু ভালোবাসা, তার সবটাই তৈরি হয়েছে সেখান থেকে চলে আসার পর। এই গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পরই আমি জানতে পেরেছি, পরমতলা কেমন, তার কোথায় কী, সেখানে আমার কে আছে, সবই। যুদ্ধের সময় এই গ্রাম কেমন ছিল, আমি জানি না। বাবার কাছে যেটুকু শুনেছি, তাতে এই ছবিটা পুরো হয় না। শুনেছি আব্বা যখন গভীর রাতে বাড়িতে আসতেন, তার শরীর একটা মোটা কাঁথায় পেঁচানো থাকত। তার নিচে লুকানো থাকত রাইফেলের নল। আর ফসলের ওপর দিয়ে তখন শোঁ শোঁ করে বাতাস বইত। সেই বাতাস নুইয়ে দিত কলাগাছ, বাঁশের ঝাড়ও। কেউ বলেছিল বর্ষার সময় আব্বা আসতেন নৌকায়। বাজারের পেছনে ছিল খাল। এখনো আছে। তখন নাকি ওটা আরও প্রশস্ত ছিল, নদীর মতো। সরু হতে হতে ওটা এখন শুধু স্রোতের ধারার মতো। আব্বা ও তার ছাত্ররা এই খাল দিয়ে প্রথমে আসত বাজারে, তারপর সর সর করে জাহাজের মতো ছুটত ডুবে যাওয়া ফসলের ওপর দিয়ে, ভিড়ত পুকুরের পশ্চিম পাড়ে, যেখানে শিমুলগাছের গোড়াটার এক পাশে যুদ্ধের পরে আমার মাকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

একাত্তরের পরমতলা আমার কাছে ছিল পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া একটা গ্রাম অথবা পলায়নপর একদল শহুরে মানুষ।

আমার কাছে পরমতলা ছিল এটুকুই। মা যখন মারা যায়, তখনো এই গ্রাম আমার কাছে অতটুকুই ছিল। যেটুকু আমার খুব বেশি মনে আছে, তার মধ্যে ছিল একটা লেবুগাছ, গাছের গুঁড়ি ফেলে বানানো পুকুরের ঘাট আর টিনের একটা একচালা বাড়ি, তার সামনে নিকোনো উঠোন। উঠোনে রক্তের স্রোত। আশ্চর্য রকমভাবে এরকম আরও কিছু ছবি আমার মনের ক্যামেরায় এখনো অক্ষত রয়ে গেছে।

একটা ছইওয়ালা নৌকায় করে আমরা নানাবাড়ি থেকে দাদাবাড়িতে যেতাম। মুন্সিবাড়ির উত্তর দিক থেকে নৌকাটা ছাড়ত। মাঝির পিঠটা ছিল নৌকার ছইয়ের মতো কুঁজো। ও যখন ভর দিত, তখন তার শরীর হারিয়ে যেত ছইয়ের আড়ালে। একটানা কয়েকবার লগি মারত, পানির ছিটা লেগে ওর স্যান্ডো গেঞ্জিটা ভিজে যেত, তারপর একসময় বসে পড়ত ও। তখনো নৌকাটা সাপের মতো তড়তড় করে এগোত। মাঝি তখন হুকোর টিকায় আগুন ধরিয়ে টান দিত, গান ধরত গলা ফাটিয়ে, নবী মোর পরশমণি, আর পানির ঢেউয়ে দুলে দুলে উঠত দুই পাশে ছেয়ে থাকা শাপলা ও শালুকের পাতা।

আব্বা আর মা বসতেন ছইয়ের ভেতরে। কত কী গল্প করতেন তারা। মুড়ি-নাড়ু-গুড়-খই এসব খেতে দিতেন মা আর আব্বা মাঝেসাঝে মাঝির কথায় হ্যাঁ হু করে কী সব বলতেন। আমরা ভাইবোনেরা ঝগড়া করতাম গলুইয়ের একেবারে সামনে কে বসবে, সেটা নিয়ে।

আমি সামনের দিকে মুখ করে হাঁটুগেড়ে বসতাম বাঘের মতো। অথবা দুই পা নৌকার দুই দিকে পানিতে ডুবিয়ে। কখনো এক দঙ্গল কচুরিপানা সরিয়ে, কখনো মান্দাল গাছের কাঁটাভরা ডালের নিচ দিয়ে, আবার কখনো পাটের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটত নৌকাটা। কখনো কখনো তার নিচে পড়ত কৈয়া জাল, কখনো মাছ ধরার বড়া, ছোট ছোট আনতা, আবার কখনো আস্ত একটা রাস্তা।

নাওয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে কোথাও কোনো রাস্তা অথবা জাঙ্গাল এমনকি জমিও দেখা যেত না, পানির নিচে বিলীন হয়ে থাকত চরাচর। মাথার ওপরে থাকত একটা নীল পরিষ্কার আকাশ, চারপাশে থাকত পানিতে ভেসে যাওয়া মাঠ, কখনো আমাদের একপাশে পড়ত কিশোর-কিশোরীর দল, ওরা ঠেলা জালে মাছ ধরত অথবা পানির নিচ থেকে শামুক কুড়াত, মাঝেসাঝে চোখে পড়ত দ্বীপের মতো কয়েকটা বাড়িঘর, নিচে তাকালে টলটলে পানিতে দেখা যেত ছোট ছোট বাহারি মাছের ঝাঁক, হয়ত চককুনি নয়তো খলসে না হলে টাটকিনি অথবা পুটি কিংবা টাকি, একটা মাছের নাম ছিল বৈচা, আব্বা বলতেন, 'ওর ইংরেজি হলো বুক টি ফিশ।' তারপর এমন করে হাসতেন যে নৌকাটা ভেলার মতো দুলতে থাকত। মাঝি যখন নাওটা ঘাটে ভেড়াত, তখন বাড়ির সব বাচ্চারা শিমুলগাছের গোড়ায় জড়ো হয়ে আমাদের জন্য হই হই করত।

মা যত দিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন পরমতলার ছবিটা ছিল এরকম। পরে আব্বা যখন আমাদের ঢাকায় নিয়ে এলেন, তখন থেকে এই ছবিটা আরও বড় হতে লাগল। তখন আমরা গ্রামে যেতাম বছরে বছরে, শুধু মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে, গুনে গুনে চার দিন থাকতাম ওখানে। প্রথম দিনটা চলে যেত গ্রামে পৌঁছাতেই। ফজরের নামাজের সময় আমরা রওনা দিতাম, ভোর চারটার আগে আম্মা ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন আমাদের, তারপর মাদুরে বসিয়ে গরম গরম ভাত খাওয়াতেন, নাবিস্কো মোড় থেকে যখন বাসে উঠতাম, তখন মুসুল্লিরা মসজিদে যেত, সায়েদাবাদ থেকে যখন বাস ছাড়ত, তখন পৌরসভার লোকেরা রাস্তায় ঝাড়ু দিত, দাউদকান্দিতে যখন ফেরি পার হতাম, তখন দুপুরে চানাচুর আর আমড়া খেয়ে হরহর করে বমি করতাম, আর যখন সেফারা বাজারে দাঁড়িয়ে তালগাছের মাথা দেখতে পেতাম, তখন চারপাশে ঝিঁঝি পোকা ডাকত, দূরের বাড়িঘরে জোনাকির মতো জ্বলত হারিকেনের সলতে আর সেই আলো অনুসরণ করতে করতে আমরা পৌঁছে যেতাম বাড়িতে।

পরের দিন মিলাদের জোগাড়যন্তর হতো। টাঙানো হতো শামিয়ানা। গরু জবাই হতো। উঠোনে রান্না হতো। হ্যাজাকের আলোতে বসে সারা রাত সুর করে কোরান পড়ত দশ-বারোজন হুজুর। পরদিন সকাল থেকে গ্রাম ভেঙে লোক আসত বাড়িতে। মায়ের জন্য যতটা না দোওয়া করতে আসত, তার চেয়ে বেশি

আসত প্রফেসর সাহেবের এতিম ছেলেমেয়েদের দেখতে। ওদের মুখ থেকে আহা উহু শুনতে শুনতে আর একগাদা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুঝতে পারতাম, পরমতলা থেকে আমরা আসলে কীভাবে সরে আসতে শুরু করেছি।

মায়ের নামে আব্বা একটা বৃত্তি চালু করেছিলেন পরমতলা স্কুলে। দশম শ্রেণীতে যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেত, তাকে দেওয়া হতো এই পুরস্কার। কখনো কখনো ঢাকা থেকে লোক যেত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে। একবার গিয়েছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। সেদিন একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো স্কুলের মাঠে। ছেলেমেয়েরা ছড়া বলত, গাইত নাচত লুঙ্গি ও স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, মাথায় গামছা বেঁধে আর পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে ওরা মঞ্চে উঠত। পাঞ্জাবি পরে আর মুখে পাটের দাড়ি লাগিয়ে দু-একজন রাজাকার সাজত, ওদের হাত বাঁধা থাকত পিঠমোড়া করে, মুক্তিযোদ্ধারা ওদের টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যেত কোথাও, তারপর মুক্তিযোদ্ধা অতিথিরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে রুখসানা বেগমের কথা বলতে গিয়ে বলত একাত্তরের কথা। সেদিন পরমতলা কাঁদত কাঁদত কাঁদত আর মায়ের কবর ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত। মনে হতো ফুলের ছোট্ট একটা টিলার ভেতর ঘুমিয়ে আছেন রুখসানা বেগম। এই শোক কাটাতে গিয়ে আমাদের আরও একটা দিন ওখানে থাকা হতো।

প্রত্যেকবার যখন বাড়িতে যেতাম, একেক সময় একেকটা জিনিস এসে যোগ হতো। কোনো বছর হয়ত খালের ওপরে একটা পাকা ব্রিজ হলো, তাতে ওঠার মুখে দেখতে পেলাম শ্বেত পাথরে খোদাই করে লেখা সেতুটা উদ্বোধন করেছেন মওলানা মতিউর রহমান। পরের বছর যখন গেলাম, হয়ত বাজারের একপাশে চোখে পড়ল মোজাইক করা একটা চকচকে পাকা দালান। কেন ? এখন ওটা মসজিদ পরে আবাসিক মাদ্রাসা করার পরিকল্পনা। কে বানিয়েছে ? বাজারের লোকেরা বলল, মওলানা সাহেব। আরও এক বছর পর হয়ত প্রাইমারি স্কুলের পাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাল দোতলা একটা ঘর। এটা কার দোকান ? দোকান নয়, এটা হলো পার্টি অফিস। কার ? উপজেলা চেয়ারম্যান মওলানা মতিউর রহমানের।

তারপর এল সেই বছর, যে বছরে আমি প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে পা রাখলাম মাধ্যমিকে। আমরা যখন বাড়িতে গেলাম, তখন তিনটা ঘটনা শুনতে পেলাম। এক. বাজারে বটগাছটার নিচে, নুনের দোকানগুলোর পাশে, ঠিক যেখানে দুধওয়ালাকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে বানানো স্মৃতিসৌধটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে খালের তলায়। দুই. পরমতলা স্কুলে রুখসানা বেগমের স্মরণে আব্বার দেওয়া বৃত্তিটা বন্ধ হয়ে সেখানে অন্য কিছু

একটা চালু করা হয়েছে। আর তিন. মায়ের কবরের ভেতর নাকি কোনো এক রাতে শেয়াল ঢুকেছে।

আমরা বুঝতে পারতাম, ওখানে কিছু একটা হয়েছে; কিন্তু কী হয়েছে, সেটা তখনো জানতে পারিনি। আমরা বুঝতাম যে আমাদের পরমতলা আগের সেই পরমতলা নেই। ওটা এখন পরমতলা নয় বরং ওটা মতিউর রহমানের নির্বাচনী এলাকা। ওখানে এখন শাপলা-শালুকের ওপর দিয়ে নৌকা চলে না, ভট ভট করে বাতাসে কালো ধোঁওয়া ছড়িয়ে গাড়লের মতো কাশতে কাশতে ছুটে যায় ইঞ্জিনে টানা গাড়ি। হ্যাজাকের আলো জ্বালিয়ে সেফারা বাজারে এখন আর পালা গানের লড়াই হয় না বরং বিজলি বাতির আলো জ্বলে মতিউর রহমানের পার্টি অফিসে, সেখান থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভেসে আসে অমিতাভ বচ্চনের গোঙানির সুর।

নাখালপাড়ার বাড়িতে আব্বা সারা রাত জেগে থাকতেন। পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতেন সবকটা ঘর ও বারান্দায়। নিশি পাওয়া মানুষের মতো। ফজরের আজান পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলত। পাতার পর পাতা কী সব লিখতেন আর সকাল হলেই সেসব নিয়ে কোথায় কোথায় যেন ছুটতেন। সকালে সচিবালয়ে, দুপুরে বঙ্গভবনে, সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে, বিকেলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদে, কোনো জায়গা বাদ রাখেননি তিনি। গিয়েছিলেন পত্রিকা অফিসেও। পাঠকের পাতায় সম্পাদকের সমীপে তার কয়েকটা চিঠিও ছাপা হয়েছিল।

এর মধ্যে আব্বা কয়েকবার গিয়েছিলেন পরমতলাতেও। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছিলেন না তিনি। পরমতলা শুধু নয়, সারা দেশের বাতাস তখন উল্টো দিকে বইছিল। একবার মুখোশ পরিহিত কে বা কারা রাতের বেলায় এসে তাকে শাসিয়ে গেল, বলল আর গ্রামে না যেতে, গেলে রুখসানা বেগমের পাশে তাকেও নাকি কবর দেওয়া হবে।

বিচার চেয়ে আব্বা তখন গ্রামের মুরুব্বিদের কাছেও গিয়েছিলেন, যেমনটা যুদ্ধের পর থানায় গিয়ে মতিউর রহমানের নামে মামলা করতে চেয়েছিলেন তিনি। পুলিশ তখন মামলা নেয়নি। একই ঘটনা ঘটল এবারও, মুরুব্বিরা আব্বাকে ফিরিয়ে দিল। ফিরিয়ে দিল মানে, ওরা রইল বোবা হয়ে।

তারপর কোনো একসময় পরমতলায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আমাদের, টানা কয়েকটা বছর। আমূল বদলে গেল আব্বার জীবন। তিনি ভুলে যেতে চাইলেন গ্রামের কথা। জীবন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেন কবরের স্মৃতি। সত্যি কথা বলতে কি, একসময় এই কবরই আমার কাছে আমার মা হয়ে উঠেছিল। শিমুলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলতাম। বলতাম, কেন আমার রোল নম্বর ৪২, কেন আমার বলে কেউ কখনো ছক্কা পেটাতে পারে না,

আমি কয়বার কোরান খতম দিয়েছি, আম্মা কত যত্ন করে নতুন ক্লাসের বইয়ে মলাট লাগিয়ে দেন আর আমি কেন ছাপ্পা হয়ে যাওয়া ঘুড়িটা ধরার জন্য জীবন বাজি ধরতে পারি। তারপর যখন কলেজে উঠলাম, মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যুক্তি দেখাতাম, কেন আমি সায়েন্স না নিয়ে পড়তে চাই আর্টস, একদিন বললাম, কেন আমি রাজনীতিতে জড়িয়েছি, আরও পরে ওনাকে শীলার কথাও বলেছিলাম। আর মোনাজাত শেষ হয়ে যাওয়ার পর চোখের ওপর দশ আঙুল ছুঁয়ে হাতের তালুতে চুমু খেতে খেতে সব সময় যে কথাটা বলতাম, সেটা হলো মায়ের হত্যাকারীদের বিচারের কথা। প্রতিশোধের লেলিহান আগুন যখন আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লকলক করে ছড়িয়ে পড়ত, তখন গ্রামের চারপাশ ঝলমল করত, হালকা বাতাসে শিরশির করে কেঁপে উঠত কবরের সবুজ ঘাস এবং তার পাশে শিউলিগাছটা সোজা হয়ে আকাশের দিকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকত।

এরপর কলেজে ওঠা পর্যন্ত আমি আর পরমতলায় যাইনি, আব্বা গিয়েছিলেন কি না, জানি না। হয়ত গিয়েছেন, হয়ত যাননি, কিন্তু আমি কখনো জানতে পারিনি। আমি পরমতলায় যাইনি, কিন্তু পরমতলা আসত আমার কাছে, আসত আমার স্বপ্নের ভেতর। রাতের পর রাত আমি পরমতলা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি, যেমন এখনো দেখি মাঝেমধ্যে। আমি দেখতাম, পরমতলায় আমরা যে বাড়িটাতে থাকি, তার নম্বর ৩০০/এ, বাড়ির উঠোনের ওপর দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন। গ্রামের মাঠে বাজারে জমিতে রাস্তায় সবখানে শুধু কবর কবর আর কবর। খালে লাল লাল রক্তের মতো পানি, বড় বড় দাঁত ও নখওয়ালা কতগুলো শকুন, লাশের জন্য তালগাছের মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে আকাশে উড়ছে।

এখনো আমি পরমতলাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি। ঠিক পরমতলাকে নিয়ে নয়, তবে পরমতলার মতো। হয়ত দেখি, কোলনে খুব বন্যা হয়েছে, পিওনিয়ার স্ট্রাসে থেকে এবার্টপ্লাৎস, বাল্টহাসার স্ট্রাসে থেকে রিলার গুয়েরটেল, সবখানে শুধু পানি আর পানি, রাইনের দুই কূল উপচে চারদিকে শুধু প্লাবিত শহর, মাঝেমধ্যে গির্জাগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো, ট্রামের লাইনগুলো যেন সাপের মতো পেঁচানো পেঁচানো খাল, সেখান দিয়ে ছুটছে ছইওয়ালা নাও এবং তার ভেতর আমি ও ফ্রাউ বাওয়ার।

এই পরমতলাকে আমি চরমভাবে ঘৃণাও করেছি একসময়, এখনো করি কি না, স্পষ্ট করে জানি না। তবে এটা ঠিক যে এই গ্রামকে আমি ভালোবাসি এবং এই অনুভূতিটা শীলাকে ভালোবাসার চেয়ে কোনো দিক থেকে কমও ছিল না। বেশি কি না, তা-ও জানি না। শুনেছি ভালোবাসার আয়ু যত দিন থাকে, এর স্মৃতিও নাকি ঠিক ততদিন স্থায়ী হয়। পরমতলার সঙ্গে আমার ভালোবাসা কত দিনের ? কবে এটা ছিন্ন হবে ? মায়ের সঙ্গে আমার ভালোবাসার আয়ু তো ছিল মাত্র চার-পাঁচটা বছর। তাহলে সেই ভালোবাসাটা এখনো শেষ হয় না কেন ?

কেন এই অনুভূতি অযুত-নিযুত কণা হয়ে আমার কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে ? তাহলে কি জন্মের সময় থেকে যার সঙ্গে ভালোবাসা, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার বিনাশ হয় না ? আমার জন্ম তো পরমতলায়, তাহলে কি স্মৃতি থেকে এই গ্রাম মুছে ফেলতে আমাকে জীবনের একেবারে শেষ বিন্দু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ? মৃত্যুর পর কি লাশের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাও কবরে চলে যায় ? মা কি তাহলে আমাকে আর ভালোবাসে না ? তাহলে আমি কেন ভালোবাসি ?

ওই পরমতলা আজও আমার পিছু ছাড়েনি। হয়ত কখনো ছাড়বেও না। আমি এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করতাম। মনের ভেতর প্রশ্নের পর প্রশ্ন কিলবিল করত, গ্রাম কি শুধুই একটা একটা খাল ? আদিগন্ত সবুজ ফসলের মাঠ ? নিছকই তালগাছ ? পরমতলা কি শুধুই বয়সী বটের ঝিলিমিলি পাতা ? নাকি এরচেয়েও বেশি, অন্য কোনো কিছু ?

আমি পরমতলাকে ভালোবেসেছি কিন্তু পরমতলা তো আমাকে বাসেনি। এই গ্রামের আলো, বাতাস, জল ও জমিতে আমার জানের শত্রুরা হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে দিনের পর দিন। পরমতলার জমি সব সময় তার ধানের গোলা ভরিয়ে রেখেছে, পরমতলার পুকুর পরম মমতায় ধুয়ে দিয়েছে তার শরীর, পরমতলার খাল দিয়েছে মাছ, গরু দিয়েছে দুধ, ঘরের বেড়া বেয়ে বেয়ে চালের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে পুঁইশাকের ডাটা, টিউবঅয়েলের পানিতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে তার ঘরের কলসি, বাড়ির গাছগুলো প্রত্যেক মওসুমে ছেয়ে উঠেছে ফুলে, নুয়ে পড়েছে ফলে, এই ভালোবাসার গ্রামের মানুষেরাই আমার শত্রুকে ভোট দিয়ে বছরের পর বছর তাদের চেয়ারম্যান বানিয়েছে। আর সেই চেয়ারম্যান আমাকে শুধু পরমতলা থেকে নয়, আমার মায়ের কবরের কাছ থেকে, ঢাকায় আমার আব্বার কাছ থেকে, তারপর শীলা তারপর বাংলাদেশ থেকে আমাকে এতটা দূরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এই পরমতলাকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম। কারণ আমার মায়ের শরীর মিশে আছে তার মাটিতে। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন এক গ্রীষ্মের ছুটিতে একাই গিয়ে হাজির হলাম গ্রামের বাড়িতে। বাড়ির দরজায় তালা লাগানো ছিল। প্রথমে খুললাম মরচে পড়া তালা। তারপর বন্ধ করলাম ইঁদুরের গর্তগুলো। বাড়ির চারদিকে নতুন করে দরজা-জানালা লাগানো হলো। কোথাও কোথাও ঘরের মাচাও বদলানো হলো। পুকুরের তল থেকে নরম মাটি তুলে লেপা হলো উঠোন। চালের যেখানে যেখানে ফুটো হয়ে গিয়েছিল, যেখান দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ত মেঝেতে, সেখানে নতুন টিন লাগানো হলো। রং করা হলো বাড়ির চারদিকে আর শিমুলগাছের ওখানে একটা বাঁশ পুঁতে সেখানে ঝুলানো হলো বিজলির আলো, তারপর একদিন সকালে চুলায় আগুন জ্বলল।

তারপর মায়ের কবরে নতুন করে মাটি ফেলা হলো। তারপর সবুজ ঘাস লাগালাম কবরের ওপর। তারপর চারপাশের জংলি গাছ ও ঘাস ছাঁটাই করে সেখানে কিছু গোলাপ, চামেলি আর গাঁদা ফুলের চারা লাগিয়ে দিলাম। তারপর বাঁশের বেড়া দেওয়া হলো কবরের চারপাশে। তারপর এর চারদিক ঘিরে লাগালাম কয়েকটা বোগেনভেলিয়া। তারপর কালো একটা টিনের বোর্ড গুনাই দিয়ে বেঁধে দিলাম শিউলিগাছটার বুকে, যেখানে সাদা রং দিয়ে লেখা ছিল : 'এখানে ঘুমিয়ে আছেন মুক্তিযোদ্ধা রুখসানা বেগম, মুক্তিযুদ্ধের পরের যুদ্ধে যিনি রাজাকারদের হাতে শহীদ হয়েছেন।'

কয়েক দিনের মধ্যেই বোগেনভেলিয়ার লতাপাতারা যখন বেড়ার গা বেয়ে বেয়ে কবরের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, তখন লাল লাল ফুল আর সবুজ সবুজ পাতায় পুকুরের পশ্চিম পারের এই এক চিলতে জায়গাটা ছোট্ট একটা বাগানের মতো হয়ে উঠল।

এরপর থেকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে আমি পরমতলায় যেতাম। বাবাকে বলে যেতাম, কিছু বলতেন না তিনি, তবে তার চোখেমুখে দেখতাম, তিনি চাইছেন আমি ওখানে যাই। বাবা নিজেও কিছু টাকাপয়সা দিতেন আমাকে। কয়েকটা কাগজে এটা-ওটা লিখে আমি যা কিছু পেতাম, তার সবটাই খরচ হয়ে যেত পরমতলার পেছনে।

কখনো কখনো কয়েক দিনের জন্য যেতাম, প্রথমবার যখন এক সপ্তাহের মতো বাড়িতে ছিলাম, তখন পুকুরের পূর্ব দিকে, জামগাছটার কাছে, আমাদের যে খালি জায়গাটা ছিল, ওখানে শাকসবজি লাগালাম, তার পরের সপ্তাহে ওখানে মাচা করে লাগালাম শিম ও লাউ। ওখানে যে ফলন হতো, তার কিছু নিয়ে আসতাম নাখালপাড়ায়, আর বাকিটা নিয়ে যেতাম সেফারা বাজারে। যখন কিছু আয় রোজগার হতে লাগল, তখন বাড়ির জন্য একজন কেয়ারটেকার রেখে দিলাম। একসময় ওটা একটা বড় খামার হয়ে উঠল। তারপর হাত দিলাম পুকুরে। নানা রকমের মাছ ছাড়লাম সেখানে। কয়েক মাসের মধ্যেই ওখানে রুই-কাতলা থপথপ করে লাফাতে শুরু করল।

গ্রামে আমার বয়সী যারা ছিল, একসময় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হলো। প্রথমে ওদের আমি খামারের কিছু কাজ দিলাম। কেউ আমার কাছে মাছের চার বিক্রি করত। কেউ শুধু পুকুরের মাছ কিনত, তারপর সেই মাছ মুরাদনগর টাউনে নিয়ে বিক্রি করত। ওদের কেউ কেউ শুধু জাল ফেলে টাকা পেত। কেউ শুধু দুধ কিনত, বিক্রি করত সিদ্ধেশ্বরীর আড়ংয়ে।

তারপর আমরা সবাই মিলে পরমতলা '৭১ নামে একটা সংঘ তৈরি করলাম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘ। আমাকে তার প্রেসিডেন্ট বানানো হলো।

কখনো কখনো গ্রামের মানুষদের নিয়ে এই সংঘ থেকে আমরা খেলার আয়োজন করতাম, নানা ধরনের খেলা, ছিল নৌকাবাইচ, ভলিবল, মোরগের লড়াই, ফুটবল, ঘুড়ি উড়ানো ও কাবাডি। এই খেলাগুলো হতো কখনো পহেলা বৈশাখে, আবার কখনো অগ্রহায়ণ মাসে, হেমন্তে ধান কেটে ফেলার পরে। শুধু নৌকাবাইচ হতো বর্ষার সময়, যখন পরমতলা টুইটম্বুর পানিতে ডুবে থাকত। এর মধ্যে যে খেলাটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল, তা হলো বিয়াইত্যা ও আবিয়াইত্যার হাডুডু। পরমতলায় যখন রাত নামত, তখন এই লড়াইটা হতো আর হতো ফসল তুলে নেওয়ার পর যে জমির নাড়া আগুনে পোড়ানো ছিল, সেই জমিতে। লাঙলের ফলা দিয়ে চারকোনা দুটো ঘর বানানো হতো। দুই পাশে দুটো বাঁশ পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো চার-পাঁচটা হ্যাজাক বাতি। চারকোনা ঘরের একপাশে থাকত পরমতলার হাঁপানিপ্রবণ কিছু বিবাহিত পুরুষ, যারা প্রতিপক্ষ অবিবাহিত তরুণদের হাতে খপ করে ধরা পড়ত।

কয়েক মাসের মধ্যেই এই সংঘ বাড়িতে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ছড়াল স্কুলে, তারপর কলেজে। গ্রামের নারী ও পুরুষেরা দলে দলে এর সদস্য হতে শুরু করল। ওরা আসত মূলত অর্থনৈতিক কারণে, পরমতলা '৭১ থেকে কাউকে হয়ত রিকশা আবার কাউকে হাঁস-মুরগি কিনে দেওয়া হতো, যার টাকা ওরা শোধ করত কিস্তিতে।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল বাজারে একটা পাঠাগার বসানো। বটগাছটার নিচে একটা জায়গা ভাড়া নিলাম বাজার কমিটির কাছ থেকে, তারপর বেড়ার একটা ঘর তুললাম ওখানে, ভেতরে বড় একটা টেবিল এবং তার চারপাশে কয়েকটা চেয়ার বসানো হলো, দরজার দুই পাশে ছিল বড় দুটো আলমারি। আমি যেসব কাগজে সাংবাদিকতা করতে শুরু করেছিলাম, তার সম্পাদকদের বলে পাঠাগারের জন্য কয়েকটা সৌজন্য কপির ব্যবস্থা করা হলো, ঢাকা থেকে কয়েকজন প্রকাশক বই দিলে ঠাসাঠাসি করে ভরে উঠতে শুরু করল আলমারির তাকগুলো।

একটা সাইনবোর্ড লাগানো হলো দরজার ওপর। তারপর একদিন 'শহীদ স্মৃতি পাঠাগার' উদ্বোধন করতে ঢাকা থেকে পরমতলায় এলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।

সেদিন গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ল সেফারা বাজারে।

তারপর আমরা লাইব্রেরির পাশে একটা স্মৃতিসৌধ বানালাম। এর সামনে বড় একটা ফলক বসানো হলো, যাতে লেখা হতে লাগল একগুচ্ছ থোকা থোকা

নাম। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের এই তালিকাটা দিনে দিনে বড় হতে লাগল। সবার ওপরে ছিল দুধওয়ালার নাম, ছিল পরমতলার সেই কুঁজো হয়ে যাওয়া মাঝি আব্বাস খাঁ, দেবিদ্বার কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামান, ভিটেহীন আবুল করিমের নামও ছিল তালিকায়, ছিল হাবিবুন নাহার ও তার দুধের শিশু বকুলবালাও। কতশত সব নাম। যেন গুচ্ছ গুচ্ছ থোকা থোকা সব ফুল। প্রথমে একটা সারি, তারপর দ্বিতীয় তারপর তৃতীয় সারিও ভরে উঠল; তারপর শুরু হলো চার নম্বর।

সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমরা যখন হারিয়ে যাওয়া এসব নাম পাঠাগারে তুলে আনতে লাগলাম, তখনই পরমতলায় একটা ঝড় উঠল।

ঝড়ের এই আঁচড় প্রথম এসে লাগল আমার খামারে। একদিন দেখলাম পুকুরের মাছ চুরি হতে লাগল। রাতের অন্ধকারে জাল ফেলে কে বা কারা চুরি করত, সেটা কেয়ারটেকারও ধরতে পারত না। তখন পুকুরের কিনার ঘেঁষে কাঁটাওয়ালা গাছের ডাল ফেলা হলো। তারপর চুরি হলো একটা গাভি। একদিন ওরা কেয়ারটেকারকে তেঁতুল গাছের গোড়ায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল। আমি জিডি করলাম মুরাদনগর থানায়। তখন ঝড় আরও তীব্র হলো। ওরা বিষ ঢেলে দিলে সব মাছ ফুলেফেঁপে পরদিন সকালে ভেসে উঠল পুকুরের পানিতে।

এর মধ্যেই পরমতলায় এল চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং তাতে অবধারিতভাবে আবারও প্রার্থী হলো মওলানা মতিউর রহমান। পরমতলা '৭১-এর সভা ডাকা হলো, কতজনে কত কী বলল, কিন্তু আমি বললাম, 'না, আর না, এবার থামাতে হবে, ওই লোকটাকে আর চেয়ারম্যান বানানো যাবে না।' একাত্তরে তার ভূমিকার কথা বললাম, বললাম তার হাতে দুধওয়ালার মৃত্যু, পাঠান বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড আর রুখসানা বেগমকে ধর্ষণের কথা।

তখন আমি একবারও মা শব্দটা উচ্চারণ করিনি।

তারপর শুরু হলো প্রচারণা। বাড়ি বাড়ি ছুটল ছেলেমেয়েরা, আড়ং ও বাজারে, স্কুল-কলেজ এবং মসজিদ ও মাদ্রাসায়, আর বাস স্টেশনে লিফলেট ছাড়া হলো, বিলি করা হলো পত্রিকার কাটিং, সন্ধ্যার পরে স্কুলের মাঠে দেখানো হলো মুক্তিযুদ্ধের ছবি, সেফারা বাজারে পালাগানের আসর বসল, পুতুল নাচ হলো, মাথায় কুয়াশা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকল পরমতলার মানুষ।

সভায় আলোচনায় ও সমাবেশে আমি হত্যাকারীদের বিচার চাইতাম, ফাঁসি চাইতাম ধর্ষণকারীদের। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন প্রশ্ন করতাম, কে রুখসানা বেগমকে ধর্ষণ করেছে ? তখন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত, কিন্তু আমি অটল দাঁড়িয়ে থাকতাম। থাকতাম অবিচল। লজ্জা নয়, কোনো অপমান নয়, কষ্ট নয় বরং একটা ক্রোধ অজগরের মতো আপাদমস্তক গিলে খেত আমাকে।

তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আর শীলার ভালোবাসার জালে হাত-পা-হৃদয় সব জড়িয়ে ফেলেছি। পরমতলার এই ঝড়ের সঙ্গে আমার যুদ্ধের কথা আব্বাকে কখনো বলিনি। তবে শীলা সব জানত। এ জন্য দিনের পর দিন আমি ক্লাসে যেতে পারিনি। কিন্তু ও আমাকে নোট করে দিত, লাইব্রেরিতে বসিয়ে পড়াত, বাড়ি থেকে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসত, দুপুরে মুখে তুলে খাওয়াত, তারপর নিয়ে যেত পরীক্ষার হলে। পরমতলার ঘটনায় শীলা আমাকে সাহস দিত, এমনকি টাকা-পয়সাও দিত, সময় দিত আর বুক দিয়ে সমস্ত তুফান থেকে আগলে রাখত আমাকে।

কীভাবে কীভাবে আব্বাও একদিন জেনে গেলেন পরমতলার ঘটনা। আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তার পড়ার ঘরে। তিনি বসেছিলেন আরাম কেদারায়। আব্বার পেছনে বইয়ের আলমারির তাকে কাচের ডালার ভেতর ছিল মায়ের একটা ছবি। আমি যখন ঘরে ঢুকি, তখন তিনি তাকিয়েছিলেন সেই ছবিটার দিকে। আমিও যখন ওদিকে তাকালাম, তখন আব্বা বললেন, 'তুমি তো সবই জানো, তোমার মার কথা, আমার কথা, তোমাকে আমি আর কী বলব, এই কালি আর না ছড়ালে কি হয় না, বাবা ?'

আব্বা আমাকে কখনো বাবা বলে ডাকেন না, নাম ধরেই ডাকেন সব সময়। মনে হয় আমার জীবনে এই একবারই আমি তার মুখ থেকে বাবা ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। কিন্তু আমি তখন খুশি হইনি, আমার রাগও হয়নি। এক ফোঁটা কালি যেভাবে টিস্যু পেপারে মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে যায়, তেমনি একটা কষ্ট শুধু আমার বুকের ভেতর থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পরে আমি শীলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা শীলা, আমি কি কোনো ভুল করছি ?'

'না', শীলার ছোট্ট জবাব।

'তাহলে ?'

'তাহলে কী ?'

'আব্বা কালি বললেন কেন ?' আমি জানতে চাইলাম।

ও বলল, 'এটা বাবার বুকের কথা না, মুখের।' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে শীলা বলল, 'আসিফ, কোনো ভুলই সব সময়ের জন্য ভুল থাকে না।'

'যেমন ?'

'যেমন ধরো নষ্ট একটা ঘড়ি। দিনের দুইটা মুহূর্তে কিন্তু ঘড়িটার সময় ঠিক থাকে।' তারপর দুহাত দিয়ে আমার চোখ মুছতে মুছতে ও বলত, 'দেখো, বাবা একদিন ঠিক ঠিক সব বুঝতে পারবেন, তখন তোমাকে নিয়ে ওনার গর্ব হবে।'

শীলা যখন জোর করে আমার চোখ মুছত, তখন ওর দুই হাতের চুড়ি রিনিঝিনি করে বাজত আর সেই শব্দ ছিল আমার সব কষ্ট ধুয়ে ফেলার সাবান।

কোনো কোনো দিন শীলা আমাকে পরমতলায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসত ঢাকায়। ও বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলে আমার কাছে আসত। আমরা সায়েদাবাদ থেকে কোম্পানিগঞ্জের বাস ধরতাম সকালে। শীলা বসত জানালার পাশে। ও জানালাটা বন্ধ করত না কখনো। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে এই বাসটা ছুটত পরমতলার দিকে। কখনো আমাদের একপাশে পড়ত লালসালুর মাজার, কখনো শুধু পানি আর পানি, তারপর পড়ত বিদ্যুতের খুঁটি, কোল্ডস্টোরেজ, ক্যান্টনমেন্ট, লেখা উঠে যাওয়া হলুদ হলুদ মাইলফলক, কখনো ডোবার মধ্যে উল্টো হয়ে পড়ে থাকত মরচে ধরা পুরনো ট্রাক। সূর্যটাও বাসের সঙ্গে সঙ্গে পরমতলার দিকে দৌড়াত। জানালা দিয়ে তার আলো এসে পড়ত শীলার পানপাতা মুখে। দস্যি বাতাসে এলোমেলো হয়ে উড়ত শীলার রেশমি চুল আর ছুঁয়ে যেত আমার চোখ-মুখ-নাক ও চিবুক। বৃষ্টি হলেও ও খোলা রাখত জানালা। তার ছাঁট এসে লাগত চোখে-মুখে-কপালে। কখনো কখনো ও চোখ বন্ধ করে রাখত। পুরোটা পথ আমার ডান হাত ওর বাম হাতের মুঠোর ভেতর নিয়ে বসে থাকত শীলা, আর গুন গুন করে শোনাত, 'এই মন তোমাকে দিলাম', তারপর যখন আলতো করে মুখ ঘুরিয়ে আবেশী ভঙ্গিমায় আমার দিকে তাকাত, আমি ওর চোখের ভেতর মরে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠতাম।

আমাকে নামিয়ে দিয়েই ফিরতি বাস ধরত শীলা। বিদায়ের সময় কানের কাছে মুখ রেখে বলত, 'সাবধানে থেকো সোনা। আমি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকব।' ওর বুকের ভেতরটা যখন ভালোবাসায় উপচে পড়ত, আমি বুঝতে পারতাম, শীলা তখন আমাকে 'সোনা' বলে ডাকত। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আমার চোখের ভেতর। পলক পড়ত না ওর। সেসময় ওর চোখের ভেতর ঝরঝর করে নামত আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। বাসটা যখন ঢাকার দিকে ছুটত, জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। ফেরার সময় মাথায় ঘোমটা তুলে দিত শীলা। ওড়নার একটা প্রান্ত জানালার বাইরে পতপত করে উড়ত পতাকার মতো। ছোট হতে হতে ওর মাথাটা একসময় বিন্দুর মতো দেখাত, তারপর হুস করে কোথাও হারিয়ে যেত। তার কিছুক্ষণ পর শূন্যে মিলিয়ে যেত ছাদের ওপরে যাত্রী নেওয়া কাঠবডির রঙিন বাসটাও।

বাসটা যখন শীলাকে নিয়ে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেত, আমার বুকের ভেতর এসে ঢুকত পরমতলা আর ঢুকত আমার মায়ের মুখ।

সেদিনও শীলা আমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তখন নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে, ভোটাভুটির আর কিছুদিন বাকি। দুপুরটা ছিল মেঘলা। বিকেলটা ছিল

গুমোট। সন্ধ্যার পর একটা আলোচনা সভা তারপর গানের অনুষ্ঠান ছিল শহীদ স্মৃতি পাঠাগারে। মাগরিবের নামাজের পর পিঁপড়ার মতো লোক আসতে লাগল বাজারে। আশপাশের গ্রাম থেকেও এল অনেকে। একসময় লাইব্রেরি উপচে পড়ল। কেউ বসল বটগাছের গোড়ায়, কেউ নুনের দোকানের ভেতর, কেউ দাঁড়াল স্মৃতি সৌধের বেদীতে, আবার কেউ কেউ খালের ওপরে ছোট ছোট নৌকায়। সেখানে জোনাক পোকার মতো জ্বলছিল হারিকেনের আলো।

সেই রাতে পরমতলার মাথার ওপরে ছিল আমাবস্যার আকাশ। সেখানে ছিটেফোঁটা কোনো তারাও ছিল না, যত দূর চোখ যায়, তত দূর ছিল শুধু অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার। দিগন্তের ওপারে সারি সারি বাড়িগুলো ছিল সেই আঁধারের উৎস। সেই রাতে গ্রামের কোথাও কোনো ঝোপ থেকে তক্ষক ডেকে উঠেছিল কি না জানি না, মনে নেই গ্রামের কোনো দিক থেকে বয়ে এসেছিল কি না ঝড়ো কোনো হাওয়া, অথবা হঠাৎই চারদিক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কি না, কিংবা মেঘ গুড় গুড় করে উঠেছিল কি না রাতের আকাশে, মনে নেই কে প্রথম কীভাবে চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু এখনো, এই এত বছর পরও পরিষ্কার দেখতে পাই, সেই রাতে দৈত্যদানবের দাঁত ও নখের কামড়ে আঁচড়ে কেমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল পরমতলার শরীর, গ্রামের হৃৎপিণ্ডটা কীভাবে তার থাবার নিচে খামচে ধরেছিল পুরনো শকুন।

মতিউর রহমানের লোকজন বর্শা, বল্লম, দাও, কুড়াল নিয়ে লাফিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি, কিছুই করতে পারিনি। চারদিক থেকে এসেছিল ওরা। তারপর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল পাঠাগার, পুড়ে ছাই হয়ে গেল জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আর শামসুর রাহমানের 'অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।' ওরা ভেঙে গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিল স্মৃতিসৌধ, রক্তের ছোপ লাগা শহীদের নামের তালিকাটা ভাসিয়ে দিল খালের পানিতে, তার সঙ্গে ভেসে গেল পরমতলাকে নিয়ে রচিত আমার সব স্বপ্ন ও স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা।

ওই রাতে রচিত হলো আরও তিনখানা নতুন কবর। তারপর সারা রাত বৃষ্টি হলো পরমতলায়। আমি দেখলাম, লাউয়ের মাচাগুলো কত সতেজ আর সবুজ হয়ে উঠল বৃষ্টির ছোঁয়ায়, পুকুরের বিষাক্ত পানি অবিরাম বর্ষণে কীভাবে আবারও পরিষ্কার হতে শুরু করল, বৃষ্টির পানিতে কীভাবে রাতভর ভিজতে লাগল মায়ের কবর।

ফজরের আজানের আগে শুনলাম, আমাকে প্রধান আসামি করে মুরাদনগর থানায় মামলা করেছে মতিউর রহমান। তখন বৃষ্টি কিছুটা ধরে এসেছে। তারপর নামাজ শেষ হওয়ার আগে কেউ একজন খবর নিয়ে এল যে একদল পুলিশ

আসছে পরমতলার দিকে। তখন আবার মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর আমি যখন একটা বোরখার ভেতর নিজেকে লুকিয়ে প্রথমে শিমুলগাছের তলায় মায়ের কবর, তারপর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া সেফারা বাজার, তারপর খালের সেতু পার হয়ে ঢাকার বাসে ঝুলতে লাগলাম, তখন বৃষ্টির ভেতরও সূর্যটা প্রখর হয়ে জ্বলছে।

আকাশের পূর্ব দিকে তখন ছড়িয়ে পড়ছিল বিশাল একটা রংধনু।

আমি ছুটছি শীলার কাছে। আমি পালাচ্ছি সাপের উৎপাতে। তুমুল বৃষ্টির ভেতর দিয়ে বাস ছুটছে রাজধানীর দিকে। আর পেছনে ভিজছে আমার প্রেম ও ঘৃণার গ্রাম, পরাজিত পরমতলা।

পালাবার সময়

জুন মাস আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে এল ভয়াবহ রকমের একটা দুঃসংবাদ। এর জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। প্রস্তুত ছিল না ২১ নম্বর বাড়িটাও। খবরটা যেদিন এল, বাড়িটার তিন তলার ঘরগুলো পরিণত হলো অন্ধকার গুহায়। সন্ধ্যার পরেও সজল আর রফিক বাতি না জ্বালিয়ে বসে রইল সোফায়, জ্বলল না রান্নাঘরের চুলা, অন্ধকারের মতো কালো হয়ে থাকল টেলিভিশনের স্ক্রিন। কোনো শব্দ ছিল না ঘরের ভেতর। শুধু ছিল চার দেয়ালে ঘেরা একটা স্তব্ধতা। রাস্তা থেকে হঠাৎ ছুটে আসা কোনো গাড়ি বাগানে খেলতে থাকা একটা শিশুকে চাপা দেওয়ার আগে, দিগন্তের ওপার থেকে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় সবুজ কোনো গ্রামকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার ঠিক আগে যেরকম স্তব্ধতার জন্ম হয়, সারা ঘরজুড়ে সেরকম স্তব্ধতা।

সজল আর রফিক বসেছিল সোফার দুই দিকের দুই হাতলে ঠেস দিয়ে আর আমি বিছানার এক কিনারে। আমি একবার সজলকে দেখছিলাম, একবার রফিক আমাকে আবার রফিক দেখছিল সজলকে, সজল দেখছিল রফিককে ও আমাকে, আমি রফিককে। ঘরের ভেতর সন্ধের আলোয় তখন ইতস্তত ঘুরছিল তিন জোড়া চোখ, এদিকে-সেদিকে, পিংপং বলের মতো, কখনো কখনো জানালা ডিঙিয়ে বাগানটার ওপারে। সামনের রাস্তায় এফসি ক্যোলনের সমর্থকদের হই হল্লা শোনা গেল, ওরা ফিরছিল স্টেডিয়াম থেকে। রাস্তার ওপারে বাস্কেটবল খেলার মাঠে কয়েকটা ছেলে তখনো লাল বলটাকে ছুড়ছিল বোর্ডের দিকে। বল ড্রিবলিঙের শব্দকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল ওদের কেডসের আওয়াজ। বলটা বাস্কেট হলে ওরা হই হই করে উঠছিল। কোথাও একটা গাড়ি স্টার্ট নিল, তারপর হারিয়ে গেল ইঞ্জিনের শব্দটাও।

বাল্টহাসার স্ট্রাসে থেকে ফিরে পেয়েছিলাম এই খবর, আর সেটা দিয়ে গিয়েছিল রিটা, একটা সাদা খামের ভেতর। যার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ সময় কাটিয়ে এলাম, সেই মানুষটাই এরকম একটা দুঃসংবাদের বাহক হতে পারে, সেটা কখনো ভাবিনি। যে দুটো হাতে আমার বুকের ওপর ভর রেখে, মুখ হা করে রিটা

পেছন দিকে ভেঙে পড়ে, হাতের যে আঙুলগুলো দিয়ে গোলাপি রঙের সাবানটা মুঠোর ভেতর নিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দেয় সাদা ফেনায়, সেই হাতগুলোই আমার জন্য রেখে গেল এই খবর।

সজলই প্রথম বলল চিঠিটার কথা। আমাদের উকিলের লেখা চিঠি। খোলা খামটা পড়েছিল কার্পেটে, মুখটা এবড়োখেবড়ো করে ছেঁড়া আর টাইপ করা চিঠিটা টেলিভিশনটার ওপরে। উকিল লিখেছে, মামলার রায় হবে সপ্তাহ তিনেক পর, আমরা যেন প্রস্তুত থাকি। এর পরের প্যারাতে ছিল আসল খবর। উকিলের আশঙ্কা, রায় নাকি আমাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর সেরকম হলে আমাদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে ইমিগ্রেশন বিভাগ।

এরকম একটা কথা শোনা যাচ্ছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। আমরা গায়ে মাখিনি। মনে হয়েছিল এসব গুজব। আর এ ধরনের কথা কয়েক দিন পর পর বাতাসে ভেসে আসে। সপ্তাহ খানেক ধরে রেস্তোরাঁ থেকে সজলও খবর আনছিল যে আদালত রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে করা মামলাগুলোর রায় দিতে শুরু করেছে। বেশির ভাগই ছিল খারাপ খবর। যারা হেরে গেছে, তাদের অনেকে পালিয়ে যাচ্ছিল জার্মানি থেকে। ফ্রাংকফুর্টের ফারুক, বার্লিনের খোকন, ডুসেলডর্ফের সিরাজ। সম্ভবত ওরা পালিয়েছিল অন্য কোনো শহরে, প্রথমে চোখের আড়াল হয়ে থাকবে কয়েক দিন, তারপর পালিয়ে যাবে অন্য কোনো দেশে, সেখানে গিয়ে ওরা আবারও শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাইবে, তখন আবার শুরু হবে নতুন নতুন মামলা।

একসময় আমাদের পালিয়ে যাওয়ার কথাও উঠল। হাজারখানেক ডলার খরচ করলে একজন দালাল আমাদের পৌঁছে দেবে ইটালি। একটা নতুন নাম নিতে হবে আমাকে, সাজাতে হবে নতুন পরিচয়। রাতের পর রাত থাকতে হবে আলোবাতাসশূন্য জানালাহীন ছোট্ট একটা ঘরে। কবুতরের খোপের মতো একটা ছিদ্র দিয়ে খাবার আসবে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসবে পুলিশ। ঘরের ভেতর কোনো একটা কোনায় থাকবে কমোড, ওখানে গন্ধ হলে গন্ধ ছড়িয়ে থাকবে ঘরজুড়ে, সিমেন্টের ঢালাই বিছানা আর মাথার ওপরে সারাক্ষণ জ্বলবে চল্লিশ ওয়াটের একটা বাতি। সেই গুহার ভেতর কত দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটাতে হবে কে জানে !

সজল আর রফিক বলল, ওরা দালালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে। পালাতে চাইলে টাকাটা দিতে হবে দু-একদিনের মধ্যেই। ওরা আমার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত পার হলে ভোরে ওরা ফ্রাংকফুর্ট যাবে এবং সেখানে দালালের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে সময় সুযোগ মতো পালাবে।

এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একেবারেই তৈরি ছিলাম না আমি। বেশ ভালোই তো ছিলাম। একটা কারখানায় কাজ করি, এক মহিলাকে যুদ্ধের গল্প বলি আর বাড়িতে এসে ঘুমাই। আজও, এই কিছুক্ষণ আগেও, কুড়িগ্রামে তারামন বিবির একটা সম্মুখ লড়াইয়ের কথা মনের ভেতর সাজাতে সাজাতে বাড়ি ফিরছিলাম আমি। রিটাকে আজ তার নামটা বলেছি আর বলেছি স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পর, এক গবেষক কীভাবে আবিষ্কার করল হারিয়ে যাওয়া এই যোদ্ধাকে। অকৃতজ্ঞ বাংলাদেশ ভুলে গিয়েছিল তারামন বিবিকে আর দারিদ্র্য তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল একাত্তরের কথা। বললাম, বীর প্রতীকের তালিকায় তার নাম থাকলেও দেশের মানুষ কেন একবারও খোঁজ নিল না এই নারীর। কীভাবে ও চাপা পড়েছিল সমাজের তলানিতে। রিটাকে বলেছিলাম তারামন নিজেও জানত না তাঁর সাহস আর বীরত্বের জন্য পাওয়া এই খেতাবের কথা, দুই যুগ পর মানুষের মুখে শুনল সেও নাকি স্টেনগান নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যুদ্ধ করেছিল।

তারামন বিবির কথা আরও শুনতে চাইছিল রিটা কিন্তু আমার হাতে সময় ছিল না। ভাবছিলাম, কাল ওকে শোনাব তারামন বিবি কীভাবে নদী পার হয়ে পাকসেনাদের একটা ক্যাম্প আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই কাহিনি। আমার জীবনটা তখন হয়ে উঠেছিল এমনই। দিনের একটা বড় সময় কেটে যেত চামড়ার গন্ধে, তারপর বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িতে, প্রথমে রিটার শরীরে, তারপর বাথটাবে, তার পরও যে সময়টা বাকি থাকত, সে সময়টা কেটে যেত রিটার জন্য যুদ্ধের গল্প সাজাতে সাজাতে।

আমি তখন একটার পর একটা একাত্তরের কাহিনি সংগ্রহ করে চলেছি। চুকনগর বাজারের কাছে একদিনেই, সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে, কীভাবে দশ হাজার মানুষকে মেরে ভাসিয়ে দেওয়া হলো ভদ্রা নদীতে, বেয়নেটের খোঁচায় মৃত শিশু কীভাবে গুলিবিদ্ধ মায়ের বুকে চিৎ হয়ে পড়েছিল, আর নদীর পারে কীভাবে জড়াজড়ি করেছিল স্বামী ও স্ত্রীর লাশ, সংগ্রহ করলাম ফার্মগেটের এক মায়ের কথা, যে তার পাঁচজন ছেলেকে স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছে, বিজয়ের ঠিক আগেভাগে রাজাকার-আলবদরেরা চোখ বেঁধে কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনীর চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেল তার বিবরণ, গণহত্যা চালানোর পর মিলিটারিরা যখন মাসিগাড়ায় মসজিদের ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিল, দরজায় তালা লাগিয়ে গ্রামবাসীরা আগুন দিয়ে কীভাবে তাদের পুড়িয়ে মেরেছিল, জমা করছিলাম একাত্তরের এসব ছোট ছোট ইতিহাস।

রিটাকে যখন থেকে যুদ্ধের গল্প বলা শুরু করি, তখন থেকেই প্রত্যেকটা কাহিনি একটা শিরোনাম দিয়ে লিখে রাখতাম চামড়া দিয়ে মোড়ানো একটা ডায়েরিতে। কোন গল্পটা কবে বলেছি, সেই তারিখটাও লিখে রাখতাম

শিরোনামের পাশে। কাহিনিটা শোনার পর রিটা কী বলেছিল বা ওর প্রতিক্রিয়াও আমি লিখে রাখতাম গল্পগুলোর পাশে, নীল কালিতে। ডায়েরিটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম। অক্টোবর মাস পর্যন্ত পাতাগুলো রেখেছিলাম ওকে বলে ফেলা কাহিনিগুলো লেখার জন্য। আর নভেম্বর ও ডিসেম্বরের বাষট্টি পাতা রেখে দিয়েছিলাম রিটাকে যেসব গল্প এখনো বলা হয়নি, সেগুলো নোট করে রাখার কাজে।

বাড়িতে ফেরার পর সজল আর রফিক জানতে চাইল, আমি এখন কী করব। কোনো জবাব ছিল না আমার মুখে। বুঝতে পারছিলাম না, কী করি। পালাবার কথা যখন ভাবছিলাম, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল রিটার মুখ, ঢাকার ব্যস্ত রাস্তা, শীলার চোখ আর আমার শেষ না করা ডায়েরিটা। ভাবছিলাম, পালিয়ে গেলে এই ডায়েরির পাতাগুলো আর কখনো ভরবে না। রিটাকেও বলা হবে না তারামনের লড়াই আর চুকনগরে গণহত্যার কাহিনি।

আমার নীরবতায় রফিক আর সজল চিৎকার করে উঠল। কিছুই বললাম না আমি। সেই রাতে কে ঘুমিয়েছিল, আমি জানি না। তবে জানি, আমার নির্ঘুম রাত আমি ওদের কাছ থেকে গোপন করেছি। হয়ত ওরাও ওদের জেগে থাকা লুকিয়েছে, সেটা ওরা জানে। বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমের জন্য অপেক্ষা করেছি সারাটা রাত, ঘুম আসেনি। ঘুম ছিল চোখে; কিন্তু ছিল না মাথায়। ডায়েরিটার পাতায় পাতায় যখন চোখ বুলিয়েছি, মনে হয়েছে, আমি ঘুমের সাগরে তলিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু যেই সেটা বালিশের নিচে রেখে ঘুমাতে চেষ্টা করেছি, ঘুম উধাও হয়ে গেছে। মাথার পেছনের বাতিটা জ্বালিয়ে আবার যখন ডায়েরিটা হাতে নিয়েছি, ঘুম এসে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। ঘুমাতে গিয়ে জেগে থেকেছি আবারও।

সজল আর রফিক সকালে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, ফিরল পরদিন দুপুরে। ব্যাগ গোছাল দুজনে, তারপর বেরিয়ে গেল সন্ধ্যার পর, কিন্তু ফিরল না বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারেও। সজল আর রফিক এল না, কিন্তু এল রিটা, শনিবার সকালে।

বাভারিয়ান একটা স্কার্ট পরেছে রিটা বাওয়ার, পোশকটার নাম ছিল ডির্নডেল, গাঢ় লাল রঙের জমিনে নীল, কালো আর সবুজ রঙের কিছু গোল-গোল অপরিচিত ফুল। সাদা একটা শার্ট। তার ওপর দিয়ে স্কার্টের দুটো ফিতে, বুকের মাঝখানে ক্রস হয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেছে পিঠের পেছনে। মাথার চুল পনিটেল করা। খুব সুন্দর লাগছিল রিটাকে। দেখাচ্ছিল কিশোরীর মতো। আজ ও সাইকেল নিয়ে এসেছে। ওর হাতে একটা বেতের ঝুড়ি, কনুই ভাঁজ করা, সেখানে ঝুলছে বাজারের ঝুড়িটা।

আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসল রিটা। তার পরেই মিলিয়ে গেল তার চোখের হাসি, হয়ত আমাকে দেখে। গত চার দিন আমি কোথাও যাইনি, স্নান করিনি, দাড়ি কাটিনি, বদলাইনি কাপড়ও। আমার মতোই এলোমেলো হয়ে আছে ঘরগুলো। ঘরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে রিটা জানতে চাইল আমার কী হয়েছে, কেন আমি ওর ওখানে যাচ্ছি না, ও আগেই আসত কিন্তু সময় করতে পারেনি। এর জন্য ও মাফও চাইল একসময়। আমি রিটাকে বসতে বললাম; কিন্তু ও বসল না। ঘুরে ঘুরে হাঁটতে লাগল ঘরের ভেতর।

তারপর ঘর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে গেল রিটা। চায়ের টেবিলে গুছিয়ে রাখল কয়েকটা ম্যাগাজিন। ছাইদানি থেকে ঝেড়ে ফেলল আধপোড়া সিগারেট। সোফার ওপর থেকে টাওয়েলটা উঠিয়ে রেখে এল গোসলখানায়। বালিশে কয়েকটা চাপড় মেরে সেটা সোজা করে শুইয়ে দিল খাটের মাথার দিকটায়। চাদরটা টেনে টেনে ঝুলিয়ে দিল বিছানার কিনারে। একটা লুঙ্গি ভাঁজ করে রাখল পায়ের কাছে। তারপর ভাঁজ করল আম্মার শাড়ি দিয়ে সেলাই করা কাঁথাটাও, বাল্টহাসার স্ট্রাসের সেলারে যেভাবে ভাঁজ করেছিল শুকনো কাপড়, ঠিক সেভাবে। তারপর ঢুকল কিচেনে। কল থেকে পানি পড়ার শব্দ হলো কিছুক্ষণ, কেবিনেটের দরজাগুলো ঠুসঠাস খুলে গিয়ে বন্ধ হলো, তারপর শোনা গেল চুলায় পানি ফোটার শব্দ।

আমি তখন বসেছিলাম সোফার ডান দিকের হাতলে পিঠ ঠেকিয়ে। জানালা দিয়ে একটা বুড়ির চিৎকার শোনা গেল, তার কুকুরটা দৌড়ে যাচ্ছিল রাস্তায়, একটা গাড়ির জোরে ব্রেক কষার শব্দ হলো। গলা উঁচু করে রিটাও দেখার চেষ্টা করল ঘটনাটা। কেউ চিৎকার করে গাল দিল আর্শলক। বুড়িকে, না কুকুরকে, নাকি চালককে বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তারপর রিটা একটু ঝুঁকে এল আমার দিকে। কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর আছে কি না। একসময় ও বসে পড়ল আমার হাঁটুর কাছে, কার্পেটে।

নাম ধরে ডাকল আমাকে, 'সেলিম', জিজ্ঞেস করল 'কী হয়েছে তোমার ? তুমি কি জানো, গত চার দিন আমার কীভাবে কেটেছে ? আমাকে একবার জানাতেও তো পারতে !'

রিটার কোনো প্রশ্নের জবাব দিইনি আমি। একবার ভেবেছিলাম ওকে বলি, তুমি যখন টেরনোপল গিয়েছিলে, তখন আমারও এমন হয়েছিল রিটা। কিন্তু কথাটা ওকে বলিনি।

রিটা ওর মুখ রাখল আমার হাঁটুর ওপর। চিবুকটা আমার দুই হাঁটুর মাঝখানে। আমার দিকে মুখ তুলে চাইল রিটা। ওর চোখের মধ্যে টলটল করছে পানি। যখন কথা বলছে, ওর চিবুকটা বসে যাচ্ছে হাঁটুর মাঝখানে। ওর গলাটা তখন ভাঙছে।

'এই ছেলে তুমি তো আমাকে তারামনের কথা বললে না', রিটার অভিমান। 'পরে কী হয়েছিল তারামনের ?'

আমি বললাম, 'বলব।' তারপর ওর মুখটা দুই হাতের তালুতে ধরে আমিও বসলাম মেঝেতে। ছোট ছোট কয়েকটা চুমু দিলাম ওকে। আমার ঠোঁট ওর কান্না শুষে নিল ব্লটিং পেপারের মতো। রিটা আর আমি সোফায় ঠেস দিয়ে পরস্পরের হাত ধরে বসে রইলাম কিছুটা সময়। ওর মধ্যমা দিয়ে আমার আঙুল গুনল রিটা...'আইন, সোয়াই, ড্রাই, ফিয়ার...' অবু...দশ, বিশ, ত্রিশ খেলার মতো। রিটা বলল, আমাকে তৈরি হয়ে নিতে। আমি বাথরুমে গিয়ে শেভ করলাম, গোসল করে পরলাম নতুন কাপড়। বাইরে এসে দেখি, রিটার দুই হাতে দুই মগ কফি, ধোঁয়া উড়ছে কুণ্ডলি পাকিয়ে।

তারপর আমরা একসঙ্গে বাজার করলাম। চিজ, শালগম, ক্যাপসিকাম, নিউ পটেটো, স্প্রিং অনিয়ন আর সুকিনিতে ভরে গেল রিটার ঝুড়িটা। বাজারে বোতাম বিক্রি করত যে মেয়েটা, জানালার পর্দা দেখার নাম করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম একটা লম্বা সময়। মনে হলো মেয়েটা ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা উঁচু করে চোখ ঘুরিয়ে সজলকে খুঁজছিল।

ঘরে এসে রান্না করলাম একসঙ্গে। রিটা সবজি কাটল আর চুলায় আগুন ধরিয়ে রান্না করলাম আমি। ইয়োরোপের সবজি রাঁধলাম হলুদ-জিরা দিয়ে দেশি স্টাইলে। গল্পে গল্পে খাওয়া হলো আমাদের। চোখে যখন শনিবার দুপুরের ঘুম নেমে এল, নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিছানায়, আমার পাশে কাত হয়ে গল্প শুনছে রিটা। এবার ও শুনছিল আমার নিজের গল্প।

আমার জন্মের কথা শোনালাম ওকে। বললাম আমার যে কোনো জন্মতারিখ নেই, সে কথাও। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রিটা। বলল, 'ওমা, জন্মতারিখ ছাড়া মানুষ হয় নাকি কখনো।' আমি বললাম, 'হয়। সবাই সালটা জানত কিন্তু দিন, তারিখ জানা ছিল না কারও। দাদি বলত, তুই যখন হইলি, খাল উপচাইয়া বন্যা হইল। আর দাদা বলত, যেই সময় তুই জন্মাইলি, বিশ্যুদবার রাইতে, তুফানে পইড়ে পশ্চিম পারের বটগাছটা উপড়াইয়া গেছিল। আব্বাকে জন্মের কথা জিজ্ঞেস করার সাহস আমার কখনো হয়নি। আম্মাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, সংগ্রামের কয়েক বছর আগে।'

'তাহলে ?' রিটার প্রশ্ন, ওর চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে।

'না না, আমার একটা জন্মতারিখ আছে, সেটা বানানো। স্কুলের পরীক্ষার সময় আব্বা দিয়েছিল।'

রিটা জানতে চাইল, 'কবে ?'

আমি বললাম, 'পহেলা জানুয়ারি।'

'তোমাদের দেশে, এই ছেলে, সবার গেব্যুর্টসডাটুম এক হয় কেন ! পোস্ট অফিসে বাংলাদেশের লোকেরা যখন আসে, অথবা রেজিস্টার্ড চিঠি বিলি করার সময় যখন ওদের পাসপোর্ট দেখি, সেখানেও এই তারিখটা লেখা থাকে।'

'আমাদের দেশে হার্ভেস্ট হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। বাবা-মায়েরা তখন খুব খুশি থাকে। সেই জন্য আমরা জন্মাই পরের বছরের শুরুতে।'

রিটা হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল আমার বুকের ওপর। ওর পনিটেল কখন খুলে গিয়ে কাঁধের দুই পাশ দিয়ে চুল নেমে এসেছে বুকের ওপর। আমার জীবনকাহিনি শুনছে রিটা। বললাম, 'এটা কিন্তু সেলিমের প্রথম জীবন না, এটা দ্বিতীয় জীবন।'

'কেমন ?' আবার প্রশ্ন রিটার। ভুরু উঠল কপালের ওপর।

'খুব ছোট বেলায় আমি একবার পুকুরে ডুবে গিয়েছিলাম, রিটা। কয়েক ঘণ্টা শুয়েছিলাম পুকুরের তলায়। তারপর জাল ফেলা হলো। পুকুরের তল থেকে তোলা হলো আমাকে।'

'তারপর ?'

'অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলাম আরও কয়েক ঘণ্টা। সবাই বলল, বেঁচে নেই আমি, মরে গেছি। দাফন-কাফনের আয়োজন শুরু হলো। মা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না সে কথা। তিনি কবর দিতে দেবেন না আমাকে। উঠানের মাঝখানে রাখা হলো আমার নিথর শরীর। চারপাশে কাঠ আর তুষ বিছিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আগুন। মা সেজদা দিলেন জায়নামাজে আর ভোরের দিকে আমি কেঁদে উঠলাম, মা মা।'

রিটা তখন জড়িয়ে ধরল আমাকে। তুষের আগুনের মতো আরামদায়ক ওর শরীর। আমি যখন মা মারা যাওয়ার পর আমাদের ঢাকায় চলে আসার কথা বললাম, তখন ও আরও একটু ঘনিষ্ঠ হলো, আর হাতটা শিথিল হয়ে এল, যখন বললাম, শীলার সঙ্গে আমার ভালোবাসা এবং ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার কাহিনি।

তারপর তো আমি এই দেশে।

'এই ছেলে...'

'বলো, রিটা', আমি তাকিয়েছিলাম ওর চিবুকের দিকে। ওখানে আমার নখের আঁচড়ে সুতার মতো চিকন লাল একটা দাগ পড়েছে।

'এখন কী করবে তুমি ? তোমার জীবনের ভবিষ্যৎটা একটু বলো', রিটা হাসতে হাসতে জানতে চাইল।

'জানি না।'

'কেন ?'

আমি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে উকিলের চিঠিটা এনে দেখালাম রিটাকে। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল রিটা। চিঠিটা কয়েকবার পড়ল, একবার পড়ল জোরে, বুকের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে, পড়ার সময় কয়েকবার আমার দিকেও তাকাল। তারপর শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, উঠে বসল বিছানার কিনারে, তারপর সোফায়। একসময় ও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এই দেশের সঙ্গে আমার শেষ যে যোগাযোগ ছিল, যেন ছিন্ন হয়ে গেল সেই সুতোটাও।

দরজার ওপাশে

রিটা যতক্ষণ এই বড়িতে ছিল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম চিঠিটার কথা। আসলে চিঠির কথা ভুলিনি, ওখানে লেখা কথাগুলো তো ও কয়েকবার জোরে জোরেই পড়ল এবং পড়ে শোনাল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম চিঠির পরিণতির ভয়াবহতা।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যখন একসঙ্গে থেকেছি, রিটা আমার সঙ্গে পিওনিয়ার স্ট্রাসের ঘরে অথবা আমি রিটার সঙ্গে বাল্টহাসার স্ট্রাসের চারতলায়, আমার মগজ ও শরীরজুড়ে শুধু রিটাই থাকত। কোলনের কোথাও হয়ত একটা ট্রাম চলতে চলতে লাইন থেকে পিছলে পড়ল অথবা ঢাকার রাস্তায় রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙল আব্বার হাত, অথবা পরমতলায় স্থানীয় নির্বাচন হলো, ভুতুড়ে কোনো ভোটার ভোটকেন্দ্রে ঢুকে বাক্সে ফেলে গেল আমার আর রুখসানা বেগমের ব্যালট, এসবের কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করত না। আমার কাছে রিটা ছিল ক্লোরোফর্মের মতো। চেতনানাশক এই তরল যেমন অপারেশন থিয়েটারে রোগী আর কাটাছেঁড়ার যন্ত্রণার মাঝখানে একটা দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি রিটাও আমাকে আলাদা করে রাখত শীলার সংসার, পুলিশের মামলা, মতিউর রহমানের আস্ফালন, জুতার কারখানা আর কোলনে অনিশ্চয়তার সুতায় ঝুলতে থাকা জীবনের কাছ থেকেও।

আমার জীবনে রিটা ছিল এরকম একটা নিরাপদ পুকুর, যেখানে আমি মাছ হয়ে সাঁতার কাটতাম, অনায়াসে ঘুরে বেড়াতাম এদিকে-সেদিকে, ডুব দিতাম, ভাসতাম। আমার কাছে রিটা ছিল একটা নীল পরিষ্কার আকাশের মতো। আর আমি একটা পাখি। যখন ডানা দুটো দুই পাশে মেলে ধরতাম, হালকা একটা বাতাস এসে উড়িয়ে নিত আমকে। চারদিকে ছড়িয়ে থাকত সুখের মতো একটা আলো। সেই আলো আমাকে ভাসিয়ে নিত বহু দূর।

রিটা একবার আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, ওর রং কী।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এটা আবার কেমন প্রশ্ন ? তোমার গায়ের রং ! আমরা যারা কালো এই প্রশ্নটা তো তাদের। আমরা বলি ফরসা, উজ্জ্বল, শ্যামলা অথবা কালো। তোমরা তো সবাই সাদা।'

'আরে বোকা, গায়ের রং না। তুমি চোখ বন্ধ করো।' রিটা বলল। তারপর দুই হাত দিয়ে আমার দুটো হাত ধরে রাখল ওর কোমরে। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

'এবার ভাবো তো তুমি, কোন রং দেখতে পাও,' রিটার পরীক্ষা।

আমি বললাম, 'মানে ?'

'আমাকে যখন তুমি স্পর্শ করো, তখন তুমি কোন রং দেখতে পাও, সেলিম ?' রিটা এরপর আরও বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'কোন রঙের সঙ্গে তুমি আমার মিল দেখতে পাও ? যেমন ধরো, নীল বললে খুব সহজেই কি মনে হয়, কোন জিনিসটা চোখে ভাসে ?' প্রশ্ন করল রিটা। আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। চোখ বন্ধ রেখেই আমি বললাম, 'আকাশ।' তারপর রিটার প্রশ্ন, 'আর লাল রং ?' আমি বললাম, 'রক্ত।'

'এবার বলো, আমার রং কী', রিটা জানতে চাইল। চোখ বন্ধ রেখেই আমি দেখতে পাচ্ছি, রিটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললাম, 'কালো। তোমার রং কালো।'

একটা ঝাড়া দিয়ে রিটা আমার দুটো হাত ওর কোমর থেকে ছাড়িয়ে নিল। এক লাফে দূরে সরে গিয়ে বলল, 'সেলিম, আমার রং কালো ? তোমার কাছে আমি কালো ! কালো একটা রং !'

যখন আমি বুঝিয়ে দিলাম চোখ বন্ধ করে ওকে দেখলে কেন আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসে, রিটার চোখ দুটো তখন খুশিতে ঝলমল করে উঠল। আমি বললাম, 'কালো রহস্যময়, কালো হচ্ছে ক্ষমতা, শক্তি আর যৌনতা, খুব গভীর কিছু হলো কালো। পৃথিবীটার জন্ম হলো যেখানে, সেটাও একটা কালো গহ্বর ছিল। মৃত্যু আর ধ্বংসের পরও এই কালোর ভেতর সেঁধিয়ে যাবে সবকিছু।'

রিটা বলল, 'যেখানে কোনো রং থাকে না, সেটাই কালো, সেলিম।'

আমি বললাম, 'এই কালোর কারণেই কিন্তু বাকি সব রং উজ্জ্বল মনে হয়।'

তারপর রিটাকে একটা নেশায় পেয়ে বসল। একটার পর একটা খেলা খেলতে লাগল আমাকে নিয়ে। খেলার নায়ক থাকত ও, খেলত সে নিজে, কিন্তু খেলাত আমাকে দিয়ে। এরপর রিটা জানতে চাইল চোখ বন্ধ করে আমি যখন ফুলের কথা ভাবি, তখন কোন ফুলটার কথা মনে হয় ? আমি বলেছিলাম, 'কচুরিপানা।' এই ফুল সে চেনে না। একদিন চিড়িয়াখানার পাশে যে বোটানিশে গার্টেন আছে, ওখানে গেলাম আমরা। পানিতে নেমে কচুরিপানার ফুল ঘরে নিয়ে আসতে চাইল রিটা। তারপর জানতে চাইল, কোন গানের সঙ্গে তার মিল আছে। আমি বললাম, 'লুচিয়ানো পাভোরত্তি।' খাবার 'রিভফ্লাইশ,' পাখি 'কাকাতুয়া' আর পশু 'ব্যাঙ।'

রিটা হাসল। বলল, 'ওটা পশু না।' আমি বললাম, 'তাহলে তুমি জিরাফ।' ও জানতে চাইল, 'কেন, তোমার চেয়ে খুব বেশি লম্বা ? ধরতে পার না ?'

ও আমাকে ডাকল 'টাট্টু ঘোড়া।'

এই খেলা খেলতে খেলতে একদিন উন্মাদ হয়ে গেল রিটা। এবার ও জানতে চাইল ওর কথা ভাবার সময় আমার কোন মানুষের কথা মনে হয়। আমি বললাম, 'এটা কেমন কথা। তোমার কথা ভাবলে তোমার কথা মনে হয়। আর কার কথা মনে আসবে তখন !' আমি ভাবলাম, রিটা হয়ত জানতে চায় যে আমি এখনো কাউকে ভালোবাসি কি না, বিশেষ করে শীলাকে।

আসলেই আমি কি শীলাকে ভালোবাসি এখনো ? ওকে ভুলতে পারিনি এতগুলো বছরেও ? আগেও বলেছি, মানুষের ভালোবাসার স্মৃতি নাকি ততদিনই স্থায়ী হয়, যতদিন আয়ু ছিল ভালোবাসার। আচ্ছা, শীলার সঙ্গে আমার ভালোবাসা বেঁচে ছিল কত বছর ? আমি ওকে কবে থেকে ভালোবাসি ? সেটা কি এখনো মরেনি ? বেঁচে আছে ? কীভাবে আছে ? ওর সঙ্গে আমার ভালোবাসার শেষটা ধরব কোন জায়গা থেকে ? যেদিন আমি বিমানে উঠি, সেদিন থেকে, নাকি ধরব যেদিন শীলার শেষ চিঠি এল, তার পর থেকে ? নাকি ফ্রাউ বাওয়ার যেদিন আমাকে ঘোড়া বানাল, সেদিন ?

তখন থেকে আমি শীলাকে ভালোবাসি, যে বছর কারওয়ান বাজার মোড়ে বসানো হয়েছিল প্রজাপতির ফোয়ারা আর ঢাকায় টেম্পু চালু হলো, আমি শীলাকে ভালোবাসি, যখন ও টেলিভিশনে শিশুদের সঙ্গে নতুনকুঁড়িতে গান করে, যখন চুলে বেণি করে ও কলা ভবনে আসত, তখন থেকে আমি ওকে ভালোবাসি, শীলাকে আমি ভালোবাসি যখন আমার মুখ ছেয়ে গিয়েছিল ব্রনে, বাবা যখন পরমতলায় মায়ের কবরটা শান পাথরে বাঁধানোর কথা বললেন, যখন ভাবছিলাম একটা পাথরে খোদাই করে ওখানে লিখে দিয়ে আসব 'এখানে জেগে আছেন আমাদের মা', কবরের পাশে যে বছর শিউলি গাছটা লাগানো হলো, তখন থেকে আমি শীলাকে ভালোবাসি।

রিটা তখন আমাকে বোঝাল, 'এটা একটা খেলা, সিরিয়াস কিছু না।' তারপর বলল, 'ধরো, আমরা দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি। তুমি ভাবছ যে আমি আছি কিন্তু আসলে আমি নেই। তোমাকে হঠাৎ এই শূন্য স্থানটা পূরণ করতে বলা হলো। সেটা করতে হবে একটা মানুষ দিয়ে। আমি ছাড়া যেকেনো মানুষ। সেটা একটা পুরুষ হতে পারে, হতে পারে একটা শিশু, যেকোনো কেউ।'

রিটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করলাম আমি। দেখলাম রিটাকে। কালো একটা অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে ও। তারপর একসময় আমার সামনে থেকে রিটা উধাও হয়ে গেল। আমি দেখলাম, শুধু একটা অন্ধকার গুহা। এখন

সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা মানুষ বসাতে হবে। একবার ভাবলাম, শীলা; না, শীলা না, ও হারিয়ে গেল, আমার ছোট বোনের মুখটাও স্থায়ী হলো না। তারপর ওখানে হেলমুট কোলের কথা মনে হলো, মনে হলো স্টেফি গ্রাফের মুখটাও। কিন্তু না, কোনো মুখই রিটার উধাও হয়ে যাওয়ার পরে তৈরি হওয়া খালি জায়গায় বসতে রাজি হলো না।

আমি তখন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে চলেছি, রিটা না, কিন্তু রিটার মতো একটা মুখ। তখন যে মানুষটা আলোর ঝলকানির মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই মুখটার কথা আমি কোনো এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। বজ্রপাতে পাওয়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুটা সময়। রিটা আমাকে যেভাবে স্নান করায়, তিনিও আমাকে গোসল করাতেন সেভাবে। রিটা যেভাবে কাপড় পরায়, চুল আঁচড়ে খাইয়ে দেয়, বেঁধে দেয় জুতার ফিতা, সেরকম করে তিনিও দেখতেন আমাকে। আমার মনে হলো, রিটার ভালোবাসার সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে সেই মানুষের ভালোবাসার।

আমার তখন চোখ খুলতে ভয় হচ্ছিল। রিটার ভালোবাসাটা দেখতে চাইছিলাম, কিন্তু শরীরটা না। এই কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটা শূন্যস্থান পূরণ করতে মনের দরজায় এসে হাজির হয়েছিল, রিটার মধ্যে সেই মানুষটার ভালোবাসা আছে, আছে মায়া, অসীম মমতা, আছে তার মতো স্নেহ কিন্তু এর বাইরে আমি আর কিছুই দেখতে চাইনি। এই কথাটা আমি রিটাকে বলতেও পারব না। ভাবনাটাকে তখন খুন করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

মিথ্যা বললাম রিটাকে। চোখ বন্ধ রেখেই আমি বললাম, 'রিটা, শূন্য জায়গায় আমি এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছি। তোমার জায়গায় আমি। আমার জায়গায় তুমি। তোমার মতো আমি। আমার মতো তুমি।'

তারপর থেকে রিটা আমাকে নিয়ে এই খেলা আর কখনো খেলেনি। শুধু মাঝেমধ্যে সে আমাকে 'রিটা' বলে ডাকত আর আমি ওকে ডাকতাম 'কাকাতুয়া' অথবা 'ব্যাঙ', কখনো 'কচুরিপানা' আবার কখনো কখনো 'গরুর মাংস।'

রিটা চলে যাওয়ার পর চিঠির সেই আতঙ্কটা ঝুপ করে নেমে এল ঘরের ভেতর, বৃষ্টির মতো। ভয়ের সেই বৃষ্টিতে ভিজলাম কিছুটা সময়। তারপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম বিছানায়। ভাবছিলাম, আমাদের ডাকাডাকির কথাটাও। ভাবলাম, ইয়োরোপের অন্য কোথাও পালিয়ে গেলে হয়ত কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো রিটার সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সুযোগ থেকে যাবে, কিন্তু দেশে পাঠিয়ে দিলে সেটা আর কখনোই হবে না। এই ডাক আমি আর কখনো শুনব না। আমি কি তাহলে পালাব ? রিটার জন্যই পালিয়ে যাব রিটার কাছ থেকে ?

এর কয়েক দিন পর, রৌদ্রোজ্জ্বল এক রবিবারে, দুপুরের কিছু আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যখন আমার পালানো এবং না পালালে ভবিষ্যৎ কী হতে পারে, সেসব নিয়ে ভাবছিলাম, তখন বেজে উঠল ডোরবেল। আওয়াজটা অপরিচিত মনে হলো। একটা আতঙ্কে কুঁকড়ে উঠলাম আমি। রিটা চলে যাওয়ার পর, গত কদিনে কেউ আসেনি এখানে। আসেনি রফিক আর সজলও। ওদের কোনো খোঁজও পাইনি, ওরা কোথায় আছে, পালাল কি না, আর পালালে কোথায় গেছে, আমি তার কিছুই জানি না। ওরা ফিরে এল, নাকি চিঠির কোনো সাড়া না পেয়ে বাড়িতেই এল উকিল, না এল ইমিগ্রেশন বিভাগের কোনো পুলিশ, কে জানে !

বেলটা বেশ কয়েকবার বাজল, অস্থির আঙুলে বাজালে যেভাবে বাজে।

দরজার সামনে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তার আসার কথা আমি এখন একটুও ভাবিনি। সাইকেলটার ভর কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে আছে রিটা। পিঠে বাঁধা একটা রুকসাক। ওর চোখ দুটো বরফে জমাট বেঁধে থাকা সসেজের মতো স্যাঁতসেতে রকমের লাল। বললাম, ভেতরে আসতে, এল না। জানতে চাইলাম, কী হয়েছে, জবাবে ও আমার কাছে কিছু কাগজ চাইল, সরকারের কাছ থেকে পাওয়া কিছু দলিল। কাগজগুলো ওর হাতে তুলে দেওয়ার আগে যখন জানতে চাইলাম, এগুলো দিয়ে সে কী করবে, 'শাইসে কিড' বলে ও আমাকে একটা ধমক দিল, তারপর সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখে ভরল রুকসাকে, ঘোড়ায় চড়ার মতো লাফ দিয়ে বসল সাইকেলে এবং একসময় হারিয়ে গেল পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাম দিকে, হেয়ার স্টুডিওটার পেছনে।

কারখানায় গেলাম এক সপ্তাহ পর, তারপর উকিলের কাছে, যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা সুখবর। উকিল জানাল, আদালতের সেশন স্থগিত করা হয়েছে। রায় হচ্ছে না আপাতত। এখন আরও কয়েকটা মাস নিশ্চিন্ত।

একটা পাথর নেমে গেল বুকের ওপর থেকে; কিন্তু আরেকটা নতুন ভাবনা এসে ভর করল মাথায়। পিওনিয়ার স্ট্রাসের এই বাড়িটা আমাকে ছাড়তে হবে, একার পক্ষে এই ভাড়া টেনে যাওয়া খুব কঠিন। আবার বাড়ি দেখতে শুরু করলাম শহরে। পত্রিকার পাতায় পাতায়, দোকানের উইন্ডোতে আর এদিকে-সেদিকে। আমি বাড়ি খুঁজতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসের আশপাশে, নিদেনপক্ষে এবার্টপ্লাৎসের কাছে।

এখন সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করি, সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে ওভারটাইমসহ রাত দশটা পর্যন্ত। শনিবার সকালের দিকে বাড়ি খুঁজি, বাড়ি দেখি। দুপুরের পরে যাই বাল্টহাসার স্ট্রাসে, ফিরি সন্ধ্যায়। পরদিন সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যে আমার এখানে আসে রিটা। তারপর দিনের গোসল, খাওয়া আর ঘুমের আগে একাত্তরের কথা। গত রবিবারে আমি ওকে বলছিলাম

ডাক্তার ক্যাপ্টেন সিতারা বেগমের কথা। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন বীর প্রতীক সিতারা। বঙ্গবন্ধুর ডাকে তখন সারা দেশে শুরু হয়ে গেছে অসহযোগ আন্দোলন। সিতারার ভাই, সেক্টর টুর মুক্তিযোদ্ধা মেজর হায়দার তাকে বললেন, কুমিল্লায় ফিরে না যেতে। বাবা আর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সিতারা রওনা দিলেন ভারতের মেঘালয়ের দিকে। ওখানে পৌঁছাতে সময় লাগল দুই সপ্তাহেরও বেশি। একটা হাসপাতালে কাজ করতেন সিতারা, নাম ছিল বাংলাদেশ হাসপাতাল, সিতারা ছিলেন তার কমান্ডিং অফিসার। এতটুকুই বলা হয়েছিল রিটাকে।

ভাবছিলাম আগামীতে দেখা হলে বলব এনেসথেশিয়া না দিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধার শরীর থেকে সিতারা কীভাবে বুলেট বের করে আনতেন, ওষুধের জন্য তার নিয়মিত আগরতলায় যাওয়ার কথা, আহত যোদ্ধাদের যখন ঝাঁকে ঝাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হতো, একটামাত্র অপারেশন থিয়েটারে তিনি সবকিছু সামাল দিতেন কীভাবে, এরকম কিছু গল্প মনের ভেতর সাজাতে-গোছাতে কেটে যাচ্ছিল আমার অলস সময়।

পরের সপ্তাহে কারখানা বন্ধ ছিল টানা তিন দিন, বেতন নিয়ে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের কী যেন ঝামেলা হচ্ছিল, কর্তৃপক্ষ মজুরি বাড়াতে রাজি হলো, কিন্তু জানিয়ে দিল কাজ শুরু হবে পরের সোমবারে।

শুক্রবার দুপুরের পর, আমি যখন রিটার উইকেন্ডের জন্য অপেক্ষা করছি, খাওয়ার পরে ঘুম আসছিল না বলে একটা পর্নো মুভি দেখছিলাম টেলিভিশনে, তখনই রিটা এল। কালো রঙের একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে রিটা। চেনা যাচ্ছিল না ওকে। রিটা ছিল দরজার ওপাশে, ওর পরনে গোড়ালি পর্যন্ত নেমে আসা সাদা রঙের একটা জামা। সেটা কোমরের কাছ থেকে কুচি দেওয়া। পায়ের কাছে, কোমরে এবং গলার কাছে ঝালরের মতো লাগানো। জামার হাতা কনুই ছুঁয়েছে, সেখানেও নেটের মতো সাদা রঙের লেইস লাগানো।

মাথার মাঝখান দিয়ে পিওনিয়ার স্ট্রাসে রাস্তাটার মতো সিঁথি করেছে রিটা, শেষের দিকে গিয়ে একটু বাঁকা। দুই দিকে দুটো বেণি করেছে ও। বেণির গোড়ায় ব্যান্ড লাগানো, সেখানে কাঁচা টমেটো রঙের কয়েকটা ছোট ছোট বল। কানের লতিতে ঝুলছে চুরির মতো গোল গোল দুল, রুপালি রঙের। একই রকমের চুড়ি ঝনর ঝনর করে বাজছে রিটার দুই হাতে।

ঠোঁটে হালকা গোলাপি রং আর চোখে কাজল দিয়েছে রিটা। মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে একটা সাদা পরী পিওনিয়ার স্ট্রাসে নেমে এসেছে। পরীর হাতে ফুলের বিশাল একটা ব্যুকে।

রিটা কিছু বলল না আমাকে। ঘরে ঢুকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা প্যাকেট। তার ভেতর একটা দামি ফুলহাতা সাদা শার্ট, হাতার ওখানে কাফলিং লাগানো। আর একটা কালো প্যান্ট। জামাজুতা পরিয়ে দিল রিটা এবং চুল আঁচড়িয়ে, কোমরে জড়িয়ে নেমে এল রাস্তায়। তারপর সোজা গিয়ে বসল গাড়িতে।

স্টান্ডেসআমেট বিয়ে হলো আমাদের। রেজিস্ট্রার ছাড়াও আরও দুজন ছিল সেখানে। ওরা রিটার পরিচিত। দলিলে সইসাবুদ শেষ হওয়ার পর রেজিস্ট্রার রিটার কাছে জানতে চাইলেন, ওর নামের শেষে আমার পদবী লাগাবে কি না। লাফিয়ে উঠল রিটা, দ্রুত হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সরাসরি 'না' করে দিল। তারপর ওই কর্মকর্তা জানতে চাইলেন, আমার বংশ-পরিচয়, বাবার নাম ও পেশা, মায়ের কথা যখন বলছিলাম, রিটা বসেছিল মাথা নিচু করে। কী হচ্ছিল বা কোথায় আছি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি। তবে আমার মনে আছে, শুধু একবার মনে হয়েছিল, আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে, সে রিটা না, সে লাল শাড়ি পরিহিত শীলা, ঘোমটার নিচে ওর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে কিন্তু মুখের আড়ালে লুকানো হাসি।

আমরা যখন রাটহাউজ থেকে বেরিয়ে এলাম, তখনো বাইরে ছিল প্রচুর আলো। নগর ভবনের সামনের উঠোনে, কুয়ার মতো ঝরনাটার চারদিকে, কয়েকটা কবুতর গোল হয়ে ঘুরছিল আর বৃদ্ধ মতো একটা লোক, বেঞ্চে, মাটির কাছাকাছি হয়ে বসে, ছুড়ে দিচ্ছিল গমের দানা। রিটা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল কিছুটা সময়, ধরার চেষ্টা করল একটা কবুতর, হাঁটু বাঁকা করে ওর পেছনে ছুটল বাচ্চাদের মতো, তারপর ডানার ঝাপটায় সরে এল পেছনে। তারপর আমরা ডোমের সামনে উঁচু জায়গাটায় হেঁটে বেড়ালাম। একটা লোক মেঝেতে এক দম্পতির ছবি আঁকছিল, ট্যুরিস্টরা পয়সা রাখছিল উল্টো করে রাখা শিল্পীর টুপিতে, একটা জোকার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সাদা সিমেন্টের মূর্তির মতো, যার সঙ্গে ছবি তুলছিল অনেকে।

রিটা আমাকে নিয়ে গেল রাইনের তীরে, বসল একটা কাঠের বেঞ্চিতে। একটা হাত দিয়ে ও ধরে রেখেছে আমার ডান বাহু। আমাদের সামনে নিস্তরঙ্গ পানি, মাঝেমধ্যে দু-একটা জাহাজ কল্লোল তুলে আসা-যাওয়া করছে। ব্রিজের পশ্চিম কোনায়, নদীর ওপরে ঘুরে ঘুরে মন্থরভাবে উড়ছে কতগুলো সাদা গাংচিল।

আমরা যখন ৫৬ বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে ফিরে এলাম, তখন রাস্তার বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। আমাকে সোফায় বসিয়ে রিটা চলে গেল ওর ঘরে। ভাবছিলাম, আজ আমাদের বাসর রাত। এর আগে এরকম একটা রাত আমি শুধু শীলার সঙ্গে কল্পনা করেছি।

রিটা যখন ফিরে এল, ওর চুল খোলা, হাত নগ্ন, পরনে আটপৌরে পোশাক, যেন কিছুক্ষণ আগে ও পোস্ট অফিস থেকে বাসায় ফিরেছে। আমি বুঝতে পারিনি রিটা এখনই হোকসাইটের পোশাক খুলে ফেলবে। ভেবেছিলাম ও হয়ত এই কাপড়ে আমার সঙ্গে ঘুমাতে যাবে, আমরা বিছানায় শুয়ে-বসে গল্প করব, তারপর করব খুনসুটি, কথায় কথায় আর চাহনিতে ও আদর সোহাগে আর হাসাহাসিতে একসময় রাতের অন্ধকার হারিয়ে যাবে সকালের আলোর পেছনে, আর দশটা দম্পতির বাসর রাতের মতো হবে আমাদের এই রাত, তারপর ঘুম ভাঙলে আবিষ্কার করব আমাদের বিয়ের কাপড় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেঝেতে আর আমাদের নগ্ন শরীর কাঁচা পেয়ারা রঙের একটা ডুভের নিচে ঢাকা পড়ে আছে।

রিটাকে দেখে খুব অবাক হলাম আমি। বুঝতে পারছিলাম না, কী করব, কী বলব ওকে। একবার মনে হলো, আসলে কি আমাদের বিয়ে হয়েছে, না অন্য কিছু ? এটা কি আসলেই রিটা, নাকি অন্য কেউ ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি ? এখন থেকে কি আমরা দম্পতি, রিটা আমার ফ্রাউ আর আমি রিটার এহমান !

যথারীতি দুই মগ কফি করল রিটা, একটায় দুধ চিনি দিয়ে, আরেকটা ঘন কালো আলকাতরার মতো। ও গিয়ে বসল সোফার আরেক কোনায়। আমি সরে এলাম ওর দিকে, ও তখন কিচেনের কী একটা ছুতা করে উঠে গেল। তারপর, একটু আগে আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখানে গিয়ে বসল। আমার মনে হলো, রিটা ইঁদুর-বিড়াল খেলছে। হয়ত একটু পরেই ধরা দেবে, সব সময় ও যা করে।

তারপর একসময় রিটা জানতে চাইল সিতারা বেগমের কথা। আমি বললাম, শেখ মুজিবকে মেরে ফেলার পর ক্যাপ্টেন সিতারা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেছে আমেরিকায়, আর কখনো ফেরেনি বাংলাদেশে। তারপর রিটা জানতে চাইল চুকনগরে সেদিন যারা হত্যাযজ্ঞে পাকিস্তানি সেনাদের সহায়তা করেছিল, স্বাধীনতার পর তাদের পরিণতির কথা। আমি বললাম, ওদের কেউ কেউ এখন বীর মুক্তিযোদ্ধা ! আর তারামন বিবি ? আমি বললাম, কুমিল্লায় যক্ষ্মার সঙ্গে লড়াই করে কোনোমতে বেঁচে আছে তারামন।

এসব বলতে বলতে আমি অপেক্ষা করছিলাম আমাদের বাসর রাতের জন্য। ভাবছিলাম রিটা কখন আমাকে নিয়ে যাবে ওর ঘরে, পাশাপাশি দুটো বালিশে মাথা রেখে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো শুয়ে থাকব, ঘুমাব। আমি যখন ঘুমের জন্য তৈরি হব ও তখন আয়নার সামনে বসে মাথার চুল আঁচড়াবে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা আদর করব, মাঝরাতে ঘুম ভাঙবে ওর অথবা আমার, তখন আরেকবার ভালোবাসব, আবার ঘুমিয়ে পড়ব বিছানায়, যখন ঘুম ভাঙবে আমি ওকে আবিষ্কার করব আমার বাহুর ভেতর অথবা আমার মুখ ওর পেটের কাছে, সকালে আমি যখন দাঁত ব্রাশ করব, রিটা ডয়েচে পোস্টের পোশাক পরবে, যখন শেভ করব ও

ঠোঁটে রং লাগাবে, ও যখন রুটি-টোস্ট করবে, আমি ডিম ভাঙব, আমি যখন জুতা পরব ও তার মুখে বেঁধে দেবে ফিতার ফুল, আমি যখন কারখানায় ব্যস্ত থাকব, রিটা ফোন করে খুনসুটি করবে, যখন ফিরে আসব ও আমাকে জড়িয়ে ধরবে, আমি কফি বানাব, আমরা একসঙ্গে বাজারে যাব। আমি ট্রলি ঠেলব, শেল্ফ থেকে পাস্তা খুঁজে খুঁজে রিটা সেগুলো ট্রলিতে রাখবে।

আসলেই কি রিটা আমার বউ...বুঝতে পারছিলাম না কিছু। আমার মনের ভেতর তখনো ছিল একটা স্তব্ধতা–কখন, কেমন করে এত কিছু হয়ে গেল আমার জীবনে। অস্বীকার করব না যে আমার রোমকূপে তখন লুকানো ছিল শরীরী শিহরণ। সত্যি কথা বলতে কি, রিটার সঙ্গে আমি খেলেছি, শুয়েছি কিন্তু কখনো পুরো রাত একসঙ্গে থাকিনি, আজ আমরা সারা রাত জেগে থাকব, একাত্তরের গল্পে আর শরীরে শরীরে, আমাদের অতীতের বয়ান আর ভবিষ্যতের রচনায়...

রিটা ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার গরম করে নিয়ে এল। আমরা খেতে খেতে গল্প করলাম। রিটার সামনে তুলে ধরলাম হানিমুনে আমার কোথায় কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা, তার একটা লম্বা তালিকা। ও আবার জানতে চাইল, একাত্তরের কথা, সিতারা বেগম এখন কোথায় আছেন, তার ভাই মেজর হায়দারকে কেন মেরে ফেলা হলো, তারামনের ভবিষ্যৎ এসব কাহিনি।

খাওয়া যখন শেষ হলো, গির্জা থেকে ভেসে এল রাত বারোটার আওয়াজ। রিটা দেয়ালে ঝুলে থাকা ঘড়িটার দিকে তাকাল। ছোট কাঁটাটা চাপা পড়ে আছে লম্বাটার নিচে। আমিও তাকালাম সেদিকে। তারপর হাসতে হাসতে বললাম, 'গরুর মাংস, বড় কাঁটাটা তুমি, ছোটটার ওপরে।' আমার চোখ ভরা দুষ্টুমি। বড় বড় চোখ করে তাকাল রিটা। ধমক দিল, তারপর বলল, 'এই ছেলে, অনেক রাত হলো, এখন তোমার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে...'

রিটা দাঁড়িয়েছিল ওর ঘরের দরজায়। বলল, আগামী দুদিন ও কোলনে থাকবে না। ফিরে এসে যোগাযোগ করবে রিটা। তারপর আমাকে একটা চুমু দিয়ে গুটেন নাখ্‌ট বলে সটান বন্ধ করে দিল দরজা। তারপর ওপাশ থেকে দরজা লক করার শব্দ হলো। ঘরের মেঝেতে চোখ রেখে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুটা সময়। কার্পেটের সঙ্গে দরজাটা যেখানে মিশেছে, সেখানে সরীসৃপের মতো শুয়ে আছে চিকন আলোর রেখা। তার ওপাশে, রিটার ঘরে অন্ধকারের ভেতর জ্বলে উঠেছে লাল রঙের মিহিন একটা আলো।

আমি যখন সিঁড়ি ভাঙছিলাম, তখন আমার জুতার শব্দ ছাড়া শহরের কোথাও কোনো শব্দ ছিল না।

ভৈরবের কসাই

এরপর থেকে রিটার সঙ্গে আমার দেখা হতো খুব কম, ও থাকত লুকিয়ে লুকিয়ে। আমার কাছ থেকে ও নিজেকে গোপন করে রাখত। আমি যখন কিচেনে যেতাম, রিটা ওর ঘরে শুয়ে থাকত, সোফায় বসলে ও গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়াত; আর আমি যদি শোয়ার ঘরে যেতাম, ও তখন কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে সেলারে চলে যেত। আমি বাল্টহাসার স্ট্রাসে গেলে ও যেত অফিসে, আবার আমি যখন পিওনিয়ার স্ট্রাসে ফিরে যেতাম, রিটা চলে আসত বাল্টহাসার স্ট্রাসে। আমার সঙ্গে ও তখন চোর-পুলিশ খেলত।

জানতাম না, কেন ও এরকম করছে, খুব কষ্ট হতো আমার, অপমানে গা গুলিয়ে উঠত। মনে হতো, ওর ওখানে আর কখনো যাব না, কিন্তু তার পরও নিজেকে বারবার আবিষ্কার করতাম ওর বাড়ির দরজায়, দাঁড়িয়ে আছি অথবা পায়চারি করছি। ডোরবেলের বোতামে আঙুল চেপে চেপে অস্থির হয়ে উঠতাম আমি। প্রথমে চাপতাম মধ্যমায়, তারপর বুড়ো আঙুলে, চাপতাম তো চাপতামই, চেপে ধরেই রাখতাম। বেলের শব্দ আমি শুনতে পেতাম না, কিন্তু বুঝতে পারতাম, রিটার ঘরে ওটা কীরকম তীব্র কর্কশ সুরে বেজেই চলেছে। একের পর এক মানুষ বাড়ির এই গেট দিয়ে বেরিয়ে যেত, ঢুকত, কিন্তু এই দরজাটা আমার জন্য খুলত না কখনো। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দরজায় লেখা সবগুলো নাম আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

মনে আছে, একতলার ডান দিকে থাকতেন ফন বেভারবর্গ, বহু আঙুলের স্পর্শে এই বাটনটা তেল চিটচিটে হয়ে গিয়েছিল, দোতলায় তুর্কি কেউ, নাম ছিল চাভাত, তিনতলার কোনো এক পাশে থাকত বালভেগ, এই নামটা চকচক করত, সম্ভবত সে ছিল রিটার নতুন প্রতিবেশী।

আমি যখন বাল্টহাসার স্ট্রাসে যেতাম, বুঝতে পারতাম না রিটা সে সময় বাড়িতে থাকত কি না, যদি থাকত এত শব্দের পরও সাড়া না দিয়ে ঘরে বসে থাকার তো কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু আমি বাল্টহাসার স্ট্রাসে তখনই যেতাম, যখন রিটার থাকার কথা, আগে যে সময়ে গিয়ে রিটাকে প্রায় নগ্ন হয়ে সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

ছুটির দিনগুলোতেও আমার জন্য রিটার দরজা খোলেনি।

একবার অন্য এক বাসিন্দার পিছু পিছু টুক করে ঢুকে গিয়েছিলাম বাড়িটার ভেতর, রিটার দরজায় বহু সময় ধরে নকও করলাম, নিচ দিয়ে চেষ্টা করলাম ভেতরে দেখার, সাড়া না পেয়ে বসে রইলাম সিঁড়িতে; কিন্তু রিটা এল না। আমি খুব ভালো করে জানতাম, রিটা এই শহরে আছে, অফিসে ফোন করলে বলা হতো ফ্রাউ বাওয়ার এখন ব্যস্ত, আমার নাম ও নম্বর টুকে রেখে অপারেটর জানাত যে তার কাছে মেসেজ পৌঁছে দেওয়া হবে কিন্তু রিটা পরে আর ফোন করত না আমাকে।

বাসায় ফোন ধরত না কেউ, রিং হতে হতে সেটা চলে যেত আনসারিং মেশিনে।

শুধু দেখা হতো তখন, যখন রিটা চাইত। রিটা আগের মতোই হাসত, জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত আমাকে 'এই ছেলে, এই ছেলে' বলে চিৎকার করে ডাকত, কিন্তু এর বেশি ঘনিষ্ঠ হতো না। বিয়ের পরে আমি কখনো রিটাকে নগ্ন দেখিনি, পাশাপাশি রাখা বালিশে মাথা রেখে আমরা কখনো গল্প করিনি, রিটা আমার ওপরে ওঠেনি, আমরা একসঙ্গে গোসলও করিনি।

রিটা আমার কাছ থেকে তার শরীর হঠাৎ করে দূরে সরিয়ে নিল। আমি ভাবতাম কেন ? বিয়ের কারণে ? আমি তো ওকে বিয়ে করতে চাইনি, ও-ই করেছে, আর বিয়ের পর তো শরীর আরও বেশি কাছাকাছি আসে, তাহলে ! রিটাকে এই প্রশ্নটা কয়েকবার জিজ্ঞেস করতে করতেও করিনি। ভেবেছি, ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর কী আছে, দেখা যাক না কী হয়, হয়ত ওর কোনো সমস্যা হয়েছে। রিটাই হয়ত একদিন সব খুলে বলবে। তারপর সে হয়ে উঠবে আগের মতো, আমার 'কচুরিপানা' অথবা 'কাকাতুয়া' কিংবা 'টাট্টু ঘোড়ার' সওয়ারি।

এর মধ্যে আমি বাসা বদল করেছি, পিওনিয়ার স্ট্রাসে ছেড়ে উঠেছি কারখানায় যাওয়ার পথে কোনার একটা বাড়িতে, স্টুডিও ফ্ল্যাট, ঘরের ভেতরেই কিচেন, তার সঙ্গে বাথরুম লাগোয়া। বড় একটা রাস্তা ক্লুডভিৎস প্লাতস থেকে সোজা এসে এই ৪৯ কোবলেন্সার স্ট্রাসের এখানে ইংরেজি ওয়াই অক্ষরের মতো ভাগ হয়ে সামনে আর পেছন দিয়ে চলে গেছে দুটো রাস্তা, ত্রিভুজের মতো, মাঝখানে দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা ম্যাকডোনাল্ডস। তার মুখোমুখি নতুন বাড়িটা, পাঁচতলায় আমার ফ্ল্যাট। একটাই জানালা। পর্দা তুললে দেখা যেত উঁচু সবুজ একটা পাহাড়। তার পেছনে ঝুলে থাকত গোলাপি আকাশ।

এই ঘরের জানালা দিয়ে শহরের প্রায় সবকটা বাড়ির ছাদ দেখা যেত, দেখা যেত রাইনের ব্রিজ, ডোমের চূড়া আর চারকোনা একটা স্কাই স্ক্র্যাপার। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি খুঁজতাম, কোথায় বাল্টহাসার স্ট্রাসে। চারদিকে শুধু বাড়ি

আর বাড়ি, চিমনি, সবুজ পার্ক আর উঁচু উঁচু গাছ, এর ভেতরে ভেতরে যে এত শত রাস্তা, ওপর থেকে সেটাও বোঝার উপায় ছিল না।

বিয়ের বেশ কয়েক দিন পরের ঘটনা, ওর ঘরের মেঝের ওপরে আমরা বসে আছি, বন্দিশিবিরের ফাইলগুলো রিটা ঘাঁটাঘাঁটি করছে, আমার কাছে শুনেছে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জহির রায়হানের কথা, ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে কীভাবে সে হারিয়ে গেল চিরতরে, শেষবারের মতো তাকে কোথায় দেখা গেছে, শহীদুল্লাকে কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এসব কাহিনি।

রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে বিজয় দিবসে পাওয়া তিন ভাইয়ের লাশের কথা যখন বললাম, একটু বাঁকা হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল রিটা। বললাম, 'রাজাকাররা এদের ধরে নিয়ে যায় চূড়ান্ত বিজয়ের ঠিক একদিন আগে। একই পরিবারের তিনজন ওরা।'

রিটা জানতে চাইল শহীদুল্লা কায়সার এবং জহির রায়হানের ঘাতকেরা এখন কোথায় ? আমি বললাম, 'আছে দেশেই।'

'দেশের কোথায়', রিটার চোখ লাল।

আমি বললাম, 'কোথায় আবার, ক্ষমতায়।'

চোখ সরিয়ে নিল রিটা। সে তার নিজের কাজে মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করল। ফাইলে রাখা কাগজগুলোতে রিটা এটা-ওটা লিখছিল, দাগ দিচ্ছিল, এক ফাইল থেকে কাগজ খুলে নিয়ে রাখছিল আরেক ফাইলে। একসময় শেল্ফ থেকে কিছু একটা খুঁজে বের করতে করতে জিজ্ঞেস করল, মতিউর রহমানের কথা। আমি বললাম, 'এখন কোথায় জানি না। তবে যখন দেশ ছেড়ে এখানে চলে আসি, তখন সে ছিল জনগণের প্রতিনিধি।'

'কোথায় ?' রিটার কপালে ভাঁজ, পুরনো কাপড়ের মতো কুঁচকে আছে। মাথাটা জিরাফের মতো বাড়ানো। আমি বললাম, 'জাতীয় সংসদে।'

'মানে ?' ঘুরে তাকাল রিটা। ঘরের কোনায় জ্বলতে থাকা আলোটা ওর মাথায় এসে পড়েছে, তার ছায়া কার্পেটে, ওয়াইনের লম্বা বোতলের মতো সেই মাথা।

রিটার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি, সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মায়ামাখানো অদ্ভুত এক আলো, সেই আলোয় ভেসে যাচ্ছে বাল্টহাসার স্ট্রাসের ঘরবাড়ি দরজা-জানালা।

আমি মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে থরে থরে লেখা নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের নাম—জোসেফ মেংগেল, ফ্রানৎস স্ট্যাংগ্যাল, কুর্ট ভাইজে, ডেমিয়ান, আরিবের্ট হাইম, হেরমাইন ব্রাউনস্টাইনারসহ আরও অনেকে,

এসবের কিছু কিছু এখনো মনে আছে আর বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে।

নামগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি রিটাকে জানালাম আমাদের গ্রামের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান এখন কীরকম প্রভাবশালী, তিনশো সংসদ সদস্যের একজন তিনি।

এরপর রিটা জানতে চাইল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা মানুষ হত্যা করেছে, যারা গণহত্যায় সহযোগিতা করেছে, জিসি দেবের মতো মানুষদের রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে গেছে, রুখসানা বেগমের মতো নারীদের ধর্ষণ করেছে, তাদের কোনো বিচার হয়েছে কি না।

আমি বললাম, যুদ্ধের পরপর সাড়ে সাতশো জনের মতো যুদ্ধাপরাধীর বিচার হয়েছিল। সাজা অনুযায়ী তারা জেলে আটকও ছিল। আরও প্রায় এগারো হাজার, যাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ বা লুটতরাজের অভিযোগ ছিল, তারাও বন্দী ছিল কারাগারে। শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে এরা বেরিয়ে এল জেল থেকে। তারপর বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলা হলো সপরিবারে। ক্ষমতায় এল জিয়াউর রহমানের সরকার। আইন সংশোধন করা হলো। যাদের সাজা হয়েছিল, তাদের সাজা মওকুফ হলো আর কারাগারে বন্দী থাকা বিষধর সাপগুলো জেলের শিক গলে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল সমাজের অলিতে গলিতে, বসল ক্ষমতার কাছাকাছি।

রিটা জানতে চাইল, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি। এরপর আর কিছুই হয়নি অথবা বলতে পার যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। সাপগুলো দুধ-কলা খেয়ে আরও মোটাতাজা হলো, খোলস বদল করল, লক লক করে বাড়ল এদের বিষাক্ত জিহ্বা, দাঁতগুলো আরও ধারালো হলো, বিষ ছড়াল বাতাসে, এরা তো এখন স্বাধীনতা যুদ্ধের কথাই স্বীকার করে না, রিটা', বললাম আমি।

'ওরা বলে কী তাহলে ?' রিটা প্রশ্ন করল।

'এখনো ওরা বলে যে একাত্তরে তারা কোনো ভুল করেনি।'

'আর ?'

'ওটা নাকি যুদ্ধ ছিল না।'

'তো কী ছিল ?' চোখ দুটো বেরিয়ে আসছিল রিটার।

'গণ্ডগোল।'

'এদের কি কোনো তালিকা হয়েছে, এরা কারা ?'

'কে করবে তালিকা ?'

'সরকার।'

'আরে ধাৎ, এরাই তো সরকার ! তারা যদি এখন একটা তালিকা করেও, তাদের নাম কি আর যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় থাকবে, না আসবে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় ?' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমি। প্রশ্নের মতো বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে রিটা, ও শুনতে চাইছে আরও। আমি বলতে শুরু করলাম আবারও, 'সরকার অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের একটা বিশাল দলিল তৈরি করেছে। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের একটা তালিকা আছে। কিন্তু এই তালিকার কোনো প্রয়োজন ছিল না, রিটা। মুক্তিযোদ্ধা ছিল সবাই, সাত কোটি মানুষ, রুখসানা বেগম থেকে দুধওয়ালা সবাই যুদ্ধ করেছে, বিরোধিতা করেছে শুধু হাতেগোনা কিছু মানুষ। তালিকা করলে করার দরকার ছিল এসব জালিমের।'

'ঠিক আছে, সরকার করেনি, কিন্তু বেসরকারিভাবে কেউ কি এদের তালিকা করার চেষ্টা করেছে ?'

রিটার এই প্রশ্নের কোনো জবাব আমি দিতে পারিনি। তবে বললাম যে জাহানারা ইমাম একবার এদের বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন।

'কার ?'

'গোলাম আজমের।'

'কে সে ?'

আমি রিটাকে বললাম, একাত্তরে গোলাম আজমের ভূমিকার কথা, সে কীভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলশামস ও আলবদর বাহিনীর। বললাম, গ্রামে-গঞ্জে শান্তি কমিটি গঠন আর বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খানের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা, একাত্তরের পর কীভাবে সে আরও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে চলে আসে, সেই কাহিনি। রিটা আমার কাছে আরও কয়েকজন ঘাতকের কথা জানতে চাইল। আমি ওকে বললাম, একাত্তরের কসাই নাদের মোল্লার কথা, আব্বাস আলী, হোসেন সউদী, মওলানা মান্নানসহ আরও কিছু পশুর নৃশংসতার নমুনার কথা।

এই নমরুদেরা নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের জবাই করে হত্যা করত। ভৈরবের কাছে নদীর পারের এক শ্মশানের কথা বললাম রিটাকে, যেখানে গুলির শব্দে লোকজন যাতে ভয় পেয়ে পালিয়ে না যায়, সে জন্য তাদের জবাই করা হতো। স্থানীয় এক বুড়ো কসাইকে প্রত্যেকটি জবাইয়ের জন্য দেওয়া হতো পাঁচ টাকা করে। পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় গ্রামের মানুষেরা যখন জবাইয়ের জন্য শুতে না চেয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করত, তখন বৃদ্ধ কসাই তাদের অনুরোধ করত শুয়ে পড়তে, যাতে তারও কষ্ট না হয় আর তাদের যন্ত্রণাও শেষ হয়ে যায় চিরতরে।

রিটার মুখ দিয়ে গোঙানির মতো বেরিয়ে এল একটা চিকন অস্ফুট স্বর। ওর সারা মুখ ততক্ষণে লাল হয়ে গেছে আর কেমন তিরতির করে কাঁপছে চিকন দুটো ঠোঁট। মনে হচ্ছে, ও কিছু একটা বলতে চাইছে; কিন্তু পারছে না। রিটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে কিছু কথা, যেমন জানালার সাদা পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়তে চাইছে অন্ধকার। একটা লম্বা ঢোঁক গিলে রিটা বলল, 'এদের কারোরই বিচার হলো না, সেলিম ?' ওর প্রশ্নটা গোছানো ছিল না, ছিল এলোমেলো, ভাঙা ভাঙা, জিজ্ঞাসার চেয়েও বেশি ছিল আকুতি।

হরহর করে বমি করল রিটা। এমনভাবে বমি করছিল যে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল ওর পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে নাড়িভুঁড়ি সবকিছু। ছোপ ছোপ রক্তের মতো। বমি করার সময় পেটের মধ্যে দুহাত রেখে কার্পেটে মিশে যাচ্ছিল ওর শরীর। আলঝেইমার রোগীর মতো কেঁপে কেঁপে উঠছিল রিটার মাথাটা। ও যখন শান্ত হলো, সারা ঘরে তখন ছড়িয়ে পড়েছে বমির উৎকট তীব্র একটা গন্ধ।

আমার কাঁধে ভর দিয়ে যখন ওকে বাথরুমে নিয়ে গেলাম, তখন রাত সোয়া নয়টা, তারপর নগ্ন করলাম রিটাকে, শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে ওর শরীর ধুয়েমুছে যখন বিছানায় শুইয়ে দিলাম, তখন রাত দশটা। সোয়া দশটাতেই ঘুমিয়ে পড়ল রিটা।

কার্পেট পরিষ্কার করলাম আমি। জোসেফ মেংগেল আর ফ্রানৎস স্ট্যাংগ্যল লেখা ফাইল দুটো ওর বমিতে ভেসে গিয়েছিল। ধুয়েমুছে ওগুলো তুলে রাখলাম টেবিলের ওপর।

রিটা ঘুমাচ্ছে চিৎ হয়ে। ওর মুখটা শুকনো, ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে, চোখ ঢুকে গেছে কোটরে, গাল বসা। ওর হাত দুটো রাখা বুকের ওপরে, বাম হাতের উল্টো পিঠের ওপরে ডান হাতের তালু। আঙুলগুলো একটা আরেকটার ভেতর পেঁচানো।

কতক্ষণ বসে রইলাম সোফায়, বই পড়ার চেষ্টা করলাম কিছুটা সময়; তারপর একটা রাগ বিছিয়ে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম মেঝেতে।

আমাদের হানিমুন

রিটা সেই যে সোয়া দশটায় ঘুমাল, উঠল পরদিন সকালে, সাতটার কিছু আগে। খুব ফ্যাকাশে লাগছিল ওর মুখ। নিজেই দাঁত ব্রাশ করল, রাতের কাপড় বদলাল, অফিসে ফোন করে চাইল সিক লিভ, তারপর নাশতার আয়োজন করল রিটা। গরম দুধের সঙ্গে ফ্রুট মুসলি, হাফ বয়েল্ড ডিম, কলা আর কিছু আঙুর। তারপর চা।

নাশতার টেবিলে আবারও রাতের কথায় ফিরে গেল রিটা। ও তখন ছাড়িয়ে ফেলেছে পুরোটা কলার খোসা, তার হাতের মুঠোয় নগ্ন একটা কলা। মাথার দিকটায় কামড় দিয়ে রিটা জানতে চাইল, 'আচ্ছা সেলিম, এত বছরেও ওদের বিচার হলো না কেন?'

'কাদের?' আমি তাকিয়ে আছি ওর মুখের দিকে, ডান গালের ভেতর গোল হয়ে নরম কলাটা ভেঙে যাচ্ছে।

'মতিউর রহমানদের', রিটার জবাব।

আমি হাসলাম। বললাম, 'বিচার তো দূরের কথা যুদ্ধের কয়েক বছর পর মওলানা মান্নানসহ আরও অনেকেই সরকারের মন্ত্রী হয়েছে।' জবাবে রিটা কিছুই বলল না, নিস্প্রাণ গলায় শুধু জানতে চাইল, সেটা কীভাবে হলো। আমি বললাম, 'মান্নান ছিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের নেতা, যুদ্ধের সময় সে জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করত, স্বাধীনতার পর সে চলে যায় আত্মগোপনে, খবরের কাগজে ছাপা হয় তাকে ধরিয়ে দেওয়ার আবেদন এবং শেষ পর্যন্ত তার কিছুই হয়নি, ধর্মকে ব্যবহার করে সে একসময় চলে যায় ক্ষমতার কাছাকাছি।'

'ঠিক আছে,' আমাকে থামিয়ে দিল রিটা। তারপর প্রশ্ন করল, 'রাষ্ট্র করেনি বুঝলাম; কিন্তু সমাজ কী এদের কোনো বিচার করেছে?' আমি বললাম, 'না, দু-একজন হয়ত যুদ্ধের পরপর জনতার রোষে পড়েছিল, কিন্তু পরে একসময় তারাই আবার সমাজের নেতা হয়ে উঠেছে।' আমি মতিউর রহমানের কথা টেনে বললাম মাসিগাড়ায় আপসু রাজাকারকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা আর জয়পুরহাট শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল হালীমের কথা। যুদ্ধের শেষ দিকে তার

সহযোগিতায় বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়ে পাক বাহিনীর হাতে, চোখ বেঁধে তাদের ঘোরানো হয় সারা শহরে, তারপর গুলি করে হত্যা করা হয় ওই মুক্তিযোদ্ধাদের। জয়পুরহাট মুক্ত হওয়ার পর সেই আবদুল হালীমকে খাঁচায় পুরে রেখে দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণের দেখার জন্য, সেই কয়েকটা দিন, তারপর আবদুল হালীমই সবাইকে পুরে ফেলল সমাজের খাঁচায়।

পরে সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিল আবদুল হালীম।

রিটা তখন ওর ঘর থেকে ছবির লাল অ্যালবামটা নিয়ে এল, রাখল টেবিলের ওপর, আমার সামনে, একটার পর একটা পাতা উল্টে গেলাম আমি, নার্সের পোশাক পরিহিত সেই মহিলা, আগেরবার আমার দিকে যেভাবে তাকিয়েছিল, এখনো ঠিক একইভাবে তাকিয়ে আছেন তিনি, তার সঙ্গে এ আমার দ্বিতীয়বার দেখা, সে যেন এখন আমাকে অল্প বিস্তর চেনে, মনে হলো তার চোখ দুটো একটু একটু হাসছে।

ভাবলাম, এটা কি তাহলে রিটার শৈশবের ছবি ? কিন্তু ও তো কখনো নার্স হিসেবে কাজ করার কথা বলেনি, নাকি তিনি রিটার মা, কে এই মহিলা ?

'শাৎস,' আমি রিটাকে বউ বলে ডাকলাম, আমার মুখের দুষ্টুমিভরা হাসি ওর চোখ এড়াল না। এভাবে আর কখনো ওকে ডাকিনি, একটু চমকে উঠল রিটা। তারপর আমার দিকে তাকাতেই জানতে চাইলাম, এই মহিলার বিষয়ে। কে তিনি, তিনি কি কোনো হাসপাতালের নার্স, এখন কোথায় আছেন ? রিটা কিছু প্রশ্নের জবাব দিল, কিছু গেল এড়িয়ে। বলল, 'ওর নাম সোফিয়া, সোফিয়া নোভাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে জার্মানদের হাতে বন্দী ছিল টেরনোপল শহরে, এসএস বাহিনীর একটা কারখানায় সে কাজ করত, কাজ করত ভেরমাক্টের এক অফিসারের মেসেও, তার কাজ ছিল রান্না করা, কাপড় ধোয়া আর ঘরদোর পরিষ্কার রাখা। নাৎসি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সামান্য কয়েক দিন আগে বহুবার ধর্ষিত হয় সোফিয়া।'

আমি জানতে চাইলাম, ফ্রাউ নোভাক তার কী হয়। প্রথমে সে বলল, কিছু হয় না। তারপর বলল, 'আমার পরিচিত।'

'তাহলে তুমি টেরনোপলে কেন যাও ?'

'সোফিয়ার ধর্ষণকারীদের খুঁজতে', রিটা আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, কী বলছে এসব রিটা ! ও কি পাগল হয়ে গেছে, মাথা ঠিক আছে ওর ? সোফিয়া নোভাকের ধর্ষণকারীরা কি এখন আর আছে ওখানে ? সেটা সেই কত বছর আগের ঘটনা, তাদের কীভাবে

খুঁজে বের করবে রিটা, এটা নেহায়েত একটা পাগলামো ছাড়া আর কী হতে পারে !

রিটা জানাল ও প্রায়ই যায় টেরনোপল শহরে। ওখানে একটা স্মৃতি জাদুঘরের মতো আছে। ওখানকার কাগজপত্র খুঁজে সে দেখার চেষ্টা করছে, যুদ্ধের শেষ দিকে কারা কারা ছিল ওখানে, সোফিয়া নোভাকের নাম কোনভাবে কোথাও আছে কি না, এসএস বাহিনী আর ভেরমাক্টের বড় বড় পদে কারা ছিল টেরনোপলে, পরে তারা কোথায়, কোন দিকে গেছে, এসব।

রিটা ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা বলল, বলল যে যুদ্ধ শেষে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে শুধু হাতেগোনা কিছু নাৎসি চাইয়ের বিচার হয়েছে, আইন আর আদালত এড়িয়ে হাজার হাজার যুদ্ধাপরাধী পালিয়ে গেছে অন্য কোথাও, অন্য কোনো দেশে। তার হিসেবে এখন পর্যন্ত হয়ত কুড়ি ভাগ অপরাধীর বিচার হয়েছে, বেশির ভাগই পালিয়েছে আমেরিকায়। ওখানে নাম পরিচয় বদল করে, চেহারা পাল্টিয়ে, ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে নতুন পরিচয় নিয়ে আত্মগোপন করে আছে বহু নাৎসি। ভোল পাল্টে তারা মিশে আছে সমাজের মানুষের সঙ্গে, যাদের হত্যা করা হয়েছে, সেসব হতভাগ্য মানুষের ভাই-বোন-ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এই পশুরা একই সুপার মার্কেটের লাইনে দাঁড়িয়ে বাজার করছে, বাসে চড়ছে, সিনেমা দেখছে অথবা কফি খাচ্ছে রেস্তোরাঁয়, তারই পাশের টেবিলে। কেউ জানে না যে তাদের দাঁতে আর হাতে লেগে আছে লাখ লাখ মানুষের রক্ত।

রিটা বলল, সে এই নরপশুদেরই খোঁজার চেষ্টা করছে।

তারপর ও সিমন ভিজেনথালের কথা বলল। নাৎসি শিবিরে বন্দী ভিজেনথালের কাজ ছিল এখানে-সেখানে স্বস্তিকা আর ঈগলের ছবি আঁকা। সে নিজের চোখে দেখেছে হাজার হাজার মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে কীভাবে মৃত্যুর কোলে চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে, মৃত মানুষের দাঁতের পাটি থেকে কসাইগুলো কেমন করে খুলে নিয়েছে বাঁধানো সোনার দাঁত, তীব্র শীতের সময় ক্যাম্পের মেঝেয় বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাওয়া শিশুর লাশ পচে-গলে কী দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে, হাজার হাজার নারী-পুরুষের দীর্ঘ সারি লাকড়ির মতো কীভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে কার্বন মনোক্সাইডে ভরা গ্যাসের চেম্বারে। তারপর সেখানে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে চুলা।

একসময় হাতের কব্জির রগ কেটে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল ভিজেনথাল, মরে গিয়ে বেঁচে যেতে চেয়েছিল এসব বিভীষিকা থেকে। এসএস ডাক্তাররা তাকে সেই যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়নি, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে দেখেছে, পঙ্গু আর প্রতিবন্ধীদের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তারা কীভাবে চিৎকার করত, জবাই করা পশুর মতো লাফাতে লাফাতে নিথর হয়ে আসত একসময়,

সেই চিৎকারে কেঁপে উঠত এসএস হাসপাতালের ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা বড় বড় পাখা।

যুদ্ধ শেষ হলো, আত্মসমর্পণ করল হিটলারের বাহিনী, ভাগ্যের হাত ধরে বেঁচে গেলেন ভিজেনথালও, কিন্তু তাকে তাড়া করতে লাগল নাৎসি ক্যাম্পের বিভৎস সব স্মৃতি। তারপর নতুন এক যুদ্ধে নামলেন ভিজেনথাল, চল্লিশ বছর ধরে খুঁজলেন যুদ্ধাপরাধীদের, উদ্দেশ্য পলাতক খুনিদের খুঁজে বের করে তাদের বিচারের সম্মুখীন করা।

'সেলিম, তোমাদের দেশে ভিজেনথালের মতো কেউ কি আছে ?' রিটা জানতে চাইল।

'কয়জনকে ধরতে পেরেছে ভিজেনথাল ?' আমার পাল্টা প্রশ্ন।

রিটা বলল, 'প্রশ্ন সেটা না, কথা হলো অপরাধীদের সাজা হয়েছে কি না, অপরাধ হয়েছে কয়েক দশক আগে কিন্তু যারা এই অপরাধ করেছে, তাদের ধরে-বেঁধে এখনো দাঁড় করানো হচ্ছে কাঠগড়ায়, সেটাই হলো কথা।'

'কিন্তু এত বছর পরও ভিজেনথাল কেন তাদের মাফ করতে পারেনি ?' জানতে চাইলাম আমি।

এই প্রশ্নের উত্তরে নাৎসি হান্টার ভিজেনথাল নাকি বলত তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছিল, সেটা ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার তার আছে কিন্তু যে অপরাধ অন্যদের প্রতি করা হয়েছে, যারা আজ মৃত, সেটা সে ক্ষমা করে কীভাবে ?

তারপর রিটা একটা গল্প বলল আমাকে, ভিজেনথালের গল্প। বলল, ভিজেনথাল ছিলেন স্থপতি, এসএস বাহিনীর কাছে সে তার এই পরিচয় গোপন রেখেছিল। কারণ সে জানত বন্দিশিবিরে শিক্ষিত ইহুদিদের মৃত্যু অপরিহার্য ছিল। যুদ্ধের পর বছরের পর বছর সে যখন নাৎসি অপরাধীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখন এক জুয়েলারি ব্যবসায়ী তার কাছে জানতে চেয়েছিল, সে বাড়ির নকশা করার কাজে ফিরে গেল না কেন ? তাহলে তো সে অনেক অর্থবিত্তের মালিক হতে পারত ! সেই ব্যবসায়ীও একটা বন্দিশিবিরে আটক ছিল ভিজেনথালের সঙ্গে।

জবাবে ভিজেনথাল নাকি বলেছিল, 'তুমি তো ধর্মে বিশ্বাস রাখ, বিশ্বাস কর পরকালে, আমিও সেটা বিশ্বাস করি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত লাখ লাখ মানুষের সঙ্গে সেখানে দেখা হলে তারা যখন জানতে চাইবে যে আমি তাদের জন্য কী করেছি, তখন এর জবাবে কী বলব, এর অনেক জবাব আছে, তুমি হয়ত বলবে যে তুমি একজন বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছ, কেউ হয়ত বলবে যে সে চুরুট আর কফি পাচার করেছে, আরেকজন বলবে, সে বাড়িঘর বানিয়েছে, আর আমি বলব যে বন্ধুরা, ভিজেনথাল তোমাদের ভুলেনি।'

রিটা বলল, 'সেলিম, তোমরা দুধওয়ালাকে মনে রাখনি, মনে রাখনি রুখসানাকেও। তোমরা সবাইকে ভুলে গেছ। ওদের জন্য তোমরা যতটুকু কর,

ওটা শুধু আবেগ, অর্থহীন আবেগ, ওটা তোমরা দেখানোর জন্য কর, মন থেকে কর না, সেলিম।'

'কেন রিটা ?' জানতে চাইলাম আমি।

'তাহলে তোমরা এত দিনে একজনেরও বিচার করতে পারলে না কেন, বলো ?' আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর আমাকে চুপ থাকতে দেখে বলল, 'এটাও তো আরেকটা যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ, যুদ্ধের পরের যুদ্ধ, এই যুদ্ধটা তো তোমাদের করার কথা ছিল। করেছ ?

ও তাকিয়েছিল আমার দিকে। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। তারপর আবার বলল, 'তোমার আব্বা, দুধওয়ালা আর রুখসানা বেগম, এরা তোমাদের জন্য যুদ্ধ করেছে; কিন্তু তোমরা তাদের জন্য যুদ্ধটা করলে না, ওরা কি ক্ষমা করবে তোমাদের, বলো ?'

রিটার এই প্রশ্নগুলোর কি জবাব দিতে পারতাম আমি ? ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ওসব কথা রাখো, আগে বলো, তুমি কেন নাৎসিদের খুঁজে বেড়াচ্ছ।' তারপর বললাম, 'তুমি তো আর শিবিরে বন্দী ছিলে না বা সেখানে যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, সেটাও তুমি ভিজেনথালের মতো নিজের চোখে দেখনি।'

রিটার মুখে বাঁকা হাসি। ও বলল, 'সেলিম, রাজাকাররা কি তোমাকে একাত্তরে হত্যা করেছিল বা তারা যে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, তুমি কি সেটা দেখেছ ? তাহলে কি তাদের কেউ মারেনি ? হঠাৎ মড়ক লেগে মাত্র নয় মাসে তিরিশ লাখ মানুষ মরে গিয়েছিল ? একাত্তরে কোনো মহামারি হয়েছিল বাংলাদেশে ? কলেরা ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ রিটা, মহামারি হয়েছিল, মৃত্যুর মহামারি।'

'তুমি কি তাহলে তোমার দেশের এসব হত্যাকারীর বিচার চাও না ?'

'হ্যাঁ চাই, অবশ্যই চাই', চিৎকার করে উঠলাম আমি। বললাম, 'তারা প্রত্যেক দিন গড়ে দশ থেকে বারো হাজার মানুষ মেরেছে। এই পিশাচেরা আমার মায়ের মতো দুই লাখ নারীকে ধর্ষণ করেছে এবং সেটা আমি দেখেছি।'

'আহ্, সেলিম, তোমার চোখের সামনে রুখসানা বেগমকে ধর্ষণ করা হয়েছে, এটা ঠিক, কিন্তু তুমি সেটা দেখনি, কারণ তুমি তখন কোলের শিশু, তোমার এই দেখার কোনো মূল্য নেই আদালতের কাছে, এই অপরাধের কথা তুমিও পরে শুনেছ, আমিও নাৎসিদের হাতে বন্দী ছিলাম না, আমিও দেখিনি তারা কীভাবে লাখ লাখ মানুষ হত্যা করেছে, আমিও তোমার মতো এই ইতিহাস পরে জানতে পেরেছি, তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে হিটলার মানুষ মারেনি বা মতিউর রহমান তোমার মাকে ধর্ষণ করেনি !'

এরপর রিটা আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, ওর প্রশ্নের জবাব চাইছিল রিটা।

[redacted]

তারপর বলল, 'আমরা যদি ভুলে যাই সেসব অপরাধের কথা, তুমি কি বলতে পারো সেলিম, আগামী কুড়ি, পঞ্চাশ বা একশো বছরে এই একই রকমের ঘটনা পৃথিবীতে আবার ঘটবে না !'

এই প্রশ্নেরও জাবাব পেল না রিটা। ও তখন উঠে গিয়ে সোফায় বসল, হেলান দিয়ে পা দুটো মেলে ধরল সামনে, একটার ওপরে আরেকটা গোড়ালি ক্রস করে রাখা, পায়ের এই জায়গাটা ওর শরীরের যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি সাদা, মাশরুমের মতো ফ্যাকাশে, গোড়ালির যেখান থেকে জুতার শুরু সেখান থেকে রংটা একটু লালচে হয়ে ওপরের দিকে উঠেছে।

অ্যালবামটা এখন রিটার হাতে। পাতা উল্টাতে উল্টাতে ও বলতে লাগল ভিজেনথালের কথা। মানুষের সাক্ষ্য নিয়ে নিয়ে সে তৈরি করেছে যুদ্ধাপরাধের এক বিশাল দলিল, ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের পর সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তখন সাবেক নাৎসিদের বিচারের জন্য ভিজেনথালের চেষ্টাই ছিল একমাত্র কণ্ঠ, যখন সবাই ভুলে যেতে চেয়েছে পৃথিবীর সেই মহাপ্রলয়ের কথা, ভিজেনথাল চেষ্টা করেছে নৃশংস সেই সময়ের কথা মানুষের স্মৃতিতে জিইয়ে রাখতে।

'তোমাদের এখন উচিত একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা। সময়ের সঙ্গে এসব হারিয়ে যাবে, মুছে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শার্টের প্রথম বোতামটা যদি ঠিক জায়গায় লাগাতে না পার সেলিম, তাহলে কিন্তু পরের সবকটা উল্টোপাল্টা হবে।'

'তোমাদের একজন ভিজেনথালের দরকার, রিটা বলল।

ওর কথার স্রোতে বাধা দিলাম আমি, জানতে চাইলাম কোন কোন নাৎসিকে ধরায় ভিজেনথালের গবেষণা কাজে লেগেছে, তার কথার তোড়ে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল আমার প্রশ্নের বাঁধ।

রিটা বলল, আডল্ফ আইখমানের কথা। 'নাৎসি প্রশাসনে ইহুদি বিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা ছিল আইখমান, যারা ইহুদি নিধন পরিকল্পনা করেছিল, আইখমান ছিল তাদেরই একজন, তাকে বলা হতো মৃত্যুর আমলা, তাকে ধরিয়ে দিয়েছে ভিজেনথাল।'

'কোথায় ছিল এই আইখমান ?'

'ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে বিচার চলার সময় বলা হয়েছিল, যুদ্ধের শেষ দিকে, জার্মানদের যখন পতন হতে শুরু করেছে, তখনই তার মৃত্যু হয়। তার স্ত্রীর জমা দেওয়া জাল ডেথ সার্টিফিকেটও দেখানো হয় আদালতে। কিছুটা সময় সে লুকিয়ে ছিল অস্ট্রিয়ায় তারপর ব্যুয়েনেস আয়ার্সে, আইখমানের বাবা মারা যাওয়ার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা যারা এসেছিলেন, গোপনে তাদের ছবি তোলেন ভিজেনথাল, আইখমানের এক ভাইয়ের চেহারার সূত্র ধরে তাকে পাওয়া যায়

আর্জেন্টিনায়। গ্রেপ্তারের পর তার বিচার হয় জেরুজালেমের এক আদালতে। কারাগারের ভেতর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হয় তার মৃত্যুদণ্ড।'

'কিন্তু এই বিচার নিয়ে তো প্রশ্ন উঠতে পারে, রিটা', আমার আপত্তি।

'কেন ?'

'কারণ সেটা ইসরায়েলে হয়েছে।'

'অপরাধ যেখানেই হোক, বিচার হতে পারে সবখানেই', রিটা বলল।

'আর ফ্রানৎস স্ট্যাংগ্যল ?' জানতে চাইলাম আমি।

যুদ্ধের শুরুর দিকে সে ছিল গেস্টাপো বাহিনীর একজন নেতা, পরে সে যোগ দিয়েছিল গণহত্যার পরিকল্পনাতেও। যুদ্ধের পরপরই মার্কিন সেনাদের হাতে গ্রেপ্তার হয় স্ট্যাংগ্যল, বিচার চলাকালে পালিয়ে যায় জেল থেকে, রেডক্রসের পরিচয়পত্র নিয়ে সে বসবাস করতে থাকে সিরিয়ায় এবং পরে ব্রাজিলে। সাও পাওলো শহরের ফোকসভাগেন কারখানায় মোটর মেকানিক হিসেবে কাজ করছিল স্ট্যাংগ্যল, ভিজেনথালের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরে সে আটক হয় পুলিশের হাতে, বিচার শুরু হয় ডুসলডর্ফে, দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সিমন ভিজেনথালের গবেষণার সূত্র ধরে পুলিশের চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় কার্ল ইওসেফ জিলবার বাওয়ার। আমস্টার্ডামে একটি বাড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকা আনে ফ্রাঙ্ক এবং তার পরিবারকে গ্রেপ্তার করেছিল এই জিলবার বাওয়ার, পরে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিল বেরগেন-বেলজেন শিবিরে। আনে ফ্রাঙ্কের লেখা ডায়েরিটা আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যায় ওখানে।

রিটা তখন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। বুকশেল্ফের সামনে দাঁড়িয়ে ও আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল এককেটা বইয়ের শরীর, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল ওপরের তাকের বইগুলো, আর পেছন বসে আমি দেখছি তার শরীরের কোথায় মেদ জমে একটু ফুলে উঠেছে, কোথায় কোথায় খাঁজগুলো এখনো বেশ গভীর।

আনে ফ্রাঙ্কের ডায়েরিটা আমার হাতে দিয়ে রিটা জানতে চাইল, এই বইটা আমি পড়েছি কি না। এই কিশোরীর নাম আমি শুনেছি, তার দিনলিপির সারাংশও আমার জানা কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তার ডায়েরি আমি পড়িনি। অসম্ভব মিষ্টি আর নিষ্পাপ একটা মেয়ের হাসি বইয়ের প্রচ্ছদে, তার ঘন কালো চুল নেমে এসেছে ঘাড়ের কাছাকাছি, বাম পাশে সিঁথি করে চুলগুলো একটা ক্লিপ দিয়ে বাঁধা মাথার ডান দিকে, মোটা কলারের একটা ওভারকোট পরেছে আনে, মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

আমি যখন স্বীকার করলাম যে না বইটা আমি পড়িনি, রিটা তখন সেটা পড়ার উপদেশ দিয়ে বলল, পড়া শেষ হলে ও আমাকে আমস্টার্ডামে আনে ফ্রাঙ্ক জাদুঘরে নিয়ে যাবে এবং সেটাই হবে আমাদের হানিমুন।

রবিবার রাতে যখন বইটা মেলে ধরলাম, তখন ১৯৪২ সালের ১২ জুন, আনে ফ্রাঙ্ক ওর ত্রয়োদশ জন্মদিনে এই ডায়েরিটা উপহার পেয়েছে, আনে ওর নাম দিয়েছে কিটি, সেখানে পাতার পর পাতা সে লিখে চলেছে গোপন সব কাহিনি আর বুধবার সকালে গিয়ে যখন শেষ পাতাটা উল্টালাম, সেটা ছিল ১৯৪৪ সালের ৪ অগাস্টের কথা, এই দুই বছর ওরা বাড়ির যেখানে লুকিয়ে ছিল সেদিন, সেখানে অভিযান চালাল নিরাপত্তা বাহিনী, ওদের গোপন আস্তানার পতন হলো।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আমরা রওনা দিলাম হল্যান্ডের পথে, আমস্টার্ডামে গিয়ে যখন পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আসার পথে বাসের জানালা দিয়ে দেখছিলাম গম কেটে ফেলার পরে খা খা করছে মাঠ, সেখানে পড়ে আছে গোল করে বেঁধে রাখা খড়ের স্তূপ, কোথাও আলুর ফসল পলিথিনে ঢাকা, আস্তাবলে চড়ছে দু-একটা ঘোড়া, আওটোবান থেকে দূরে আবার কখনো কাছে বাহারি পাতার ঝোপ ও জঙ্গল, মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে লাইলাক আর উড সোরেল, উঁচু উঁচু টিলার ওপরে দু-একটা বাড়ি, সারি সারি উইন্ডমিল, বাড়ির পেছনে ডিমের কুসুমের মতো ডুবন্ত লাল সূর্য, তার নরম আলো বাসের জানালা টপকে এসে পড়েছিল রিটার মুখেও।

আমরা পার হয়ে এলাম সমুদ্রের মতো ঢেউ খেলে যাওয়া লাল, নীল, কমলা আর হলুদ টিউলিপের বাগান।

সন্ধ্যার পরপরই আমরা উঠলাম ছিমছাম ছোটখাটো একটা হোটেলে, রেড লাইট এরিয়ার কাছে। হোটেলের পেছন দিয়ে বয়ে গেছে সরু খাল, সেখানে বাঁধা ছোট ছোট নৌকা, হোটেলের অদূরে খালের ওপর ছোট্ট একটা সেতু। আমি রিটাকে তিনতলার একটা রুম নিতে বললাম, যেখান থেকে খালের ওপরে নুয়ে পড়া সবুজ উইলো গাছটা দেখা যাবে।

তিনতলাতেই উঠলাম আমরা, কিন্তু আমি আর রিটা থাকলাম পাশাপাশি দুটো ঘরে।

৩০৮ নম্বর রুমে

হোটেলের রুমে রাত পার হলো কিন্তু ঘুম হলো না, আর যখন ঘুম হলো, স্বপ্নের কোলাহলে ঘুমানো গেল না। চোখের পাতা জুড়ে এলে স্বপ্নের মিছিল শুরু হলো আর সেটা থামল ভোরে, যখন বেডসাইড টেবিলে ফোনটা একবার রিং হয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন। সারা রাত একটার পর একটা স্বপ্ন দেখলাম আমি। একটা শেষ হলে আরেকটা। আগের স্বপ্নটা যেখানে শেষ হলো, পরেরটা শুরু হলো ঠিক ওখান থেকে। সারা রাত আমার সঙ্গে গড়গড় করে চলল একটা স্বপ্নের রেলগাড়ি।

যখন ঘুম ভাঙল, দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশজুড়ে ছড়িয়ে আছে নরম আলোর আভা। উইলো গাছটা গতরাতের চেয়ে আরও একটু উবু হয়ে খালের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে, জুলাই মাসের কচি কচি সবুজ পাতাগুলোর গায়ে সকালের নরম আলো, দু-একটা পাতা টুপটাপ করে ঝরছে জলের ওপর।

শীলার সঙ্গে দেখা হলো কিছুক্ষণ আগে, ভোর রাতের দিকে, সম্ভবত ওটাই ছিল শেষ স্বপ্ন, ময়মনসিংহের একটা হোটেলে, রেলস্টেশনের কাছে, আমাদের দেখা হলো দোতলার করিডোরে। আমি যে রুমে উঠেছি, শীলা ছিল তার পাশের ঘরে, স্বামীকে নিয়ে ও হানিমুনে বেড়াতে এসেছে। সকালে নাশতার জন্য হোটেলের রুম থেকে বের হতেই ওর মুখোমুখি, কী সুন্দর পান পাতার মতো মুখ, চোখ দুটো লিচুর মতো সাদা, গোসলের পর ওকে বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছিল, তুমুল বৃষ্টির পরে যেমন গাঢ় সবুজ হয়ে থাকে কচুপাতা, ও রকম। কোমর ছুঁয়ে যাওয়া লম্বা ভেজা চুল ঘাড়ের পেছনে ছড়িয়ে দিয়েছে শীলা। আমাকে দেখেই হাসতে লাগল ও। তারপর ওই মুখটা হারিয়ে গেল আনে ফ্রাঙ্কের মুখের আড়ালে।

আমার স্বপ্নের ভেতর বারবার কেন আসে শীলা ? আমি তো দেখতে চাই না ওকে, পৃথিবীর কোনো শহরে নয়, নয় স্বপ্নেও, কোথাও না। ও যেখানে ইচ্ছা, যাক। যার সঙ্গে ইচ্ছা, থাকুক। কিন্তু আমি চাই না, ও আমার কাছে আসুক, আমার সঙ্গে থাকুক। এখানে, এই হোটেলে আমি রিটাকে নিয়ে এসেছি, মধু চন্দ্রিমায়, গতরাতে আমরা এক রুমে এক বিছানায় থাকিনি কিন্তু ও আমার স্ত্রী, বিয়ের পর রিটাকে আমি রাতের ঘুমের সময় স্বপ্নের মধ্যে দেখতে চাইনি, চেয়েছি

ও আমার সঙ্গেই থাকুক, সব সময়, হয়ত পাশে অথবা নিচে কিংবা ওপরে। কিন্তু ওই রাতে রিটা থাকল অন্য এক ঘরে; আর ৩০৭ নম্বর রুমে আমার সঙ্গে থাকল শীলা, মাখামাখি হয়ে স্বপ্নের ভেতর।

আমি যাকে স্বপ্নে দেখি, সে-ও কি আমাকে দেখে তার স্বপ্নের ভেতর ? ঠিক একই রকমের স্বপ্ন এবং একই সময়ে ? আমি যেমন ওকে ময়মনসিংহে দেখলাম, তেমনি শীলাও কি আমাকে দেখল ওখানে ? কোথায় দেখল ? রেলস্টেশনের পাশে তাজমহল হোটেলে, না দেখল আমস্টার্ডামে ? ওর স্বামী হিসেবে ওর পাশে, নাকি ও আমাকে দেখল রিটার সঙ্গে। কীভাবে দেখল ? স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর আমার যেরকম অনুভূতি হয়, ওরও কি ঠিক সেরকম লাগে ? স্বপ্নের এই কাহিনি কে রচনা করে, কে ঠিক করে, স্বপ্নটা কোথায় শুরু হবে আর কোন জায়গায় এসে সেটা ভেঙে পড়বে ? যে দেখে সে, নাকি যে দেখায়, সে ? স্বপ্ন কে কাকে দেখায় আসলে ?

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় নিয়ে শেভ করলাম আমি, গোসল করলাম তারচেয়েও বেশি সময় ধরে। তারপর রিটার ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে হোটেল থেকে যখন বেরোলাম, তখন শীলার সুখী সুখী মুখটা ম্লান হতে হতে আবার ডুব দিল মনের অতল গহ্বরে।

দুটো সাইকেল ভাড়া করে আমরা ঘুরে বেড়ালাম শহরের আনাচে-কানাচে, কখনো খালের পাশ দিয়ে; আবার কখনো সেতু ডিঙিয়ে, রিটা কখনো ছিল সামনে, আবার কখনো ও ঠিক আমার পেছনে। কখনো আমাদের একপাশে পড়ল হাতে তৈরি চকোলেটের কারখানা, সেক্স শপ, থিয়েটার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ভবন, কখনো স্যান্ডউইচ বার; আবার কখনো পড়ল পুরনো বই ও রেকর্ডের দোকান। একটা বই কিনল রিটা, তারপর রাখল সাইকেলের পেছনে ছোট্ট কেরিয়ারে। আমি যখন জানতে চাইলাম ওটা কার জন্য, তখন ও বলল 'তোমার।'

আনে ফ্রাঙ্কের ওখানেই কাটল দিনের বাকিটা সময়।

যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, রিটা চুপ করে ছিল, কোনো কথা বলেনি ও, বিষণ্নতার কালো মেঘ ছেয়েছিল ওর চোখেমুখে, আলতো পায়ে শিশুর মতো হেঁটে বেড়াল বাড়িময়, কোথাও ও দাঁড়িয়েছিল পাথরের মতো, কখনো দেখছিলাম রিটার ওপরের ঠোঁটটা কাঁপছে, কখনো ও চোখ বন্ধ করেছিল, আবার কখনো বসেছিল মাথায় হাত রেখে, ঘরের কোনো এক কোনায়, সিঁড়ির কাছে মেঝের ওপর, ওর দীর্ঘশ্বাসে সারা বাড়ির বাতাস যেন কুয়াশার মতো ভারী হয়ে উঠেছিল।

বাড়িটার জানালা দিয়ে দেখা যায় ওই বাদাম গাছটা, যার কথা আনে তার ডায়েরিতে কয়েকবার লিখেছে, রিটাকে আমি এই চেস্টনাট গাছটার কথাও বলতে

চেয়েছিলাম, ও শুনতে চায়নি, বইয়ের আলমারির পেছনে লুকানো ছোট্ট ওই ঘর থেকে আনে যে সীমিত প্রকৃতি দেখতে পেত, তার মধ্যে ছিল একশো বছরের পুরনো এই গাছটাও, আমি রিটাকে বলতে চেয়েছিলাম মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে আনে লিখেছিল, 'জানালা দিয়ে দেখা যায় নীল আকাশ আর পত্রপল্লবহীন বাদামগাছটা, ওর শাখায় শাখায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির কণাগুলো রুপার মতো চকচক করছে।' তারপর মে মাস, ও লিখল, 'আমাদের চেস্টনাট গাছটা এবার ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, পাতায় পাতায় ঢেকে গেছে ওটা, গতবারের চেয়েও আরও বেশি সুন্দর লাগছে গাছটাকে, বাইরের দিকে তাকালে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হই আর ভাবি, যতদিন এগুলো আছে, অন্তত ততদিন আমি সুখী না হয়ে পারি না।'

এগুলো আমি বলতে চেয়েছিলাম রিটাকে।

কিন্তু হাতের ইশারায় আমাকে সরিয়ে দিচ্ছিল রিটা। ওটা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম ওকে, জানতে চেয়েছিলাম কে আগে মারা গিয়েছিল, আনে না ওর বোন মার্গট, পিটারের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বটা কি শুধু চুমুতেই সীমিত ছিল, নাকি আরও কিছু; যা আনে ওর বন্ধু কিটিকেও বলেনি, লাল-সবুজ কাপড়ে মলাট দেওয়া ডায়েরিটার মুখে তো একটা লক ছিল, উদ্ধার করার সময় এর পাতাগুলো কি খোলা ছিল, নাকি তালাটা ভাঙতে হয়েছিল ?

একটা প্রশ্ন করতেই আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে রিটা এমনভাবে তাকাল যে আমি আর ওর দিকে এগোতে পারিনি, অথবা সাহস পাইনি। মনে হলো ওর চোখের ভেতর গুটিয়ে শুয়ে আছে একটা বিষাক্ত সাপ। কথা বললেই ফণা তুলে সেটা ফুঁসে উঠবে। তারপর আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি, সারা বাড়িতে শুধু ওর পায়ে পায়ে হেঁটেছি।

একটু দূর থেকে আমি দেখতাম, কীভাবে ও ঘরের জিনিসগুলো দেখছে। একটা ঘর থেকে যাচ্ছে আরেকটা ঘরে। লেখাগুলো পড়ছে। এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। এখানে-ওখানে হাঁটছে। দাঁড়াচ্ছে। অথবা বসছে।

রিটার চুল ততদিনে ওর কাঁধ ছাড়িয়ে কোমরের প্রায় কাছাকাছি ঝুলতে চাইছিল, দুই পাশের তুলনায় মাঝখানের চুলগুলো ছিল একটু বড়, সেদিন ওর চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো ছিল, রিটা যখন কোনো জিনিস খুব কাছ থেকে দেখছিল সবগুলো চুল ও নিয়ে আসছিল ঘাড়ের বাম পাশে, বুকের ওপর, কখনো কখনো দুই হাতের আঙুলে ও চুলের গোছা নিয়ে খেলছিল, সুতার মতো পেচাচ্ছিল আঙুলের ডগায়, আর রিটার মুখে যখন একটার পর একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠছিল, তখন ও চুলের গোছা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে ঠোঁট দিয়ে কামড়াচ্ছিল, কখনো কখনো রিটা ওর মাথা এমনভাবে ঝাঁকাল যে সবগুলো চুল একসঙ্গে হয়ত

ঘাড়ের বাম থেকে ডানে অথবা ডান থেকে বামে চলে গেল এবং মাথার যে পাশে চুল ছিল, রিটার ঘাড়টাও সেদিকে ছিল একটু বাঁকানো।

আনে ফ্রাঙ্কের বাড়ি থেকে যখন বেরোলাম, তখন সূর্য হেলে পড়েছে শহরের পশ্চিম আকাশে।

তারপর আমরা গেলাম ভান গগ মিউজিয়ামে। ফ্রেমে বাঁধানো হলুদ সূর্যমুখী ফুল পেছনে রেখে ছবি তুলল রিটা। কেউ একজন তুলে দিল আমাদের যুগল ছবিও, সে আমাদের বলল আরও কাছাকাছি হতে, আমি আরেকটু সরে গেলাম ওর দিকে, ক্যামেরায় যখন ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল, রিটা তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। আনে ফ্রাঙ্কের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর এটাই ছিল ওর প্রথম হাসি।

রিটা যখন হাসত, তখন ওর শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত আর কাঁধের দুই পাশে ছড়ানো চুলগুলো ঝলমল করত, ও যখন হাসত শুরুতে হাসির একটা উচ্ছ্বাস শোনা যেত, তারপর মুখটা হাসির মতো হয়ে থাকত, খরগোশের মতো ওপরের দু-তিনটা দাঁত দেখা যেত এক পলক, কিন্তু আর কোনো আওয়াজ হতো না। ওর হাসি ফুরিয়ে যেত কিন্তু হাসি হাসি মুখটা কম্পিউটারে হ্যাঙ হয়ে যাওয়া স্ক্রিনের মতো আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকত।

ওর সেই হাসিটা এখনো আমার কানে বাজে আর প্রতিধ্বনির মতো ওর হাসির রেশটা আজও কুমকুম করে বুকের ভেতর।

এর মধ্যে পিওনিয়ার স্ট্রাসের গাছগুলো কতবার ন্যাড়া হলো, কতবার ছেয়ে গেল গোলাপি চেরি ব্লসমে, কত শীত আর কত তুষারপাতে পার হলো এত এত পুরনো বছর, পরমতলায় কত বর্ষা হলো, মায়ের কবরের ওপরে শিমুলগাছটা কত বসন্তে লাল হলো, মতিউর রহমান তার দলের নেতা হলো, চেয়ারম্যান থেকে সংসদ সদস্য হলো, মন্ত্রী হলো, গাড়িতে পতাকা উড়িয়ে নামল রাস্তায়; কিন্তু রিটার সেই হাসিটা একটুও মলিন হলো না, আমার স্মৃতিতে ওই মুখ এখনো ঠিক সেদিনের মতোই সজীব হয়ে আছে।

সন্ধ্যার দিকে আমরা হেঁটে এলাম রেড লাইট এরিয়াতেও, মানুষের ঢলের ভেতর পিঁপড়ার মতো পিলপিল করে হাঁটছিলাম আমি ও রিটা, শত শত পায়ের ভিড়ে ঠিকমত এগোতেও পারছিলাম না আমি। আমার হাত দুটো ছিল ওর মুঠোর ভেতর। আমাদের এক পাশে ছিল সারি সারি কিছু বাড়ি, আরেক পাশে চিকন

একটা খাল, খালের ওপর ছোট ছোট জাহাজ, ওপারে অন্ধকার, আমরা যে পাশে হাঁটছিলাম, সে পাশে লাল-নীল উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় চিকচিক করে জ্বলছিল থরে থরে সাজানো কিছু অর্ধনগ্ন শরীর।

আমার এখনো মনে আছে, ওদের পরনে ছিল ঝাঁঝালো রঙের প্যান্টি আর বুকে সরু সরু বে হা, কেউ হাঁটু ভাঁজ করে, কোমরে কোনো একটা হাত রেখে; আবার কেউ কেউ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজার মুখে। কার নাকটা ভোঁতা ছিল, কার চিবুক থেকে ঠোঁটটা ছিল একটু বেশি ওপরে, এখন আর সেসব মনে করতে পারি না; কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, লম্বা একটা পা কীভাবে চিকন হয়ে নিচের দিকে নেমেছে, মোমবাতির মতো মসৃণ ছিল ওই পা, ওর গায়ের রং ছিল নতুন ওঠা বেবি পটেটোর মতো। ওই মেয়েরা ছিল জানালার কাচের ওপারে, ওদের নগ্ন শরীর থেকে বেরিয়ে আসছিল আগুনের আঁচের মতো কড়া একটা আলো, ঢাকা স্টেডিয়ামে ইলেকট্রনিক্সের দোকানে আর রাইশেনস্প্যারগার প্লাৎসের জাটুর্নে সাজিয়ে রাখা সারি সারি টেলিভিশনের ঝলমলে স্ক্রিন থেকে যেভাবে রঙিন আলো ছিটকে আসত, ও রকম আলো।

রিটা আমাকে খোটা দিল। বলল, 'চাইলে যেতে পার।' ওর মুখের আড়ালে চোরা হাসি। আমি বললাম, 'কেন ? আমার বউ আছে।' আমার হাসি ছিল ঠোঁটের কোনায়।

তারপর কী হলো জানি না, শুধু দেখলাম, রিটার হাসি মিলিয়ে গেল, বদলে গেল ওর মুখ ও চোখের ভাষা, সারাটা পথ ও আর কোনো কথা বলল না। এর পর থেকে শুধু স্তব্ধ হয়ে রইল রিটা, ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠছিল সে, ঝড়ের আগে আকাশটা যেরকম গুমট হয়ে থাকে, সেরকম।

রাস্তা পেরিয়ে আমরা গেলাম ছোট্ট একটা পাবে, ওটা গম গম করছিল মানুষের ভিড়ে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘোলাটে হয়েছিল ভেতরটা আর মানুষের হই হল্লা চিৎকারে শোনা যাচ্ছিল না নিজের কথাও। রিটা নিল পটেটো স্ম্যাশ, স্যালাড আর আমি খেলাম বিফ স্টেকের সঙ্গে বাটার মাখানো একটা ব্রুটশেন, এই রুটির বাইরেটা ঝিনুকের খোলসের মতো শক্ত হলেও ভেতরটা তুলার মতো নরম। খাওয়া শেষে আমরা নিলাম কফি আর কয়েক ছিলিম গাঁজা। রিটা খেল টাকিলাও। ওখানে বসে থাকতে থাকতে রাত বাড়ল একসময়, ফাঁকা হয়ে এল রাস্তাঘাট, তার সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে গেল পাবের ভেতরটাও। এক এক করে বেরিয়ে গেল নেশায় টলতে থাকা একেকটা মানুষ, চলে গেল খয়েরি রঙের একটা হুড নিয়ে আমাদের পাশে বসে থাকা বুড়োটাও।

রিটার কেমন লাগছিল জানি না, তবে আমি বুঝতে পারছিলাম যে নিজের ওপর তখন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমার কী হয়েছিল, বলতে পারব

না; কিন্তু আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমার জীবন ছেয়ে থাকা সবগুলো মানুষের মুখ। একটার পর একটা। ওরা ভেসে উঠছিল, ডুবে যাচ্ছিল আবার যাচ্ছিল হারিয়ে। রুখসানা বেগম, মৃত। শীলা অপহৃত। রফিক, পলাতক। সজল, নেই। আব্বা, পরাজিত। রিটা, শুধু রিটা তখনো ছিল আমার সঙ্গে কিন্তু সেও ছিল অপসৃয়মাণ।

আমার মাথার ভেতর তখন শন শন করে ঘুরছিল একটা পাখা, ফুল স্পিডে, সেই পাখার ছিল তিনটা ব্লেড, তার একটা রিটা, অন্য একটা শীলা এবং আরেকটা ব্লেড খালের পাশে নারী দেহের পসরা, তেজকুনি পাড়ায় পোস্ট অফিস আর করাতকলটার কোনায় 'শবদার খার গোশতের দোকানে' যেভাবে গরুর রানগুলো ঝুলত, ওরকম।

কখনো দেখতে পাচ্ছিলাম, রিটা যাত্রাবাড়িতে বাসস্টেশনের পাশে ওরকম একটা বাড়ির শাটার লাগানো গেটের কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অর্ধনগ্ন, কখনো মনে হচ্ছিল ও শীলা, হাঁটু মুড়ে বসে আছে বাল্টহাসার স্ট্রাসের রাস্তায়, ব্লাউজ ছাড়া, শুধু গায়ে একটা সবুজ শাড়ি পেঁচানো।

আমার তখন দাঁড়ানোর মতোও শক্তি ছিল না। টেবিলের একটা কোন ধরে চেয়ার থেকে ওঠার চেষ্টা করলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো টলে উঠল, নিজেকে সোজা করার আগেই পড়ে গেলাম রিটার পিঠের ওপর, ওর কাঁধে ভর দিয়ে ফিরলাম হোটেলে।

যখন ঘুম ভাঙল, নিজেকে আবিষ্কার করলাম রিটার রুমে, ওর বিছানায়। হালকা সবুজ একটা ডুভের ভেতর দলা পাকিয়ে শুয়েছিলাম আমি। পা দুটো ছিল বিছানার বাইরে, জুতা খুলে দিয়েছে রিটা, দুই পায়ের মোজা গোড়ালি পর্যন্ত নামানো। চারদিকে তাকিয়ে রিটাকে খুঁজলাম আমি। ঘরের ভেতর ছড়িয়ে আছে নীল রঙের পাতলা একটা আলো। জানালায় পর্দা টেনে দেওয়া। পর্দাটা ভারী, তাতে নানা রকমের কোল বালিশ, পিলো, কুশন আর ভাঁজ করা কম্বলের ছবি। জানালার ডান দিকে ছিল লম্বা একটা কর্নার লাইট, ওখান থেকে নীল আলোটা প্রথমে সিলিঙে তারপর চার দেয়ালের ভেতর বন্দী হয়ে সারা ঘরে হাওয়ার মতো ভাসছিল।

কর্নার লাইটের নিচে ছিল সিংগেল সোফাটা। তার ভেতর বিড়ালের মতো গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে ছিল রিটা। ওর পাগুলো ছিল দ অক্ষরের মতো ভাঁজ করা, হাঁটু দুটো বুক পর্যন্ত গুটানো আর হাতগুলো ও হাঁটুর ফাঁকে গুঁজে রেখেছে।

ডুভে সরিয়ে উঠে বসলাম আমি, হাতের ওপর ভর দিয়ে বসলাম বিছানায়, পা দুটো ঝুলছিল কার্পেটের ওপর। চারদিকে কিছু একটা খুঁজছিলাম আমি। হয়ত

এমন কিছু খুঁজছিলাম, যা এখনো জেগে আছে, কিন্তু কেউ জেগে ছিল না কোথাও, ঘড়িটাও মনে হয় চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়েছে, শব্দ ছিল না তারও, বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিল বাতিটাও নেভানো, ড্রেসিং টেবিলের পাশে লেখালেখির জন্য যে গোল মতো টেবিল, সেখানে ঘুমাচ্ছে পানি গরম করার কেটলি, একটা লেখার প্যাড, টিভির রিমোট, বাসের টিকিট, একজোড়া চাবি, রিটার ওয়ালেট আর পোরসালিনের সাদা পিরিচে রাখা কিছু ফল, ফিনফিনে পলিথিনে মোড়ানো।

ঘুমিয়ে ছিল রিটা কিন্তু ওর মুখে ও ঠোঁটে কিছু একটা জেগে ছিল, যা আমাকে বিছানা থেকে ওর কাছে নিয়ে এল। নিচে কোথাও কল ছাড়ার শব্দ হলো, কেউ টেলিফোনে কথা বলছিল আর কেউ একজন করিডোর দিয়ে অসমান পায়ে হেঁটে গেল, খুব দ্রুত।

জানালার পর্দা কিছুটা সরাতেই ভুস করে ভেসে উঠল আমস্টার্ডামের রাতের আকাশ। ওখানে শিউলি ফুলের মতো ফুটে আছে কয়েকটা তারা, এলোমেলো, তারাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালের দুই পাশে জ্বলছে সারি সারি কিছু বাতি, কোথাও কোথাও ল্যাম্প পোস্টের মাথায় ঝুলছে বাহারি ফুল ও লতাপাতা।

মনে হচ্ছিল এটা যেন ভান গগের আঁকা রাতের কোনো স্টিল লাইফ।

জানালার কাচগুলো দুই পাশে টানা ছিল, পর্দাটা সরাতেই ঘরের ভেতর হুট করে ঢুকে পড়ল জুলাই মাসের কোনো এক মাঝ রাতের হালকা বাতাস। রিটার মুখটাও কিছুটা খোলা ছিল। আমি যখন ঘোড়া হই আর ও আমার ওপর বসে নিঃশব্দে একটা চিৎকার দিয়ে পেছনের দিকে ভেঙে পড়ে, তখন ওর মুখটা এরকম খোলা থাকে, তখন কোনো শব্দ হয় না, আওয়াজ হয় না, শীৎকার বা গোঙানিও না; কিন্তু কী যেন একটা বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে, যা আমাকে চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো দাবড়াতে থাকে।

৩০৮ নম্বর রুমে ওই রাতে আমি চেয়েছিলাম রিটার ঘোড়া হতে, ও প্রস্তুত ছিল না, হয়ত ও ভাবতেও পারেনি, কিন্তু আমি ভাবতে পেরেছিলাম, আমার কোনো সংশয় ছিল না, জড়তা ছিল না। আর পাঁচশটা স্বামীর মতো আমিও তখন ওর সঙ্গে সহবাস করতে চেয়েছিলাম, যেমন আর সবাই করে, পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িগুলোতে, বাল্টহাসার স্ট্রাসের শ্লাফসিমারেও যা হয়, পরমতলায় বিআইত্যারা আর শীলার সঙ্গে ওর স্বামী যা করে, আমিও ওর সঙ্গে তাই করতে চেয়েছিলাম।

একটা চিৎকার দিয়ে সোফার ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল রিটা। দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে যেরকম শব্দ হয়, ওরকম শব্দ হলো রুমে। দুই হাতের

তালুতে মুখ ঢেকে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জানালার অন্য এক কোনায়, তারপর যখন হাত সরিয়ে নিল, দেখলাম, রক্তের মতো লাল হয়ে আছে ওর মুখ। ক্ষোভে ও ক্রোধে ফুঁসছিল রিটার শরীর।

ওর মুখের ওপর জমা হয়েছিল আতঙ্কের ঘন সর, চোখ দুটো ছিল মাশরুমের মতো ফ্যাকাশে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমিও, ভয়টা তখন বুকের ভেতর ঢভ ঢভ করে বাজছিল। চেয়েছিলাম ওটা বের করে দিতে, পারছিলাম না কিছুতে, ওটা আটকে ছিল গলার কাছে, একটা কাশি দিয়ে তাড়াতে চাইলাম কিন্তু ওটা আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

প্রজাপতির গল্প

আমি যখন ছোট ছিলাম, হঠাৎ ভয় পেলে আম্মা বুকে থুতু দিয়ে দিত অথবা আমাকে লবণ খাওয়াত। চকচকে একটা দাওয়ের মাথায় রাখা হতো এক চিমটি লবণ, তারপর সেটা জিভের ডগা দিয়ে চেটে খেতে হতো, ধারালো দাওটা যতই মুখের কাছাকাছি নিয়ে আসা হতো, টের পেতাম বুকের ভেতর থেকে ভয়টা জলীয় বাষ্পের মতো উড়তে উড়তে কীভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওটা ছিল জিন, ভূত অথবা পেত্নীর ভয়। ওই রাতে হোটেলের তৃতীয় তলায় যদি কোনো জিন কারও ওপর আছর করে থাকে, সেটা রিটার ওপর নয়, ভর করেছিল আমার ওপর। আমি ভয় পাচ্ছিলাম নিজেকে, এই ঘটনার পর নিজেকে একটু অচেনা লাগছিল, সেটা তাড়াতে কী করব, বুঝতে পারছিলাম না আমি। মনে হচ্ছিল জানালার ওপাশে কালবৈশাখী ঝড়ের মতো একটা কিছু শহরের আকাশে জড়ো হয়ে শক্তি সঞ্চয় করছিল।

একসময় নীরবতা ভাঙলাম আমি। জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছে রিটা ?'

ও কিছু বলল না। জবাবে শুধু বাতিটা জ্বেলে দিল। আলোটা ছড়িয়ে পড়ল বেহায়ার মতো।

'আমি তোমাকে চাই কাকাতুয়া', বললাম আমি। আমার কথায় ছিল আকুতি। বলার সময় আমার ঠোঁট কাঁপছিল। এবারও কিছু বলল না রিটা বরং বিছানায় হাত রেখে পা ভাঁজ করে বসল। ওর মাথাটা ফুলদানিতে রাখা বাসি ফুলের মতো নিচের দিকে নোয়ানো।

'আমরা কি বিয়ে করেছি, রিটা ?' আমার প্রশ্ন। উত্তর হিসেবে ও বিছানা থেকে উঠে গেল। দাঁড়াল গোল টেবিলটার কাছে, ওপর থেকে রিমোটটা হাতে নিল, ছাড়ল টেলিভিশন। 'শোন', ডাকলাম আমি। বললাম, 'তাহলে কেন বিয়ে করলে আমাকে ? আমরা তো আগেই ভালো ছিলাম, রিটা।'

ও তখন টেলিভিশনের আওয়াজ একবার বাড়াচ্ছিল, আবার মিউট করছিল। তারপর একটার পর একটা চ্যানেল চেঞ্জ করছিল রিটা। বদলানোর সময় প্রত্যেকবার বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা তীব্র আলো টেলিভিশনের স্ক্রিন থেকে

আছড়ে পড়ছিল ঘরের চার দেয়ালের ভেতর। কোথাও ভূমিকম্পের খবর হচ্ছিল, কোনো চ্যানেলে রিয়েলিটি শো, একটা ঘরের ভেতর একদল ছেলে মেয়ে হইচই করছে, বিগ ব্রাদার ধরনের কিছু, কেউ সোফায় আবার কেউ মেঝেতে শুয়ে আছে, একবার দেখলাম, কোনো একটা চ্যানেলে কালো মতো নগ্ন দুটো মেয়ে উপুড় হয়ে টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছে, স্ক্রিনের নিচে একটা টেলিফোন নম্বর।

'আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি, রিটা। তুমিই করেছ। বিয়ের পর থেকে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ...' রিটা তখনো চুপ করে রইল। আমি তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। ওর দিকে একটু এগিয়েও গিয়েছিলাম। যখন ওর চোখে আমার চোখ পড়ল তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কেন বিয়ে করলে আমাকে... ?'

রিটা ঠিক ওরকম করে তাকাল, যেরকম প্রথম দিন তাকিয়েছিল, পিওনিয়ার স্ট্রাসের মাথায়, শীতল ও ক্রুদ্ধ এক চাহনি, ওর চোখের পাতা অর্ধেক খোলা আর অর্ধেক বন্ধ ছিল।

কথাটা শেষ করতে পারিনি আমি। টিভির স্ক্রিনটা হুশ করে জ্বলে উঠল, তারপর ওটা বন্ধ হয়ে গেল। শাইসে কিড বলে চিৎকার দিয়ে উঠল রিটা। তারপর রিমোটটা ছুড়ে মারল জানালার দিকে। ঝনঝন করে একটা শব্দ হলো পর্দার পেছনে। ব্যাটারিটা ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপর। ঘুরতে ঘুরতে ওটা আমার পায়ের কাছে এসে থামল। হলুদ রঙের একটা ব্যাটারি, কোথাও কোথাও থ্যাঁতলানো।

তারপর আমি কিছুই বলিনি। ও চলে গেল বাথরুমে। বেসিনে জল পড়ার শব্দ হলো, একসময় ভেতরের বাতিটা নিভে গেল, অনেকক্ষণ পর আবার জ্বলল, তারপর কমোডে ফ্ল্যাশ করার আওয়াজ হলো।

আমি তখন কার্পেটের ওপর শুয়ে আছি।

একসময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রিটা। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল ও। তারপর চায়ের কেটলিটায় পানি বসাল। রিমোটটা উঠিয়ে রাখল টেবিলে। জানালার পাল্লা দুটো যখন দুই দিক থেকে টেনে এনে একসঙ্গে লাগিয়ে দিল তখন ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। বালিতে কামড় দিলে যেমন শিরশির করে ওঠে, তেমনি কেঁপে উঠল আমার শরীর।

তারপর টেনে দিল পর্দাটাও। মাথার ওপরে চারকোনা বাতিটা যখন নেভাল, তখন ঘরের ভেতর আবার ফিরে এল পুরনো সেই নীল আলোটা।

একসময় রিটা এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল, আমার ডান পাশে, ওর ওপাশে জানালা, ছাদের দিকে মুখ করে শুয়েছিলাম আমি, ও শুয়ে থাকল আমার দিকে কাত হয়ে, তারপর ডান হাতের তালুতে আমার চোখ মুছে দিল রিটা।

আমিও ঘুরলাম রিটার দিকে। আমরা দুজন মুখোমুখি। আমার বাম হাত ওর বাহুর ওপর। ওর চোখ তখন পানিতে টলটল করছে। আমি বললাম, 'রিটা, আমি সরি।'

রিটা কাঁদছে।

'গরুর মাংস,' আমি ডাকলাম রিটাকে। ও তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। রিটার কানের পাশের চুলগুলো আমার ডান হাতের কয়েকটা আঙুলে পেঁচাতে পেঁচাতে বললাম, 'আমাকে একটা গল্প বলো, রিটা।'

রিটা তখনো কাঁদছে। ওর বাম চোখের জল নাকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ডান চোখের পাতা ছুঁয়ে টুপ টুপ করে পড়ছে কার্পেটের ওপর। চোখের জল জমতে জমতে যখন ডান চোখের পাতায় ওটা একটা বিন্দুর মতো ঝুলত, তখন আমি ওটা চুষে নিতাম। আমার মনে আছে রিটার চোখের পানির স্বাদ ছিল পাকা অ্যাভোক্যাডোর মতো।

আমি যখন আবার গল্প শুনতে চাইলাম, তখন পানির কেটলিটা স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে একটা হুইসেল বাজিয়ে থেমে গেল।

তারপর চোখ খুলল রিটা। বলল, 'এই ছেলে, তুমি আমাকে বুঝতে পার না।'

আমি বললাম, 'ছেলে না। আমি তোমার ছেলে না, রিটা।'

'তাহলে কী ?' জানতে চাইল রিটা।

আমি বললাম, 'টাট্টু ঘোড়া।'

ওর মুখে একটা বিষণ্ন হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর মাথা গুঁজে দিল আমার ঘাড় ও গলার মাঝখানে। আমি ওর চুলে কড়া একটা শ্যাম্পুর গন্ধ পেলাম।

আমার নাক ধরে টানল রিটা। ওর দিকে তাকালাম আমি, ওর মুখ ছেয়ে আছে বিষণ্নতায়।

'আনের জায়গায় যদি তুমি হতে সেলিম, তাহলে তুমি কী করতে ?' হঠাৎ ও জানতে চাইল।

একটু অবাক হলাম আমি। রিটার এই প্রশ্নে আমার কপাল কুঁচকে ছিল। কিন্তু মুখে কোনো জবাব ছিল না।

তারপর ও বলল, 'আনের জায়গায় তো আমিও হতে পারতাম, সেলিম, যুদ্ধের সময় আমিও যদি ওর মতো বড় হতাম, থাকতাম এই শহরে, আমাকেও তো ওরা পারত বন্দিশিবিরে পাঠাতে। তারপর ওর মতো আমারও মৃত্যু হতো ওই বেরগেন বেলজেনে', বলতে বলতে রিটার গলা তখন ধরে আসছিল।

'তুমি চিন্তা করতে পার সেলিম, আনে যদি বেঁচে থাকত, তাহলে ও এখন এই শহরের কোথাও থাকত, হয়ত ওই বাড়িতেই, ওর হয়ত আরও অনেক

ডায়েরি হতো, হয়ত পিটারের সঙ্গে ওর বিয়ে হতো, হয়ত ও জীবনে বিয়েই করত না, হয়ত ওর সংসার হতো কিংবা হতো না, হয়ত এই হোটেলের আশপাশে ও কোথাও থাকত, সামনের এই রাস্তাটা দিয়ে ও প্রত্যেক দিন হেঁটে যেত, কোনো একটা কফিশপে বসত, আনে সাংবাদিক হতে চেয়েছিল, হয়ত এখানকার কোনো কাগজে ও কাজ করত, অথবা ও হয়ত ছোটখাটো কোনো লেখক হতো, কে জানে', একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিটা থামল, ও বলছিল খুব আস্তে আস্তে, আমি ওকে থামাতে চাইনি, জানতাম থামালে ওর কথাগুলো কান্না হয়ে ফেটে পড়বে।

তারপর ও বলল, 'অটো ফ্রাঙ্কের মতো তোমার আব্বারও তো একটা লাইব্রেরি ছিল সেলিম, ভাবো যে ওখানে ওই বইয়ের আলমারির পেছনে তোমরা সবাই লুকিয়ে আছ, তোমাদের সঙ্গে আছে আরও কয়েকটা পরিবার, তারপর নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে তোমরা সবাই ধরা পড়লে, মতিউর রহমান তোমাদের ধরিয়ে দিল মিলিটারিদের হাতে, যেমনটা দিয়েছিল আনেদেরকেও।'

'আনের গোপন আস্তানার কথা যে ফাঁস করে দিয়েছিল, তার কখনোই বিচার হয়নি, সেলিম।'

তারপর রিটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সেলিম, এরকম আরেক আনের গল্প আমি তোমাকে বলব।'

আমি বললাম, 'বলো।'

'উহু, আজ না,' ডান তালুর উল্টো পিঠে চোখ মুছল রিটা। ওর কান্না থেমেছে কিন্তু কান্নার দমকে তখনো কাঁপছিল রিটার শরীর।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, তাহলে আজ অন্য একটা গল্প বলো আমাকে।' রিটা বলল, 'তুমি বলো।' আমি বললাম, 'না তুমি।' 'কিসের গল্প ?' ও জানতে চাইল। আমি বললাম, 'যা খুশি। হয়ত ভালোবাসার অথবা বিরহের কিংবা ঘৃণার, তোমার ইচ্ছা।' তারপর আমি বললাম, 'তোমার কাহিনি বলো।' ও বলল, 'তুই পরমতলার কথা বল।' আমি বললাম, 'না, আজ তুমি বলো।' 'হ্যাঁ' 'না না', 'আমি না, তুমি' এরকম করতে করতে রিটার মুখ একসময় কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

আমাকে কার্পেটের ওপর রেখে উঠে গেল রিটা। ফিরল দুই হাতে দুই কাপ চা নিয়ে। ওর বগলের নিচে একটা বই। এই বইটা ও কিনেছিল দুপুরে। তারপর আমরা বসলাম মুখোমুখি। আমাকে মাইনে কিড বলে ডাকল রিটা তারপর উল্টাতে লাগল পাতার পর পাতা। রঙিন ছবিতে আঙুল বুলাতে বুলাতে ওই রাতে রিটা ভীষণ ক্ষুধার্ত এক শুয়োপোকার কাহিনি শোনাল আমাকে।

'চাঁদের আলোয় একটা পাতার ওপর পড়ে আছে ছোট্ট একটা ডিম। রোববার সকালে সূর্য উঠে তাপ দিল, তারপর ব্যস, সেই ডিম থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট আর ভীষণ ক্ষুধার্ত এক শুয়োপোকা। ও খাবার খুঁজতে লাগল, সোমবার ও আস্তে

আস্তে একটা আপেল খেয়ে ফেলল; কিন্তু ওর ক্ষুধা মিটল না, মঙ্গলবার ও কুড়ে কুড়ে দুটো পেয়ার্স খেল কিন্তু ক্ষুধা গেল না, বুধবার ও খেল তিনটা প্লাম, বৃহস্পতিবার চারটা স্ট্রবেরি, শুক্রবার পাঁচটা কমলা, শনিবারে ও খেল মহাভোজ চকোলেট কেক, কোন আইসক্রিম, একটু চাটনি, একটু সুইট চিজ, এক টুকরো সালামি, একটা ললিপপ, চেরি পাই, একটা সসেজ, কাপ কেক ও এক টুকরো তরমুজ। তারপর ওই রাতে ওর বেশ পেট ব্যথা হলো। পরের দিন আবার রোববার, সেদিন শুয়োপোকাটা শুধু খেল একটা তাজা সবুজ পাতা, তারপর ওর ভালো লাগতে শুরু করল, এরপর ওর আর ক্ষুধা লাগেনি। একসময় ও হয়ে উঠল পেটমোটা একটা বিরাট শুয়োপোকা, নিজের চারপাশে ও একটা গুটি তৈরি করল। তারপর ওই ঘরের ভেতর থাকল দুই সপ্তাহেরও বেশি সময়, একদিন একটা ঠোকর দিয়ে তাতে একটা গর্ত তৈরি করল, তারপর ও বেরিয়ে এল এবং সে তখন একটা সুন্দর প্রজাপতি।'

রিটা বইটার প্রথম পাতা থেকে ওই শুয়োপোকার মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল শেষ পাতা পর্যন্ত, যেখানে একটা রঙিন প্রজাপতির ছবি। ও যখন শেষ পাতাটা উল্টাল আর বলল যে কোকুনের ভেতর থেকে অতঃপর বেরিয়ে এল একটা সুন্দর প্রজাপতি, তখন ও মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল, ওর চোখের পাতা তখন বন্ধ ছিল।

আমি বুঝতে পারছিলাম না রিটা কেন হঠাৎ এই গল্পটা শোনাল। ও কি কিছু ইঙ্গিত করল আমাকে ? আমি কি তাহলে শুয়োপোকা ? আমিও কি খুব ক্ষুধার্ত ? রোববার, সোমবার, মঙ্গলবার তারপর আরেক রোববার পর্যন্ত আমি কি ওকে কুড়ে কুড়ে খেতে চেয়েছি ? এবং তার পরেই কি আমি একটা রঙিন প্রজাপতি ?

বইটা যখন শেষ হলো, তখন জানালার ওপাশে আলো ফুটতে শুরু করেছে। পর্দার ফোকর গলে আলোটা চাইছিল ভেতরে আসতে। তার আগে বোঝার উপায় ছিল না যে কখন রাত পার হয়ে আরও একটা দিন শুরু হয়েছে এবং আর কিছুক্ষণ পর এখান থেকে চেক আউট করতে হবে আমাদের।

দেশ ছাড়ার পর প্রকৃতি আর আশপাশ দেখে আমি কখনো সময় বুঝতে পারিনি। সেটা বুঝতে হতো ঘড়ির কাটা দেখে। অথচ আগে ঘড়ি দেখতে হতো না কখনো। পরমতলায় মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আজান দিত, চালের ওপরে মোরগ ডাকত, অজু করার সময় দাদু গরগর করে মুখে পানি নিত অথবা বুবু যখন খোয়ার থেকে কুরকুর কুরকুর করতে করতে মুরগিগুলো ছেড়ে দিত আর হাঁসগুলো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পুকুরে নামত, নাখালপাড়ায় বাড়িওয়ালা যখন খাঠাশ খাঠাশ করে কলাপসিবল গেট খুলত অথবা আব্বা বাথরুমে গিয়ে কল ছাড়ত, রেজার দিয়ে বেসিনের গায়ে ঠক ঠক শব্দ করত আর ছোট বোন যখন সুর করে

'মাই এইম ইন লাইফ' বা 'জার্নি বাই বোট' রচনা মুখস্থ করত তখন বুঝতে পারতাম সকাল হয়েছে।

আমি বললাম, 'গুটেন মর্গেন রিটা। দেখো, কখন সকাল হয়েছে অথচ আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি', ও আমার কথা না শোনার ভান করল, তারপর হেলতে হেলতে আবার শুয়ে পড়ল কার্পেটে। রিটার বাম পায়ের ওপরে ডান পা ত্রিভুজের মতো ক্রস করা, ওর মুখে উপচে পড়ছে হাসি, চুলগুলো কার্পেটে মাথার দুই পাশে ছড়ানো, একসময় ও পা দুটো নাচাতে লাগল। আমি ওকে ডাকলাম, 'প্রজাপতি।' শুনে রিটা হাসল।

আমি তখন ওর দিকে পাশ ফিরে শোয়া। শুয়োপোকার বইটা ওর পেটের ওপর ধরা। গুন গুন করে গান গাইছিল রিটা।

মনে আছে, আমার জীবনে পার্থিব যত সুখ আছে, তার একটা ছিল রিটার পাশে শুয়ে থাকা, ওর বালিশের পাশে আরেকটা বালিশ, মুখোমুখি দুজনের মাথা, এত ঘনিষ্ঠ আর কাছাকাছি যে আমি ওর চোখের ভেতর মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো লাল লাল শিরাগুলোও দেখতে পেতাম, আমার ডান হাতের আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত ওর নাকের ডগা, কানের লতি, ঠোঁটের রেখা আর চিবুকের সীমানা। রিটার নরম ত্বকের ভেতর ডুবে ডুবে লাঙলের মতো চষে বেড়াত নখগুলো। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আমি ফিসফিস করে কথা বলতাম। রিটাও ফিসফিস করে জবাব দিত। ওটা ছিল আমাদের খেলা। অনেকক্ষণ চলত ওভাবে। একসময় আমাদের মুখে কোনো কথা থাকত না, শুয়োপোকার মতো ওটা উঠে আসত শরীরে।

আমি রিটাকে বললাম, 'কাকাতুয়া, এই বইটা তো ছোটদের।'

'তো ?' রিটার প্রশ্ন, ওর চোখ বড় বড়।

'এটা আমাকে দিলে কেন ?' জানতে চাইলাম আমি।

আমার দিকে ঘুরল রিটা। তারপর প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সেলিম, এই শুয়োপোকা বা প্রজাপতির গল্পটা কি আনে জানত ?'

আমি চুপ করে ছিলাম আবারও। ও ডান পা-টা বাম পায়ের ওপর থেকে নামিয়ে আনল। ঘুরল আমার দিকে। তারপর বাম পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমার কোমরে। ওর দুই হাত তখন আমার গলায় পেঁচানো। বলল, 'মাইন শাৎস, ডু বিস্ট নখ আইনে কিড।'

তারপর ওর চোখ থেকে আবারও বৃষ্টির মতো কান্না ঝরে পড়তে শুরু করল। কোনো শব্দ ছিল না ওই বৃষ্টির। রিটার কান্নায় ভেসে গেল আমার হৃদয়। আমি তখন কাঁদতে পারিনি কিন্তু চেষ্টা করেছি। যদি পারতাম, তাহলে সেদিন ওর সঙ্গে আমি আবারও কাঁদতাম।

একসময় আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতেও পারিনি। আমরা দুজন পাশাপাশি। আমার ডান হাত ওর বাম পাশে, ওর মাথার সঙ্গে আমার মাথা লাগানো, ওর পায়ের গোড়ালি আমার হাঁটুর কাছে ওঠানো, ওর নিশ্বাস আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার নিশ্বাস পড়ছে ওর কাঁধের ওপর, আমরা ঘুমিয়ে আছি, ঠিক স্বামী ও স্ত্রী যেভাবে ঘুমায়।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল আমার, দেয়ালের ঘড়িতে তখন এগারোটার মতো, দরজার বাইরে ক্লিনার এসে একবার ডোরবেল বাজাল, করিডোরে একটা ট্রলি টেনে নেওয়ার শব্দ হলো, ওপরের তলায় কেউ একজন চেয়ার টানল, রাস্তায় শোনা গেল গাড়ির শো শো, রিটা তখনো ঘুমিয়ে আর আমি দেখলাম, ওর হাতের মুঠোয় আমার আঙুলগুলো জড়ানো, আকাশে উড়ে যাওয়ার ভয়ে ঠিক যেভাবে একটা বাচ্চা ছেলে খামচে ধরে রাখে গ্যাস বেলুনের সুতো।

ড্রাগনের পাহাড়ে

ঢাকার সঙ্গে আমার তখন কোনো যোগাযোগ ছিল না। আগে তাও মাঝেমধ্যে ফোন করা হতো, চিঠি লিখতাম, মানুষের হাতে হাতে এটা-ওটা পাঠাতাম, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে করে দিয়েছি। দেশের সঙ্গে আমার যেটুকু যোগাযোগ ছিল, তার পুরোটাই ছিল রফিক ও সজলের কারণে। ওদের কাছে খবর পেতাম, গণ আদালতে গোলাম আজমের ফাঁসির রায় হয়েছে, ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে জাহানার ইমামের পরাজয়। ওরা চলে যাওয়ার পর যোগাযোগের সেই সেতুটাও ভেঙে পড়েছে। ওই সেতুর কয়েক হাজার মাইল ওপারে ছিল ঢাকা আর এপারে ক্রুলের কারাখানায়, কখনো-সখনো বাল্টহাসার স্ট্রাসে আর বাকিটা সময় কোবলেন্সার স্ট্রাসের ছোট্ট একটা বাড়িতে আমার নিস্তরঙ্গ সাদামাটা জীবন।

আমাদের মাঝখানে গোটা এক মহাদেশ।

আমি কদাচিৎ নাখালপাড়ায় ফোন করতাম, হ্যাঁ হুঁ করে আম্মার সঙ্গে এক-আধটু কথা হতো, ব্যস, এতটুকুই। যা বলার বলতেন আম্মা, আমি শুধু শুনতাম। প্রত্যেকবার নতুন নতুন গল্প ছিল তার কাছে। সংসারের গল্প। একেকবার তিনি বলতেন একেকটা কাহিনি। তার কোনো ক্লান্তি ছিল না। রুমানার বিয়ের প্রস্তাব আসছে, কোথায় কোন ছেলের সঙ্গে ও সন্দেহজনকভাবে খুব বেশি মিশতে শুরু করেছে, আব্বার কোমরের ব্যথা এসব। আব্বার সঙ্গে আমার কখনো কথা হতো না, সত্যি বলতে কি, টেলিফোনে তিনি কথা বলতে পারতেন না। সামনাসামনিও যে খুব পারতেন, তা-ও নয়। তার ক্লাস নেওয়া, ছাত্রদের পড়ানো এসব ভেবে আমি খুব অবাক হতাম, ভাবতাম তিনি হয়ত কলেজে এত কথা বলেন যে বাড়িতে এসে তার মুখে আর কোনো কথা থাকত না। কিন্তু তা-ও নয়, আম্মার সঙ্গে কথা বলতেন তিনি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আম্মা ছিলেন তার একমাত্র ও নীরব শ্রোতা।

আম্মা কথা বলতেন শুধু আমাদের সঙ্গে। তার অভাব-অভিযোগ যা ছিল, তার সবটুকু ছিল আমাদের কাছে। আব্বার কাছে তিনি ছিলেন পুতুলের মতো, কিন্তু পুতুলের মালিক পুতুলের দেখাশোনা করত না, বরং পুতুল নিজে তার প্রভুর সেবাযত্ন করত। আব্বার খাওয়ার সময় আম্মাকেও তার সঙ্গে টেবিলে বসতে

হতো, ঘুমানোর সময় আব্বার সঙ্গে ঘুমাতে হতো, আব্বার প্রয়োজনে তাকে ঘুম থেকে উঠতে হতো, আম্মা ওনার চুল আঁচড়ে দিতেন, মেরে দিতেন পিঠের ঘাঁমাচি, পরিয়ে দিতেন জামাকাপড়, স্যান্ডো গেঞ্জি ছাড়া আব্বার চলত না; আবার সেটা তিনি নিজে একা পরতেও অক্ষম ছিলেন, শুধু গেঞ্জির ভেতর নিজেকে গলিয়ে দিতে পারতেন তিনি। তারপর ওটা বুক আর পিঠের ওপর দড়ির মতো পাকিয়ে থাকত। আব্বা তখন চিৎকার করে ডাকতেন আম্মাকে। চশমা পরতেন কিন্তু চশমা খুঁজে পেতেন না তিনি, ওটা খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল আম্মার। আম্মা ছিলেন ওনার চশমার খাপ। জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে পারতেন না, বল থেকে ভাত নিতে পারতেন না বাসনে, ওটাও করে দিতে হতো, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় জুতাটা রাখতে হতো দরজার কাছে।

আমার সঙ্গে আম্মা কথা বলতেন টেলিফোনে। এপাশ থেকে আমি তাকে পরিষ্কার দেখতে পেতাম। তার পান খাওয়া মুখের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগত। দেশ থেকে যেদিন চলে আসি, সেদিন আম্মার শরীরে পেঁচানো উলের শালটা আমার গায়ে কীরকম উষ্ণতা ছড়িয়েছিল, সেটাও মনে আছে হুবহু।

আব্বা যে আমাদের তার ছেলেমেয়ের মতো বড় করতেন, তা-ও কিন্তু না। তার কাছে আমরাও ছিলাম একান্ত বাধ্য ছাত্রের মতো। খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যেটুকু কথা বলতেন, তা ছিল নিতান্ত বইখাতা আর পড়াশোনা নিয়ে। আমার স্মৃতিতে এরকম কোনো ছবি নেই, যেখানে আব্বা কোনো দিন একটা খেলনা বা ঘুড়ি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। আমাকে 'বাবা' বা 'খোকা' বলে ডেকে গালে বা কপালে একটা চুমু দিয়ে ছড়া গান বলতে বলতে কোলে নিয়ে কখনো হেঁটেছেন।

আমার বন্ধুদের বাবারা ওদের সঙ্গে ফুটবল অথবা ক্যারাম খেলত। ঘুরতে নিয়ে যেত রিকশায়। বেড়াতে নিয়ে যেত রমনায়, শিশুপার্কে অথবা সংসদ ভবনের সামনে। আইসক্রিম কিনে দিত। বাবার কাঁধে চড়ে ওরা মেলায় ঘুরে বেড়াত। অথবা ঘরের ভেতর ছুটির দিনে ওদের বাবারা ঘোড়া হতো আর ওরা পিঠের ওপর বসে চাবুক মারত। এসব দেখে আমাদের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠত, খুব গভীর থেকে বেরিয়ে আসত দীর্ঘশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাস।

আব্বার কথা আমি রিটাকে বলেছি। বলেছি আমার মাতৃহীন শৈশবের কথাও। ওর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হতো না। হাবভাবে ও বোঝাত, এটা স্বাভাবিক, বাবারা সাধারণত এরকমই হয়। আব্বার কথা যখন বলতাম, রিটা খরগোশের মতো মাথা উঁচিয়ে আমার দিকে তাকাত, গলা পরিষ্কার করে ও বলত, 'তুই কি তোর বাচ্চাকে নিয়ে নাচবি নাকি !' তারপর ও হাসত। হাসতে হাসতে ওটা যখন কাশির মতো হয়ে উঠত, আমার কল্পনার চোখে তখন ভেসে উঠত বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়ির দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো একটা সুখী পরিবারের ছবি, আমার

সোনার পরমতলা–১৩

[redacted]

ও রিটার মাঝখানে একটা বাচ্চা মেয়ের মুখ, নাকটা মোটা, ওর মাথার চুলগুলো ছোট্ট একটা ক্লিপ দিয়ে ঝুঁটি করে বাঁধা, তার গোড়ায় একটা লাল রঙের ক্লিপ, ওখানে বসানো লেডি বার্ড, মেয়েটার চোখ ও মুখের হাসিটা এতই জীবন্ত আর দুষ্টুমিতে মাখানো যে মনে হতো, ও বুঝি এই এখনই কাচের ভেতর থেকে আমার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

আব্বার এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন আমাদের মা রুখসানা বেগম। একাত্তরের পর থেকে আব্বা চুপচাপ হয়ে গেলেন, মায়ের মৃত্যুর পর তিনি হয়ে গেলেন নির্বাক এবং মতিউর রহমান যখন পরমতলার চেয়ারম্যান হলো তারপর থেকে আব্বা যেন রক্ত মাংসের একখানা অধ্যাপক পাথর।

তখন থেকে আব্বার ছিল খুব কষ্টের জীবন, অন্তত মানসিকভাবে হলেও। আর্থিক জীবনেও তিনি খুব একটা সচ্ছল ছিলেন না। কলেজের বেতন দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতেন তিনি। মনে আছে, সারা জীবন, আমরা বড় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে ছিল একটা মাত্র মশারি, ভাতের মারের মতো ওর রং, এখানে ওখানে ছিঁড়ে ঝাঝরা হয়ে গেলেও বিছানায় নতুন মশারি লাগানোর ক্ষমতা ছিল না। ছোট্ট একটা কীটের উৎপাতে সারা রাত জেগে থাকার পর সকালে আমরা কত অভিযোগ-অনুযোগ করেছি। মশার কামড় থেকে বাঁচাতে আমাদের অঙ্ক খাতার পেছন থেকে কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে আম্মা ভাত দিয়ে ছিদ্রগুলোর ওপর পট্টি দিতেন। একসময় পুরো মশারিটা হয়ে উঠল তালিতে ভরা একটা চাদরের মতো। যখন পট্টি দিয়েও কুলানো যেত না, তখন মশারিটা টাঙানোর পর ছেঁড়া জায়গার ওপর গামছা মেলে রাখা হতো।

রিটা জানতে চাইল, মশারি কী জিনিস। আমি বললাম, তাঁবুর মতো। ও জানতে চাইল এর ভেতর মানুষ ঘুমায় কীভাবে, দম বন্ধ হয়ে আসে কি না। আমি বললাম, 'রিটা, একমাত্র এর ভেতরই ঘুমানো সম্ভব।' বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল ও। বলল, 'কেন ?' আমার কাছে এই প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না।

পরমতলা থেকে ঢাকায় চলে আসার পর আমরা থাকতাম রামপুরায়, টেলিভিশন সেন্টারের পেছনে। বাড়িতে ছিল ছোট ছোট দুটো ঘর। বর্ষার সময় টিনের চাল থেকে পানি পড়ত ঘরের মেঝেতে। আম্মা এখানে-ওখানে বালতি আর হাঁড়িপাতিল বিছিয়ে রাখতেন। বর্ষণমুখর রাতে আমরা যখন ঘুমাতাম, আমাদের গায়ের ওপর বৃষ্টির পানি পড়ত। আব্বা যেন শুনতে না পান, এমন নিচু সুরে, ঠিক যত ডেসিবলের নিচে গেলে মিউট হয়ে যায়, তারচেয়ে এক ধাপ ওপরে শব্দ করে আমরা কাঁদতাম। তখন আম্মা চলে আসতেন আমাদের ঘরে। ঘুমাতেন আমাকে জড়িয়ে। বৃষ্টির পানি ঠেকাতে মশারির ওপর রাখা হতো ভাতের থালা অথবা অ্যালুমুনিয়ামের বল। তার বিশাল ছায়া পড়ত মশারির গায়ে। আমাদের কল্পনায়

সেই ছায়া কখনো হয়ে উঠত পাহাড়, কখনো পূর্ণিমার গোল চাঁদ অথবা ট্রাকের চাকায় পিষ্ট রিকশার চাকা। কল্পনার সেই রিকশায় চেপে আমি হয়ত একসময় ঘুমের দেশে চলে যেতাম; কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে ঘুম ভেঙে যেত, যখন আম্মা মশারির ওপর থেকে থালাটা নামিয়ে বৃষ্টির পানি ছুড়ে ফেলতেন জানালার বাইরে।

বাড়িতে যেদিন মাংস রান্না হতো, সেদিন পরিবেশটা উৎসবের মতো হয়ে উঠত। আমাদের খুব প্রিয় ছিল আম্মার রান্না করা ডিমের তরকারি। সেটাও হতো মাঝেসাঝে। ডিম যে আস্ত খাওয়া যায়, ছোটবেলায় আমরা তা বুঝতে পারিনি। একটা ডিম দুই ভাগ করা হতো। আম্মা যখন দ্বিখণ্ডিত ডিমের একটা টুকরো আমাদের পাতে তুলে দিতেন, আমরা সবাই বাটির দিকে তাকিয়ে থাকতাম বড় কুসুমের ভাগটা কার পাতে যায়, সেটা দেখার জন্য। আব্বার পাতে যেত ছোট্ট একটা ভাগ আর আম্মা তার বাসনে যে টুকরোটা নিতেন, সেটা দেখলে বোঝা যেত না যে ডিমে কুসুম বলে আসলে কিছু আছে।

এই কষ্টও আব্বাকে বোবা করে দিয়েছিল। পরের দিকে, আমরা যখন বড় হয়ে উঠতে লাগলাম, সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা ফিরে আসতে লাগল কিন্তু আব্বার মুখে আর কথা এল না। যেটুকুও ফিরে এল, সেটা ছিল মাপজোঁক করা। আর টেলিফোন ? ওখানে ছিল তার আনুষ্ঠানিক কিছু কথা, 'হ্যালো', 'জি আচ্ছা', 'ওয়ালাইকুম সালাম' এতটুকু।

কখনো যদি আব্বা ফোন ধরতেন একটা-দুটো কথা বলার পর রিসিভার তুলে দিতেন আম্মার হাতে। তারপর আম্মার মাধ্যমে জানতে চাইতেন, আমার স্থায়ী হওয়ার কতটা কী হয়েছে, জার্মানিতে থাকার অনুমতি মিলেছে কি না, আদালতের রায় কবে দেবে, এসব। আর ফোন রেখে দেওয়ার আগে প্রশ্ন করতেন, আমি কবে দেশে যেতে পারব। মাঝেমধ্যে তিনি বিয়ের কথাও বলতেন আমাকে। বলতেন, আমার জন্য তিনি মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন। এই কথাগুলো ছিল তার নিজের। আম্মা যখন কথা বলতেন, বুঝতে পারতাম, আব্বা তখনো তার আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বোঝা যেত আব্বার কোনো কোনো বাণীর শুধু প্রেরক ছিলেন তিনি।

বাড়ির এই অভাবটা আর ছিল না, যখন আমরা নাখালপাড়ায় চলে আসি, তখন। ততদিনে আমরা একটু বড় হয়েছি। তখন বাড়িতে ফোন লাগানো হলো, ফ্রিজার কেনা হলো, আনা হলো টেলিভিশনও, সাদাকালো। মনে আছে, যে বছর টেলিভিশন কেনা হয়েছিল, সে বছর থেকে টারজান শুরু হলো। লোকটার ডাকে চলে আসত জঙ্গলের বানর, হাতি ও হরিণ। ভাবতাম, আব্বা যদি টারজান হতেন, তাহলে কেমন হতো। আমরা সবাই জঙ্গলে থাকতাম। গাছের ওপরে মাচা করে থাকতেন আম্মা। নেংটি পরিহিত আমাদের অধ্যাপক আব্বা ছড়া থেকে মাছ

মারতেন, লাফিয়ে লাফিয়ে গাছ থেকে পেড়ে আনতেন ফলমূল, লড়াই করতেন বাঘ, কুমির, ভালুক ও মতিউর রহমানের সঙ্গে।

আমার বিদেশে চলে আসার পর নাখালপাড়ার বাড়িতে আরও একটু সচ্ছলতা যোগ হলো। থাকা-খাওয়ার খরচ বাদ দিয়ে রোজগারের সবটুকু পাঠিয়ে দিতাম ঢাকায়। আলাদা করে আম্মা ও রুমানার জন্যও কিছু পাঠাতাম। আমি জানতে চাইতাম, আম্মা কী চাই। আম্মা বলতেন, তার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আব্বা যখন আশপাশে না থাকতেন, তখন আসল কথাগুলো বলতেন তিনি। বলতেন, 'তুই ফিরে আয়, বাবা।' আমি বলতাম, 'কেন আম্মা।' আম্মা বলতেন, 'আমার বুকটা খালি হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমার তো ওখানে কিছু নাই, আম্মা', কিছু শব্দটার ওপর জোর দিতাম আমি।

'তুই আয়', তার কথাগুলো টেলিফোনের তারের ভেতর কাঁপতে কাঁপতে আমার কানে এসে পৌঁছাত।

'আমার পড়াশোনা নেই। ফাস্ট ইয়ারে পড়া ফেলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হলো', একটু হাসি মিশিয়ে দিতাম কথাগুলোয়।

'কিছু লাগব না তোর। তুই আয়। আবার পড়বি।'

'আমি তো চাকরিও পাব না, আম্মা', যুক্তি দেখাতাম আমি।

'চেষ্টা করে দেখ, কী করতে পারস', আম্মা শিশুর মতো বোঝাতে চাইতেন আমাকে।

'আমি কীভাবে দেশে যাই। দেশে তো আর যাওয়া হবে না, যাওয়া হবে জেলে।'

আম্মা তখন ওপাশে হু হু করে কাঁদতেন। আমি ঘড়ির কাঁটা দেখতাম। টেলিফোন কল তখন খুব একটা সস্তা ছিল না। আম্মার কান্নাটা যখন কানে এসে লাগত, আমার পৃথিবীটা এলেমেলো হয়ে যেত। আমি চাইতাম, আরও কিছু বলি কিন্তু গলার কাছে এসে ওসব আটকে থাকত। আমি বলতে চাইতাম, আমার কে আছে দেশে। কেউ নেই। আমার মা নেই। পরমতলা নেই। শীলা নেই। আম্মা, আমি কার কাছে যাব !

নিজে যেতে পারতাম না বলে আমার যা কিছু আছে, তার সবই আমি পাঠিয়ে দিতে চাইতাম নাখালপাড়ায়। মনে হতো, কাউফহফের নিচের তলায় যত প্রসাধনী আছে, সব জাহাজের একটা কন্টেইনারে ভরে পাঠিয়ে দিই রুমানার কাছে। আম্মার জন্য পাঠাই রান্নার সবকিছু। আর নিউ মার্কেটে, পাতাল স্টেশন থেকে এসকেলেটরে ওপরে ওঠার পর হাতের বাম পাশে চারতলা, যে বইয়ের দোকান, মন বলত, ওটা পুরো প্যাকেট করে পোস্ট করে দেই আব্বার কলেজের ঠিকানায়।

এই দোকানে আমি ও রিটা প্রায়ই যেতাম। ছুটির দিনে। ওটাও ছিল বেড়াতে যাওয়ার মতো ঘটনা। ফিকশন বইগুলো যে তলায়, আমি সেখানে ঘুরঘুর করতাম আর রিটা নেড়েচেড়ে দেখত রান্না ও ভ্রমণের বই। যেটুকু সময় ওখানে থাকা হতো, তার বেশির ভাগই ও কাটাত সবচে ওপরের তলায়, যেখানে তাকের পর তাক সাজানো ছিল শুধু ইতিহাসের বই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও কাটিয়ে দিত ওখানে। রিটা খুঁজত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, থার্ড রাইশের উত্থান ও পতন, রিটা হাতড়ে বেড়াত বন্দিশিবির থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের স্মৃতিকথা। যুদ্ধের রাজনীতির দিকে তার খুব একটা আগ্রহ ছিল না, কিন্তু কোনো বইয়ের মলাটে কোনো মানুষের মুখ দেখলে ওটা হাতে নিয়ে পাতার পর পাতা খুলে খুলে দেখত ও। বইটা হাতে নিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকত। ওর কাঁধ থেকে বগলের নিচে ঝুলত একটা বড় ব্যাগ। তার ভেতর থেকে উঁকি দিত একটা পরিষ্কার পানির বোতল।

কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখার পর কোনো কোনো বই নিয়ে ও কোনার সোফায় গিয়ে বসত। ওখানে ছিল কাচের একটা টেবিল, তার ওপর কম্পিউটার। পা দুটো সোজা সামনে মেলে ধরে হেলান দিয়ে বসত রিটা। তখন নাকের ডগায় ঝুলত রেক্টাংগুলারের মতো গাঢ় খয়েরি ফ্রেমের ব্রিলে।

ওখানে একবার ক্রিগ ডের ভেল্ট নামে একটা বই পাওয়া গেল। রিটাই আমাকে দেখাল। ওটা ছিল শুধু ছবির বই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বের যখন যেখানে যত যুদ্ধ হয়েছে, তার কিছু ছবি ছিল ওই গ্রন্থে। একেকটা পাতায় একটা দেশ, একেকটা পাতায় একেকটা যুদ্ধ। প্রত্যেকটা পাতার ওপরে মোটা হরফে লেখা ছিল যুদ্ধের সাল। ১৯৭১ লেখা পাতাটা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল রিটা। ওখানে ছিল একটা সাদাকালো ছবি। কোথাও কোনো একটা মাঠের ওপর বেয়নেট দিয়ে রাজাকারদের মারছে কাদের সিদ্দিকী। তার চারদিকে গোল করে দাঁড়িয়ে আছে একদল মানুষ। আঁতকে উঠল রিটা, প্রথমে ও মনে করল লোকটা মতিউর রহমানের মতো কেউ। ভুল ভাঙালাম আমি। রিটার চোখগুলো তখন বড় বড় হয়েছিল। ফেটে পড়ছিল প্রায়। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে রেখেছিল রিটা। ছবির নিচে ক্যাপশনটা পড়ার পর ও জানতে চাইল, এরকম কত রাজাকারকে হত্যা করা হয়েছে। আমি বললাম, 'জানি না।' তারপর বললাম, 'যুদ্ধের পরপরই যদি এভাবে সব মেরে ফেলা যেত, তাহলে খুব ভালো হতো রিটা।' রিটা আমার দিকে কপাল কুঁচকে তাকাল। ও বলল, 'এটা বর্বরতা।' আমি জানতে চাইলাম, 'তাহলে ওরা, এই জানোয়ারেরা যা করেছিল, সেটা কী ছিল রিটা !' ও বলল, 'সেটাও নৃশংসতা। বর্বরতার জবাব বর্বরতায় হয় না, সেলিম। কিন্তু তোমরা ওদের বিচার করলে না কেন ?'

...এভাবে কাটত আমাদের সময়। একটা বছর থেকে আরেকটা বছরে গুটেন রুচ হতো। শীত এসে কামড় বসাত কোলনের বাতাসে। প্রথমে পাতাগুলো হলুদ হয়ে উঠত, তারপর খয়েরি, তারপর গাছগুলো কালো হতে হতে ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে। নদীর দুই পার হয়ে উঠত মৃত্যুপুরীর মতো। দিনে ও রাতে, সব সময় ও সবখানে জন্ডিসের মতো আলো জ্বলত। শীতের আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য নানা রকমের উৎসবের আয়োজন করা হতো শহরের আনাচে-কানাচে। রিটা ওখানে নিয়ে যেত আমাকে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আসত ভাইবারফাস্টনাখট, ইচ্ছে করেই সেদিন টাই পরতাম আমি, কাঁচি দিয়ে রিটা বুকের কাছে টাইটা কেটে দিত। ওই দিনটায় ছিল নারীদের রাজত্ব। পুরুষের লিঙ্গ কেটে দেওয়ার মতো ওরা টাই কেটে দিত, জবাবে ওরা চুমু দিত পুরুষের দুই গালে। কাউকে কাউকে দেখতাম, টাই পরে মেয়েদের সামনে ঘুরঘুর করতে, ওদের চোখ বলত 'কাটো কাটো', শুনেছি কেউ কেউ নাকি বাথরুমে গিয়ে কাটা টাই খুলে গলায় নতুন টাই ঝুলিয়ে আবার মেয়েদের সামনে গিয়ে দাঁড়াত। সেদিন শহরের রাস্তাঘাটে, বাসের ভেতর, ফুটপাতে, কারখানায়, অফিসের ক্যান্টিনে, সব পুরুষেরা বুকের কাছে কাটা টাই নিয়ে ঘুরে বেড়াত, ওদের মুখে ঝুলত সলাজ হাসি আর গালে আঁকা থাকত লাল, বেগুনি অথবা গোলাপি মোটা মোটা ঠোঁট।

প্রত্যেক বছর জাদুঘর দিবসে রিটা আমাকে মিউজিয়ামে নিয়ে যেত, ছুরি থেকে শুরু করে চকোলেটের জাদুঘর, ওখান থেকে বিয়ারগার্টেন বা পাব হয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে আসত। কারফ্রাই দিনে শহরের রাস্তায় কোনো গাড়ি নামত না, চলত না কোথাও কোনো ট্রাম। আমি ও রিটা তখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম কোলনে।

ভাইনাখেটর সময় আমরা হাতে হাত ধরে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতাম মেলার আসরে। রিটা ঝিনুক খাওয়াত আমাকে। আমি জাংরিয়া খাওয়াতাম রিটাকে। বড় দিনের রাতে ডোমের প্রার্থনায় গলা চড়িয়ে হাইলিগে নাখট গাইতাম ওর সঙ্গে। ডিসেম্বরের একেবারে শেষ রাতে, ঘড়িতে যখন রাত বারোটা বাজত, জড়াজড়ি করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম রাইনের তীরে। কোলনের আকাশ তখন ছেয়ে থাকত আতশবাজির লাল-নীল আলোতে। ওগুলো ফুল হয়ে ফুটত রাতের আকাশে আর তারা হয়ে ঝরে পড়ত নদীর পানিতে। তারপর আসত রোজেন মোনটাগ, দুপুরের আগে কার্নিভালের রঙিন মিছিল নামত শহরের রাস্তায়, সাপের মতো লম্বা, যখন মিছিলের মাথাটা থাকত শহরের এক প্রান্তে, তখন কোলনের আরেক প্রান্তে পড়ে থাকত মিছিলের লেজ। টাউন হলের সামনে দিয়ে যেত এই মিছিল, যেতে যেতে রাস্তার দুই পাশে বৃষ্টির মতো ছুড়ে মারত চকোলেট আর ফুল। আমি ও রিটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়াতাম সিনেডোমের ওখানে, আমরা যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন দুপুর পার হয়ে সন্ধ্যা নামত আর ব্যাগ দুটো এত ভারী হয়ে উঠত যে কিছুক্ষণ পর পর হাত বদল করতে হতো আমাকে।

তারপর শহরে সামার আসত। মরা গাছগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠত। প্রথমে গাছের বাকলের ফাঁকফোকর দিয়ে একটা-দুটো সবুজ পাতা গজাত। তারপর ফুল আসত। চেরি আর অ্যাপেল ব্লোসমে কোথাও সাদা, আবার কোথাও গোলাপি ফিতার মতো হয়ে উঠত কোলনের অলিগলি। কিছু দিনের মধ্যেই ফুলগুলোর পাপড়ি বাতাসে উড়তে উড়তে ঝরে পড়ত। মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে থাকত ফুরফুরে বাতাসে। খুব হালকা। তারপর ফুলের আড়াল থেকে বের হয়ে আসত গাঢ় সবুজ কচি কচি শিশুপাতা। ওই পাতাগুলো যখন বড় হতো, তখন পুরো শহরটাকে ঘন এক বনানীর মতো মনে হতো। ছোট ছোট কাঠবিড়ালি সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে এদিকে-ওদিকে দৌড়াত। গাছ বেয়ে ওঠার চেষ্টা করত। দল বেঁধে হাঁসগুলো নেমে আসত লেকের পানিতে। রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওদের দিকে ছুড়ে মারত রিটা। খাবারের গন্ধ পেয়ে ঝোপের আড়াল থেকে কিচিরমিচির করে ওর পায়ের কাছে দৌড়ে আসত কাঠবিড়ালি। রিটা যখন ঘুরে সামনের দিকে ঝুঁকে ওর চোখে চোখ রাখত, তখন কাঠবিড়ালিটা লেজ উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াত। হুঁশ হাঁশ করে জোরে হাততালি দিলেও পালাত না।

শহরের এই পরিবর্তনটা ছিল আমার কাছে বিস্ময়ের মতো। কয়েক মাস আগেও যে শহর জীর্ণশীর্ণ হয়ে মরে গিয়েছিল, সেই একই শহর আবার কীভাবে এত রঙিন, এত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেটা ভেবে খুব অবাক হতাম আমি। জাদুর মতো মনে হতো আমার। রিটাও ছিল আমার জীবনে ওরকম। কখনো কখনো ও ছিল ফুরফুরে বসন্তের মতো; আবার কখনো কখনো ও নিজেকে শীতের মতো দুর্বোধ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য করে রাখত। আমি ওকে আমার বাবা-মায়ের কথা, ভাইবোনের কথা, আম্মার কথা, গ্রামের কথা, শহরের কথা, শীলার কথা, সবই বলেছি। বলেছি দারিদ্র্যের গর্তের ভেতর থেকে আমি কীভাবে বেরিয়ে এসেছি, সেই কাহিনি। কিন্তু রিটা আমাকে কিছু বলেনি। কিচ্ছু না। কখনো জিজ্ঞেস করলে ও জবাব দিত না আর যদি বুঝতে পারত যে আমি জোরাজুরি করছি বা ও আমার সঙ্গে যুক্তিতে পারছে না, তখনই ও চলে যেত শীতনিদ্রায়।

আমার দিনগুলো তখন ছিল মোটামুটি এরকম : সকালে কারখানা। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা। রাতে রিমোট কন্ট্রোল টিপে টিপে ফের্নজেহেন দেখা। ভোররাতে ঘুমানো। শুক্রবার সন্ধ্যায় রিটাকে নিয়ে পাবে বসা। শনি ও রবিবার ছিল একটু অন্য রকম। শনিবার প্রায় সারা দিন আমরা একসঙ্গে কাটাতাম, রুটি-মাছ-সবজি কিনতাম, রান্না করতাম, কখনো বাল্টহাসার স্ট্রাসে, কখনো কোবলেন্সার স্ট্রাসের বাড়িতে। কাপড় ধোয়া হতো, ঘরদোর পরিষ্কার করা হতো, আর শোনা হতো গান, গান এবং গান। আমার প্রিয় ছিল জাভিয়ের নাইডু, সাবরিনা সেটলুর, জাশা বড়জোড় ভোল্ফ বিয়েরমান। আর রিটা শুনত বেটোফেন, শোপে, মোৎসার্ট বড়জোড় লুচিয়ানো পাভারোত্তি। রোববার আকাশে রোদ উঠলে আমরা ঘরে

থাকতাম না কখনো। কোলন বানহফ থেকে ট্রেন ধরতাম। কুড়ি মিনিটে পৌঁছে যেতাম বনে। আমরা বসতাম ট্রেনের দোতলায়। ওপরে বসতে ভালো লাগত আমার। রিটাও আসত আমার পিছু পিছু। পুরোটা পথ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম আমি। রিটা বসত আমার পাশে। মাথাটা রাখত আমার কাঁধের ওপর। ডান হাতের মুঠোয় ও ধরে রাখত আমার বাম হাত। মাঝেমধ্যে এমন জোরে খামচে ধরত যে হাতের তালুতে রিটার নখের দাগ বসে যেত। আমি তাকাতাম না ওর দিকে; কিন্তু অনুভব করতাম, আমার কাঁধে ওর চিবুকের স্পর্শ, ওর চুলের গন্ধ আর শরীরের উষ্ণতা।

আমরা চলে যেতাম ক্যোনিগসভিন্টার গ্রামের দ্রাখেনফেলসে। রাইনের পারে বিশাল সাতটা পাহাড়ের যে চুড়ো, তার কাছাকাছি। তার একটা ছিল ড্রাগনের পাহাড়। ওখানে ছিল বহু বছরের পুরনো একটা ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ। তার পায়ের কাছে দাঁড়ালে দেখা যেত আশপাশের শহরও। নদীতে ছুটত ছোট-বড় জাহাজ। তার কোনোটায় থাকত একদল মানুষ, কোনোটায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি, কোনো জাহাজে থাকত শুধু লাল-নীল-সবুজ কন্টেইনার। আলকাতরার মতো কালো রঙের কয়েকটা কামান আর টেলিস্কোপ বসানো ছিল পাহাড়ের ওপর। ওটা দিয়ে দেখা যেত কোলনের ডোমও। আমরা চোখ লাগিয়ে খুঁজতাম বাল্টহাসার স্ট্রাসে কিংবা কোবলেন্সার স্ট্রাসের বাড়িগুলো। আমি খুঁজতাম পিওনিয়ার স্ট্রাসের ২১ নম্বর চারতলা বাড়িটা।

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে চোখে পড়ত দিগন্তছড়ানো সবুজ এক শহর। প্রাসাদের আশপাশে কোথাও চাদর বিছিয়ে বসতাম আমি আর রিটা। কখনো আকাশের দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে, কখনো আমি রিটার দিকে কিংবা রিটা আমার দিকে মুখ করে আমরা শুয়ে থাকতাম চাদরে। ক্ষিদে পেলে আমরা চা-কফি খেতাম আর খেতাম ড্যোনার কেবাব। খেতে খেতে রিটা আমাকে টুকটাক কিছু গল্প বলত। যেমন দ্রাখেনফেলসের কোনো এক গুহায় একটা ড্রাগন বাস করত। জিগফ্রিড নামে লোককাহিনির এক নায়ক ছিল এই ক্যোনিগসভিন্টারে। এই নায়কই একসময় ড্রাগনটিকে হত্যা করে, তারপর ড্রাগনের রক্তে স্নান করার পর অমর হয়ে ওঠে জিগফ্রিড। ক্যোনিগসভিন্টারের লোকেরা বিশ্বাস করে, জিগফ্রিড বেঁচে আছে এখনো। রিটা আমাকে এসব বলত আর ও আমার কাছ থেকে শুনত একাত্তরের কাহিনি : ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ফার্মগেটের একটা বাড়িতে কয়েক দিন পড়েছিল তিন ভাইয়ের লাশ। যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাদের শরীরে পিঁপড়া লেগে গিয়েছিল।

ভালোবাসার জাল

রিটার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল ইয়ো ইয়োর মতো। ওর হাতের আঙুলে বাঁধা ছিলাম আমি। আমাকে ও ছুড়ে মারত; আবার টেনে নিত কাছে। এটা ও কেন করত, জানি না; তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এটা ওর কোনো খেলা ছিল না। ছিল না খেয়ালও। ও এটা কেন করত জানি না, তবে এই রহস্যটাই আমাকে ওর দিকে চুম্বকের মতো টেনে রাখত।

অথবা আমাদের সম্পর্কটা ছিল ঠিক রোলারকোস্টারের মতো, উঠত ধুপ করে নামত, আবার শাঁই করে উঠত।

কোলনের এই জীবন নিয়ে আমার বড় কোনো অভিযোগ ছিল না। শুধু মাঝেমধ্যে রফিক আর সজলের কথা মনে পড়ত। আর খুব বেশি মনে পড়ত পিওনিয়ার স্ট্রাসের ২১ নম্বর বাড়িটার কথা। ওই বাড়িটার সবকিছু আমার মুখস্থ ছিল। বেসিনের কলটা কতটুকু ঘোরালে কত জোরে পানি আসত, জানালার কোন দিক থেকে কখন, কী রঙের আলো ঢুকত, বাথরুমের দরজাটা কতখানি খোলার পর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করত, সব। এ ছাড়া কোলনের জীবনে আমার কোনো অভাব ছিল না। আমার সব ছিল। একটা চাকরি ছিল। থাকার জন্য ছিল গরম একটা ঘর। আর ছিল রিটার মতো বউ। বউ বলব না, বলব আপন একজন মানুষ।

একটা অভিযোগই শুধু ছিল আমার। বিয়ের আগে রিটা আমাকে আদর করত, হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত বিছানায়, অনেক সময় লাগিয়ে আলতো করে নগ্ন করত আমাকে, বাথটাবে কুসুম কুসুম গরম পানিতে ডুবিয়ে স্নান করাত, সাবান মেখে দিত বগলে, বুকে, সবখানে, তোয়ালে দিয়ে মুছে দিত শরীরের জল, আমাকে ঘোড়া বানাত, জিপসিদের মতো ঝড় তুলত বিছানায় কিংবা মেঝেতে, ওর সোনালি চুলে আমার মুখ ঢেকে যেত, মুখ হা করে ও পেছনের দিকে ভেঙে পড়ত। কিন্তু বিয়ের পর এই অংশটা রিটা মুছে দিয়েছে। বাকি সব ঠিক একই রকমের আছে। ও আমাকে চুমু দেয়, জড়িয়ে ধরে, আঁচড়ে দেয় মাথার চুল, কখনো কখনো মুখে তুলে খাইয়েও দেয়। আমরা একসঙ্গে থাকি, পাশাপাশি বালিশে একই ডুভের নিচে একসঙ্গে ঘুমাই, আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে ও

শুয়ে থাকে, কিন্তু আমি কখনো কোনো অভিযোগ করি না। আমস্টার্ডামের ওই রাতের পর ওর দিকে আমি আর কখনো ওভাবে এগিয়েও যাইনি। রিটাকে কখনো জিজ্ঞেসও করিনি। আমি ধরে নিয়েছি, এটা প্রকৃতির মতো। যেমন করে আমার জীবনে ওটা এসেছিল, তেমনি হয়ত চলেও গেছে। আমি চেয়েছি বলে তো আর ওটা আসেনি। এমনি এমনিই এসেছে। পিওনিয়ার স্ট্রাসের মোড়ের ছোট্ট ওই দুর্ঘটনা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। এখন হয়ত ওটা আবার চলেও গেছে। রিটার সঙ্গে আমার এই অধ্যায়টা হয়ত আবার কখনো ফিরে আসবে সামারের মতো। হয়ত ফুলে-ফলে, পত্রপল্লবে ওর সঙ্গে আমার শরীর আবার জড়াবে। আমি যে তার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতাম, তা-ও না। এটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম জীবনের হাতে। এলে আসবে, না এলে নাই। আসুক আর না আসুক, আমি জানতাম, আমি যেমন রিটাকে ভালোবাসি, তেমনি রিটাও আমাকে ভালোবাসে, আমার যেটুকু ভালোবাসা, ওর ভালোবাসা তারচেয়েও বেশি। আর এই বিশ্বাসটাই ওর প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে রেখেছে।

আমি বুঝতে পারতাম, রিটার ভালোবাসায় আমি আকণ্ঠ ডুবে আছি। ওর জন্য বুকের ভেতরের ফুলগুলো পাপড়ি মেলতে শুরু করে, পাখা ঝাপটাতে থাকে পায়রাগুলো, আবার ওর জন্যই বুকের ভেতর শুকিয়ে ঝরে যায় খয়েরি পাতাগুলো, আকাশটা কালো হয়ে ঝুলে থাকে শহরের চিমনিগুলোর মাথায়। আমি জানতাম, রিটার ভালোবাসার গুড়ে আমার হাত-পা-মাথা-বাহু-বুক সবকিছু মাখামাখি। আমি ওই জালে আটকে গিয়েছি।

আমরা যখন একসঙ্গে বাজারে যেতাম, আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত অনেকে। ভাবত, আমরা কোনো দম্পতি। ফ্রাউ বাওয়ার হয়ত কোনো বিদেশি ছেলেকে বিয়ে করেছে। হয়ত ভাবত, আমি রিটার স্যুভেনির, গোয়ার সমুদ্রসৈকত থেকে ও আমাকে কুড়িয়ে এনেছে। ওরা আর কী ভাবত, আমি জানি না। তবে মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের নিচতলা থেকে আমরা যখন লিফটে দ্বিতীয় তলায় উঠতাম, বড় একটা আয়নায় দেখতে পেতাম নিজেদের। ওর আর আমার চোখ-মুখ-চুল-শরীর দেখে মনে হতো আর সবার মতো আমরাও সাধারণ এক দম্পতি, দুঃখহীন
দুশ্চিন্তামুক্ত, আমাদের মধ্যে গোপন কিছু নেই, কোনো মিথ্যা নেই, অনুতাপহীন, ক্লান্তিহীন মধ্যবিত্তের এক সাধারণ সংসার যাপন।

এই ছিল কোবলেন্সার স্ট্রাসে আর বাল্টাহাসার স্ট্রাসেতে আমার ছোট্ট নিরিবিলি জীবন। এই জীবনের জন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। সবকিছু মিলিয়ে আমি খুশি। কিন্তু এই সুখ আমি খুব সহজে পাইনি। এমন নয় যে এই জীবন আমি কোনো মূল্য না দিয়ে পেয়েছি।

চুকনগরের কথা

ওস্টার্নের ছুটিতে আমি ওকে শোনালাম চুকনগর হত্যাকাণ্ডের কাহিনি। এই কাহিনি বলতে আমার লাগল দুদিন। রিটাও শুনছিল খুব মনোযোগ দিয়ে, খুটিয়ে খুটিয়ে। ওর একটা ভালো দিক ছিল, ও যখন যা কিছু করত, সেটা সে করত শতভাগ নিষ্ঠার সঙ্গে। ও খুব ভালো শ্রোতা ছিল, ওর চোখ-মুখ দেখেই বলে দেওয়া যেত, কত গভীরে ডুব দিয়ে ও আমার কথা শুনত। রিটা যখন আমার কথামালায় নিমগ্ন হয়ে থাকত, তখন ওকে একটা শিশুর মতো দেখাত, আমার বলা কথাগুলো ওর চোখের ভেতর ছবি হয়ে ভেসে উঠত, কাহিনিটা যদি আনন্দের হতো, ওর চোখমুখ খুশিতে চিকমিক করত; আর যদি কষ্টের হতো, ওর চোখ দুটো হয়ে উঠত দৃষ্টিহীন এক জোড়া আঁখির মতো।

রিটাকে মনে হতো ছোট্ট একটা মেয়ে, রুদ্ধশ্বাস নিয়ে ও সাত দরজার ওপারে অবরুদ্ধ কোনো এক রাজকন্যার কাহিনি শুনছে, অপেক্ষা করছে সবকটা দরজা পার হয়ে রাজকুমার কখন ওর কাছে গিয়ে পৌঁছাবে, রিটার এই আগ্রহ আর কৌতূহলের কারণে একাত্তরের গল্প বলতে সামান্য কোনো ক্লান্তিও আমাকে স্পর্শ করেনি, করত না কখনো।

গল্পের শুরুটা পছন্দ হলে রিটা কিছু বলত না, শুধু মন দিয়ে শুনত, শুনত আর শুনত। ও অপেক্ষা করত কখন গল্পটা শেষ হবে কিন্তু ভালো না লাগলে ও সোজা না করে দিত, বলত, 'এটা না, অন্য একটা বলো', ওর ঠোঁটে কোনো রাখঢাক ছিল না। রিটা যখন কোনো একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনা মেলাতে পারত না, অথবা ঘটনার ধারাবাহিকতায় খাবি খেত, তখন ও আমাকে জোর করে থামিয়ে জিজ্ঞেস করত, বারবার হলে বারবার করত, আমি বিরক্ত হলে ও বিরক্ত হতো তারচেয়েও বেশি, তাই খুব বেশি কিছু বলতাম না ওকে, ঠান্ডা ঠান্ডা মুখ করে শুধু ওর চোখের দিকে তাকাতাম। তখন রিটার চোখে থাকত গল্প শোনার আকুতি মিনতি।

গল্পের মাঝখানে আমাকে থামিয়ে কোনো কিছু জানতে চাওয়ার অদ্ভুত একটা কায়দা ছিল রিটার। হয়ত কোনো জায়গায় বুঝতে পারল না বা খটকা লাগল, প্রথমে ওর গলাটা কচ্ছপের মতো ওপরে উঠত, তারপর উঠত শরীরটা, তারপর

ও 'এই ছেলে থাম থাম থাম', বলে চিৎকার করে উঠত, যেমন করে কোনো ট্রেন একটা স্টেশনের ভেতর ঢুকে থেমে যাওয়ার পরও পেছনের লোকোমোটিভগুলো গড় গড় করে এগোতে থাকে, সেরকম। ওর ঠোঁটে 'থাম থাম' শব্দটাও রেলগাড়ির চাকার মতো গড়াতে থাকত, তারপর আমার দিকে ঝুঁকে আসত রিটা, একটা হাত রাখত আমার হাঁটুর ওপর। বলত, 'সুন্দরী দাসীকে ওরা কোথায় পেল ? কোনখানে ? কী বললি ? ওরা ওকে কীভাবে পেয়েছিল ?'

আমি বললাম, 'সুন্দরী দাসী ওর নাম কিনা, আমরা কেউই জানি না, রিটা, জানে না চুকনগরের কোনো মানুষ, ইতিহাসও জানে না, ওর নাম আসলে কী।'

'এই নামটা শুধু আমরা ধরে নিয়েছি', বললাম আমি।

'তাহলে ওর নাম সুন্দরী দাসী হলো কীভাবে ?' রিটা আমার দিকে এমন বড় বড় চোখ করে তাকাল যে ওকে দেখে মনে হলো, ও ভাবছে গল্পের খাতিরে এই নামটা আমি বানিয়ে দিয়েছি।

আমি রিটাকে বললাম, সুন্দরী দাসী চুকনগরবাসী ছিল না। ও এসেছিল বাইরের কোনো একটা গ্রাম থেকে। কোত্থেকে বা কার সঙ্গে এসেছিল সেই গল্প পৃথিবীর কেউ জানে না। শুধু জানে যে ওরা, ওর মতো আরও অনেকে সেদিন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে পালাতে চেয়েছিল। পালাতে চেয়েছিল ওদের পিছু নেওয়া মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছাল, যেখানে ছোট্ট এই মেয়েটাকে জীবন করুণা করল, হয়ত ওরা নাখালপাড়া থেকে ওখানে গিয়েছিল, হয়ত রাজশাহী বরিশাল অথবা পরমতলা থেকে, কে জানে, সারা দেশটাই তো তখন হয়ে উঠেছিল মৃত্যুর উপত্যকা।

পাকিস্তানি মিলিটারিদের এলোপাতাড়ি গুলিতে মারা যায় ওর বাবা-মা দুজনেই। চুকনগর বাজারের কাছে একটা বটগাছের গোড়ায়, অজগরের মতো ফুলেফেঁপে থাকা আর গুটানো পেঁচানো কয়েকটা শিকড়ের ফাঁকে ফাঁকে পড়েছিল ওর মায়ের রক্তমাখা লাশ, যেন ওকে জড়িয়ে রেখেছিল শিকড়গুলো, মায়ের বুক থেকে তখনো রক্ত চুইয়ে পড়ছিল মাটিতে, কয়েক মাসের এই শিশুর হাতে ও মুখে লেগেছিল ছোপ ছোপ রক্ত, নিষ্প্রাণ মায়ের স্তনে মুখ রেখে দুধ খাচ্ছিল ও, হয়ত দুধের সঙ্গে খেয়েছিল মায়ের রক্তও, পরে আনোয়ার আলী নামের এক বাউল ওকে গাছের নিচ থেকে উদ্ধার করে। তার পর থেকে ওর কাছেই বড় হয়েছে সুন্দরী দাসী।

গল্পটা এখানেই শেষ করতে পারতাম আমি কিন্তু করিনি। এতটুকুই ছিল একাত্তরের কাহিনি, রিটাকে আমার এটুকুই বলার কথা, অথচ আমি আরও কিছু বললাম, ওকে জানালাম যে বড় হওয়ার পর আনোয়ার আলীর পরিবার সুন্দরী দাসীকে ধুমধাম করে বিয়েও দিয়েছে।

তখনই 'এই ছেলে থাম থাম থাম থাম...' করে উঠল রিটা। ওর ঠোঁটের কোনায় তখন জ্বলছিল সিগারেটের আগুন। ক্যান্ডি অ্যাপেলের মতো লাল একটা শার্টের কলারের ভেতর থেকে খরগোশের মতো বেরোল সরু গলাটা, এলোমেলো চুলগুলো কানের দুই পাশে ছড়িয়ে পড়ল, ঝরনার জলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল কাঁধের দুই পাশে। তার দু-এক ফোঁটা পড়ল আমার মনের জমিনেও, অনেক দিনের অনাবৃষ্টি শেষে পরমতলায় যখন ধুলোওড়া জাঙ্গালের ওপর গুলির মতো বৃষ্টি পড়ত, তৃষ্ণার্ত মাটি তার প্রত্যেকটা ফোঁটা গোগ্রাসে গিলে খেত, তামাক অথবা তরমুজের ক্ষেতের ওপর দিয়ে ছুটে আসা বাতাসে তখন পাওয়া যেত মাটির সোঁদা গন্ধ, তখন নেশা ধরার মতো দুলে উঠত মাথা ও মন, ঠিক তেমনি রিটার চুলের গন্ধে আমার বুকের ভেতরটা তখন শিরশিরিয়ে উঠল।

রিটা বলল, 'আনোয়ার আলীর মেয়ের নাম তো হওয়ার কথা সুন্দরী আলী।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ হতো, হতে পারত। কিন্তু আনোয়ার আলী নিজেই ওর নাম দিয়েছে সুন্দরী দাসী। ও যখন সুন্দরীকে তার মায়ের রক্তাক্ত বুক থেকে কোলে তুলে নেয়, তখন মহিলার মাথায় ও নাকি সিঁদুর আর হাতে শাখার বালা দেখেছিল। একারণেই সুন্দরী দাসীকে ওরা হিন্দু বিশ্বাসে বড় করেছে।'

সিগারেটের আগুনের দিকে খেয়াল ছিল না রিটার । ওটা যখন আঙুল ছুঁয়ে গেল, তখনই নড়ে উঠল রিটা। জানতে চাইল, 'আর ওর মায়ের লাশ...ওটার কী হলো ?' আমি বললাম, 'রিটা, এই প্রশ্ন আমিও করেছি। গ্রামের কেউ তার উত্তর দিতে পারেনি। যুদ্ধের বহু বছর পর, আমি যখন এখানে-ওখানে সাংবাদিকতা করতে শুরু করি, তখন চুকনগর গিয়েছিলাম আমি, গণহত্যার ওপর একটা ধারাবাহিক ফিচার ছাপা হচ্ছিল কাগজে, বধ্যভূমির সন্ধানে, চুকনগর কলেজের সামনে কোনো একটা চালের কলের ভেতর একজনের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন বাজার কমিটির নেতা। হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মিলিটারিদের নির্দেশে সে নাকি লাশ সরিয়েছিল গ্রাম থেকে। একটা না, দুটো না, হাজার হাজার লাশ। দশ হাজার। একেকটা লাশের জন্য ওকে দেওয়া হয়েছিল এক আনা। লাশের জন্য রাস্তায় গাড়ির চাকা গড়াতে পারছিল না, লাশ ছিল নদীর পানিতে, নৌকার তলায়, বাড়ির চালে, ঘরের ভেতর, কোথাও চকির ওপরে, কোথাও নিচে, কুমড়ার মাচায়, আখ ও পাটক্ষেতের ভেতর, জামগাছের ডালে, টিওবঅয়েলের গোড়ায়, পুকুরের ঘাটে, বাড়ির দাওয়ায়, পায়খানার ভেতর, সবখানে।

সেদিন চালকলের ভেতর ওই লোকটার কাছে আমি যা কিছু শুনেছিলাম, তার পুরোটাই বললাম রিটাকে। 'তখন জোয়ার ছিল ভদ্রা নদীতে। স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে লাশের পর লাশ। নৌকার গলুইয়ে বসে এক মহিলার লাশ সে নাকি ধরে রেখেছিল স্রোতের বিপরীতে, পানির তোড়ে একসময় খুলে যায়

মহিলার শাড়ি, তারপর নগ্ন নিথর সেই লাশ ভাসতে ভাসতে হারিয়ে যায় চোখের আড়ালে।' রিটাকে বললাম, 'যুদ্ধের এতগুলো মাস, এতগুলো বছর পর উজানে সেই ভদ্রা এখন মৃত, দক্ষিণে সেটা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। মনে আছে, ওই লোকটা বলেছিল, কি জানি ভাই, কোনো কোনো লাশ হয়ত সাগরে গিয়ে পড়েছে আর বাদবাকি যেগুলো নদীর দুই পারের এদিকে-ওদিকে ঢোলকলমির ঝোপেঝাড়ে আটকা পড়েছিল সেগুলোকে হয়ত খেয়েছে নদীর মাছে আর শেয়ালে-কুকুরে।'

তারপর আমি রিটাকে বললাম, 'জানো কাকাতুয়া, চুকনগরে আমি অনেক মানুষের দেখা পেয়েছিলাম, যারা ওই দিনের পর মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। যারা খেত, তারা নাকি বমি করতে করতে একসময় রক্তবমি হয়ে মারা যেত। তাদের বমিতে পাওয়া যেত লাশের গন্ধ।'

আমি বললাম, বাজারে পূজামণ্ডপের ঠিক পেছনে একটা বটগাছ ছিল, তার শেকড়গুলো অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নদীতে গিয়ে পড়েছে। ভাটার সময় ওই শেকড়গুলো ভেসে উঠে আর জোয়ারের সময় মনে হবে বটগাছটা যেন উঠে এসেছে নদীর একেবারে তল থেকে। হায়েনারা যখন আক্রমণ করে, তখন নাকি অনেকেই দুই হাতে বটগাছটার শিকড় আঁকড়ে ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল নদীতে, ওখানেও গুলি করা হলো বৃষ্টির মতো, রং গুলানো লাল শরবতের মতো হয়ে উঠল ভদ্রার ঘোলা জল, একসময় জোয়ারের পানি সব রক্ত ধুয়েমুছে উগড়ে দিল সাগরে, আর বটগাছের গোড়ায় শেকড়ের চিপা-চাপায় এখানে-ওখানে মৃত মাছের মতো ভেসে উঠল মানুষের লাশ।'

থামলাম আমি। স্তব্ধ হয়ে আছে রিটা। আমি তাকিয়ে আছি ওর চোখের দিকে। ও তাকিয়ে আছে আমার চোখে। ওর চোখের ভেতর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম চুকনগর গ্রাম।

'আগুনে পুড়তে পুড়তে পুরো গ্রামটা যখন ছাই হয়ে গেল, তখন আহত লোকজনের কাছে সব লাশ ফেলে রেখে মিলিটারিরা গিয়ে উঠল পাকা রাস্তায়, পথে পড়ল একটা গাছ, যার মাথায় উঠে আশ্রয় নিয়েছিল জনা পঞ্চাশেক মানুষ, পাখি শিকারের মতো ওরা গুলি করল, পাতায় পাতায়, একেকটা মানুষ আম অথবা পাকা কুল পড়ার মতো টুপ টাপ টুপ টাপ করে ঝরে পড়ল মাটিতে, তারপর জন্তুরা ছুটল সদরের দিকে, থমথমে সন্ধ্যা নামল উঁচু উঁচু গাছগুলোর মাথায়, আকাশ থেকে নেমে আসা কালো চাদরের নিচে চাপা পড়ল চুকনগর, রাতের অন্ধকার চিরে ভয়াল নেকড়ের মতো শো শো করে দৌড়ে গেল মিলিটারি জিপ, পেছনে পড়ে রইল আদিগন্ত বিস্তৃত উদোম নগ্ন এক শ্মশান।'

কোন সালে আমি চুকনগরে গিয়েছিলাম, সেটা এখন আর মনে করতে পারি না; তবে এটা মনে আছে যে তখন ছিল গরমের সময়, ঢাকা থেকে নাইট কোচে

রওনা দিয়েছিলাম আমি আর আমাদের ক্যামেরাম্যান ইকবাল হাসান। প্রথমে যশোর, তারপর খুলনা শহর হয়ে আরেকটা বাস ধরে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম চুকনগরে। আমি বসলাম জানালার পাশে, আমি যখন মাথার ওপরে ছোট্ট বাতিটা জ্বালিয়ে চুকনগরের ইতিহাস পড়ার চেষ্টা করছিলাম, ডান পাশে আমার কাঁধের ওপরে কাত হয়ে হাসান নাক ডাকল সারাটা পথ। সকালে ময়লাপোঁতায় এক বন্ধুর বাড়িতে ফ্রেশ হয়ে নাশতার ঝামেলা শেষ করে তারপর আবার রওনা হলাম চুকনগরের পথে।

রাস্তার একপাশে পড়ল একটার পর একটা চিংড়ির ঘের, তার ওপরে ছোট্ট ছোট্ট টং, ফার্নিচারের দোকান, রিকশা ও সাইকেল মেরামতের ওয়ার্কশপ, কোনো এক সময় দেখলাম, একটা মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, মাছের খাবারের দোকান, আমরা ছুটছিলাম চুকনগরের দিকে। আমাদের সঙ্গে ছুটছিল সূর্যটাও। যখন ডুমুরিয়ায় গিয়ে নামলাম, তখন সূর্যটা ঠিক মাথার ওপরে।

চুকনগর কলেজের প্রিন্সিপাল আমাদের সামনে তুলে ধরলেন গণহত্যার ইতিহাস, মেলে ধরলেন এক গাদা ফাইল, খবরের কাগজ থেকে কেটে কেটে আঠা দিয়ে লাগানো, কাগজগুলো পুরনো, লালচে হলুদ, ছিঁড়ে যাওয়ার মতো। কবে, কোথায় ওনারা স্মৃতিসৌধ বানাতে চেয়েছেন, কেন ওনারা মে মাসের ১৭ তারিখকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিলেন, এসব। গণহত্যা থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁদের কয়েকজনকে ডেকেও এনেছিলেন প্রিন্সিপাল সাহেব।

একজন লুঙ্গি তুলে তার ঊরুতে গুলির চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, আরেকজনের গলায় ছিল ছুরি চালানোর কালশিটে দাগ আর ছিল আটপৌরে শাড়ি পরা সুন্দরী দাসী, তার কোথাও কোনো ক্ষত ছিল না, তবে তাকেই মনে হয়েছিল আস্ত একটা ক্ষত।

একটা ভ্যানগাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল আমাদের জন্য। সেই গাড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে আমরা খুঁজে বেড়ালাম মে মাসের সেই দিনটার স্মৃতি। একটা বিল। এই বিলে এখন কোনো পানি নেই। তখন ছিল। ওখানে নৌকা ছিল। আর ছিল লাশ। এখন ওখানে জমি। জমিতে পাকা ধানের শীষ। এক কোনায় ক্রিকেট খেলছিল কলেজপড়ুয়া কিছু তরুণ। তারপর সারি সারি কিছু গাছ। তখন ওখানে ছিল একটা গাছ। এখন ওটা নেই। এই গাছ থেকে পাকা ফলের মতো ঝরে পড়েছিল থোকা থোকা মৃত মানুষ। ওখানে বাজার। বাজারের পেছনে সরু একটা নদী। এই বাজারে নেমেছিল মানুষের ঢল। এখন ওখানে কলের একটানা আওয়াজ। ধান ভাঙার শব্দ। নদীতে নৌকার পর নৌকা লাগিয়ে বানানো হয়েছিল সেতু, মানুষ যাতে ওপারে পালাতে পারে। এখন ওখানে ইঞ্জিন দিয়ে ভট ভট করে চলে বালুর নৌকা।

চুকনগর গণহত্যার এই কাহিনির কিছুটা আমি রিটাকে বলেছিলাম বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িতে, বাকিটা কোবলেন্সার স্ট্রাসেতে। শুরু করলাম দুপুরের কিছু আগে, এক দফা চা খাওয়ার পর, অনেকটা এভাবে: খুলনা থেকে বাসে যশোরে যাওয়ার পথে রাস্তাটা যেখানে সাতক্ষীরা যাওয়ার সড়কের সঙ্গে মিশেছে, ওখানেই চুকনগর। দুই মাস আগে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তানি সেনারা যতই রাজধানী থেকে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আশপাশের গ্রাম ও শহর থেকে মানুষ ততই পালিয়ে আসছিল সীমান্তবর্তী এই গ্রামে। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে পালানো। রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না কিন্তু ছিল মানুষের ঢল, পায়ে হেঁটে পরিবার পরিজন নিয়ে ওরা ছুটছিল সীমান্তের দিকে। ওখানে ছিল একটা বিল। আর বিলের মাঝখানে উঁচু একটা মাঠ। একদিনেই ওই মাঠটা ভরে গেল মানুষে। হাজার হাজার মানুষ। বিলের ওপরে ভাসছিল নৌকার পর নৌকা। তার ভেতরেও মানুষ, এসেছিল ভদ্রা আর ঘাংরাই নদী দিয়ে। রিটা জানতে চাইল 'কেন।' আমি বললাম, মিলিটারিরা পানি ও নদী ভয় পেত। ওরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ। সাঁতার জানত না। মুক্তিযোদ্ধারা ওদের নদীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজত। নিতে পারলেই ডুবিয়ে মারত। আমি বললাম, 'ওরা যাতে মিলিটারির চোখে না পড়ে হয়ত সে জন্যও ওরা এসেছিল নদীপথে।'

আমার মনে আছে, এই কাহিনি বলার কয়েক দিন পর রিটাকে আমি অ্যালেন গ্রিন্সব্যার্গের 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' গানটাও লং প্লেয়ারে বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম। শুনতে শুনতে পুরোটা গান একসময় রিটার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িতে ওর ঘরের মেঝের ওপর বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আমি যখন বললাম চুকনগরের বিলে সেদিন ভাসছিল কয়েকশো নৌকা, ঠিক তখনই কয়েকটা ফোন এল রিটার। খুব বিরক্ত হলো ও, একসময় খুব রেগেও গেল, ফোনের তারটা খুলে রাখল; তারপর বাকি কাহিনিটা শুনতে বসল দুপুরের খাবারের পর। বারান্দা থেকে তখন আমরা আবার ওর ঘরের মেঝেতে। মনে আছে, সেদিন কোলনের এই বাড়িটার বাইরে কখনো খুব রোদ উঠছিল, আবার কখনো হচ্ছিল তুমুল বৃষ্টিও।

এই কাহিনির শেষ অংশ রিটা শুনেছে ৪৯ নম্বর কোবলেন্সার স্ট্রাসের বাড়িতে। টি-টেবিলের একপাশে ছিল ও, বেতের একটা চেয়ারে, ওর ডান দিকে আমি, বিছানায়।

রিটা ওর দুই হাতের দুই কনুই রাখত টেবিলের ওপর, ত্রিভুজের মতো, হাতের তালুতে থাকত ওর মুখ, ওভাবেই থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, যতক্ষণ আমি চুকনগরের কথা বলতাম, রিটা ওভাবেই বসে থাকত, কোথাও কোনো শব্দ হলে ওর কপালের চামড়া কুঁচকে উঠত, জানালা দিয়ে যখন কোনো গাড়ির আওয়াজ ঘরের ভেতর আসত, ও তখন খুব বিরক্ত হতো। কপাল কুঁচকে উঠত। উঠে

দাঁড়াত চেয়ার থেকে। বসত বিছানার কিনারে; আমার বাম পাশে। মনে আছে, সেদিন নিচে রাস্তার ওপারে ম্যাকডোনাল্ডস থেকে যখন একদল বাচ্চার হই হই শোনা গেল, তখন ও শাইসে কিড বলে জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

চুকনগরের কথা রিটাকে আমি অতটুকুই শুনিয়েছি, ইতিহাসের পাতা থেকে আমার যতটুকু মনে ছিল, ঠিক ততটুকু। আর কিছু বলেছি আমার স্মৃতি থেকে। যা কিছু মনে আসত, আমি লিখে রাখতাম ডায়েরিতে। রিটাকে আমি শুনিয়েছি আমার নিজের চোখে দেখা চুকনগরের কথা। আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম, তখন ওটা আর গ্রাম ছিল না। চুকনগর তখন একটা শহরের মতো, বাসা বাড়ি আর দোকানের ছাদে ডিশ বসানো, তখন কলেজের দালান উঠেছে, এখানে ওখানে ডেকোরেটরের দোকান, চালকলে সারাক্ষণ শোনা যায় জেনারেটরের আওয়াজ। আশপাশে গড়ে উঠেছে চিংড়ি চাষের হ্যাচারি।

রিটাকে আমি যে চুকনগরের কথা বলেছি, সেটা একাত্তরের চুকনগর ছিল না। সেখানে ছিল না গণহত্যার খুব বেশি স্মৃতিও। আমি যে সময়ে ওখানে যাই, তখন সেই রাস্তাঘাট, যেখান দিয়ে মানুষ পালাতে চেয়েছিল, সেসব চাপা পড়েছে নতুন ইট-বালু-সুরকি আর আলকাতরার নিচে, লাশে ভেসে যাওয়া খালবিল ভরাট হয়ে সেখানে ছোট ছোট দালান উঠছিল, ভদ্রা নদীতে তখন জলের সরু ও ক্ষীণ প্রবাহ।

এটুকুই ছিল আমার স্মৃতি। এর বেশি রিটাকে বলতে পারিনি। ও আরও শুনতে চাইত, জানতে চাইত পরমতলার কথা, দুধওয়ালা আর আমার মা রুখসানা বেগমের কাহিনি, কিন্তু এর বেশি কিছু আমার স্মৃতিতে ছিল না।

মানুষ তার স্মৃতিকে কতটা পেছনে ফেরাতে পারে ? আমি পারি বড়জোর পরমতলা পর্যন্ত পেছনে তাকাতে। আমার পক্ষে তার ওপারে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। ওখানেই ছিল আমার স্মৃতির সীমানা। পিওনিয়ার স্ট্রাসের ২১ নম্বর বাড়িতে বালুর পুকুর, সরু একটা গলির ভেতর কয়েকটা মুদির দোকান পার হয়ে ৩০০/এ নাখালপাড়া, যাত্রাবাড়ির মোড়ের কাছে শীলাদের বাড়িতে দেয়াল ছাড়িয়ে ছাদে ওঠে যাওয়া একটা পেয়ারাগাছ, পরমতলায় সবুজ ঘাসে ছাওয়া নিঃসঙ্গ একখানা কবর, ব্যস, এতটুকুই। স্মৃতির এই রেলগাড়িতে শেষ যে বগিটা, স্মৃতির মালায় সবশেষ যে ফুলটা গাঁথা, সেখানে শুধু বিন্দুর মতো একখানা মুখ, সেই মুখ আমার মায়ের।

রিটাকে আমি মায়ের কথাও বলেছি।

দোজখে বৃষ্টি

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, রিটার সঙ্গে তখন আমার খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না, ও কোলনের বাইরে গিয়েছিল, সম্ভবত ওদের গ্রামের বাড়িতে। একদিন খুব ভোরে, ছুটির দিন ছিল, তখনো রাস্তায় ছিল না খুব বেশি গাড়ির আওয়াজ, ম্যাকডোনাল্ডসের বাতিগুলো জ্বলছিল নিস্তেজ হয়ে, আর আমি ডুভের তলায় শুয়েছিলাম নিজেকে মুড়িয়ে, তখন টুংটাং করে বাজল ডোরবেল, জানালার পাতলা পর্দাটা সরিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে রিটা। ওর মাথায় একটা ফুলতোলা গোলাপি ছাতা, ছাতাটা একপাশে কাত করা। দেখে বোঝার উপায় নেই যে বৃষ্টি হচ্ছে ওখানে।

অনেকটা জোর করেই আমাকে নিয়ে বের হলো রিটা, ঢুকল ম্যাকডোনাল্ডসে, আমি নিলাম একটা ক্রোসো আর এক কাপ কাপোচিনো। রিটা খেল কফি, তার আগে কয়েকটা ফিশ ফিংগার, তারপর সোয়া সাতটার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম হাউপ্ট বানহফে, তখনো শীত পড়েনি; কিন্তু টানা বৃষ্টিতে গাড়ির ভেতরও ঠান্ডা লাগছিল, ফ্রন্ট মিররে দেখলাম, আমার দিকে তাকিয়ে আছে রিটা; ওর চোখগুলো শীতল, ভেজা ভেজা, খোসা ছাড়ানো লিচুর মতো। রিটা বলল, ও আমাকে নিয়ে বার্লিনে যাবে, আমি জানতে চাইলাম, কেন ? ও জানালা দিয়ে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কোলন থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেন ছিল, আমরা ধরলাম আটটার ট্রেন, বসলাম দোতলায়, আমি জানালার পাশে, রিটা বসল মুখোমুখি। পুরো বগিটাই খালি ছিল, শুধু কয়েকটা সিট পরে একজন ব্যবসায়ী মতো লোক মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে গলগল করে কথা বলছিল, বলছিল গেনাও গেনাও আর হাসতে হাসতে জানালার কাচের ওপর লুটিয়ে পড়ছিল রিটা।

কাচের ওপাশে ছিল বৃষ্টির ছাঁট। সেই বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ছুটছিল সকালের ট্রেন। ফিসফিস করা বৃষ্টি। এত নীরবে ও নিঃশব্দে বৃষ্টি হতে পারে, জানতাম না আমি। বৃষ্টির কণাগুলো ঘুরে ঘুরে উড়ছিল বাতাসে, তার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ছিল

অস্পষ্ট ব্রিজ, চার কোনা হলুদ, সবুজ ও খয়েরি মাঠ, কোথাও উইন্ডমিল, কোনো একটা শহরে তৈরি হচ্ছিল স্টেডিয়াম, সেখানে পুকুরের মতো বড় বড় গর্ত, চারপাশে কালো কালো মাটির স্তূপ, হয়ত সিমেন্টের অথবা হয়ত বালির। কোথাও বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল আকাশচুম্বী উঁচু উঁচু ক্রেন।

বৃষ্টির ছাঁট লেগে ট্রেনের জানালা কখনো ছিল ঘষা কাচের মতো, ওপাশের কিছুই দৃশ্যমান ছিল না, ট্রেনটা যখন জোরে ছুটত, তখন বাতাসের তোড়ে জানালাটা হয়ে উঠত পরিষ্কার, তখন বাইরে অনেক কিছু চোখে পড়ত, আর ট্রেনটা যখন কোনো স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত, বৃষ্টির ফোঁটায় আবার ঝাপসা হয়ে উঠত কাচ, একটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ত আরেকটার ওপর, পেট মোটা ফোঁটাটা তখন খসে পড়ত ধূমকেতুর মতো। কখনো কখনো মনে হতো ওটা শুক্রাণু, ডিম্বাণুর খোঁজে সাঁতার কাটছে।

এপাশের কাচ হাতের তালু দিয়ে পরিষ্কার করতাম আমি, জানালার কাছে মুখ নিয়ে দেখার চেষ্টা করতাম, কিন্তু ভেতরের কামরাটাই দেখা যেত শুধু।

আমরা যখন বার্লিনে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন দুপুর। আমি তখনো জানিনা, আমরা কোথায় চলেছি, কার কাছে যাচ্ছি। ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। গাড়িতে প্রশ্নের জবাব না পেয়ে আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। ট্রেনটা যখন হানোফার শহর পার হচ্ছিল, রিটা আমাকে বলছিল হামলেনের বাঁশিওয়ালার কথা, ও বলল, আমি নাকি ওরকম একটা শিশু, আমাকে ও নিয়ে যাচ্ছে অচেনা একটা পাহাড়ের গুহায়। আমি তখন সাহস করলাম, জানতে চাইলাম, ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। জবাবে ও শুধু বলেছিল, কথাটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, 'চুকনগর।'

রিটা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল জাকসেন হাউজেন বন্দিশিবিরে। তখনো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ছিল শহরের আকাশে, জোর বৃষ্টি না, কিন্তু বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতে আমরা হেঁটে বেড়ালাম শিবিরের এখানে-ওখানে। কখনো কোনো একটা ঘরে, কখনো খোলা ময়দানে, আবার কখনো একটা গর্তের ভেতর। কখনো হাঁটতে হাঁটতে আবার কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিটা জাকসেন হাউজেনের ইতিহাস বলছিল আমাকে। এখানে দুই লাখের মতো বন্দী ছিল একসময়, মারা গেছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। প্রাইমারি স্কুলের মতো লম্বা একচালা দুটো ঘর ছিল তখনো, এখানেই বন্দিদের রাখা হতো। গার্ড টাওয়ার পেরিয়ে আমরা গেলাম প্যারেড গ্রাউন্ডে, পানিশমেন্ট সেল, তারপর ক্যাম্প হাসপাতাল, প্যাথলজি ল্যাবরেটরি তারপর স্টাৎসিওন জেড এ।

আমি জানতে চাইলাম, ‘এই ঘরটার নাম কেন শেষ বর্ণমালা দিয়ে রাখা হয়েছিল।’

‘জেড হলো শেষ অক্ষর’, রিটা বলল। ‘কারণ এটাই ছিল জীবনের শেষ স্টেশন। এটা ক্রেমাটোরিয়াম, লাশগুলো এই ঘরে পোড়ানো হতো।’

ওখানে কাচের একটা ঘরের ভেতর রাখা ছিল বন্দিদের হাতে আঁকা কিছু ছবি, কোনো ছবিতে একটা ঘর। কোথাও একটা পরিবারের ছবি। একটা ছবি ছিল এরকম : কালো রঙের একটা ফায়ার প্লেস, তার ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে কয়লার আগুন, সেই আগুনে পুড়ছে কয়েকটা কবুতরের ডানা।

একটু ভেতরের দিকে কোনো একটা ঘরে ছিল শুধু চুল আর চুল, রিটা বলল, এই চুল দিয়ে ঝুড়ি বানানো হতো, নিজের চুল দিয়ে মাথার টুপি বানাত বন্দিরা। তারপর ওসব বাজারে বিক্রি করা হতো। আরেকটা ঘরে কাচের একটা বাক্সের ভেতর ছিল সোনার কিছু দাঁত, মাড়ি থেকে কেটে নেওয়া, ছিল বন্দিদের পোশাক, তার গায়ে নানা রকমের চিহ্ন দেওয়া, একটা লাল রঙের ত্রিভুজ, ওরা কমিউনিস্ট, সমকামীদের ত্রিভুজ গোলাপি রঙের। একটা জামার কথা আমার এখনো মনে আছে। নীল স্ট্রাইপের সাদা একটা পাজামা, ওপরের দুটো বোতাম কালো, মাঝখানের বোতামটা ছিল খয়েরি, বুকের ডান দিকে একটা নম্বর লাগানো, ৬৪২০৫।

লম্বা হলের মতো একটা ঘরে ছিল সারি সারি বাংক বেড, সবগুলো তিনতলা।

জাকসেন হাউজেনে সেদিন খুব বেশি দর্শনার্থী ছিল না। আমাদের ছাড়া ছিল কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর একটা দল। যেখানেই যেত, ওরা সব সময় জটলা করে দাঁড়াত, ওরা থাকত গোল হয়ে, মাঝখানে থাকত একজন গাইড। বৃত্তের কেন্দ্রের মতো। বৃষ্টির ঝড়ো ছাঁটও এই বিন্দুকে ঘিরে তৈরি হওয়া ব্যাসকে কখনো ভাঙতে পারত না। ছিল থুত্থুড়ে একজন বুড়ো, ক্ষয়িষ্ণু পুরনো দালানের মতো, খসে পড়ছিল ওর গায়ের পলেস্তরা, কুঁজো হতে হতে লোকটাকে মনে হচ্ছিল প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। ওর হাতে ছিল একখানা ছড়ি, হয়ত সে নিজেও একসময় ছিল এই বন্দিশিবিরে, কে জানে !

আমার গাইড ছিল রিটা। যেন সবকিছু ওর মুখস্থ ছিল। আমি কিছু জানতে না চাইলেও ও নিজেই আগ বাড়িয়ে কথা বলছিল। ওর চোখেমুখে বিরক্তির একটা ভাব ছিল, কেন আমি খুঁটিনাটি জানতে চাইছি না। ও বলল, নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর অলিম্পিকের সময় দাস শ্রমিকদের দিয়ে এই জায়গাটা তৈরি করা হয়েছিল। যুদ্ধের সময় এটা পরিণত হয় বন্দিশিবিরে। যুদ্ধের শেষের দিকে

সোভিয়েত সেনারা এখান থেকে বন্দিদের মুক্ত করেছিল আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই শিবিরেই আটকে রাখা হয়েছিল নাৎসিদের।

রিটা আমাকে বিশাল একটা মাঠের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, এখানে রোল কল করা হতো। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছিল। তারপর একটা কিনারে নিয়ে গেল আমাকে। বলল, এখানে ছিল ওয়াচ টাওয়ার। তখন জোরে বাতাস বইছিল। তারপর একটা ঘরের ভেতর নিয়ে জানাল, ওটা ছিল লাশঘর, পোড়ানোর আগে ওখানে লাশ বাছাই করে আলাদা করা হতো, বুড়ো অথবা শিশু ও নারীদের লাশ। ততক্ষণে অলস বৃষ্টি ও দমকা বাতাস দুটোই থেমে গিয়েছিল। শিবিরে ঢোকার যে মুখ, তার ওপারে ছিল সবুজ একটা ঘর। রিটা বলল, ওটা ছিল এসএস বাহিনীর ব্যারাক। তখন মেঘ সরলো আকাশে, একটু রোদের মতো উঠল। তারপর আমরা যখন একটা গর্তের ভেতর নামলাম, রিটা জানাল, ওটা ছিল মৃত্যুকূপ, গুলি করে বা দড়িতে ঝুলিয়ে ওখানে পাইকারি হারে হত্যা করা হতো, তখন মেঘে মেঘে আবার কালো হয়ে উঠল বার্লিনের আকাশ।

তারপর রিটা আমাকে নিয়ে গেল গ্যাস চেম্বারে। ও বলল, ওরা যখন গুলি করে আর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কুলাতে পারছিল না, তখনই এটা তৈরি করা হয়। দরজার কাছে যেখানে ভেন্টিলেটর, তার পাশেই ছোট্ট একটা কাচের শিশিতে রাখা হতো সিলন বি গ্যাস। তারপর দরজা বন্ধ করা হতো, একটা লাঠি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হতো ওই শিশি, মুহূর্তেই বন্দিরা লুটিয়ে পড়ত মাটিতে।

ততক্ষণে আবার শুরু হয়েছে তুমুল বৃষ্টি। তার সঙ্গে ছিল ঝড়ো হাওয়াও। আকাশের সেদিন কী হয়েছিল, জানি না। কোলনে, বার্লিনে সবখানে, সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা সব সময় ছিল শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সন্ধ্যার বৃষ্টিটা ছিল পরমতলায় বর্ষণের মতো, যেন আকাশ ভেঙে পড়ল জাকসেন হাউজেনের মাথায়। হঠাৎই অন্ধকার হয়ে এল চারপাশে। শিক্ষার্থীদের দলটিও ছিল না তখন, ছিল না প্রশ্নবোধক চিহ্নটাও। কোথাও কেউ ছিল না। ছিলাম শুধু আমি আর রিটা। ছিল রিটার হাতের বন্ধ গোলাপি ছাতা। আর কিছু সোনালি দাঁত। কিছু চুল। একটা পাজামা।

আমাকে নিয়ে ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল রিটা। ওর বাঁ হাত আমার কোমরে পেঁচানো। ছাতাটা ডান হাতে। সামান্য ভিজে গিয়েছিল আমাদের শরীর। ঠান্ডাও লাগছিল বেশ। শীতে যখন কাঁপছিলাম, কোমরের ওখানে টের পাচ্ছিলাম রিটার হাতের উষ্ণতা। শেকলের মতো পেঁচানো। ওর কয়েকটা ভেজা চুল লেপ্টে ছিল কানের এপাশে-ওপাশে, কয়েকটা গালের ওপর।

ঘরটার চারপাশের দেয়ালে টাইলস বসানো। মাঝখানে একজন মানুষের চেয়ে সামান্য বড় একটা টেবিল, সাদা মার্বেল দিয়ে বানানো, তার মাঝখানে ছিল

ইঁদুরের বাসার মতো ছোট্ট একটা গর্ত। রিটা বলল, ওখানে জীবিত মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা চালানো হতো। অবশ না করেই বের করা হতো ফুসফুস হৃৎপিণ্ড। একবার নাকি দুটো শিশুকে সেলাই করে জোড়াশিশু বানানোরও চেষ্টা করা হয়েছিল। রিটা বলল, 'এটা কোনো ডাক্তারের চেম্বার ছিল না আসলে, ওটা ছিল একটা কসাইখানা।'

টেবিলটার ডান দিকে, যে পাশে ছোট্ট একটা জানালা, তার এক কোনায় দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রিটা। আমি ছিলাম এ পাশে। রিটা বলল, 'এই চেম্বার যে চালাত, আরিবের্ট হাইম, সে পরিচিত ছিল ড. ডেথ হিসেবে, যুদ্ধের পর তার বিচার শুরু হয়েছিল। শেষ হওয়ার আগেই ও পালিয়ে যায়। কেউ জানে না, এখন ও কোথায় আছে, কী করছে।'

ঝড় শুরু হলো কসাইখানার বাইরে। জানালার ও পাশে ছিল শো শো আওয়াজ। দু-একবার বজ্রপাতের মতো হলো, বিদ্যুৎ চমকালো আকাশে, সেই আলোয় চিকচিক করছিল রিটার ভেজা চুল। ওর হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা, ইংরেজি এক্স অক্ষরের মতো, ডান পা মেঝেতে আর বাম পা হাঁটু ভাঁজ করে দেয়ালে। এই ঝড় ছিল পরমতলার তুফানের মতো। এরকম বাতাস পরমতলা ছাড়া আমি আর কোথাও দেখিনি। শিবিরের প্রাচীরের বাইরে, একসময় যেখানে এসএস সেনাদের ব্যারাক ছিল, তার পেছনে পাইন গাছগুলোর মাথা দুলছিল এ পাশে-ওপাশে, পরতমলায় ঝড়ের রাতে মায়ের কবরের ওপরে যেভাবে নুয়ে পড়ত শিমুলের মাথা।

একসময় ঘণ্টা বেজে উঠল জাকসেন হাউজেনে, যেরকম ছুটির ঘণ্টা বাজত যুদ্ধের সময়, রোল কল শেষ হলে মানুষগুলো হয়ত ফিরত বাংক বেডে অথবা কারখানায় কিংবা গ্যাস চেম্বারে। ছাত্রছাত্রীদের দলটি আরও আগেই চলে গিয়েছিল। ছিল না বুড়োটাও, শেষ অবদি ওখানে ছিলাম শুধু আমরা দুজন। ততক্ষণে জ্বলে উঠেছিল শিবিরের সবগুলো বাতি, দু-একজন লোক এল, কিছু একটা বলল লাউড স্পিকারে, তারপর আমাদের পেছনে বন্ধ হলো শিবিরের দরজা।

আমরা রওনা দিলাম রেলস্টেশনের দিকে। ঝড়ের চিহ্ন ছিল আশপাশে। চারপাশ থমথমে, রাস্তাগুলো মোটামুটি খালি, পুলিশের দু-একটা গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটছিল এ দিকে-ও দিকে, ছিল অ্যাম্বুলেন্সও।

ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে শুনলাম, ঝড়ের আরও কিছু খবর। ঝড় হয়েছে প্রায় সবকটা শহরেই, হয়েছে আশপাশের কয়েকটা দেশেও। ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে অনেকগুলো গাড়ি। চার কি পাঁচ জনের মৃত্যুর কথাও বলল খবরে। ডর্টমুন্ডে গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে আছে আওটোবান। হামবুর্গ

ড্রেসডেন ফ্রাংকফুর্ট জারব্রুকেন সবখান থেকে আসছিল ক্ষয়ক্ষতির খবর। স্টুটগার্টে নাকি বিদ্যুতের বেশকিছু পাইলন মাটিতে মিশেছে। কোথাও কোথাও ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে। কোন একটা শহরে যেন বলা হলো স্কুল বন্ধ রাখার কথাও।

রিটা বসেছিল চুপচাপ। ওর চোখেমুখে কোনো ভাবান্তর ছিল না। কিছুক্ষণ পর পর মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল কোথায় ট্রেন চলছে আর কোথায় চলছে না। আমাদের ট্রেন আসবে কি না, তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। রিটার ভাব ছিল এলে আসবে, না এলে নাই।

রাত একটার দিকে এল কোলনের ট্রেন। হুড়মুড় করে উঠল মানুষ। ফিরতি ট্রেনটা ছিল একতলা; কিন্তু জানালার পাশে কোনো জায়গা হলো না। একটা দম্পতি ছিল আমাদের পাশে।

হাঁসের মতো ওরা মুখের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে সারাক্ষণই আদর করছিল। কয়েক স্টেশন পরে ওরা নেমে গেলে আমরা সরে বসলাম জানালার কাছে। বাইরে ছিল তুমুল অন্ধকার, তার ভেতর জোনাক পোকার মতো কিলবিল করছিল বিন্দু বিন্দু আলো। ভেতরে একটা মেয়ে সিটে পা তুলে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছিল, একজন খেলছিল সুডোকো, পঞ্চাশোর্ধ্ব এক মহিলা মুখে মাখছিল প্রসাধন, প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে চুল আঁচড়াল, তারপর চোখের পাতায় ও গালে রং ব্রাশ করল। বগির একেবারে পেছন থেকে শোনা গেল দু-একজনের আলাপ। ওদের বাড়ির পেছনের বাগানে প্লুম গাছের মাথায় বাসা বাঁধতে এসেছিল অচেনা এক পাখি। ওদের ভয় হচ্ছিল ঝড়ে হয়ত ভেঙে গেছে পাখির ওই বাসাটাও।

একসময় জাকসেন হাউজেনের কথা তুললাম আমি। বললাম, 'দেখো রিটা, বন্দী মানুষগুলো নেই ওখানে, নেই হত্যাকারীরাও, কিন্তু তার পরও সব আছে, আছে সেই ঘর, সেই ক্যাম্প, সেই মাঠ, ইতিহাস স্থবির হয়ে আছে ওখানে, কিন্তু দেখো রিটা, এখন আর কিছু নাই চুকনগরে। যুদ্ধের পর মাত্র কয়েকটা বছর পার হয়েছে, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই সেখানে, কোনো চিহ্ন নেই, নেই কোনো স্মৃতিও, ওখানে যদি কেউ যায়, কেউ বলতে পারবে না, একসময় ওখানে কী হয়েছিল।'

'কারও কি বিচার হয়েছিল, সেলিম ?' জানতে চাইল রিটা।

'না না, রিটা। কার বিচার ? বিচার করবেটা কে ?' বললাম আমি, 'জাকসেন হাউজেনে তো তা-ও ড. ডেথের বিচার অন্তত শুরু হয়েছিল। চুকনগরে সেটাও হয়নি, রিটা। হয়নি পরমতলায়ও।'

'তোমরা ওদের বিচার করলে না কেন ?' এটা কোনো প্রশ্ন ছিল না, ছিল রিটার অভিযোগ।

তখন রাতের শেষ। ভোর হয় হয়। অন্ধকারের ভেতর থেকে চারাগাছের মতো উঁকি মারছিল সকালের কচি কচি আলো। ছাইরঙা হয়ে ছিল কুয়াশায়

মোড়ানো চারপাশ। মাথার ওপরে একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছিল ভোরের হালকা নীল আকাশ। আমাদের নিয়ে ট্রেনটা তখন ছুটছিল রাইনের তীর ধরে। নদীর ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছিল একদল গাংচিল। তীরে বাঁধা ছোট ছোট ইয়াস্ট, সাজানো-গোছানো ফেরি, ক্যালেন্ডারের পাতার মতো সাজানো, কোথাও ঝড়ের কোনো চিহ্ন ছিল না।

আমি তখন রিটাকে আবৃত্তি করে শোনালাম শামসুর রাহমানের একটা কবিতা, কবিতাটা আমার মুখস্থ ছিল, নাখালপাড়ায় বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে শৈশব থেকেই আমি আবৃত্তি করতাম এই কবিতা :

'...আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিল সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা পুঁতেছিল আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,
যারা গণহত্যা করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক
পশু, সেসব পশুদের।'

ছুটছিল ট্রেন। একপাশে পড়ল সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাইন রাইন আর রাইন, তার ওপাশে উঁচু উঁচু পাহাড়ের ঢালে আঙুরের বাগান। ওলকপির ক্ষেত। রিটা আবার বলা ধরল জাকসেন হাউজেনের কথা, কিছুটা টেরনোপলের কাহিনি, আর পারছিলাম না আমি, আমার দুচোখে বরফের মতো জমাট হয়েছিল দুই রাতের ঘুম, রিটার মুখে ছিল ক্লান্তির পাহাড়। শরীরটাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখতে পারছিলাম না কিছুতে। ভাবছিলাম ফিতে ছেঁড়া স্যান্ডেলের মতো এই দেহটাকে এখন টানতে টানতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে হবে কোবলেন্সার অথবা বাল্টহাসার স্ট্রাসে।

ট্রেনটা যখন হুড়মুড় করে কেচোর মতো বানহফের ভেতর ঢুকল, তারপর খুব চিকন একটা ব্রেক কষার শব্দ হলো, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের হই হল্লা শোনা গেল, লাউড স্পিকারে স্টেশন মাস্টার ঘোষণা করল পরের যাত্রার কথা, মানুষগুলো এদিকে-ওদিকে দৌড়াতে শুরু করল, মাথার ওপর চোখে পড়ল কাঠের বড় গোল ঘড়িটা, রিটা ঠিক তখনই পাড়ল সোফিয়ার কথা।

সোফিয়া নোভাক।

সে এক আশ্চর্য নারীর আশ্চর্য কাহিনি।

সোফিয়ার হাতে

সীমান্ত পার হয়ে আডলফ হিটলার যখন পোল্যান্ড আক্রমণ করে সোফিয়া নোভাকের বয়স তখন সতেরো। ওর জন্ম পোল্যান্ডের পশ্চিমে, কসওয়াভা গোরা শহরে, জার্মান সীমান্তের কাছে। যুদ্ধের শুরুতে ও ছিল র‍্যাডম শহরের এক হাসপাতালে নার্সিঙের ছাত্রী। খুব ভোরে ও হাসপাতালে যেত। অসুস্থ মানুষকে ওষুধের পাশাপাশি মায়া ও মমতা দিয়ে কীভাবে সারিয়ে তোলা যায়, সেটা শিখত হাতে-কলমে, ডরমিটরিতে ওর ঘরে ফিরত সন্ধ্যায় আর স্বপ্ন দেখত কবে ও সত্যিকারের সেবিকা হতে পারবে। তারপর গিয়ে দাঁড়াবে বিছানায় লেপ্টে থাকা মৃতপ্রায় রোগীদের মাথার পাশে। ভাবত হাসপাতালে মানুষগুলোর কপালের ওপর ও যখন হাত রাখবে, ওর ছোঁয়ায় রোগীরা বিছানা থেকে উঠে বসবে, প্রথমে বিছানায় পা ঝুলিয়ে তারপর নেমে আসবে মেঝেতে, তারপর নিজেরাই হেঁটে হেঁটে সোজা চলে যাবে হাসপাতালের বাগানে।

সোফিয়া কখনো ভাবতে পারেনি যে এই হাসপাতালের ওপর এভাবে বোমা পড়বে কখনো। বিছানার ওপর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়বে ওয়ার্ডের ছাদগুলো, পরিচালকের অফিসের সামনের বাগানটা এভাবে মাটিতে মিশে যাবে। ও কখনো ভাবতে পারেনি যে ওর দেশে, যা কিনা কোপার্নিকাস আর শোপেরও দেশ, সেখানে বেটোফেন আর আইনস্টাইনের পিতৃভূমি এভাবে হামলা চালাতে পারে।

আক্রমণ শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখে। ওটা ছিল ব্লিৎসক্রিগ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শহরের সবকিছু গুড়িয়ে দেয় বোমারুরা। বাড়িঘর, জমির ফসল, স্কুল, গাছপালাসহ সবকিছু মিশে যায় মাটিতে। শহরের অলিতে-গলিতে, রাস্তাঘাটে, বাজারে অফিসে সবখানে শুধু লাশ আর লাশ। স্কুলের ময়দানে সারি সারি পড়েছিল ইউনিফর্ম পরিহিত শিশুরা, ওদের কারও হাতে বই, কারও মুঠোর ভেতর ইরেজার, বাজারে শাকসবজির নিচে ছিল মৃত মানুষের স্তূপ, অফিসে ছিল লাশের ওপর ফাইল আর রাস্তায় কোনো গাড়ি ছিল না। এখানে-সেখানে জেব্রা ক্রসিংয়ে ফুটপাতে এলোপাতাড়ি পড়েছিল মানুষের হাত-পা অথবা ছিন্ন কোনো

মাথা। মৃত্যুর ছোবল থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তারাও ছিল আহত। মুহূর্তের মধ্যেই উপচে পড়ল হাসপাতাল; মেঝেতে, চেয়ারে আর সিঁড়িতে মানুষের গোঙানি আর রক্তের স্রোত। একসময় পুরো শহরটাই পরিণত হলো হাসপাতালে।

কয়েকটা দিন কাটল ওভাবে।

সোফিয়া যেখানে ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করত, সেখানে নিয়ে আসা হতো যুদ্ধাহত পোলিশ সেনাদেরও। আহত সৈনিকদের কাছ থেকে ও জানতে পারল যে ওর দেশ নাৎসি জার্মানির হাতে আক্রান্ত হয়েছে। সোফিয়া তখনই হিটলারকে বার্লিন পর্যন্ত তাড়া করতে রণাঙ্গনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একদিন সকালে যোদ্ধাদের সঙ্গে ট্রাকে করে পূর্ব দিকে পালাতে শুরু করে। পোলিশ সেনারা চেয়েছিল ভিসওয়া নদী পার হয়ে ওরা সেতু ধ্বংস করে দেবে, যাতে ভেরমাখ্ট ওদের পিছু নিতে না পারে। ওরা ভেবেছিল, নদী পার হয়ে গেলেই ওরা বেঁচে যাবে। মা ভিসওয়ায় হিটলার ডুবে মরবে অথবা ভিসওয়া ফুলেফেঁপে শত্রুদের গিলে খাবে।

সেরকম কিছুই হলো না। জার্মানরা পন্টুন এনে ওদের পিছু নিল। হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হলো পানসার, পিঁপড়ার সারির মতো। আর সোফিয়াকে নিয়ে সেনাদের ট্রাক ছুটল কভনো শহরের দিকে, সোভিয়েত সীমান্তের কাছে। সেখানেই সোফিয়া জানতে পারল যে জার্মান ও সোভিয়েতরা তার দেশকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে রুটি ভাগাভাগির মতো। ও জানল, পোল্যান্ড বলে আর কোনো দেশ নেই। তারপর ওরা পালিয়ে গেল গহিন একটা অরণ্যের ভেতর।

ও যত দিন সেখানে ছিল, কোনো সেনা নিজের মুখের ভেতর গুলি করে, কোনো সেনা গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করল।

ইতিমধ্যে হিটলার ঘোষণা করল পোল্যান্ড বলে আর কোনো দেশ নেই পৃথিবীতে আর দেশটা মুহূর্তে নাই হয়ে গেল।

এই যুদ্ধের কিছুই বুঝতে পারছিল না সোফিয়া। অবাক হয়ে ও ভাবত তার দেশ হঠাৎ উধাও হয়ে গেল কীভাবে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা সেই পুরনো মাটি, এই মাটি আগেও ছিল এখানে, চারদিকে সোনালি গমের যে ঢেউ, সেটা সে আগেও দেখেছে, আর মাথার ওপরের নীল আকাশও তার বহু চেনা। তাহলে কোথায় হারিয়ে গেল তার দেশ। দেশ কি কখনো পারে সাবানের বুদবুদের মতো হাওয়ায় মেলাতে অথবা কোথাও পালাতে !

গভীর জঙ্গলে কয়েক দিন কাটিয়ে একসময় তারা যাত্রা শুরু করে দক্ষিণের লোভভ শহরের দিকে। পথে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তারা ভোদকার বিনিময়ে পেল আলু, তামাকের পরিবর্তে সসেজ আর ডিম পেল চিনির বদলে।

ফল চলে গিয়ে এল শীত। দুর্গম আর গহিন অরণ্যের ভেতর দিয়ে ছুটল সোফিয়াদের ট্রাক। অসুস্থ হয়ে পড়ল অনেকে। ১৯৪০ চলে এল কিন্তু ওরা পৌঁছাতে পারল না লোভভ শহরে। পথে রুশ পেট্রোল সেনাদের হাতে ধরা পড়ল সোফিয়া। ওরা তাকে মারল না, নিয়েও গেল না কোথাও। সেনারা পালা করে সোফিয়াকে ধর্ষণ করল এবং তুষারের মধ্যে ফেলে গেল ওর বিধ্বস্ত শরীর। সোফিয়া সেখানে পরে রইল শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায়।

মৃত্যু এল না কিন্তু এল রুশ শত্রুসেনাদের আরও একটি দল। ওকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল হাসপাতালে, বন্দী হিসেবে। সোফিয়া ওদের বলল, র‍্যাডম শহরের হাসপাতালে ও কাজ করত সেবিকা হিসেবে। তার কয়েক দিন পর সোফিয়া সেখানে নার্স হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। হাসপাতালের সব দরজায় রুশ চিহ্ন লাগানো ছিল এবং কোথাও কোথাও ছিল জোসেফ স্টালিনের ছবি। কাজ করতে করতেই রুশ ভাষা শিখতে লাগল সোফিয়া। প্রথমে শিখল হাসপাতালের কিছু শব্দ; যেমন ডাক্তার, বেড, থার্মোমিটার, প্রেসার, ওয়ার্ড এবং রক্ত। তারপর শিখল 'প্লেট নিয়ে আসি', 'ফর্কটা এখানে' আর 'চুলায় ঠিকমত আগুন আসছে না' ধরনের কিছু কথা। শুরুতে শিখেছিল কিছু শব্দ। পরে শিখল দু-একটা শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে বাক্য বানানো। বাক্য ঠিক না, কাউকে কিছু একটা বোঝানো, সোফিয়ার দৌড় ছিল এতটুকুই। হাসপাতালে আরও যেসব নার্স ছিল, তারা তাকে মস্কোর খবরের কাগজ পড়ে শোনাত, যেখানে শুধু থাকত পোলিশ সেনাদের পরাজয় আর সমাজতন্ত্রের বিজয়ের কথা।

সোফিয়ার মায়াময় সেবা আর দ্রুত ভাষা শেখা প্রশংসিত হতে লাগল হাসপাতালে। ওর কথা ছড়িয়ে পড়ল হাসপাতালের অফিসার, ওয়ার্ড বয়, অসুস্থ রোগী, এমনকি আহত রুশ সেনাদের মুখে মুখে। আর তখনই জানতে পারল ও আছে লোভভ শহর থেকে একশো কিলোমিটার দূরে টেরনোপলে।

সেখানে কয়েক মাস কেটে গেল সোফিয়ার। একসময় হাসপাতালের পুরনো ডাক্তাররা বদলি হলো। মস্কো থেকে এল নতুন প্রশাসক। ততদিনে কমিউনিস্ট প্রচারণা আরও তীব্র হলো। সবাইকে একটা হলঘরে হাজিরা দিয়ে প্রতিদিন শুনত হতো রেড আর্মির জয়-জয়কারের কাহিনি।

একদিন রাতে টানা চব্বিশ ঘণ্টা কাজের শেষে সোফিয়া যখন ঘুমিয়ে ছিল, হাসপাতালের নতুন প্রধান ওর ঘরে ঢুকে ওকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করল। পাল্টা আঘাত করল সোফিয়া এবং পালাল হাসপাতালের এক ডাক্তারের সহায়তায়। সে সোফিয়াকে পাঠাল সেভটলানা নামের একটা গ্রামে, তারই এক বান্ধবীর কাছে, পুরনো নাম গোপন করে নতুন এক পরিচয়ে।

ওকে পাঠানো হলো সেসিলিয়ার কাছে, সেসিলিয়া ছিল একজন ডাক্তার, থাকত সেভটলানায়, ও গ্রামের মানুষদের চিকিৎসা করত।

সেসিলিয়ার একজন কাজিন হিসেবে সোফিয়া গ্রামের একটা ক্লিনিকে কাজ করত। চিকিৎসার সময় সে সেসিলিয়াকে বাড়িয়ে দিত সাহায্যের হাত। পুরুষেরা মাতাল হয়ে আহত হতো। সোফিয়া তাদের গায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিত। নারীরা গর্ভধারণ করত। সোফিয়া তাদের পেটের ভেতর থেকে ফুটফুটে বাচ্চা বের করে আনত। ও স্কুলে গিয়ে শিশুদের টিকা দিত। বুড়োদের দাঁত ফেলত। এর বিনিময়ে ওরা পেত মুরগি, দুধ, রসুন ও শসার আচার, রুটি অথবা মৌচাকের মধু। একসময় গ্রামের সবাই সোফিয়ার পরিচিত হয়ে গেল। ওরা তাকে খুব সম্মানও করত। কারও বাড়িতে গেলে তাদের একমাত্র চেয়ারটা সোফিয়ার দিকে এগিয়ে দিত অথবা ওকে জড়িয়ে ধরত।

এর মধ্যে সোফিয়া জানতে পারল টেরনোপল হাসপাতালের প্রধান মস্কোর কাছে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে। বলেছে হাসপাতালে সোফিয়া ছিল পোলিশদের চর। রুশ বাহিনীর গোপন তথ্য নিয়ে ও হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে।

বছর খানেক পর সেভটলানা গ্রামে খবর এল, যুদ্ধের কারণে যেসব পোলিশ তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, রুশ এবং জার্মানরা তাদের পুনর্মিলনের সুযোগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে জন্য তাদের টেরনোপল যেতে হবে। ওখান থেকে নিতে হবে ট্রানজিট পাস। সেভটলানায় একদিন ভোর হলো এবং সেই ভোরে সেসেলিয়াকে বিদায় জানিয়ে ট্রেনে যাত্রা করল সোফিয়া নোভাক।

টেরনোপলে দুদিন অপেক্ষার পর ট্রানজিট পাস পেল সোফিয়া কিন্তু রুশ পেট্রোল সেনাদের হাতে সে আবারও গ্রেপ্তার হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো গুপ্তচরবৃত্তির। ওকে কমিসারিয়েটে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো কয়েক দিন। সে আসলে কে, কী তার পরিচয়, কোথা থেকে এসেছে, কেন সে হাসপাতালে গিয়েছিল এবং এত দিন কোথায় থেকেছে...একদিন সুযোগ পেয়ে সেখান থেকেও পালাল সোফিয়া এবং উঠে গেল এমন একটা ট্রেনে, যেটা যাচ্ছিল তার গ্রামের বাড়ি কসওয়াভা গোরার দিকে। ট্রেনটা যখন সোভিয়েত-নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে জার্মান নিয়ন্ত্রিত পোল্যান্ডে প্রবেশ করে, তখন যাত্রীদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো মেডিকেল চেক আপের জন্য। জার্মান সেনাদের একজন চিৎকার করে বলল যে ওরা সোভিয়েত রোগ বালাই এখানে ঢুকতে দেবে না। তারপর সেখানে গুজব ছড়াতে লাগল। প্রথমে ধীরে। পরে দ্রুত। যেসব পুরুষকে মহিলাদের থেকে আলাদা করা হয়েছে, তাদের লিঙ্গ দেখা হচ্ছে। বাছাই করা

হচ্ছে কার খতনা করা হয়েছে, কার করা হয়নি। যাদের খতনা করা, তাদের আলাদা করা হলো। তারপর ওদের নিয়ে যাওয়া হলো অন্য কোনখানে।

প্রত্যেক দিন সকালে ক্যাম্পের মাঠে জড়ো করা হতো সোফিয়াদের। ওরা লাইনে দাঁড়াত। লাউড স্পিকারে বলা হতো থার্ড রাইশের শত্রুদের খতম করার কথা। লাইনটা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। আর বন্দিদের সবাইকে লাগিয়ে দেওয়া হলো ক্যাম্পের কাজে।

সোফিয়া নিজেকে জার্মান পরিচয় দিয়ে বেঁচে গেল আবারও। স্কুলে যেটুকু জার্মান শিখেছিল, এবার সেই ভাষাটা সাহায্য করল ওকে। সোফিয়াকে উঠিয়ে দেওয়া হলো একটা ঘোড়ার গাড়িতে। ডাংকে শ্যোন বলে সোফিয়া বেরিয়ে পড়ল সেই ক্যাম্প থেকে। এবং ফিরে গেল র‍্যাডম শহরে। ততদিনে আমূল বদলে গেছে র‍্যাডম। বাড়িঘর, দোকানপাট কিছুই চেনা যায় না। রাস্তাঘাটগুলোর নামকরণ করা হয়েছে জার্মান নেতাদের নামে। সবখানে আঁকা স্বস্তিকা। ল্যাম্প পোস্টের গায়ে ট্রেন স্টেশনে টাঙানো এই শহরে বসবাসের নিয়মাবলি, এর কোনোটা ভাঙা হলে পোলিশদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি।

একসময় সে পৌঁছে গেল তার খালার বাড়িতে। যুদ্ধের প্রথম আক্রমণেই ওর খালু প্রাণ হারিয়েছে। সোফিয়া সময় কাটাতে লাগল তার খালাতো বোনের সঙ্গে। একসময় আরবাইটসআমেট গিয়ে নাম লেখাল সোফিয়া। আউসভাইস আর আরবাইটসকার্টে পাওয়ার পর কাজ শুরু করল জার্মান দোকানে। কাজে যাওয়ার নাম করে সে যেতে লাগল শহরের এখানে-সেখানে। ইহুদিরা শহরের যে এলাকায় থাকে, একদিন সেখানে গিয়ে দেখল তার চারপাশে তোলা হয়েছে কাঁটাতারের প্রাচীর। আশপাশের ইহুদিদেরও নিয়ে আসা হলো এই ঘেটোতে। সেখানে পাহারা দিত জার্মান সেনা আর এলসেশিয়ান কুকুর।

জার্মানি আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর খবর এল জুন মাসে। বাড়িতে বাড়িতে আর দোকানপাটে গুজবের মতো ছড়াতে লাগল হিটলারের ইহুদি নিধন পরিকল্পনার কথা। এর মধ্যে নাশকতামূলক হামলাও হতো শহরে। জবাবে পোলিশদের দেয়ালে ঠেকিয়ে কারও বুকে, কারও পিঠে, কারও কপালের মাঝখানে, আবার কারও মাথার পেছন দিকে গুলি করা হতো।

দশজন।

কুড়িজন।

তিরিশ জন।

এক রবিবারে কাজিনকে নিয়ে সোফিয়া গেল বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরের এক গির্জায়। যখন প্রার্থনা শুরু হলো, তখন ওরা দরজার বাইরে শুনতে পেল হইচই আর বুটের শব্দ। একদল সেনা ঢুকে পড়েছে গির্জার ভেতর। ওরা

অল্প বয়সী লোকজন ধরে ধরে নিয়ে গেল গির্জার বাইরে। তারপর ওদের বাছাই করে উঠানো হলো ট্রাকে। কেউ একজন বলল, থার্ড রাইশের কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন, তাদের জার্মানি পাঠানো হবে। ষাটোর্ধ্ব এক নামেজর যাদের দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল, তাদের তোলা হচ্ছিলো ট্রাকে। এ সময় তার চোখ পড়ল সোফিয়ার দিকেও।

র‍্যাডম শহরের একটা কারখানায় দাস হিসেবে কাজ শুরু করল সোফিয়া নোভাক। তার কাজ ছিল বাক্সের ভেতর গোলাবারুদ ভরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হতো ওদের। একটানা দাঁড়িয়ে থাকা আর গানপাউডারের কারণে যারা অসুস্থ হয়ে পড়ত, তাদের নিয়ে যাওয়া হতো অন্য কোথাও এবং তাদের আর কখনোই এখানে ফিরিয়ে আনা হতো না।

সোফিয়াও একদিন অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জার্মান মেজর ওকে ডেকে নিয়ে কাজ দিল অফিসার্স মেসের কিচেনে। তার কাজ ছিল রান্নাবান্নায় সাহায্য করা, থালাবাসন ধোয়া, ন্যাপকিন ভাঁজ করা, ওয়াইনের ছিপি খোলা এবং ডায়নিং হলে সেনাদের খাবার পরিবেশন করা। রুমের কোনায় কোনায় ছিল নাৎসি পতাকা। দেয়ালে দেয়ালে হিটলার আর ঈগলের ছবি। ভেরমাক্টের অফিসারেরা এখানে জড়ো হতো শূকরের চপ, রোস্টেড চিকেন, জাওয়ারক্রাউট, বিট স্যুপ আর চকোলেট দিয়ে বানানো কেকের জন্য। বেশির ভাগ সময় তারা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করত আর কখনো কখনো হাসি-ঠাট্টায় ঢলে পড়ত ওয়েট্রেসদের গায়ের ওপর।

ডিনার শেষে থালাবাসন ধুতে ধুতে সোফিয়ার কখনো কখনো অনেক রাত হয়ে যেত, যখন রাস্তায় নেমে আসত কারফিউ। নামেজর তখন পাস লিখে দিত ওর জন্য। পাসের নিচে লেখা থাকত মেজরের নাম। মেজর শোয়ামব্যার্গার।

কোনো এক রাতে সোফিয়া বলরুমের জানালা দিয়ে দেখল কিছু মানুষ দৌড়ে পালাচ্ছে আর তাদের পেছনে ছুটছে জার্মান সেনারা। তারপর কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শুনল সে। দেখল মাঠের সাদা তুষার রক্তে লাল হয়ে গেছে। সোফিয়া জানতে পারল, এই বলরুমের পাশেই ছিল ইহুদিদের ঘেটো। তার চারপাশে উঁচু উঁচু প্রাচীর। তার ওপরে কাঁটাতারের বেড়া।

কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যায় সোফিয়া কিচেন থেকে একটা ছুরি নিয়ে গোপনে চলে এল বেড়ার ওখানে। একটা গর্তের মতো করল তার নিচ দিয়ে। তারপর টিনের একটা বাক্সে কিছু চিজ আর আপেল ভরে সেটা পাচার করে দিল বেড়ার ওপারে। পরদিন সেখানে গিয়ে দেখল বাক্সটা খালি। এরপর যখনই সুযোগ পেত সোফিয়া খাবার রেখে আসত ঘেটোর ভেতর আটকে পড়া মানুষগুলোর জন্য। সে জানত, এই খাবার ছিল বিশাল মরুভূমিতে এক ফোঁটা পানির মতো।

একসময় মেজর শোয়ামব্যার্গারকে বলে সোফিয়া তার কাজিনকেও নিয়ে এল অফিসার্স মেসের কিচেনে।

মেজরের কাছে সোফিয়া একদিন জানতে পারল পুরো মিশন এপ্রিলে সরিয়ে নেওয়া হবে পূর্ব দিকের টেরনোপল শহরে। জার্মানরা তখন সোভিয়েত বাহিনীকে পিছু হটিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। গোলাবারুদের কারখানা থাকবে রণাঙ্গনের কাছাকাছি, যাতে খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি সেনাদের কাছে রসদ পৌঁছে দেওয়া যায়, সে কারণে, যারা রান্নাবান্নার কাজ করত, সঙ্গে যাবে তারাও।

এর মধ্যেই বাড়তে লাগল র‍্যাডমের এই মেসে খেতে আসা অফিসারদের ভিড়। খেতে খেতে তারা যে হইচই করত, সেটা একসময় থেমে যেত বার্লিন থেকে আসা ডের ফ্যুয়েরারের ভাষণ শুরু হওয়ার পর। রাইশের শত্রু বলশেভিকদের খতম করার কথা বলত হিটলার। সারাটা ঘরে তখন নেমে আসত কবরের নীরবতা, হিটলারের ভাষণ ডায়নিং হলের চার দেয়ালের ভেতর গমগম করত আর অফিসারদের মুখগুলো কেমন পশুর মতো হয়ে উঠত। সোফিয়া আর ওর কাজিনের কাছে হিটলারের এই ভাষণকে মনে হতো বদ্ধ এক উন্মাদের থুতু ও বমির মতো, আর মনে হতো অফিসাররা সেই বমি চেটে চেটে খাচ্ছে।

মার্চের এক সকালে কাজে এসে ওরা দেখল ঘেটোর মাঠে কয়েকটা বুলডোজার। বাড়িঘরের জানালা ভাঙা। ঘাসের ওপরে গুড়িয়ে যাওয়া চশমা, ভাঙা স্যুটকেস আর কয়েক পাটি জুতা। রাস্তার পাশে ঝুলানো মাইক থেকে র‍্যাডমকে ঘোষণা করা হলো ইহুদিমুক্ত শহর হিসেবে।

সোফিয়ারা যখন টেরনোপল গিয়ে পৌঁছাল, তখন স্টালিনগ্রাদের ওপর জোর আক্রমণ শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে ওর কাজের পরিমাণও। কারখানায় শুরু হয়েছে ডাবল শিফট। সেখানে তখন সন্ধের পরও কাজ হতো। আর ডায়নিং রুমের পাশাপাশি সোফিয়াকে লন্ড্রি রুমেরও দায়িত্ব দেওয়া হলো।

কারখানার মতো এই লন্ড্রিতেও কাজ করত ইহুদিরা। ওদের আনা হতো স্থানীয় আরবাইটসলাগার থেকে। প্রত্যেক দিন সকালে ট্রাকে করে নিয়ে আসা হতো আর সন্ধ্যায় নিয়ে যাওয়া হতো গুনে গুনে। সেখানে সোফিয়ার সঙ্গে দেখা হলো এক ডজন মানুষের। একজন সফল ব্যবসায়ী, দর্জি, একজন নার্স, মেডিকেলের একজন ছাত্র এবং একজন আইনজীবী। এরা সবাই ছিল জার্মান। শুরুর দিকে ওরা সোফিয়াকে জার্মান মনে করে খুব ভয় পেত।

শুৎস্টাফেল বা এসএস বাহিনীর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার কার্ল হাস ওদের নিয়ে এসেছিল এখানে। হাস ছিল খুব ঠান্ডা এবং ওর চোখ দুটো ছিল শেয়ালের চোখের মতো ধূর্ত। সোফিয়ার মনে হয়েছিল, ওর যেখানে হৃদয় থাকার কথা সেখানে আর কিছুই নেই বরফ ছাড়া। মেজর শোয়ামব্যার্গারের সঙ্গে ও যখন কথা

বলত, ওর চোখ ও দাঁত চকচক করত। কার্ল হাসের মুখে শোনা যেত হাইনরিশ হিমলারের কথা।

সোফিয়া লন্ড্রি রুমের শ্রমিকদের বোঝাল, ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ও জার্মান নয়, পোলিশ। আরও পরে সোফিয়া বলল যে সে ওদের বাঁচাতে চায়। ওরা কিছু বলল না। ওরা অবাক হলো। অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল সোফিয়ার দিকে। কী বলে মেয়েটি ! পরাক্রমশালী ফ্যুয়েরারের হাত থেকে ওদের কীভাবে বাঁচাবে মেসের সামান্য এই পরিচারিকা !

অফিসারদের ময়লা কাপড়ের ঝুড়িতে করে ওদের জন্য খাবার নিয়ে যেত সোফিয়া। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকানো থাকত আপেল, কমলা, চিজ, সসেজ সবচেয়ে বেশি থাকত রুটি, বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটার প্রয়োজন ছিল। ঘেটোতে আর আরবাইটসলাগারে ওরা খুব একটা খাবার পেত না। সোফিয়ার এই চেষ্টা ওদের হাসাল। বলল, 'তুমি তো পুচকে একটা মেয়ে। তুমি আর কতটা কী করতে পারবে !'

সত্যি কথা বলতে কি, এটাই ছিল সোফিয়ার সুবিধা। কম বয়সের কারণে কেউ সন্দেহ করত না ওকে। মেজর শোয়ামব্যার্গার একদিন ডিনারের সময় ত্রিরিশ বছরের সুদর্শন কমান্ডার হাসের সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল। রাতের খাবারের পর সোফিয়ার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করল হাস। যাওয়ার সময় মেজর শোয়ামব্যার্গারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ফোড়ন কাটল, 'কী মিষ্টি মেয়ে সোফিয়া। ছোট্ট একটা কবুতরের মতো, আর মেজর তুমি হলে একটা বুড়া শোয়াইন।'

মেজর শোয়ামব্যার্গারের সঙ্গে রাতের খাবারের সময় কমান্ডার হাস যখন তার পরবর্তী অ্যাকশন নিয়ে আলাপ করত, পেয়ালায় ওয়াইন ঢেলে দেওয়ার নাম করে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনত সোফিয়া। তারপর সেই গোপন দামি খবর লন্ড্রি রুমের কর্মীদের মাধ্যমে পাচার হয়ে যেত আরবাইটসলাগার আর ঘেটোর বন্দিদের কাছে।

সোফিয়া একদিন সকালে শোয়ামব্যার্গারকে বলে কয়ে আরও কিছু শ্রমিক নিয়ে এল আরবাইটসলাগার আর ঘেটো থেকে। ওরা সবাই ছিল লন্ড্রি রুমের কর্মীদের আত্মীয়স্বজন অথবা বন্ধুবান্ধব। সোফিয়া ভাবল, এখানে ওরা অন্তত দুই মুঠো খেতেও পারবে।

ডিনারের সময় কমান্ডার হাস মেজর শোয়ামব্যার্গারকে বলল, কারখানার সব শৃঙ্খলার মূলে আছে প্রশিক্ষণ। এখানে সে কাউকে অলস বসে থাকতে দেবে না। আর শোয়ামব্যার্গার বলল যে ওর কাছে যুদ্ধের জন্য এই মানুষগুলো খুব দরকারি। ওদের দিয়েই কারখানা চালাতে হয়। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন রসদ। সেই রসদ আসে কারখানা থেকে। মেজর চায় না কারখানার শ্রমিকদের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতন চালানো হোক। জবাবে হাস বলল, উদ্বেগের কিছু নেই। যেসব ইহুদি

এখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবে, এরা আসলে অদক্ষ ও অলস শ্রমিক। এদের দেখভাল করা আর খাওয়ানো-পরানোর জন্য খরচ হচ্ছে অনেক। এদের ছাড়াও কারখানা বেশ ভালো চলবে।

কমান্ডার হাসের মিশন ছিল আস্তে আস্তে সমগ্র এলাকা ইহুদিমুক্ত করা। যারা কাজ করতে পারে, তাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কাজে লাগানো আর যারা অক্ষম তাদের হত্যা করা। গোলাবারুদের কারখানা, আরবাইটসলাগার আর ঘেটো থেকে হাস মাঝেসাঝেই এ রকম ইহুদিদের চুরি করে নিয়ে যেত, যারা পরে আর কখনোই ফিরে আসেনি। হঠাৎ হঠাৎ ও কারখানা থেকে সুন্দরী মেয়ে নিয়েও উধাও হয়ে যেত। হাস ফিরত কিন্তু ফিরত না নারীরা। একসময় তার চোখ পড়ল সোফিয়ার কাজিনের দিকে। মেজর শোয়ামব্যার্গারকে বলে ওকে কারখানা থেকে সরিয়ে নিল সোফিয়া। শোয়ামব্যার্গার ওকে অভয় দিল। বলল, 'তুমি ভেব না। হাসের হাত থেকে আমি ওকে বাঁচাব। কিন্তু তুমি আমাদের ছেড়ে এখান থেকে যাবে না।' শোয়ামব্যার্গারের কণ্ঠ আর চাহনি ভালো লাগল না সোফিয়ার; কিন্তু সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া তার সামনে আর কোনো উপায় ছিল না।

তখন ১৯৪৩ সাল। শুরুর দিকের কথা। জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে। কমান্ডার হাস এল ডিনার করতে। খেতে খেতে সোফিয়াকে বলল ওর কাজিনকে তৈরি রাখতে। সোফিয়া জানাল ও দুঃখিত, কারণ ওর কাজিনের যক্ষ্মা হয়েছে এবং এই রোগ এতটা সংক্রামক যে তাকেও এখান থেকে বের করে দিতে হয়েছে।

আহত বাঘের মতো ক্রুদ্ধ হাস তখন মেজর শোয়ামব্যার্গারকে বলল ডের ফ্যুয়েরারের পরিকল্পনার কথা। প্রথমে শেষ করা হবে ইহুদি, তারপর পোলিশ এবং এর পরে ধ্বংস করা হবে সব ক্যাথলিক চার্চ। এবং ইহুদিদের শেষ করতে হবে জুলাই পার হওয়ার আগে।

পূর্ব দিকের রণাঙ্গনে জার্মানদের তখন করুণ দশা। স্টালিনগ্রাদ লড়াইয়ে হাজার হাজার জার্মান সেনা নিহত এবং আরও অনেকে গ্রেপ্তার হলো রেড আর্মির হাতে।

লন্ড্রি রুমের শ্রমিকেরা তখন আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটা শেল্ফ দিয়ে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করল, যাতে দেখে বোঝা না যায় যে এর ভেতর কেউ আছে। একজন বলল ওরা আর এখানে থাকতে চায় না, পালিয়ে যেতে চায় গভীর কোনো জঙ্গলে, এ জন্য ওরা সাহায্য চায় সোফিয়ার। কিচেন থেকে চুরি করা ভোদকার বিনিময়ে সোফিয়া একদিন ভাড়া করল একটা ঘোড়ার গাড়ি, তার ওপর চারজনকে বসাল, গমের খড় দিয়ে ঢাকা হলো সেই গাড়ি, তারপর ছুটল জঙ্গলের দিকে।

সোফিয়ার কানে সব সময় বাজত কমান্ডার হাসের কথা...'ইহুদিদের শেষ করা হবে...তারপর পোল...তারপর চার্চ।' এরপর থেকে ও চাইত সব ইহুদিকে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে। সোফিয়া মোট ছয়জনকে সেখানে নিয়ে যেতে পেরেছিল। যখনই সুযোগ পেত, ওদের জন্য নিয়ে যেত খাবার। এসব কাজে ও ব্যবহার করত মেজর শোয়ামব্যার্গারের ড্রয়ার থেকে চুরি করা পাস।

কয়েক সপ্তাহ পর বার্লিন থেকে ভেরমাখ্ট আর শুৎস্টাফেলের আরও কয়েকজন সেনা এসে জড়ো হলো টেরনোপলে। মেজর শোয়ামব্যার্গার তখন চলে গেল একটা ভিলায়। কারখানা থেকে কুড়ি মিনিটের পথ। রান্নাবান্না ও ভিলা দেখভালের জন্য সে সোফিয়াকেও সঙ্গে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সোফিয়ার ভয় ছিল, ও চলে গেলে লন্ড্রি রুমের মানুষদের কী হবে।

মেজর শোয়ামব্যার্গার একদিন ভিলা দেখতে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল সোফিয়াকেও। ভিলার নিচ তলায় ছিল ডায়নিং হল, পারলার আর একটা লাইব্রেরি। ওপরের তলায় কয়েকটা বেডরুম, বেশ বড় কিচেন, পরিচারিকার ঘর। একদম নিচে ছিল বেজমেন্ট, সেখানে ছোট্ট একটা রান্নাঘর, বাথরুম, একটা স্টোররুম আর বড় একটা সেলার। সোফিয়ার মনে হলো এখানে সে বেশ কয়েকজনকে লুকিয়ে রাখতে পারে অনায়াসে।

লন্ড্রি রুমের মানুষদের কাছে ভিলার বর্ণনা দিল সোফিয়া। ওদের একজন এই বাড়িটার কথা জানত। টেরনোপল শহরে একটা গুজব ছিল যে কোনো এক ইহুদি স্থপতি এই বাড়িটা তৈরি করেছে, এর ভেতর লুকিয়ে থাকার জন্য আছে একটা গভীর সুড়ঙ্গ। ওরা ঠিক করল যে এই ভিলার বেজমেন্টে তারা আত্মগোপন করবে।

কমান্ডার হাসের পরিকল্পনার কথা গোপনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সোফিয়া। ঘুরল পথে পথে। চুরি করা পাস সাহায্য করল ওকে। রক্ষীরা যখন ওর গতিরোধ করত, একটা হাসি দিয়ে সোফিয়া বলত যে ও মেজর শোয়ামব্যার্গারের হাউজকিপার। তারপর পাসটা যখন দেখাত, সেনারা ওর সামনে থেকে সরে দাঁড়াত। কারখানার ভেতর সবাই ওকে মেজরের বান্ধবী, আবার কেউ কেউ রক্ষিতা হিসেবেও ধরে নিয়েছিল। ফলে সেখানে ছিল তার অবাধ যাতায়াত। পোলিশরা ওকে ঘৃণার চোখে দেখত। ভাবত জার্মানদের সঙ্গে একজোট হয়ে ও নিজের দেশের লোকজনদের হত্যা করছে। শুধু নিজের স্বার্থে। কেউ একজন ওকে টিটকিরি মেরে বলেছিল, 'কেমন লাগছে বুড়া জার্মান সসেজ ?'

এই ইঙ্গিত ও বুঝতে পেরেছিল কিন্তু এসব হজম করা ছাড়া সোফিয়ার আর কোনো উপায় ছিল না। কয়েক সপ্তাহ ও পুরো শহর চষে বেড়াল। হলুদ তারকা

পরা কাউকে দেখলে কানের কাছে মুখ নিয়ে সোফিয়া ফিসফিস করে বলত, 'তোমরা লুকাও, তোমরা পালাও, মৃত্যু আসছে।'

কমান্ডার হাস একদিন মেজরকে বলল এ মাসের ২২ তারিখে টেরনোপল ইহুদিমুক্ত হবে। কথাটা শোনার পর সোফিয়ার হাত থেকে ছিটকে পড়ল ভারী ট্রে। থালাবাসন ভাঙার ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল পুরোটা ঘর। মেজর শোয়ামব্যার্গার আর কমান্ডার হাসের সামনে নিজেকে ভর্ৎসনা করল সোফিয়া। ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, ওকে আরও সাবধান হতে হবে, খেতে হবে আরও বেশি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সোফিয়ার হাতে ছিল আর মাত্র ছয় দিন। এর মধ্যেই লন্ড্রি রুমের মানুষদের বাঁচাতে হবে ওকে। অথচ এখনো সেখানে আছে আরও ছয়জন। একেক জনের জন্য পাওয়া যাবে এক দিন করে। সোফিয়া ওদের জানাল কমান্ডার হাসের কথা আর খুলে বলল ওর পরিকল্পনা। তারপর কান্নার রোল উঠল খাঁচার ভেতর।

২১ তারিখ টেরনোপল শহরের কোথাও একটা পার্টি ছিল। মেজর শোয়ামব্যার্গারসহ প্রায় সব কর্মকর্তাই গিয়েছিল সেখানে। ওই রাতে শহরে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল বৃষ্টির মতো। জার্মান সেনারা ফিরল গভীর রাতে। তার আগেই সোফিয়া লন্ড্রি রুমের মানুষদের পাচার করে দিল মেজরের নতুন ভিলায়। পরদিন হাস ভাবল টেরনোপলে বেঁচে নেই আর কোনো ইহুদি। তবে সোফিয়া জানল যতদিন ও আছে, অন্তত ততদিন এই শহর কিছুতেই ইহুদিশূন্য হবে না।

ভিলাতে তখনো রং করার কাজ চলছিল। মেজর শোয়ামব্যার্গার এই কাজ তদারকের দায়িত্ব দিয়েছে সোফিয়াকে। একদিন মেজর নিজে এল ভিলা দেখতে। ততদিনে লন্ড্রি রুমের ছয়জনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও চারজন। সোফিয়ার হাতে এখন দশ দশটা প্রাণ। সেদিন বেজমেন্টে তালা দিয়ে আটকে রাখা হলো ওদের। মেজর ঘুরে ঘুরে দেখলেন তার ভিলা। সোফিয়াকে বললেন এখনই ভিলায় চলে আসতে। তিনি আসবেন সপ্তাহ দুয়েক পর, রং আর মেরামতের কাজ শেষ হওয়ার পর।

এই সুযোগটা নিল সোফিয়া। দেরি না করেই ও চলে এল ভিলায়।

তখন বেজমেন্টের ভেতর থাকত দশজন মানুষ। সন্ধ্যার পর ভিলা থেকে মেরামতকারী সেনারা যখন চলে যেত, মেস থেকে ফিরে এসে সোফিয়া ওদের বের করে আনত বেজমেন্টের অন্ধকার গুহা থেকে। শুধু তখনই ওরা কিছুটা স্বাধীনতা পেত। মানুষগুলো বাথরুমে যেত, হাত-পা ছড়িয়ে বসত, চোখমুখ ধুয়ে নিত ঠান্ডা পানিতে। কিন্তু বাতি জ্বালানো হতো না। পুরো ভিলাটাকে একটা ভুতুড়ে বাড়ির মতো মনে হতো। সোফিয়া সেনাদের দিয়ে মেরামতের কাজ

এমনভাবে করাতে লাগল, যাতে ওরা চোখে না পড়ে। ও সারা দিন বন্ধ করে রাখত মূল দরজা। মেজরের নাম করে রুটি-চিজ-সিগারেট-ভোদকা-চিনি এনে গুদামজাত করত বেজমেন্টের কিচেনে। ওখানেই শুরু হলো আত্মগোপনে থাকা দশজন মানুষের নতুন জীবন।

অবশেষে মেস থেকে ভিলায় চলে এলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার। সোফিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন প্রত্যেকটা ঘর। একসময় জানতে চাইলেন বেজমেন্ট মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে কি না। কেঁপে উঠল সোফিয়া। জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?' সোফিয়ার কাছে মেজর জানতে চাইল, তার আর্দালিকে ভিলায় নিয়ে এলে কেমন হয়। সোফিয়া চিৎকার করে বলল, 'না।'

'কেন ?' মেজর শোয়ামব্যার্গারের প্রশ্ন।

মেজরকে সে শুধু বলল যে রুশ সেনারা ওর ওপর হামলা করেছিল।

'কীভাবে ?'

'পুরুষেরা যেভাবে নারীদের ওপর হামলা করে, সেভাবে' সোফিয়া বলল, সে চায় না এখানে আর কোনো পুরুষ থাকুক। এতে তার পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে। সোফিয়ার অনুরোধ রাখলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার।

শোয়ামব্যার্গার ভিলা ছেড়ে যেতেন সকাল সাড়ে আটটায়, কারখানার উদ্দেশ্যে। সোফিয়া উঠত তারও ঘণ্টা খানেক আগে। সকালের নাশতা বানাত। মেজর চাইত সোফিয়া তার সঙ্গে বসুক, কফি খাক, গল্প করুক, সোফিয়ার সঙ্গ চাইত মেজর শোয়ামব্যার্গার। নাশতা খেতে খেতে ওরা কথা বলত ভিলার সামনের বাগানে একজোড়া পাখির নতুন বাসা আর শূকরের মাংসের সঙ্গে কোন সস আর কিসের আচার সুস্বাদু এসব নিয়ে। মেজর চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিত সোফিয়া। দরজার এপাশে চাবির গর্তে ভেতর দিক থেকে চাবিটা রেখে দিত, যাতে বাইরে থেকে দরজা খোলা না যায়। বেজমেন্টের লোকেরা তখন স্নান করত, খবরের কাগজ পড়ত আর শুনত বিবিসির যুদ্ধের খবর।

মেজরের ফিরে আসার আগেই ভিলায় ফিরত সোফিয়া। একদিন খবর পেল জঙ্গলে রেখে আসা একজন মহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওখানে থাকলে ঠান্ডায় সে মারাও যেতে পারে। ঘোড়ার গাড়িটা আবার ভাড়া করল সোফিয়া। তারপর রাতের অন্ধকারে তাকে উদ্ধার করে গোপনে ঢুকিয়ে দিল মেজরের ভিলায়।

এই ভিলায় সোফিয়ার বহু দিন বহু রাত কেটেছে দুঃস্বপ্নের মতো। মেজর শোয়ামব্যার্গার যখন একরাতে বড় একটা পার্টি দিল, কমান্ডার হাস একটা মেয়ের কোমর জড়িয়ে তাকে নিয়ে গেল নিচতলায় আর যেদিন ওই এগারোজনের এক জনের কাশি হলো।

মাথার খুলির চিহ্ন আঁকা টুপি পরে এসএস সেনারা একদিন ভিলায় এল। দেখতে এল এই বাড়িতে সোফিয়া ছাড়া আর কেউ থাকে কি না। পেছনে পেছনে এল মেজর শোয়ামব্যার্গার। তার বাড়িতে ইহুদি লুকিয়ে আছে, এসএস বাহিনীর এই সন্দেহে সে হতাশা প্রকাশ করল। প্রকাশ করল ওর রাগও, সোফিয়াকে দেখিয়ে মেজর বলল, 'যাও, সার্চ করো, এ আমার হাউজকিপার। একজন বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট। যাও, তোমরা যা দেখতে চাও, সোফিয়া তোমাদের সব দেখাবে।'

তারপর দোতলায় উঠে গেল মেজর শোয়ামব্যার্গার, কমান্ডার হাসকে টেলিফোন করল, টেলিফোনে চিৎকার করল। ভুল গোয়েন্দা তথ্যের জন্য এসএস সেনারা ক্ষমা চাইল এবং দ্রুত স্যালুট দিয়ে বেরিয়ে গেল ভিলা থেকে। সেদিন মেজর শোয়ামব্যার্গারকে খুব অস্থির দেখাল।

কয়েক সপ্তাহ পর সোফিয়া একদিন সন্ধ্যায় ভিলায় ফিরে বেজমেন্টে গিয়ে খবর পেল ওদের একজন সন্তানসম্ভবা। এ রকম একটা আনন্দের খবর যে এত বড় দুঃসংবাদ হতে পারে, সেটা না দেখলে বোঝার উপায় ছিল না। এই খবরে সবাই দারুণ হতাশ, ডুবে আছে গভীর দুশ্চিন্তায়। ওরা বলল যে তারা সেটা নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোফিয়া 'না' বলে চিৎকার করে উঠল। আত্মগোপনে থাকা মানুষেরা বলল, 'এখানে সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো বিপদ আর কিছুই হতে পারে না।' সোফিয়া আবারও বলল, 'না। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে খুব শিগগিরই। সোভিয়েত সেনারা অগ্রসর হচ্ছে।'

সোফিয়ার হাতে তখন এক ডজন মানুষের জীবন।

পশ্চিমে আঁধার

আমার তখন নিস্তরঙ্গ জীবন। সকালে কারখানায় যাই, রাতে থাকি বাসায়। জীবনে তেমন কোনো ঘটনা ঘটে না। সবকিছু মুখস্থ ও মাপজোখ করা। কোথাও বাঘের মতো ওত পেতে নেই কোনো অনিশ্চয়তা। শীলার স্মৃতিও তখন শীতকালে শুকিয়ে যাওয়া নদীর ক্ষীণ প্রবাহের মতো।

তখন ঢাকায় কথা বলার সময় চমকপ্রদ খবরের জন্য হা করে থাকি। অস্থির হয়ে গিলতে থাকি আম্মার কথা। অপেক্ষা করি নতুন খবরের : এই হয়ত তিনি বলবেন, তোর আব্বা কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, এখন বেশির ভাগ সময় পরমতলাতেই থাকে অথবা রুমানা ওই ছেলেটাকে পালিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে, কিন্তু সেরকম খবরও আসে না। সজল ও রফিকের জন্যও অপেক্ষা করি। মনে হতো, ওরা যদি আবার কখনো হুট করে চলে আসত। সবচেয়ে বেশি অপেক্ষায় থাকি রিটার, কিন্তু ওরও খুব একটা দেখা পাওয়া যায় না, ও যেন কোথায় কোথায় যায়, কখনো আর্জেন্টিনায় কখনো মেক্সিকো আবার কখনো আমেরিকায়, জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ হু ছাড়া খুব বেশি কিছু বলে না। কাজ থেকে মাঝেমধ্যে লম্বা লম্বা ছুটি নেয় রিটা, শুনেছি ও নাকি চাকরিটাও ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে, কিন্তু কেন বা কখন তার কিছুই ও আমাকে বলেনি।

সব মিলিয়ে জীবনটা তখন হয়ে উঠেছিল ভেজিটেবলের মতো, কখনো-সখনো এক-আধটু মাছ-মাংস যোগ হতো আর সেটাও করত রিটা।

পিওনিয়ার স্ট্রাসে থেকে চলে আসার পর রিটার বাড়িতেও খুব একটা যাওয়া হয় না। রিটাও আসে না কোবলেন্সার স্ট্রাসে। মাঝেসাঝে দেখা হয় আমাদের। বেশির ভাগ সময় আমরা রেস্তোরাঁ, পাব অথবা উবানের ভেতর দেখা করি। আমাদের পকেটে থাকে দুটো টাগেসকার্টে, তারপর সারা দিন ঘুরে বেড়াই এখানে-ওখানে। নদী পার হয়ে বাসে করে চলে যাই শহরের শেষ মাথায়, তরমুজের ফালির মতো দেখতে একটা জঙ্গলের গভীরে অথবা এই ট্রামে-ওই ট্রামে, শহরের আনাচে-কানাচে।

এমনও হয়েছে যে আমরা ট্রামে উঠেছি সকালে কিন্তু নেমেছি শেষ রাতের দিকে। সাধারণত বৃষ্টির দিনে, এককেকটা দিন আসত বর্ষণমুখর, মনে হতো আকাশ ফুটো হয়ে গেছে, সেই সকালে শুরু হতো বৃষ্টি, অবিরাম ক্লান্তিহীন অঝোর ধারায়, তখন সারাটা দিন কাটত বাসে ও ট্রামে। শেষ বগিটার এক কোনায় গিয়ে বসতাম আমরা দুজন। আমি ওকে একাত্তরের গল্প বলতাম আর ও আমাকে শোনাত জাকসেন হাউজেন, আউশভিৎস অথবা বুখেনভাল্ড কিংবা ডাকাওয়ের হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কাহিনি। আমরা খাবার নিয়ে যেতাম। অথবা কোথাও নেমে একটা কিছু খেয়ে নিতাম। কখনো রিটা সিটের ওপর পা তুলে, কখনো আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম ঘষা কাচের মতো জানালার ওপাশে তুমুল বৃষ্টির আড়ালে কীভাবে হারিয়ে যেত মাঠের পর খামার, খামারের পর মাঠ, তারপর জঙ্গল, জঙ্গলের পর লেক।

এর মধ্যে আচমকা কিছু কিছু দিন আসত, যা ছিল না হিসেবের খাতায়। ওই দিনগুলোর জন্যই সময়টাকে জীবন মনে হতো। যেমন একবার সারা রাত আমাদের ট্রামের একটা ডিপোতে কাটাতে হয়েছিল। সেটা কোনদিন ছিল, এখন আর মনে নেই। কিন্তু মনে আছে সেদিন বিকেলের একটু আগে আমরা উঠেছিলাম ১২ নম্বর ট্রামে। জুডফ্রিডহফ থেকে ওটা যাচ্ছিল মেশেনিশ। আবার মেশেনিশ থেকে ফিরছিল জুডফ্রিডহফ। ট্রামটা ছুটছিল এমাথা-ওমাথা। টেনিস বলের মতো। রাত বারোটার দিকে ওটা গিয়ে ঢুকল ডিপোতো, আমরা দুজনেই ছিলাম ঘুমিয়ে, পেছনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়েছিল রিটা আর সামনের আসনে পা তুলে হেলান দিয়ে শুয়েছিলাম আমি, ওর মাথাটা ছিল আমার কোলের ওপর।

প্রথমে ঘুম ভাঙল রিটার। লাফিয়ে উঠল ও। স্বপ্নে ভূত দেখার মতো। তারপর ও চিৎকার করে ডেকে তুলল আমাকে। কম্পার্টমেন্টের ভেতর তখনো ছিল অন্ধকার আর বাইরে ঘন কুয়াশার আড়ালে জ্বলছিল সিগন্যালের লাল আলো। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, ওখানে অলস সাপের মতো গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে কতগুলো ট্রাম, ওগুলোর রং ভেজা ইটের মতো লাল।

প্রত্যেকটা বগিতেই ছিল দুটো করে দরজা, ভেতর থেকে খোলার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ, একবার জানালার কাচ ভাঙার কথাও ভেবেছিলাম কিন্তু রিটা বাধা দিল। তারপর টানলাম ইমার্জেন্সি চেন, কোনো জায়গা থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন মুখোমুখি দুটো আসনে গিয়ে লম্বা দিলাম আবারও, আমি রিটার দিকে আর রিটা আমার দিকে কাত হয়ে, আমাদের মাঝখানে এক পা খালি জায়গা, যেখানে যাত্রীরা হাঁটু গুটিয়ে রাখে। সারা রাত এক রকম জেগেই ছিলাম আমি। হাঁসফাঁস করছিল রিটা। ও শুধু এপাশ-ওপাশ করছিল, বেশির ভাগ সময় ও শুয়েছিল আমার দিকে পিঠ দিয়ে, পা দুটো ছিল দ এর মতো ভাঁজ করা, আর

গোলাপি একটা জামার নিচে স্পষ্ট হয়েছিল একপাশে কাত হওয়া উ অক্ষরের মতো ওর ব্রার মোটা রেখা।

সেদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাদের। চালক যখন দরজা খুলল, তার চোখ উঠে গেল কপালের ওপর। সব কাহিনি খুলে বলার পরেও সে বিশ্বাস করল না। আমাদের ও নিয়ে গেল একেবারে সামনের বগিতে। ওর পাশে বসার ব্যবস্থা করল। ওয়্যারলেসে কারও সঙ্গে কথা বলল। তারপর ট্রেনটা যখন নিউ মার্কেটে এসে থামল, আমাদের নিয়ে নেমে গেল ও। ওপরে উঠে কা ফাউ বের অফিসে গিয়ে রিটা ও আমাকে আলাদা আলাদা করে লিখে দিয়ে আসতে হলো গোটা রাতের কাহিনি, সেই সঙ্গে আমাদের নাম ও ঠিকানা।

একটা ঠিকানাই লিখল রিটা, ৫৬ বাল্টহাসার স্ট্রাসে।

আমার জীবন ছিল মোটামুটি ট্রামের ভেতর। একটা কেঁচোর মতো জীবন। সকালের দিকে বাড়ির কাছে কোনো একটা গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়তাম মাটির তলায়, বিকালে আরেক জায়গা দিয়ে হুস করে উঠে আসতাম ওপরে। আমাকে খুব ভোরে কারখানায় যেতে হতো। বাসা থেকে যখন বেরোতাম তখন কুয়াশায় চারদিক মোড়ানো থাকত। শুধু গাড়ির হেডলাইটগুলো চোখের ওপরে তীব্র আলো ফেলে হুশ হুশ করে ছুটে যেত। তখন রাস্তায় থাকত না মানুষের চলাচল কিন্তু মাটির নিচে উইপোকার মতো গিজগিজ করত একগাদা মানুষ। বেশির ভাগই ছিল আমার মতো শ্রমিক। রাজমিস্ত্রি অথবা ক্লিনার। ট্রামের ভেতর অত ভোরেও ধুলোবালির গন্ধ পাওয়া যেত। ওদের পরনে থাকত ময়লা জিন্স, বেশির ভাগই হাঁটুর কাছে ঝলসানো, অথবা ছেঁড়া, এখানে-সেখানে থাকত নানা রঙের দাগ। প্যান্টের চারদিকে মাটির ঢিবির মতো চার-পাঁচটা পকেট। ওদের পায়ে থাকত কাদামাখানো কাপড়ের কেডস, শরীরগুলো যে ওভারকোট বা জ্যাকেটের ভেতর গুটানো থাকত, সেগুলো ভরা থাকত সাদা সাদা চুনকামের দাগে।

বেশির ভাগই ছিল পুরুষ। ট্রামের ভেতর আমার মতো ওরাও ঘুমাত। মাথাটা ঝুলতে ঝুলতে একসময় ঢুকে পড়ত পেটের ভেতর। এত ভোরেও যে দু-একজন মহিলা উঠত তারা চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত থাকত অথবা একমনে চোখ, ঠোঁট ও গালে ঘষামাজা করত।

আরও পরে সকালের দিকে থাকত স্যুট-কোট পরিহিত মধ্যবয়সী চাকুরেরা। এরা মুখ গুঁজে রাখত খবরের কাগজে। অধিকাংশই ছিল বিনা পয়সার কাগজ। সিঁড়িটা যেখানে মাটির নিচে নেমে যেত, সেখানে ওগুলো থাকত একটা কাচের বাক্সের ভেতর। কালো টপস আর স্কার্ট পরা মহিলারা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করত বই। বেশির ভাগই ছিল থ্রিলার : ‘কীভাবে আপনার স্বামীকে হত্যা করতে হবে’, ‘পাইন গাছের গোড়ায় যখন পাওয়া গেল লাশ’, ‘ওদের ভালোবাসার রাতে’ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ কাজের বইও পড়ত। যেমন ‘অর্গ্যাজমের

১০০ উপায়', 'আপনার বসকে খুশি করবেন কীভাবে' এ রকম। সকাল দশটার দিকে যারা উঠত, সাধারণত তারা হতো বেকার, এরা খবরের কাগজে ক্রসওয়ার্ড খেলত। আর থাকত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা, ওদের দুই কানে ঠাসা থাকত ইয়ারফোন, এত জোরে গান বাজত যে আশপাশের মানুষেরাও শুনতে পেত। ওরা জোরে জোরে কথা বলত, পিঠে থাকত রুকসাক, ওরা যখন কুঁজো হয়ে হাঁটত। কোমর থেকে ওদের প্যান্ট হাঁটুর কাছে নেমে আসত, ওরা সিটের ওপর পা উঠিয়ে বসত। আর দুপুরের দিকে উঠত বুড়ো-বুড়িরা, তাদের পরনে থাকত প্রজাপতির পাখার মতো ফুলতোলা রঙিন কাপড়। ট্রামের ভেতর তখন এখানে-ওখানে পড়ে থাকত দুমড়ানো কোকের ক্যান আর মুচড়ানো খবরের কাগজ।

এই কাগজগুলোর পাতায় আমি হন্যে হয়ে খুঁজতাম নতুন নতুন ঘটনা, নতুন নতুন খবর। সত্যি কথা বলতে কি, এর জন্য আমাকে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। খবরটা যখন পেলাম, তখন অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বরের শুরু। আমার নিরামিষ গেম্যুজে জীবন আরও একটা বছরে ঢুকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খবরটা ছাপা হয়েছিল ভেতরের পাতায়। আমাদের কারখানার খবর। হামাগুড়ি দিয়ে তখন শীত ফিরে আসছিল কোলনে। গাছে গাছে কিছু কিছু পাতা আছে তখনো। হালকা ঝড়ের মতো যখনই একটু বাতাস উঠত বোঁটাছেঁড়া পাতাগুলো পালকের মতো ভাসতে ভাসতে ঝরে পড়ত গাড়ির রাস্তায়, ফুটপাত আর মাঠের ওপর। গাড়ির চাকার নিচে চাপা খেয়ে ওগুলো লেপ্টে থাকত রাস্তার নতুন পিচের সঙ্গে। মনে হতো একেকটা পাতার ফসিল। ঝরাপাতার তলে ঢাকা পড়ে যেত সাদা, হলুদ ও লাল রঙের রোডমার্ক। রাস্তার এক মাথায় দাঁড়িয়ে সোজা সামনের দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা ঠান্ডা বাতাসে শিরশির করে উঠত। মনে পড়ত এই রাস্তাটার মতোই শীলার ছিল একটা কালো রঙের শাড়ি। তার গায়ে আমপাতা-জামপাতার প্রিন্ট।

মাঠের ওপরে ঝরা পাতাগুলো থাকত স্যাঁতসেঁতে। আর ফুটপাতে হেঁটে গেলে জুতার নিচে শোনা যেত পাতা ভাঙার মর্মর ধ্বনি। দুপুরের দিকে যখন জোর হাওয়া দিত শহরের বাতাসে তখন ঝরা পাতার নাচন উঠত। পাতাগুলো দলবেঁধে রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়াত। তখন শীষ দেওয়ার মতো করে একটা শিরশির শব্দ হতো, বাতাসে কান পাতলে শোনা যেত পাতা ঝরার গান।

ওই খবরের সঙ্গে আমাদের কারখানার একটা ছবিও ছাপা হয়েছিল। কী সুন্দর বিশাল এক কারখানা ! একচালা লম্বা একটা ঘর। সামনে উঠোনের মতো বিশাল খোলা জায়গা। সেখানে মোটা মোটা গাছের ঘন সারি। ছবিটা যখন তোলা হয়েছিল, তখন ছিল ফল যেন গাছগুলোর মাথায় আগুন লেগেছে। কারখানার পেছনে উঁকি মারছে কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু একটা টিলা। ছবিটা যত সুন্দর

শিরোনামটা ছিল ঠিক ততখানি নির্মম। কোলনের এই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর আছে ওখানে। ব্যাংক থেকে নিয়ে মালিক এখন দেউলিয়া। ছুটে গেলাম কারখানায়। কয়েক দিন সামান্য হইচই হলো। বয়ে গেল এক-আধটু আন্দোলনের হাওয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা আর বাঁচানো গেল না।

দুই মাস কাজ খুঁজলাম পাগলের মতো, যেখানেই কাজের গন্ধ পেতাম দৌড়ে যেতাম সেখানে, যেকোনো কাজ, সিনেমার টয়লেটে মগ মারা থেকে কেবাবের দোকানে পেঁয়াজ ছেলা অথবা বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলানো কিংবা স্টেডিয়ামে টিকিট বিক্রি করা, কিন্তু কোনো কাজই জুটল না কপালে। কোবলেন্সার স্ট্রাসে থেকে খুব সকালে বেরিয়ে পড়তাম আর ফিরতাম সব দোকানপাটে আলো নিভে যাওয়ার পর। আমার ঘরে বাতি জ্বলত সারা রাত। তখন বাড়ি ভাড়া দেওয়ার মতোও অর্থ ছিল না পকেটে। ছিল না বাসের টিকিটের পয়সাও। চাকরির খোঁজে তীব্র ঠান্ডার ভেতরও হেঁটে যেতাম শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায়। দুরন্ত বাতাস তখন শরীরে সুচ ফুটাত আর ভেতরের উষ্ণ রক্ত জমাট বাঁধত বরফের মতো।

আমার এই চাকরি হারানোর কথা আমি রিটাকে বলিনি, বলিনি নাখালপাড়াকেও, মনে মনে শুধু খুঁজতাম পিওনিয়ার স্ট্রাসের মানুষগুলোকে। কে জানে সজল আর রফিক এখন কোথায় আছে ? এই বিপদের সময় ওরা হয়ত আমাকে সাহায্য করতে পারত। ভাবতাম, আমার জীবনে হঠাৎ কেন এরকম বিপর্যয় নেমে এল ? শুনেছি বিপদ নাকি দল বেঁধে আসে, তাহলে আর কোন বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে ? আবার ভাবতাম, বিপদের পরেই হয়ত শোনা যাবে সুখবর, কবিরা বলেন পশ্চিমে আঁধার ঘনায় আজ কারণ পূর্বে ভোর হবে আগামীকাল।

একদিন খুব ভোরে ফোন করল রিটা। ওকে খুব অস্থির মনে হলো। বলল, 'এই ছেলে, কী খবর তোমার ?'

আমি বললাম, 'এই তো।' কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বললাম, 'আছি।'

'কই আছ ?' ওর পাল্টা প্রশ্ন। কিন্তু গলাটা ছিল উঁচু।

'তোকে কোথাও পাই না। ব্যাপার কী। দুই দিন গেলাম তোর ওখানে। কোথাও গিয়েছিলে ?' ততক্ষণে ও তুই তুমি গুলিয়ে ফেলেছে।

আমি ওকে চাকরি হারানোর কথা বলতে চাইনি। বলতে চাইনি আমার বর্তমান দুঃসহ জীবনের কথাও। আর কত ভার আমি চাপাব ওর কাঁধে। আমি ভালোবাসতাম ওকে। আমাকে বাঁচাতে ও বিয়ে করল আমাকে। আমি বুঝি এটা

ছিল ওর করুণা। না হলে বিয়ের পর কেন দূরে সরে গেল রিটা। বিয়ের আগে তো আমরা আরও বেশি কাছাকাছি ছিলাম। তাহলে ? শুধু শরীরের জন্যই কি ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বাল্টহাসার স্ট্রাসে ? এই সিদ্ধান্তেই বা আসি কীভাবে ? রিটা কি ভালোবাসে আমাকে ? কেন ভালোবাসে ? ও কী চায় আমার কাছে ?

বিয়ের পর ও আমার কাছ থেকে গুটিয়ে নিল নিজেকে। আর এখন যদি চাকরি হারানোর কথা বলি, তাহলে কী করবে রিটা ? একটা কাজ জোগাড় করে দেবে আমাকে ? কিন্তু তারপর ? আমার সঙ্গে যোগাযোগের সরু যে সেতুটা এখনো আছে, তখন কি সেটাও ভেঙে দেবে রিটা ?

আমার বুকের ভেতরটা ডুকরে উঠল। কান্নার মতো শব্দ হয়ে ওটা ফেটে পড়ল ফোনের এপাশে। তারপর শুধু শোনা গেল 'শাইসে কিড।' ওপাশ থেকে ভেসে এল রিসিভার রেখে দেওয়ার বিকট একটা শব্দ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল রিটা। ওর পরনে ছিল হাঁটু ছাড়িয়ে যাওয়া লম্বা একটা ওভারকোট, তার নিচে ডয়েচে পোস্টের হালকা নীল জামা, পা থেকে জুতাও খুলেনি, একটা কালো বুট জুতা ছিল ওর পায়ে, হাঁটু পর্যন্ত উঠানো, জুতার গায়ে চিনির গুঁড়োর মতো লেগেছিল বরফের কুচি। কোথাও বসল না রিটা। পায়চারি করল সারা ঘরে। জানালার কাছে গেল। বাইরে তখন তুষারপাত হচ্ছিল। গেল কিচেনে। বাতিটা জ্বালাল। নেভাল আবার। সুইচ টেপার শব্দ শোনা গেল। তখনো আমি বসেছিলাম বিছানার কিনারে। একসময় ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

'সেলিম।' ডাকল আমাকে। মুখ তুললাম আমি। ওর মাথা আমার দিকে নামানো। বলল, 'কী হয়েছে তোমার ?'

আমি বললাম, 'কিছু না।'

রিটা হাঁটু মুড়ে বসল কার্পেটে। ওর হাত দুটো আমার হাঁটুতে আর মুখটা আমার পেটের কাছে। সেদিন ওর মাথার চুলগুলো ছিল অন্যান্য দিনের চেয়ে খুব যত্ন করে আঁচড়ানো। চুলের মাঝখানে পরমতলার কাঁচা রাস্তার মতো একখানা সিঁথি। রাস্তাটা কোথাও মোটা, কোথাও সরু। শ্যাম্পুর গন্ধ আসছিল ওর মাথা থেকে। জেসমিন ফুলের মতো। খরগোশের মতো মুখ তুলে ও তাকাল আমার চোখ বরাবর।

'কিচ্ছু হয়নি, রিটা', আবারও বললাম আমি।

আমার দিকে তখন ওর কাতর চাহনি। রিটা নাছোড়বান্দা। না জানা পর্যন্ত ও ছাড়বে না আমাকে।

'অবশ্যই কিছু হয়েছে', জোর করল রিটা।

'তাহলে তুমিই বলো, আমার কী হয়েছে ? আমি বলছি কিছু হয়নি আর তুমি বলছ হয়েছে', মাথাটা একটু নিচের দিকে নামালাম আমি। আমার চিবুকটা তখন ওর মাথা ছুঁই ছুঁই করছে।

'তাহলে তুই কাঁদছিলি কেন ?'

'এমনিতেই।'

'এই ছেলে, খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছ তুমি। আমার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছ, সেলিম ?' রিটার চোখগুলো তখন বড় হয়ে উঠল।

'না, কী লুকাব আমি ?'

'তোমার কাগজপত্র কি কিছু এসেছে ? এখানে থাকা নিয়ে আবার কি কোনো সমস্যা হলো ?'

আমি যতই না বলি, ততই চেপে ধরে রিটা। একসময় আর লুকানো গেল না। যখন সব কথা ওকে খুলে বললাম, তখন ঘড়িতে আটটার মতো বাজে। আধা ঘণ্টা পর আমরা নাশতা করলাম একসঙ্গে। আরও আধা ঘণ্টা পর আমি গোসল করলাম, কাপড় চাপালাম শরীরে। তার পনেরো মিনিট পর বের হয়ে গেলাম কোবলেন্সার স্ট্রাসে থেকে।

রিটা গেল অফিসে। আর আমি কাজের খোঁজে, আরবাইটসামেট। যাওয়ার সময় ও বলে গেল আমার জন্য চাকরি দেখবে রিটা। আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বলিনি।

সপ্তাহ দুয়েক পর রিটা বলল ও একটা কাজ পেয়েছে কিন্তু শহরের বাইরে। কোথায় ? স্টুটগার্টের কাছে একটা গ্রামের বাড়িতে। কী কাজ ? একটা খামারে। ঘোড়ার খামার।

রিটা বলল, ওই খামারের মালিক কয়েক দিনের জন্য যাবেন গ্রামের বাইরে। সে সময় বাড়িটা দেখাশোনা করতে হবে আমাকে। বাগানে পানি দিতে হবে। ঘোড়াটাকে খাওয়াতে হবে, নাওয়াতে হবে। উঠোন পরিষ্কার করতে হবে। পাহারা দিতে হবে বাড়িটা। কাজটা হবে কেয়ারটেকারের মতো।

'আর মালিক চলে আসার পর...' জানতে চাইলাম আমি।

'তখনো চাকরি করতে হবে তোমাকে', রিটার উত্তর।

স্টুটগার্ট ছিল বাডেন ভ্যুরটেমবার্গের রাজধানী। কোলন থেকে আরও দক্ষিণে। শহরের পূর্ব দিকে ছিল ওই গ্রাম। জিন্ডেলফিঙ্গেন। ছিমছাম ছোট্ট একখানা গ্রাম। ছবির মতো সাজানো। ঠিক যেরকম থাকে ক্যালেন্ডারের পাতায়। বাড়িঘর,
রাস্তাঘাট, জমিজমা, গাছপালা, মানুষ টানুষ সবকিছু মাপা মাপা।

রিটা বলল, 'কোলন ছাড়তে হবে আমাকে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে ওখানেই।'

আমার কোনো পছন্দ বা অপছন্দ ছিল না।

পরের সপ্তাহে দুই দিনের ছুটির প্রথম দিনে রিটা এসেই সবকিছু গোছগাছ করল। কতগুলো কার্টন নিয়ে এসেছিল ও। কাপড়চোপড়, থালাবাসন, জুতা, বই হাতের কাছে যা কিছু পেল, তার সব বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে টেপ দিয়ে পেঁচাল রিটা। অনেক কিছুই আমি ফেলে দিতে চেয়েছি। কিন্তু রিটা যতটুকু পারে, নিয়েছে। খুব যত্ন করে একটা বাক্স গোছালাম আমি। ওখানে রাখলাম শীলার পাঠানো কয়েকটা চিঠি, রুমানার হাতে লেখা কিছু কিছু রেসিপি, যে ডায়েরিতে রিটার জন্য লিখতাম একাত্তরের কাহিনি সেই খাতাটা, আদালত আর আউসল্যান্ডারামেটর কিছু কাগজ আর নিলাম রিটার বাড়ি থেকে আনা বাদাম ক্র্যাকার।

এটুকু গোছাতেই সারা দিন কেটে গেল আমাদের। টুকটাক করে কত কী যে জমা হয়ে গিয়েছিল আমার একার সংসারে। রান্নাঘরে হলুদ ও জিরার মতো মশলার কৌটা, ডালের ঘুটনি আর তেল চিটচিটে আঠাল লুছনি, বাথরুমে গোঁফ সমান করার ছোট্ট একটা সিসর ও এক প্যাকেট ব্লেড, বেডসাইড টেবিলে পাওয়া গেল কয়েকটা কনডম, বেসিনের ঠিক নিচে ক্যাবিনেটে পাওয়া গেল এক বোতল নিমের মাজন। বোতলটা নেড়েচেড়ে খুব অবাক হয়ে দেখছিল রিটা। চোখের সামনে ঘোরাল-ফেরাল তারপর কিছুক্ষণ ঝাঁকাল। জানতে চাইল, ওটা কী ?

'দাঁতের মাজন। টুথপেস্টের মতো একটা পাউডার।'

'কী করে ?'

'কেন ? আমি দেখালাম আঙুলের ডগায় পাউডারটা ঢেলে কীভাবে মাজতে হয় দাঁত।

'সেলিম, তুমি পাগল।' হাসতে লাগল রিটা। 'তোমার দাঁতগুলো সাদা আর এই পাউডার কুচকুচে কালো।' হাসতে হাসতে ওটা একসময় কাশির মতো হয়ে ওঠার পর রিটা থামল।

ওর চোখেমুখে তখনো বিস্ময় ছড়ানো। বোতলটার গায়ে যে লেবেল লাগানো, ওটা হা করে দেখছিল রিটা। ওখানে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা দন্ত ক্লিয়ার দাঁতের মাজন। মাঝখানে একটা বৃত্তের ভেতর মহান আবিষ্কারকের ছবি। তার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি।

আমি বললাম, 'এই কাজটা আমি দিনে দুবার করতে চাই, রিটা। সকালে মাস্ট। ফাস্ট ও রাফ।'

রিটা জানতে চাইল কোন কাজ।

আমি বললাম, 'ওটা।'

ও বলল, 'রাতেও মাস্ট নয় কেন, সেলিম, জেন্টলি অ্যান্ড স্লো।'

রিটা যখন হাসতে হাসতে ঘরের এখানে-সেখানে পড়ে থাকা জিনিসপত্র বাকশো পেটরায় ভরছিল, তখন সজলের কয়েকটা বান্ধবীর ছবিও বের হয়ে এল

একটা বইয়ের ভেতর থেকে। রিটা ওগুলোও দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। সোজা করে বাঁকা করে উঁচু করে নিচু করে। কিন্তু ও কিছু বলল না আমাকে। তারপর ছবিগুলো চালান করে দিল কাগজের একটা বাক্সের ভেতর।

ঘর গুছানো যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন বেশ খালি খালি লাগছিল ৪৯ কোবলেন্সার স্ট্রাসে।

বাক্সগুলো মেঝের ওপর ছড়ানো। ফ্রিজটা গুছিয়েই চলে গেল রিটা।

এর মধ্যে আবমেল্ডুং এর কাজটা সেরে ফেললাম আমি। এই শহরের খাতা থেকে আমার নাম কাটা হলো। ওদের দিতে হলো নতুন ঠিকানা।

পরদিন ছিল রবিবার। সকালের দিকে এল রিটা। ও এল একটা লরি নিয়ে। ড্রাইভার আর আমি মিলে বড় বড় বাক্সগুলো তুললাম লরির পেছনে। তার আগে তুললাম গ্রুনডিগ টেলিভিশন, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, ছোট্ট একটা পড়ার টেবিল ও একটা আয়রন স্ট্যান্ড। কোনটার পর কোনটা উঠাতে হবে তার পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় ছিল রিটা।

আমি বসলাম ড্রাইভারের পাশে, আমার বাম পাশে জানালার কাছে বসল রিটা। তারপর গাড়িটা যখন থ্রি পয়েন্ট টার্ন নিয়ে কোবলেন্সার স্ট্রাসে থেকে বের হলো, তখন ঘড়িতে সকাল নয়টা, সাড়ে নয়টার দিকে কোলন ছেড়ে উঠলাম আওটোবানে আর দুপুর তিনটার কিছু আগে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম জিন্ডেলফিঙ্গেন গ্রামে। পথে পড়ল বন, কোবলেন্স, ভিসবাডেন, মাইন্স, মানহাইম, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কার্লসরুহে তারপর স্টুটগার্ট। সেখান থেকে সোজা জিন্ডেলফিঙ্গেনে।

এই গ্রাম ছিল গাছগাছালিতে ছাওয়া। নিরিবিলি। শান্ত একখানা গ্রাম। শীতকালে খুব একটা বোঝার উপায় ছিল না কিন্তু সামারে বা বসন্তে পুরো জিন্ডেলফিঙ্গেনকে মনে হতো ঘন সবুজ গভীর এক জঙ্গলের মতো। ভেতর ভেতরে লুকিয়ে থাকত বাড়িঘর। কখনো-সখনো আকাশে উঁকি দিত গির্জার লাল চূড়া অথবা হাসপাতালের সা সা মাথা।

ঘরে ঢোকার মুখে রিটা বলল আসল কথাটা।

এই বাড়িটা আসলে ওদের। রিটার ছোট ভাই এখানে তার বান্ধবীকে নিয়ে থাকে। আর থাকে একটা ছোট্ট তুলতুলে বেড়াল। ওর নাম কিটি। আর থাকে একটা ফের্ড। ঘোড়াটাকে ওরা ডাকে কাসানোভা। রিটার কাছে শুধু নোভা।

নতুন ঠিকানা

বাড়িটা ছিল অনেকটা ডুপ্লেক্স ধাঁচের, কাঠের তৈরি বিশাল একটা ক্যাসেলের মতো বাড়ির সামনে ছিল খুব বড় বাগান, তার মুখে নকশা করা স্যুইং গেট , বাগানের চারপাশ ঘিরে কোমর সমান ফালি ফালি করা কাঠের দেয়াল। ওই গার্টেনের ভেতর দিয়ে ফিতার মতো সরু একখানা পথ। মূল দরজা দিয়ে ঢুকে একটু সামনে এগোলে বাম দিকে পড়ত একখানা সিঁড়ি, আরেকটু পেছনে ছোট্ট একটা টয়লেট, আরও পরে ছিল মাঝারি আকারের একটা লন্ড্রি রুম, সেখান থেকেও যাওয়া যেত পেছনের বাগানে। কাপড় ধোয়ার ঘরটা যেখানে ছিল, তার ডান পাশেই পড়ত আমার ঘর। বাগানের দিকে বিশাল একটা জানালা । বিছানাটা আগে থেকেই ওখানে ছিল, জানালার কাছে, টেবিলটা পাতা হলো অন্যপাশে, পায়ের কাছে রাখা হলো টিভিটা। টেলিভিশনটার পাশ দিয়ে ছিল প্লাস্টিকের একটা দরজা, কলাপসিবল গেটের মতো, জানালার পর্দার মতো ভাঁজ করা। দরজার পেছনে ছিল একখানা গ্যারেজ। ওখানে পড়েছিল বহু দিনের পুরনো ভাঙাচোরা একটা ভিনটেজ গাড়ি, চাকা চারটা খোলা। ওই ঘর থেকে মাঝেসাঝে পাওয়া যেত পেট্রল অথবা ডিজেলের গন্ধ ।

রিটা গুছিয়ে দিয়েছিল সবকিছু। সপ্তাহ খানেকের মতো ও ছিল জিন্ডেলফিঙ্গেনে, ছিল ওর ভাই গুস্তাভও। ওরা আমাকে চেনাল গ্রামের কোথায় দোকানপাট, কোথায় কোথায় বাজার ঘর আর কোনখানে পোস্ট অফিস, ব্যাংক ও ডাক্তারখানা। প্রত্যেক দিন সকালে নাশতা সেরে ঘরের কাজ কিছুটা গুছিয়ে দুটো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম আমরা দুজন। রিটা নিত গিয়ারওয়ালা একটা সাইকেল, ওটা থাকত গ্যারেজে। আর আমারটা থাকত কিচেনে, ফ্রিজের এক কোনায়, ওটা ভাঁজ করে চাকার মতো গুটিয়ে রাখা যেত।

সকালে উঠে আমার কাজ ছিল আস্তাবল পরিষ্কার করা, বড় বালতিটায় নতুন পানি তোলা, মাটি থেকে বাসি খড় তুলে নতুন খড় বিছানো, তারপর কিটিকে নিয়ে হাঁটতে বের হওয়া। গ্রামের পথ ধরে আমি ও রিটা হাঁটতাম পাশাপাশি। কিটি কখনো আমাদের সামনে আবার কখনো পেছনে দৌড়াত, কখনো কখনো ও

আমাদের পায়ের কাছে এসে খুব দ্রুত লেজ নাড়ত, তখন রাস্তায় হাঁটু ভেঙে বসত রিটা, হাত বুলিয়ে দিত কিটির মাথায়, তারপর ও ডিগবাজি খাওয়ার মতো করে লাফাতে লাফাতে কোথায় চলে যেত, যখন ফিরে আসত, তখন ওকে আবিষ্কার করতাম রিটার কোলে, ওভারকোটের ভেতর রিটার বুকের মধ্যে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে।

আমাদের পথের দুপাশে পড়ত শস্যহীন খা খা করা নির্জন মাঠ। সেখানে উপড়ানো কালো কালো মাটি, মনে হতো পুরোটাই জৈব সার। কোথাও কোথাও ছিল ট্যাবলেটের মতো গোল গোল করে বেঁধে রাখা খড়। চাষের মৌসুমে এসব জমিতে লাগানো হতো গম ও সরিষা। ফসল তোলার সময় যতই ঘনিয়ে আসত, জিভেলফিঙ্গেনকে মনে হতো বিশাল একটা সোনালি চাদর।

রাস্তার দুপাশে ছিল সারি সারি আপেলের গাছ, বাগানের পর বাগান, ওখানে থাকত আলু, বাঁধাকপি অথবা টমেটোর গাছ, ছিল নানা রকমের ফুল। ছোট ছোট টিলার ওপর বাংলোর মতো বাড়ি। কোনোটার সামনে উইন্ডমিল আবার কোনোটার পেছনে কাত হয়ে পরে থাকত পানির ট্যাংক, ট্রাক্টর অথবা মালবাহী গাড়ি।

দুপুরের দিকে আমার কাজ ছিল নোভাকে গোসল করানো। বড় একটা বালতিতে পানি নিয়ে ওখানে সাবান গুলে দিতাম আমি, হাত দিয়ে ওটাকে ফেনা ফেনা করত রিটা, তারপর বড় একটা ব্রাশ দিয়ে ওর গা ঘষতাম দুজনে। লম্বা একটা পাইপ দিয়ে আসা কুসুম কুসুম গরম ভাসার দিয়ে ধুঁয়ে দিতাম নোভার শরীর, শুরু করতে হতো গোড়ালি থেকে তারপর পা, ঘাড় কাঁধ, মুখ, পিঠ ও লেজ। ধোয়ার পর এক হাত লম্বা একটা কাঠি দিয়ে চেপে চেপে ঝেড়ে ফেলতে হতো শরীরের পানি। তুলা যেমন গোপনে পানি শুষে রাখে, তেমনি নোভার পশমের ভেতর পানি লুকিয়ে থাকত। তারপর চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হতো নোভাকে। আমরা দুজন থাকতাম নোভার দুপাশে, রিটা দেখিয়ে দিত চিরুনিটা ধরতে হতো কীভাবে, কেমন করে ওটা পিঠের কাছ থেকে বুকের দিকটায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নামাতে হতো আর কিছুক্ষণ পরপর দেখতে হতো চিরুনির দাঁতের ফাঁকে কোনো উকুন আছে কি না, কখনো নরম চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে হতো আর কখনো লাগত শক্ত চিরুনি, তারপর চাকুর মতো একটা জিনিস দিয়ে পরিষ্কার করতে হতো ক্ষুরগুলো।

গোসল শেষে ওকে খাওয়াতে হতো, দুপুরে খাওয়াতাম হর্স ক্যারট, কখনো কখনো হাতের তালুতে নিয়ে, তবে বেশির ভাগ সময় খাওয়ানো হতো খড়, ওগুলো বিছিয়ে দিতাম পাতলা একটা ঝুড়ির ওপর, খাওয়ানো শেষ হলে ওকে ঘুরিয়ে আনতে হতো আস্তাবলের আশপাশে। নোভার পিঠে বসে থাকত রিটা আর আমি হাঁটতাম ওর পাশে পাশে। আমরা ওকে নিয়ে যেতাম বিশাল একটা মাঠে,

আরও কিছু ঘোড়া আসত ওখানে, নোভা তখন খুশিতে ছটফট করত, এই চারণভূমিটার পেছনে ছিল সরু একটা খাল, তার ওপরে রংধনুর মতো ছোট্ট একটা ব্রিজ। নোভা যখন ঘাস খেত, ব্রিজের ওপর বসে গল্প করতাম আমি ও রিটা।

কাঠের সেতুটার ওপাশে ছিল উঁচু একটা টিলা। তার পাশে ছোট্ট ছিমছাম একটা গোরস্থান।

বাগানের কাজ করতাম সন্ধের কিছু আগে, কখনো নিড়ানি দিতাম মাটিতে আবার কখনো পানি দিতাম গাছে, ছাড়াতাম পুরনো ও মরা পাতা। তখন বাগানে ছিল আওবারজিন, টমেটো ও মিষ্টি কুমড়ার কয়েকটা গাছ, ওষুধ স্প্রে করতাম জমিতে যেন স্লাগ না উঠে, গাছ থেকে আপেল পাড়তাম, তলারগুলো কুড়িয়ে রাখতাম ঝুড়িতে, গাছের নিচে ঝাড়ু দিয়ে এক জায়গায় জড় করতাম আপেলের ঝরা মরা পাতা।

ঝাড়ুটা ছিল বাতাসের, চালানো হতো বিদ্যুতে, ওটা একটা লম্বা পাইপরে মতো ছিল, জোরে জোরে বাতাস আসত, ওই বাতাসে উড়ত পাতাগুলো।

রিটার কোলনে ফিরে যাওয়ার কয়েক দিন আগে গুস্তাভকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আলু তুললাম জমি থেকে। পাঁচ আঙুল মেলে রাখা হাতের থাবার মতো লম্বা একটা শাবল খুব আলগোছে মাটির তলায় ঢুকিয়ে তার ওপর চাপ দিত রিটা। এই কাজটা ও এমনভাবে করত, যেন কোনো আলুর গায়ে চোখা দাঁতগুলো না বসে। ওর হাতের মাপ ছিল নিখুঁত। দুটো গাছের মাঝখানে ও এমনভাবে শাবলটা রাখত, তারপর চাপ দিত যে শুধু শেকড়গুলো ওপরে উঠে আসত। হাঁটু মুড়ে বসে শেকড় থেকে আলু ছাড়তাম আমি। হাতের তালুতে গাছের শেকড়টা নিয়ে ঝাড়তাম চালুনির মতো। আলুগুলো থাকত আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু ঝুরঝুর করে পড়ত কয়লার মতো কালো কালো মাটি। শাবল হাতে নিয়ে ও পেছনে যেত আর আমি বসে বসে সামনে এগোতাম। গাছের পর গাছ। একটা আল শেষ হলে আরেকটা আল। গাছগুলো রাখতে হতো জৈব সার তৈরির সবুজ একটা বিনের ভেতর আর আলুগুলো রাখতাম বেতের ঝুড়িতে।

একসময় বড় বড় চারটা ঝুড়ি উপচে পড়ল ছোট বড় আলুতে। আলাদা আলাদা করে রাখলাম জ্যাকেট ও বেবি পটেটো। মাটি ঝাড়লাম আলুর গা থেকে। শাবলের দাঁত লেগে আহত আলুগুলো আলাদা করা হলো। ওগুলো রান্না হবে আজ ও কাল। তারপর পাটের ছালার মতো দুটো বস্তায় ভরে ফ্রেশ আলুগুলো রাখা হলো মেঝের তলায়, সেলারে। লন্ড্রি রুমের দরজার কাছে একটা ঢাকনা খুলে মই বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেল রিটা। ওপর থেকে বস্তাগুলো আমি তুলে দিলাম ওর হাতে।

আলুক্ষেতে কিছু গাজরও লাগানো হয়েছিল। ওখানে পাওয়া গেল কিছু বেবি ক্যারট। রাতে ওগুলো দিয়ে স্যামন মাছের সঙ্গে স্যুপ রান্না হলো তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় গোল হয়ে তাস খেললাম গুস্তাভ, আমি ও রিটা। তারপর গেলাম শুতে। একসময় রিটা এসে মোটা একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল আমাকে। তার ওপর বিছিয়ে দিল আরও একটা চাদর। ও ভেবেছিল, আমি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছি। চাদর টানার সময় ও যেমন আমাকে ডাকেনি, তেমনি আমিও ওকে বুঝতে দিইনি, আমি জেগে আছি।

বাঁধ ভেঙে গেলে বন্যার পানি যেভাবে হুড়মুড় করে শহরের ভেতর ঢুকে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমার মনের ভেতরও ঢুকে পড়ছিল দুশ্চিন্তার নানা স্রোত। এর পর কী করব আমি ? কত দিন থাকব এখানে, এই নতুন ঠিকানায় ? ঢাকায় আমি কী জানাব ? কী বলব ? ভাবছিলাম, এভাবে আমাকে আর কতকাল বয়ে বেড়াবে রিটা ? ও আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেল কেন ? ও কি আসলেই কখনো আমার কাছাকাছি এসেছিল ? আমার কি উচিত বিয়েটা টেনে যাওয়া ? এরকম হাবিজাবি কত শত কথা !

ঠান্ডায় কাঁপছিলাম আমি। সেই রাতে এই বাড়িটার মাথায় খুব শীত পড়েছিল, সারা বাড়ি হিম হয়েছিল শীতের কুয়াশায়, ইগলুর মতো। কোথাও কোনো শব্দও ছিল না। হয়ত কোনো একটা লেপের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমাতে পারছিলাম না আমি। খুটখাট শব্দ হলো ঘরে। চোখ মেলে দেখি রিটা। ঘরের ভেতর ও পায়চারি করছে। একসময় ও চলে এল খাটের বাম পাশে, জানালার কাছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল হিটারের গা। ওখানে বসে দু-একটা নব ঘুরাল রিটা, তারপর দরজার কাছে উঠে গিয়ে হিটারটা চালু করে দিল। কিছুক্ষণ পর ওখানে একটা শব্দ হতে লাগল, যেন কোথাও কলকল করে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

রাতে যখন ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতাম অথবা দুপুরে নোভার গায়ে চিরুনি চালাতাম কিংবা বাগানে ফুলগাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতাম, আমি ভাবতাম সোফিয়া নোভাকের কথা: কে এই মহিলা ? তিনি কি বেঁচে আছেন এখনো ? থাকলে কোথায় আছেন এবং কীভাবে আছেন ? শেষ পর্যন্ত তার কী হয়েছিল ? তিনি কি পরে বিয়ে করেছিলেন ? তার পরিবারের কেউ কি কোথাও আছে ? তারা কি এখনো পোল্যান্ডে, নাকি অন্য কোথাও ? বহুবার ভেবেছি রিটার কাছে সোফিয়ার কথা জানতে চাইব কিন্তু এখানে আসার পর অতটুকু অবসর আমাদের তখনো হয়নি।

রিটা ব্যস্ত ছিল আমাকে বাড়ির নানা কিছু দেখাতে ও শেখাতে। রিটার হাতে খুব বেশি সময়ও ছিল না। ও চলে যাবে কোলনে। গুস্তাভ যাবে জার্মানির বাইরে। ও আমাকে দেখাত কোথায় পানির স্টপকক, কোথায় ফিউজবোর্ড,

কোনখানে গ্যাসের মূল চাবিটা আর কোনটা কোন দরজার চাবি। একাত্তরের গল্প বলার যে খাতাটা ছিল, ওখানে আমি লিখে রাখতাম সব কিছু। এঁকে রাখতাম দু-একটা জিনিসের ছবিও। তিন-চার দিনেই খাতার এখানে-ওখানে কিলবিল করতে লাগল ফোন নম্বর, কোড নম্বর আর কিছু ঠিকানা। গ্যাস লিক করলে কোথায় ফোন করতে হবে, গ্যারেজের সুইচটা কোনখানে, বয়লারে কীভাবে পানি তুলতে হবে, ওটা কাজ না করলে কাকে ডাকতে হবে, নোভা ও কিটির অসুখ হলে তাদের কোথায় নিয়ে যেতে হবে, এ রকম একগাদা নম্বর ও ঠিকানা।

তারপর ও আমাকে ঘোড়ায় চড়তে শেখাল। কীভাবে লাফ দিয়ে উঠতে হবে নোভার পিঠে, সব সময় উঠতে হতো নোভার বাম দিকে থেকে, তারপর স্যাডলের ওপর বসে পা দুটো ঠিক কীভাবে ঝুলিয়ে দিতে হতো দুপাশে, নোভা যখন হাঁটত তখন শরীরটাকে কীভাবে ওর শরীরের ছন্দের কাছে ছেড়ে দিতে হতো, কীভাবে বসলে নোভার কাছে আমাকে হালকা লাগত, আর যখন নোভা দৌড়াত তখন পিঠটা কেমন করে বাতাসে তুলে দিতে হতো, নামার সময় কোন পা আগে নামাতে হতো, কীভাবে নামলে নোভা বিরক্ত হতো না এসব।

এই কাজগুলো করতে করতে আমাদের সময় কেটে যেত। বেশির ভাগ সময় আমরা থাকতাম বাড়িতে। কিন্তু জিন্ডেলফিঙ্গেনে যেদিন মৃত গাছগুলোর মাথার ওপর সূর্য উঠত, বাতাসে এপাশ-ওপাশ দোল খেত লাইলাক আর হলুদ সূর্যমুখী ফুল, সে দিন আমরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। রিটার ক্যারিয়ারে থাকত টুকিটাকি কিছু খাবার, হয়ত কিছু চিজ তার সঙ্গে বাগেট অথবা কয়েকটা আপেল ও প্লাম আর থাকত দুই বোতল পানি। ওরকম দিনগুলোতে রিটার বুকের কাছে সব সময় ঝুলত ক্যামেরাটা, ফিতেটা থাকত গলায় পেচানো। বেশির ভাগ সময় ও প্রকৃতির ছবি তুলত। হয়ত ঘাসের ডগার ওপর একটা ফড়িং, গোলাপের ঝাড়ে উড়ন্ত কোনো প্রজাপতি, পত্রপল্লবহীন কোনো গাছ থেকে টুপটাপ মাটিতে ঝরছে তুষার, অথবা সাদা বরফের ভেতর থেকে কোথাও উঁকি দিচ্ছে সবুজ কোনো চারাগাছ।

সাধারণত কোনো মানুষের ছবি তুলত না রিটা। তুললেও সেটা ছিল বিরল ঘটনা। বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে রিটা সেই যে আমার কিছু নগ্ন ছবি তুলেছিল, এরপর ও কখনো আমার দিকে লেন্স তাক করেছিল কি না, মনে নেই। ওকে কখনো গুস্তাভের ছবি তুলতেও দেখিনি। কিন্তু দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগ্ন হয়ে ও কীভাবে নোভা অথবা কিটির ছবি তুলত। ও কখনো ক্লান্ত হতো না। তারপর সারা রাত জেগে প্রিন্ট করত ওসব ছবি।

রিটা যে দিন কোলনে ফিরে যাবে, তার আগের রাতে জিন্ডেলফিঙ্গেনে হলো আতশবাজির উৎসব। সেটা ছিল ডিসেম্বরের শেষ রাত। হাত-পা জমে যাওয়ার

মতো শীতের মধ্যেও গ্রামের মানুষগুলো একটা মাঠের ওপরে জড় হলো, ছিল শিশুরাও। সন্ধের পর থেকেই ওখানে শুরু হলো ফান ফেয়ার। বসানো হয়েছিল ক্র্যজি ক্যাসেলের মতো বেশ কিছু রাইড। যত ভিড়ই হোক না কেন গুস্তাভ, আমি ও রিটা সবখানে হাঁটতাম একসঙ্গে। বেশির ভাগ সময় রিটার কোলে থাকত কিটি আর কিটি যখন গুস্তাভের কোলে পাচার হয়ে যেত, তখন আমার ডান হাতের আঙুলগুলো ঠাঁই নিত রিটার গরম মুঠোর ভেতর। মাঠের ওপর দিয়ে যখন হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস বইত, আমার শরীর তখন বরফের মতো জমে যেতে চাইত কিন্তু রিটার হাতের তালু থেকে বয়ে আসা একটা উষ্ণ প্রবাহ বিদ্যুতের মতো বাঁচিয়ে রাখত আমাকে।

গ্রামের মানুষগুলো এসেছিল নানা পোশাকে, বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চারা, কারও গায়ে ছিল ডাইনির জামা, হাতে তার ঝাড়ুটা, কারও কারও মুখে ছিল মুখোশ, ওদের কালো ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লাল রক্ত, কারও পিঠে প্রজাপতির গোলাপি ডানা, কারও গায়ে লাগানো বাদুড়ের পাখা। রিটাও একটা টুপি পরেছিল মাথায়, টুপির দুই পাশে ছিল খরগোশের দুটো কান, ওর ভেতর মিট মিট করে জ্বলছিল লাল, নীল ও সবুজ রঙের আলো।

রাত ঠিক বারোটায় শুরু হলো আতশবাজির খেলা। কত রকমের সেই আওয়াজ আর কত রকমের তার আলো। কোনোটা আকাশের একেবারে ওপরে উঠে যেত, বোমাটা ওখানে গিয়ে ফাটত, তারপর আলোর ফুল হয়ে সেগুলো ঝরে পড়ত, কোথায় পড়ত কে জানে। বেশির ভাগই ছিল গোলাকার, রঙ্গন ফুলের মতো, মনে হতো ছাতার মতো মেলে ধরা আলোর ফুলটা বুঝি এখনই মাথার ওপরে পড়বে, কিন্তু পড়তে পড়তেই ওগুলো হারিয়ে যেত আকাশের গভীরে। কখনো কখনো ওগুলোকে তারার মতো মনে হতো, কখনো লাগত ফুটকির মতো। আতশবাজির কোনোটা রকেটের মতো ওপরের দিকে ছুটত, কোনোটা ঝরে পড়ত ধূমকেতুর মতো আবার কোনোটা ব্যাঙাচির মতো সাঁতার কাটত রাতের আকাশে।

আমাদের মতো কিটির মাথাটাও তখন আলোর খেলার দিকে তাক করা ছিল। পটকার শব্দে মাঝেমধ্যে কেঁপে উঠত কিটি। চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ও তখন কিছু একটা খুঁজত। আর মেলার মানুষগুলো খুঁজত আমাকে, ওরা পিট পিট করে তাকাত, কিন্তু কিছু বুঝতে দিত না, যখন রাস্তায় বের হতাম অথবা দোকানে যেতাম কিংবা কাজ করতাম বাগানে, পথের ও বাজারের মানুষগুলো আমাকে দেখত আড়চোখে, লুকিয়ে লুকিয়ে।

এই গ্রামে সম্ভবত আমিই ছিলাম একমাত্র বিদেশি, সজল যাদের বলত সুভ্যেনির, যদি জানত ও হয়ত আমাকে রিটার স্যুভেনির বলে ডাকত। পশ্চিমা পর্যটকেরা ভারতে বেড়াতে গেলে এই স্যুভেনির আনে গোয়ার সমুদ্রসৈকত কিংবা দিল্লির আগ্রা থেকে, আর আমাকে ও এনেছে শহর থেকে।

আমি বলতাম, 'কেন বিদেশিরা স্যুভেনির হবে কেন ?'

'সবাই না, কেউ কেউ,' জবাব দিত সজল।

'ওরা কারা ?' জানতে চাইতাম আমি। সজলের ঠোঁটে ঝুলে থাকত হাসি।

'যেগুলো কোনো জার্মান মেয়ে বা মহিলার সঙ্গে এ দেশে আসে।'

'যেমন... ?'

সজল বলত, 'ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা যখন ভারতে বা আফ্রিকায় ছুটি কাটাতে যায়, ফেরার সময় ওরা সেখান থেকে নানা রকমের জিনিস নিয়ে আসে। কেউ আনে কলসি, কারও কাছে থাকে ব্রোঞ্জের মা দুর্গা অথবা কাঠের হাতি অথবা গরু কিংবা শ্বেতপাথরের তাজমহল। আর কিছু কিছু মেয়ে ফেরার সময় নিয়ে আসে ট্যাক্সি ড্রাইভার বা রেস্তোরাঁর ওয়েটার। ওগুলোই স্যুভেনির।

তুমুল হাসিতে পেট ফাটত আমাদের।

জিন্ডেলফিঙ্গেনের মানুষগুলো আমাকেও রিটার স্যুভেনির হিসেবে দেখত কি না, জানি না। কিন্তু এ নিয়ে রিটা বা গুস্তাভ ওরা কেউ আমাকে কখনো কিছু বলেনি।

মেলা থেকে বাসায় ফেরার পথে আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনি। আমরা কি ঠান্ডায় জমে গিয়েছিলাম নাকি স্তব্ধ হয়ে ছিলাম আতশবাজির আলো ও শব্দে, সেটা এখন আর স্পষ্ট মনে করতে পারি না। কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে, ঘরে ফেরার পর গুস্তাভ, রিটা আর কিটি চলে গিয়েছিল যার যার ঘরে। জানালার পর্দাটা আমি টেনে দিয়েছিলাম দুপাশে। একটু আগেও যে আকাশে ছিল আলোর উৎসব, সেই একই আকাশ এখন কুয়াশায় মোড়ানো। কোথাও কোনো আলো নেই। দিনের বেলায় যে জানালা দিয়ে বাগানের শেষ মাথায় গোলাপের ঝাড় দেখা যায়, সেখানে এখন শুধুই অন্ধকার।

গরম কম্বলের ভেতর নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি ভাবছিলাম আব্বা ও আম্মার কথা, ভাবছিলাম আমার মায়ের কথাও, আজ কতগুলো বছর পার হয়ে গেল আমি যেতে পারিনি মায়ের কবরের কাছে, কী জানি কেমন আছে ওই কবর। ভাবছিলাম, ওদের এখনো জানানো হলো না আমার ঠিকানা বদলের কথা। এর মধ্যে ওদের কোনো চিঠি কি এসেছে ৪৯ কোবলেন্সার স্ট্রাসের পোস্টবক্সে ? মনে হলো রফিক ও সজলের কথাও, রফিক এখন কোথায় কে জানে, সজল কি থিতু হয়েছে কোনো বান্ধবীর সঙ্গে, এতদিনে ও কি কারও স্যুভেনির হয়েছে ? আমার পরিষ্কার মনে আছে, ২১ নম্বর পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িতে সজলের বাণী ছিল : 'জীবন হলো আইসক্রিমের মতো, এর প্রত্যেকটা ফোঁটা চেটেপুটে খাবে, নাকি চোখের সামনে গলে গলে নিঃশেষ হতে দেখবে, এই দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে, শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সজল কে জানে ! তারপর মনে পড়ল শীলার কথাও, না জানি ও এখন কেমন আছে ? ওদের

সংসারে এত দিনে হয়ত নতুন মানুষ এসেছে, আমার কথা কি ওর মনে আছে ? ও কি ভাবতে পারে যে স্টুটগাটের কোনো এক গ্রামে আতশবাজির খেলা শেষে গভীর রাতে জানালার পাশে শুয়ে আমি ভাবছি ওর কথা ? তারপর ভাবছিলাম রিটা ও গুস্তাভের কথাও, গুস্তাভ কি আমার আর রিটার সম্পর্কের কিছু আঁচ করতে পেরেছে ? কী সম্পর্ক আমাদের ? আমি কে হই রিটার ? ভাবছিলাম জিন্ডেলফিঙ্গেনে আমার শ্বশুর বাড়ি, গুস্তাভ আমার শ্যালক, মানুষ যখন শ্বশুর বাড়িতে যায়, তখন তার কী রকম অনুভূতি হয় ? আমার কি সে রকম হচ্ছে বা হওয়া উচিত ? শীলারও কী এ রকম হয়েছিল ?

এ রকম কত কী ভেবেছিলাম ওই রাতে, কত মানুষ আর কত শত জায়গার কথা। প্রায় সারা রাত জেগেছিলাম আমি। এক বিন্দু ঘুমও ওই রাতে আমার দুচোখে শিশিরের মতো জমেনি। ভোরের দিকে আকাশটা যখন ছাইরাঙা হয়ে উঠল, বাগানে আবছা আবছা ভেসে উঠতে শুরু করল গোলাপের ঝাড়, তখনই মনে হয়েছিল কসওয়াভা গোরার ওই সোফিয়া নোভাকের কথা।

সকালে নাশতার টেবিলে আমাকে দেখে চমকে উঠল রিটা। ওর পিরিচের মাঝখানে পোচ করা একটা ডিম, তার কিনার ঘেঁষে টোস্ট করা দুই স্লাইস রুটি, ওর হাতের ডান পাশে ছিল কফি, তার পাশে গুস্তাভ। আমি টেবিলের এপাশে, আমার সামনে বেতের একটা ঝুড়িতে বড় একটা আনারসের চারপাশে ছড়ানো ছিল একগাদা আপেল, অরেঞ্জ আর কিভি।

'এই ছেলে, রাতে ঘুমাওনি তুমি ?' জানতে চাইল রিটা।

আমি বললাম, 'কেন বল তো ?'

'এই ছেলে' বলে থামল রিটা। তারপর হাতে একটা ফর্ক তুলে ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, 'আয়নায় তোমার চোখ দুটো একবার দেখেছ ?'

'কী হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। ও তখন হাতের কাটাটা ডিমের কুসুমের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। ঘন ও আঠালো হলুদ কুসুমটা ছড়িয়ে পড়ছিল আগ্নেয়গিরির লাভার মতো, পিরিচের মাঝখানে যেখানে একটু গর্তের মতো, ওখানে। তারপর বলল, 'তোমার চোখ দুটো লাল, ডিমের কাঁচা কুসুমের মতো।'

গুস্তাভ ঘুরে তাকাল আমার মুখের দিকে। আমি চোখ দুটো রাখলাম নামিয়ে।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে সেলিম।' রিটা বলল।

তারপর ও উঠে গেল। বেসিনে কল ছাড়ার শব্দ হলো। কিটি কোত্থেকে দৌড়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল গুস্তাভের কোলে।

রিটা চলে গেল দুপুরের দিকে। সকালে ও পুরোটা সময় কাটাল নোভার সঙ্গে। তারপর গুস্তাভ, আমি আর কিটি ওকে নামিয়ে দিয়ে এলাম রেলস্টেশনে। ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে থামল, তখন ও দুহাতে জড়িয়ে ধরল গুস্তাভকে,

ট্রেনটা যখন স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুইসেল দিল, তখন রিটা চুমু খেল কিটিকে, আর ট্রেনটা যখন চলতে শুরু করল, তখন আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল রিটা, ওকে মনে হচ্ছিল একটা কাকতাড়ুয়ার মতো। সেদিন রাতে ঘুমের সময় আমার কোনো হুঁশ ছিল না। ঘুমিয়ে গেলাম সন্ধ্যায় আর উঠলাম পরদিন সকালে, দশটারও পরে। গুস্তাভও ডাকেনি আমাকে। রাতে আমার ঘুম ভাঙেনি একবারও। পরের কয়েক দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম আমি। এর মধ্যে গুস্তাভও চলে গেল। কিটির কী জানি একটা অসুখ হলো। ওকে নিতে হলো হাসপাতালে। টানা এক সপ্তাহ ওকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো। কোনো একদিন ফোন করলাম নাখালপাড়ায়। আম্মাকে যখন বললাম, তিনি শুধু জানতে চাইলেন ঠিকানা বদলের কারণ।

গুস্তাভের ফিরে আসার কয়েক দিন আগে এল বহু প্রতীক্ষিত সেই খবর। সকালে আমি যখন নোভার ঘর পরিষ্কার করছিলাম, তখনই একগাদা চিঠি নিয়ে এল পোস্টম্যান। ওই দিনটার কথা আমার এখনো মনে আছে। কারণ জিন্ডেলফিঙ্গেনের ঠিকানায় ওটাই ছিল আমার কাছে আসা প্রথম কোনো চিঠি। গুস্তাভ আর রিটার কাছে লেখা কয়েকটা চিঠির নিচে চাপা পড়েছিল আমার চিঠিটা। ওটা এসেছিল আউসল্যান্ডরামট থেকে। পোস্টম্যান যখন চলে গেল, গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই খুব সাবধানে খুললাম সাদা খামটার মুখ। হাত কাঁপছিল আমার, খামের ভেতরে টাইপ করা চিঠি, প্রথম প্যারাতেই আমাকে সবিনয়ে জানানো হয়েছে 'জের গ্যেরটার হের সেলিম, এখন থেকে আপনি একজন সম্মানিত জার্মান নাগরিক।'

অন্য এক রিটা

একসময় এই বাড়িটাও আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠল। মুখস্থ হয়ে গেল এর সব কটা দরজা ও জানালা। আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারতাম, কোন দরজাটা কতখানি খোলা হলো আর কোন জানালা লাগানো হলো কীভাবে। বাতাসের শো শো আওয়াজে বুঝতে পারতাম, হাওয়াটা কোন দিক থেকে কোথায় বইছে, বইছে কত জোরে। শুধু বাড়ির ইট-কাঠ-পাথরই নয়, এর সঙ্গে জড়িত প্রাণীগুলোকেও আমি ভালোবেসে ফেললাম অকাতরে । ভালো লেগে গেল বাড়িটার আশপাশের মাঠ, গাছপালা ও রাস্তাঘাট, বাগানে ফুটে থাকা ফুল কিংবা সবুজ চারাগাছ অথবা গাছের নিচে পড়ে থাকা ঝরা পাতার দল।

আমি জানতাম, কত জোরে বাতাস এলে বাড়িটার চারপাশে পাতার সড়সড় শব্দ হতে থাকে, কতক্ষণ তুষারপাত হলে সরাতে হয় আস্তাবলের খড়, লন্ড্রি রুম থেকে কতটুকু কদম ফেলার পর আমার ঘর আর ছাদে চিমনিটার ছায়া যখন বাগান পার হয়, তখন ঘড়িতে কটা বাজে।

আমি মিশে গেলাম জিন্ডেলফিঙ্গেনের সঙ্গে, মনে হলো আমি এই গ্রামের একজন মানুষ, আমার পূর্বপুরুষেরাও বেড়ে উঠেছে এখানকার আলো ও বাতাসে, ফুলে ও ফসলে। একসময় জিন্ডেলফিঙ্গেন আমার কাছে হয়ে উঠল পরমতলার মতো।

মনে আছে, এই গ্রামে একদিন টুপ করে আতঙ্ক নেমে এল। ওর নাম ছিল ম্যাড কাউ । এক সকালে গরুগুলো পাঠানো হলো কসাইখানায়। আরেক সন্ধ্যায় খা খা করতে লাগল সবকটা খামার।

আমার কাছে রিটাদের বাড়িটা ছিল ওয়ান্ডারল্যান্ডের সেই ক্র্যাজি ক্যাসেলের মতো। বাইরে থেকে মনে হতো সাদামাটা ইট-কাঠের একটা দালান কিন্তু ভেতরে গেলে রহস্যময় একেকটা ঘর টেনে নিয়ে যেত আরেকটা ঘরের দিকে। মনে হতো, দরজার ওপাশে কী জানি কী রহস্য অপেক্ষা করছে। রোমাঞ্চিত হওয়ার মতো। মনে হতো কোথাও কিছু একটা ছমছম করছে।

সারা দিন আমি এঘর-ওঘর করতাম। কখনো জানালার কাচ পরিষ্কার করতাম, কখনো ঝাড়তাম কোনায় কোনায় জমে থাকা মাকড়সার ঝুল, হোভার দিয়ে কার্পেটের ধুলো তুলতাম, জানালা খুলে দিয়ে ভেতরে ঢুকাতাম ফ্রেশ বাতাস, কাপড়ে যাতে ছাতা না পড়ে সে জন্য কিছু সময়ের জন্য ওয়ারড্রোব খুলে দিতাম, পরিষ্কার করতাম কিচেনের ওয়ার্কটপ ও বেসিন, টবের গাছগুলোতে পানি দিতাম নিয়মিত, কাঁচি দিয়ে ছেটে ফেলতাম হলুদ হয়ে আসা পাতা, কখনো পুরনো মাটি তুলে গাছের গোড়ায় ঢেলে দিতাম নতুন কম্পোস্ট, ন্যাতানো গাছগুলোকে ব্যালকনিতে নিয়ে রোদ খাওয়াতাম উজ্জ্বল দুপুরে।

আমার সঙ্গে থাকত গুস্তাভ, কখনো কখনো ওর বান্ধবী জিলকেও সঙ্গ দিত। আমাদের রান্না করত ওরা দুজন আর আমি ওদের হেলপার হতাম, নানা রকমের রুটি ও কেক বানাত জিলকে, ওগুলো বানানো হতো শীতের জন্য, তারপর শুকানো হতো, পরমতলার উঠানে, যেভাবে ধান শুকাতেন আমার মা, তেমনি জিলকেও রুটি টুকরো টুকরো করে শুকাতে দিত হিটারের সামনে।

একদিন ওপরের তলায়, বাগানের দিকে মুখ করা যে ঘর, সেখানে সবুজ চোখের ওই মহিলার সঙ্গে আবার দেখা হলো। বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িতে রিটার শোয়ার ঘরে তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। এই বাড়িতেও তিনি কোথাও কোথাও ঝুলছিলেন দেয়ালে, আবার কোথাও বন্দী হয়েছিলেন বিছানার পাশে, চেস্টার ড্রয়ারের ওপর, ফ্রেমের ভেতর। বেশ কয়েকটা ছবি ছিল তার। কোনো কোনো ছবি আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। এগুলোর বেশির ভাগ ছিল বাল্টহাসার স্ট্রাসেতেও। যেমন ভিলার সামনে রঙিন একটা স্কার্ট পরে তার দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটা, অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় ও দাঁড়িয়েছিল পাকা সোনালি গম ক্ষেতের মাঝখানে, বুকের কাছাকাছি কনুই ভাঁজ করা, কোমরের কাছে ঝুলছে বেতের একটা ঝুড়ি।

এই বাড়িতে নতুন যে ছবিগুলো ছিল তার মধ্যে একটা ছিল এরকম : তিনি একটা বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, বাড়িটা কাঠের, আশেপাশে ফাঁকা। তার পরনে ছিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা স্কার্ট, মাথায় টুপি। তিনি একটা ঘোড়ার বুকের কাছে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘোড়াটার মুখ নামানো কিন্তু তিনি তাকিয়ে ছিলেন ক্যামেরার দিকে। আরেকটা ছবিতে তিনি বসেছিলেন ঘোড়ার গাড়িতে, তার পেছনে একটা জঙ্গলের মতো। দূর থেকে দেখলে তাকে চেনার কোনো উপায় ছিল না।

এই ঘোড়াটা ছিল আমার কাছে গভীর রহস্যের মতো। আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না, এগুলো ক্যাসানোভার ছবি, নাকি অন্য কারও। ছবিগুলো ছিল সাদাকালো। বহু বছর আগে তোলা। আমি নিশ্চিত ছিলাম, নোভা কিছুতেই এত

বুড়ো হতে পারে না। ও যেভাবে হাঁটে, দাঁড়ায় অথবা রিটাকে পিঠের ওপরে নিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যেরকম ছুটতে থাকে, তাতে কিছুতেই এই ছবি নোভার হতে পারে না। কিন্তু কোথায় যেন ছবির ঘোড়াটার সঙ্গে নোভার একটা মিল ছিল, যেমন মিল ছিল এই মহিলার সঙ্গে রিটার চেহারার অথবা চুলের কিংবা শরীরের হয়ত চাহনির নয়ত দাঁড়ানোর। একবার মনে হতো ইনি কি রিটার মা, এগুলো কি রিটার তোলা ছবি ? আরেকবার মনে হতো তাহলে ওদের বাবা কোথায় ?

মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম এরপর রিটা যেদিন জিন্ডেলফিঙ্গেনে আসবে সেদিন ওর কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইব। এ জন্যই কি না, জানি না তারপর বহুদিন ও বাড়িতে আসেনি। তখন গুস্তাভও ওর বান্ধবীর প্রেমে বেহুঁশ হয়েছিল।

একসময় এই বাড়িতেও জীবন হয়ে উঠল প্রাত্যহিক রুটিনের মতো, যেমনটা ছিল নাখালপাড়ায় তারপর পিওনিয়ার থেকে কোবলেন্সার স্ট্রাসে। আর শেষ পর্যন্ত এই জিন্ডেলফিঙ্গেনে আমার জীবন হয়ে উঠল চাকরের মতো, মাঝেমধ্যে হয়ত জমিতে সার ছিটিয়ে দিচ্ছি অথবা আগাছা নিড়াচ্ছি বাগানে আর ভাবছি আমি কি সত্যিই এরকম হতে চেয়েছিলাম ? বুকের ওপর হাত রেখে বলতে পারব যে আমি কখনো কোন বাড়ির কেয়ারটেকার হতে চেয়েছিলাম ?

আমার এই স্বপ্নটা কখনো স্থির ছিল না, একেক সময়ে আমি একেক কিছু হতে চেয়েছিলাম, কী কী চেয়েছিলাম, সেগুলোও আমার স্পষ্ট মনে আছে : এক. নাখালপাড়ায় লিচুবাগানের সরু গলিতে হেঁটে যাওয়ার সময় আমি মুদি দোকানদার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম, যার সামনে বয়ামের ভেতর ঠাসা থাকবে শুধু চকোলেট, চকোলেট আর চকোলেট। দুই. ক্লাস টেনের প্রিটেস্ট পরীক্ষার খাতায় আমি হতে চেয়েছিলাম পদ্মা নদীর মাঝির হোসেন মিয়া। আমি স্বপ্ন দেখতাম, আমার নিজের একটা নৌকা থাকবে, গলায় ঝুলবে টেলিস্কোপ, সেই বিরাট নৌকার গলুইয়ে বসে সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নতুন চর খুঁজতে বের হব আমি। তারপর এই স্বপ্ন দেখার দোষে একদিন আমার হাতের তালুতে স্টিল স্কেলের দাগ ফেলে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলেন মাসুদা ম্যাডাম। ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন. তারপর ক্লাসের আর সবার মতো আমিও একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন মুখস্থ করলাম, পরীক্ষার খাতায় আমরা সবাই লিখলাম, আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন, সুতরাং গরিব রোগীদের আমি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করব, পরীক্ষক বিশ্বাস করলেন এবং খুশিতে ডগমগো হয়ে লেটার মার্ক দিয়ে আমাকে পাস করিয়ে দিলেন। চার. কলেজে ওঠার পর স্বপ্ন দেখেছিলাম আর কিছু না হোক অন্তত মতিউর রহমানের খুনি হবো। পাঁচ. শীলাকে বিয়ে করব, ছয়. বিদেশে এসে কাড়ি কাড়ি পয়সা রোজগার করে বাড়িতে পাঠাব আর সবশেষে আমি রিটার সঙ্গে গভীর এক সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

রিটার সঙ্গে আমার সংসার করার এই স্বপ্ন কখনো সাদাকালো ছিল না, রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে আবার দিনের বেলাতেও কাজে ও অকাজে স্বপ্নে দেখতাম রিটার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের: একসঙ্গে ঘুমাতে যাওয়ার আবার একসঙ্গে জেগে ওঠার। সংসারের কতগুলো ছবি আমার সামনে অবিরাম চলত সিনেমার পর্দার মতো। আমরা একসঙ্গে দাঁত ব্রাশ করছি, আমাদের দুজনকেই দেখা যাচ্ছে বেসিনের ওপর বসানো গোলাকার আয়নায়, নীল ও গোলাপি রঙের ব্রাশ দুটো পাশাপাশি একটা গ্লাসের ভেতর, রিটা যখন ঠোঁটে লিপস্টিক মাখছে, আমি তখন দাড়ি কামাচ্ছি, ও যখন পায়ে স্কটিংস পরছে, আমি তখন জুতার ফিতা বাঁধছি, সকালে নাশতার টেবিলে আমরা আলোচনা করছি, ও যখন রুটির ভেতর সালামি ঢুকাচ্ছে, আমি তখন শেষ চুমুক দিচ্ছি কফির পেয়ালায়, আমি বেল দিচ্ছি রিটা দরজা খুলছে, আমার কাঁধের পাশে শুয়ে আছে রিটা, ও আমার বাহুর ভেতর, আমি পত্রিকা পড়ছি, রিটা চা বানাচ্ছে, তারপর বিছানায় যাওয়ার প্রস্তুতি, মাঝরাতে জেগে ওঠা তারপর শুধু রিটার নিশ্বাসের শব্দ।

তত দিনে আমার এই স্বপ্নগুলো মলিন ও ধূসর হয়ে উঠছে। জীবনটা তখন ছিল স্যাঁতসেঁতে ও ফ্যাকাশে। আমি বাড়িতে ফোন করতাম। আম্মার সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে বলতাম এই বিষণ্নতার কাহিনি। ভাবতাম, তিনি হয়ত বুঝবেন, আমাকে বলবেন দেশে ফিরে যেতে। কিন্তু আম্মা বলতেন আমার বিয়ে করার কথা। বলতেন, বিয়ে করলেই নাকি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। জানালেন, কয়েকটা মেয়েও দেখে রেখেছেন তিনি, চাইলে ছবি পাঠাবেন আমাকে। তার কথা ছিল বিয়ে করলে সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে, যেমন সক্রেটিস বলেছিলেন : 'বউ ভালো হলে তো ভালো, আর কোনো কথা নাই, তখন আপনি খুশি, আবার খারাপ হলেও আপনার লাভ, কারণ আপনি তখন দার্শনিক হয়ে যেতে পারেন।'

কিন্তু রিটাকে বিয়ে করার পরে কোনো কিছু ঠিক না হওয়ার কথা আম্মাকে আমি বলতে পারিনি। এই ভালো না লাগার কথা গুস্তাভকে যখন বলেছি, জবাবে ও হা হা করে হাসত। বলত, 'বিষণ্নতা একমাত্র জার্মানদের অধিকার। ওখানে তোমার অনুপ্রবেশ বেআইনি।'

জীবনে আবার যখন মরচে ধরতে শুরু করছিল, তখনই গুস্তাভ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল আরেক রিটাকে।

আমরা সেদিন গোল হয়ে বসেছিলাম ফায়ার প্লেসের সামনে। তিনজনই মেঝের ওপর। আমি বসেছিলাম দরজার কাছে, যোগাসনের মতো, গুস্তাভ জানালার দিকে, সোফায় হেলান দিয়ে, পা দুটো সামনে ছড়ানো, জিলকে ছিল গুস্ত াভের কোলের ভেতর।

খুব শীত পড়েছিল ওই রাতে। মাইনাস কুড়ির মতো। ঠান্ডায় আমার সারা শরীরে তখন ব্যথা করছিল। দুপুর থেকে ঝরছিল তুষার। নোভার ঘরে সেদিন জ্বালিয়ে দিতে হয়েছিল বেশ কিছু কাঠ।

ফায়ারপ্লেসের ভেতর কয়লার ফাঁকে ফাঁকে সাপের জিহ্বার মতো লকলক করে জ্বলছিল আগুন। আমার গ্লাসে ছিল ভোদকা, গুস্তাভ আর জিলকে নিয়েছিল বিয়ারের বোতল। কিছুক্ষণ পরপর ওরা বোতলের মুখে চুমু দিচ্ছিল আর চুমু খাচ্ছিল ওদের নিজেদের মুখে।

রিটা তখন স্পেনে। গুস্তাভই আমাকে জানাল কথাটা। কিন্তু কবে আসবে সেটা ও জানে না।

তারপর গুস্তাভ যে রিটা বাওয়ারের কথা বলল, সে ডয়েচে পোস্টের ফ্রাউ বাওয়ার না, রিটা আমার 'কাকাতুয়া' বা 'কচুরিপানা' না, তার নাম ছিল রিটা নোভাক। জাকসেন হাউজেন থেকে ফেরার পথে ও আমাকে যে মাহিলার কাহিনি শুনিয়েছিল, সেই সোফিয়া নোভাকই ছিল রিটার মা।

বাল্টাহাসার স্ট্রাসে আর জিন্ডেলফিঙ্গেনের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ছিল ওই সোফিয়া নোভাকের।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে গুস্তাভ আমাকে একটা ডায়েরি দিয়ে গেল, ওটা ছিল ফুলতোলা লাল একটা রুমাল দিয়ে মোড়ানো, যেরকম কোরআন শরিফ মুড়িয়ে রাখতেন আমার মা, পুরনো হতে হতে ডায়েরিটার পাতাগুলো জন্ডিসের মতো হলুদ, ছিল রুল টানা কাগজ, সেখানে খুব যত্ন করে লেখা শুধু কয়েকটা পাতা। কালির কলমে আঁকা যুদ্ধের কাহিনি।

আরও একটা রাত আমার ঘুমানো হলো না।

সোফিয়ার ডায়েরি

ডায়েরির পাতায় পাতায় লেখা ছিল টেরনোপলে যুদ্ধের কাহিনি। অগোছালো ও ছড়ানো-ছিটানো। একটা খাতার মতো দেখতে ছিল সোফিয়া নোভাকের ডায়েরিটা। তার কয়েকটা পাতা একসঙ্গে করলে গল্পটা দাঁড়ায় এ রকম :

যতই মাস গড়িয়ে যেতে লাগল, শীতের অবস্থা ততই খারাপ হতে শুরু করল। মাইনাস একুশ তারপর মাইনাস পঁচিশ মাইনাস তিরিশ করে প্রতিদিনই তাপমাত্রা নিচের দিকে নামতে লাগল। তখন জঙ্গলে পালিয়ে থাকা লোকগুলোর কথা মনে হলে ভয়ে কেঁপে উঠতাম আমি, না জানি কেমন করে বেঁচে আছে ওরা, নাকি মরে গিয়ে নিথর লাশগুলো চাপা পড়ে আছে বরফের স্তূপের নিচে ! আতঙ্কে আমার সারা শরীর জমাট হয়ে যেত বরফের মতো। মনে হতো, বেদখল হয়ে যাওয়া পুরো পোল্যান্ডে, সমগ্র ইয়োরোপে, গোটা বিশ্বে যেখানেই যুদ্ধে ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, সেখানেই মানুষেরা পশুর মতো বেঁচে আছে গভীর জঙ্গলে, দুর্গম পাহাড়ে অথবা জলাভূমিতে।

তখন ১৯৪৩ সাল। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। প্রত্যেক দিন আমি ক্যালেন্ডার দেখি আর ভাবি, কবে এই দোজখের অবসান হবে। আমার চোখ আটকে থাকে ক্যালেন্ডারের পাতায়। দিনগুলো পার হতে চায় না কিছুতে। সব সময় ডায়েরি লেখা হয়ে উঠে না। যখন পারি সবটা লিখে ফেলতে চেষ্টা করি একসঙ্গে। অনেক কথা অনেক কাহিনি, অনেক মানুষ অনেক জায়গা। এত কিছু কোথায় লিখি, কখন লিখি। লেখার জন্য সুবিধামত জায়গা পাই না। যেটুকু লিখি সেটাও লিখতে হয় লুকিয়ে। ডায়েরিটা সব সময় সরিয়ে রাখি ট্রাংকের ভেতর, কাপড়ের তলায়, হাঁড়িপাতিলের ভেতর। সময় সুযোগ পেলে ওটা বের করে বলতে চেষ্টা করি মনের কথাটুকু। আর ভাবি, না জানি কখন এই ডায়েরিটাই আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।

জার্মানরা তখন চারদিকে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। চোখ মুখ দেখে বোঝা যায় পুরোপুরি জয়ী হতে খুব বেশি দিন বাকি নেই ওদের। প্রত্যেক দিন আমরা নতুন নতুন অভিযানের কথা শুনি। সৈন্যদের মুখে মুখে শুনি প্রত্যাঘাত, মৃত্যুদণ্ড, শহর দখল আর গণহত্যার কাহিনি।

এই খবরগুলো আমরা পাই জার্মান সেনাদের পার্টিতে। মদ খেতে খেতে ওরা নেশায় চুর হয়ে থাকে। আমরা যে ওদের পাশে, হয়ত মদের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি অথবা নিয়ে গেছি মাংসের বাটি, ওরা সেটা খেয়ালও করে না। যখন ওরা যুদ্ধজয়ের কথা বলে, তখন জোরে জোরে শব্দ করে হাসে আর যখন ওরা দীর্ঘশ্বাসের মতো ফিস ফিস করে, তখন আড়ি পেতে শুনি রুশ সেনারা কোথায় ওদের এক হাত গুড়িয়ে দিয়েছে।

এখন প্রায় প্রতিদিনই পার্টি হয় এখানে। আগের চেয়ে ঘন ঘন হয়, হয় গভীর রাত পর্যন্ত। অফিসার্স মেসের এই পার্টিগুলোতে এসএস সেনাদের সংখ্যাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে, যারা আগের চেয়ে আরও বেশি মাতাল হয়, মেয়েদের কোলে ঢলে পড়ে, তারপর নিয়ে যায় বিছানায়।

গত রবিবার দুপুরে আমি কারখানা থেকে ফিরে আসছিলাম ভিলায়। আমার দুহাতে ছিল সাবান আর টয়লেট পেপার। খুব ঠান্ডা একটা বাতাস বইছিল আর আমি চাইছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিলায় ফিরে আসতে। বেশির ভাগ সময় আমি হাঁটতাম মাথা নিচু করে, যাতে আশপাশে ঘটনা অথবা মানুষজন চোখে না পড়ে। যে পথ দিয়ে আমি কারখানা থেকে ভিলায় ফিরে আসতাম, তার কোনো একটা জায়গায় ছিল ফাঁসির মঞ্চ। আমি সব সময় চাইতাম, যেন ওটা চোখে না পড়ে। সেদিন কিছুটা পথ হেঁটে আসার পর দেখি একদল মানুষের ভিড়, ওরা আমার রাস্তা অবরোধ করে আছে। এসএস বাহিনীর সেনারা নির্দেশ দিচ্ছিল, কেউ যেন ওখান থেকে না সরে। মানুষের মাথার ভিড়ের ফাঁক দিয়ে কোনো রকম গলা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করলাম কী হচ্ছে ওখানে, দেখলাম কয়েক জনকে ফাঁসিকাস্টের কাছে জড়ো করা হয়েছে। তারপর এক পোলিশ দম্পতিকে মঞ্চে উঠানো হলো। তাদের সঙ্গে ছিল দুই শিশু। দূর থেকে চোখে পড়ছিল তাদের কোটের মধ্যে লাগানো হলুদ তারকা।

তারপর লাউড স্পিকারে এদের অপরাধের কথা ঘোষণা করা হলো। কেউ একজন বলল, ইহুদিরা থার্ড রাইশের শত্রু এবং পোলিশরা তাদের গোপনে আশ্রয় দিচ্ছে। যে লোকটা ঘোষণা করছিল, তীব্র উত্তেজনায় তার গলাও কাঁপছিল। এত জোরে চিৎকার করছিল যে মনে হচ্ছিল হয়ত ছিঁড়ে যাবে স্পিকারের পর্দাটা। একসময় সে বলল, ইহুদিদের জন্য অপেক্ষা করছে শুধু মৃত্যুদণ্ড। যেসব পোল ইহুদিদের সাহায্য করবে তাদের পরিণতি হবে এই একই। তাদের কোনো বিচার হবে না, ক্ষমাও করা হবে না ওদের, তারপর লোকটা বলল, 'ইহুদি আর তাদের আশ্রয় দাতাদের পাওয়া গেলেই ঝোলানো হবে ফাঁসিতে।'

আমার চোখের সামনে, প্রকাশ্য দিবালোকে লোকগুলোর কাছ থেকে ওদের জীবন কেড়ে নেওয়া হলো। ওদের ফাঁসিতে ঝুলাতে লাগল না খুব বেশি সময়।

একজনের পর আরেকজনকে মঞ্চে ওঠানো হলো, তারপর একটার পর একটা লাশ ছুড়ে ফেলা হলো ময়লাবাহী ট্রাকের ওপর। কিছুক্ষণ আগেও এই মানুষগুলো জীবিত ছিল। এখন তারা মৃত। জীবনের সমাপ্তি এত সহজ, এত দ্রুত, এটা আমি কখনো ভাবতেও পারিনি। ভিড়ের মধ্যে আমরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম ঝুলন্ত মানুষের শরীরগুলো কীভাবে ঝুলতে লাগল, কীভাবে দুলে দুলে উঠল শিশুদের কচি কচি পা।

ভিড়ের মধ্যে মানুষ যদি ঠেসাঠেসি করে না দাঁড়িয়ে থাকত, আমি হয়ত ওদের মতোই লুটিয়ে পড়তাম মাটিতে। লোকজনকে সরে যাওয়ার জন্য এসএস সেনারা যখন চিৎকার করতে লাগল, আমিও মিশে গেলাম মানুষের স্রোতে। ভিলায় ফিরে আসার রাস্তাটা তখন মনে করতে পারছিলাম না আমি। আমার হাত-পা জমে গেল ভয়ে ও ঠান্ডায়। একসময় নিজেকে আবিষ্কার করলাম ভিলার দরজার সামনে, কোনো দেরি না করে চাবি দিয়ে দরজা খুললাম ভিলার। আমার হাত তখনো ঠক ঠক করে কাঁপছিল। তারপর চাবিসহ হাত দুটো ঢুকিয়ে দিলাম কোটের পকেটে।

সাধারণত ঘরে ঢুকে সবার আগে আমি সেলারে যাই। ওখানে যাদের লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাদের খোঁজখবর নিতে, ওরা কেমন আছে, কিছু লাগবে কি না, তার খোঁজখবর করি প্রথমে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মানুষের মৃত্যু দেখার পর আজ আর ওদের কথা মনে ছিল না আমার। ঘরে ফেরার পর আজ আর কোনো শব্দ করিনি। সেলারে যাইনি। ওরা হয়ত দরজা খোলার শব্দ পেয়েছে অথবা পায়ের আওয়াজে বুঝতে পেরেছে যে আমি ফিরেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দুজন বেজমেন্ট থেকে উঠে এল দোতালার কিচেনে। বুকটা আঁতকে উঠল। এই মানুষগুলোকেই একটু আগে আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেছি।

'সোফিয়া ! কী হয়েছে ? খারাপ কোনো কিছু ?' ক্লারা জানতে চাইল। শুকনো মুখটা আমি ওদের কাছ থেকে লুকাতে চাইলাম।

'আমি...না আমার আসলে ভালো লাগছে না।' ফিসফিস করে বললাম আমি। তারপর কাঁপুনি থামাতে হাত দুটো চেপে ধরলাম শরীরের দুই পাশে। ফাঙ্কা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার হাতটা ও ডলতে লাগল তার মুঠোর ভেতর। 'তুমি তো দেখি জমে গেছ। কী করছিলে তুমি, সোফিয়া ?'

আমি শুনতে পেলাম নিচে দরজা খোলার শব্দ। ভয়ে আঁতকে উঠলাম আমি। আমি ছাড়া এই ভিলার চাবি আছে শুধু মেজর শোয়ামব্যার্গারের কাছে। এখন তো তার ফেরার কথা না। তাহলে কে খুলল দরজা ? ক্লারা আর ফাঙ্কাকে কিছু বলার আগেই কিচেনের সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল মেজর শোয়ামব্যার্গার।

সাইক্লোন বা ভূমিকম্পের মতো কোনো দুর্যোগ আঘাত হানার আগে এরকম মুহূর্ত আসে। মেঝেতে কোনো ক্রিস্টাল পরে যাওয়ার আগে, রাস্তার গাড়ি কোনো কুকুরকে পিষে ফেলার আগে, মাতাল কোনো পুরুষের হাত শিশুর গালে চড় মারার আগে যেরকম স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের ভেতর, তখন সেরকম নীরবতা। সময়ের বিন্দুগুলো তখন আতঙ্কের চাদরে মোড়ানো এবং তারপরই ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবী।

ক্লারা, ফাঙ্কা এবং আমি তখন মূর্তির মতো স্থির হয়ে মেজর শোয়ামব্যার্গারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেজরের চোখে ছিল নিদারুণ বিস্ময়। তার মুখের চামড়া তখন কাঁপছে। কোনো শব্দ করল না মেজর, বলল না কিছুই। তারপর ঘুরে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল মেজর শোয়ামব্যার্গার।

'হলি গড,' ফিসফিসিয়ে উঠল ফাঙ্কা।

কিচেনের দরজা দুহাতে সরিয়ে আমি দৌড়ে গেলাম লাইব্রেরির দিকে।

'জনাব মেজর', কেঁদে উঠলাম আমি।

আমার চোখের দিকে তাকালেন মেজর শোয়ামব্যার্গার। তার চোখগুলো রক্তের মতো লাল, যেন ফেটে পড়বে এখনই। তারপর মেজর চিৎকার করে বললেন, 'সোফিয়া। তুমি আমার এ কী করেছ।' তার ঠোঁট তখন কাঁপছিল, যেভাবে হালকা বাতাসে তিরতির করে কাঁপে নারকেলের পাতা।

আমি হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম মেজর শোয়ামব্যার্গারের সামনে। ওর ওভারকোট হাঁটুর নিচে ঝুলছিল। কোমরের নিচ থেকে একটা বোতাম খোলা।

'এরা তো নিষ্পাপ কিছু মানুষ হের মেজর...' আমার কথাগুলো তখন কাঁপছিল। ভেঙে ভেঙে পড়ছিল মুখ থেকে। তোতলাতে লাগলাম আমি। একসময় কাঁদতেও শুরু করলাম। বললাম, 'ওরা তো কোনো অপরাধ করেনি হের মেজর। আমার চোখের সামনে ওদের কেউ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তারপর মেরে ফেলছে, সেটা তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি না।'

আমি বলতে পারব না মেজর শোয়ামব্যার্গার কথাগুলো শুনছিলেন কি না। তবে তিনি খুব অস্থির ছিলেন। যে তার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছি, সেদিকেও তার খেয়াল ছিল না।

'হের মেজর, আমি তো এর বাইরে আর কিছুই করতে পারতাম না। আর কী করতে পারতাম আমি ? এদের লুকিয়ে রাখার জন্য আমার নিজের তো কোনো জায়গা ছিল না। থাকলে আমি এদের কখনোই আপনার ভিলায় নিয়ে আসতাম না। আমাকে মাফ করবেন জনাব মেজর। দয়া করে ওদের রক্তে লাল করবেন না আপনার হাত। আমি জানি আপনি একজন ভালো মানুষ। আর যুদ্ধ খুব শিগগিরই...'

'যথেষ্ট হয়েছে সোফিয়া, এনাফ ইজ এনাফ', আমাকে থামিয়ে দিলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার। ক্রোধে ও আতঙ্কে তার মুখ লাল হয়ে আছে।

'সোফিয়া তুমি কীভাবে আমাকে এরকম একটা ধোঁকা দিলে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। থাকার জন্য তোমাকে একটা বাড়ি দিলাম, নিরাপত্তা দিলাম। তুমি জানো আমি একজন জার্মান অফিসার। আমাকে তুমি ধ্বংস করে দিলে সোফিয়া।'

মেজর শোয়ামব্যার্গারের বুটের শব্দ সারা ভিলায় তখন বোমার মতো ফাটছিল।

'আমাকে শাস্তি দিন হের মেজর। সব দোষ আমার। ওদের পালাতে দিন। আমাকে আপনার যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু ওদের আপনি বাঁচতে দিন', কাঁদতে কাঁদতে আমি লুটিয়ে পড়লাম মেজর শোয়ামব্যর্গারের পায়ে। 'আমাকে মাফ করুন। আমাকে ক্ষমা করুন।'

ভিলায় তখন ছড়িয়ে পড়ছিল আমার কান্নার আওয়াজ, আর সেই কান্না প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল সেলারের দেয়ালে।

মেজর শোয়ামব্যার্গার তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। ওর চিবুক কাঁপছে। বললেন, 'আমাকে ভাবতে দাও। আমার সময়ের প্রয়োজন।'

আমি জড়িয়ে ধরলাম তার হাত। চুমু খেলাম তালুর উল্টো পিঠে কিন্তু তার মুখে কোনো পরিবর্তন হলো না। একসময় ঘর থেকেও বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমি বুঝতে পারছিলাম সেলারের মানুষগুলো তখন কী রকম ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। নিচে দৌড়ে গেলাম আমি, অন্ধের মতো হাতড়ালাম সেলারের দরজা, ঢুকলাম ভেতরে। সবার মুখ আমার দিকে। ভয়ে ছাই হয়ে আছে ওদের মুখ। রক্তশূন্য চোখ। এদের সবার পরনে জামা, যেন ওরা পালাতে প্রস্তুত।

'তোমরা কেউ বাড়ি ছাড়বে না', ওদের বললাম আমি। তারপর জানতে চাইলাম, 'কোথায় যাবে ? বাইরে পা দিলেই মৃত্যু, এখন যদি তোমরা বের হও, কমান্ডার হাসের লোকেরা তোমাদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু এরপর আমরা এখানে থাকব কীভাবে ? সোফিয়া তুমি কি পাগল হয়েছ ?' লাসারের প্রশ্ন।

'তোমরা সবাই বাঙ্কারে চলে যাও লাসার। আমার জন্য অপেক্ষা করো সেখানে। মেজর হয়ত তোমাদের এখনই বের করে দেবে না। তোমরা কোথায় আছ, সেটা সে এখনো জানে না। আমাকে তোমরা তিন দিন সময় দাও। দেখি কী করতে পারি আমি। আমি যদি ফিরে না আসি, তোমরা তখন এখান থেকে পালিয়ে জঙ্গলে চলে যেয়ো লাসার।'

সেদিন সন্ধ্যায় আমি কারখানায় ফিরে গেলাম। বরফে ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে যখন হাঁটতাম, আমার মনে হতো, আমি মৃত্যুর দিকে হাঁটছি।

ডিনারের সময় একা বসেছিলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার। স্বাভাবিকের চেয়ে সেদিন বেশিই পান করছিলেন তিনি। আমার দিক থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন মুখ।

একসময় কোনো একজন অফিসার তার সঙ্গে কথা বলতে এল। কোনো কথা না বলে হাত নেড়ে মেজর তাকে বলল সরে যেতে। টানা কান্নার পর আমি তখন কিছুটা শান্ত। ঘূর্ণিঝড়ের পর যেমন শান্ত হয়ে থাকে বিধ্বস্ত জনপদ। আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম নির্ধারিত শাস্তির জন্য। জানতাম, শাস্তি নিশ্চিত কিন্তু কী শাস্তি, সেটা তখনো বুঝতে পারিনি। রাতের খাবারের পরপরই আমি ভিলায় ফিরে এলাম। কোলের ওপর হাত দুটো রেখে বসে রইলাম লাইব্রেরির টেবিলে।

ভিলার বাইরে তখন তুষার পড়ছিল আর ঘরের ভেতর শোনা যাচ্ছিল র‍্যাডিয়েটরের হিসহিস শব্দ।

একসময় ঘরে ফিরলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ওই রাতে তার পায়ের শব্দ ছিল এলোমেলো এবং পায়ের শব্দেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি আজ বেশ মাতাল হয়ে ভিলায় ফিরেছেন। লাইব্রেরির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মেজর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ সময়।

'আপনি কি কফি খাবেন হের মেজর ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না', আমার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার।

তখন কী করব বুঝতে পারছিলাম না আমি। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম কিছুটা আর তখনই মেজর শোয়ামব্যার্গার একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। শুধু বললাম, 'হের মেজর...'

আমার দিকে নিচু হয়ে এলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার। দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমার বাহু। তারপর বুকের কাছে টেনে নিলেন আমাকে। বললেন, 'আমি তোমার পুরো কাজটা গোপন রাখব, সোফিয়া।'

তার মুখ থেকে তখন ভুসভুস করে গন্ধ আসছিল ভোদকা ও তামাকের। আমি বুঝতে পারছিলাম, কী হতে চলেছে, তবে আমি সেটা বিশ্বাসও করতে পারিনি। একসময় তার হাত আমার ব্লাউজের বোতাম খুঁজে পেল এবং আমার নাম বলতে বলতে তিনি আমার মুখে ও গলায় চুমু খেতে লাগলেন। ধাক্কা দিয়ে আমি দূরে সরিয়ে দিতে চাইছিলাম তাকে কিন্তু তিনি সজোরে আমাকে টেনে নিলেন তার বুকের ওপর।

'আমি তোমাকে অনেক দিন ধরেই চাইছিলাম, সোফিয়া। তোমার লোকগুলোর কথা আমি গোপন রাখব কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কি তোমার কাছে কিছুই চাইতে পারব না ?'

আমার শরীরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল ভয়ের নতুন একটা স্রোত। আমি ওকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিতে। বললাম, 'ওদের বাঁচতে দিন হের মেজর। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।'

'সোফিয়া, আমি চাইছি তোমাকে। এটা হলো আমার কাছে তুমি যা চাইছ, তার দাম। আমি তোমার লোকগুলোর কথা গোপন রাখব, সোফিয়া', বললেন মেজর শোয়ামব্যার্গার।

আমার চোখ দিয়ে তখন চুইয়ে পড়ছিল পানি। চিবুক ছুঁয়ে ওটা গড়িয়ে পড়ছিল মেঝেতে। অবশেষে পরাজিত হলাম অফিসারের কাছে। হাত ধরে মেজর আমাকে নিয়ে গেল ওপরের তলায়।

পরদিন সকালে আমি যখন চোখ খুললাম, আমাকে ভাসিয়ে নিল লজ্জা ও অপমান। আমি তখন মেজর শোয়ামব্যার্গারের বিছানায় শুয়ে আছি। খামচি মেরে ধরে রেখেছি বিছানার চাদর। আমার গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল অস্ফুট কিছু শব্দ। বাথরুমের দরজা খুলে গেল। ওখান থেকে বেরিয়ে এল মেজর শোয়ামব্যার্গার। সৈনিকের একটা জোব্বা পরছিলেন তিনি। বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন মেজর। আমার দিকে যখন তাকালেন, তখন তার মুখে হাসি। ঠোঁটের কোনায় হাসিটা আরও ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'সোফি, তুমি বলো না যে আমাদের রাতটা খুব বেশি খারাপ ছিল।'

মেজরের এই কথার আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি। তারপর তিনি যখন আমার পাশে বিছানার কিনারায় বসলেন আর হাতটা রাখলেন আমার নিতম্বের ওপর, আমি পারলাম না নিজেকে সরাতে।

'আমি তোমাকে বাঁচাব, সোফি। তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমার লোকগুলোকেও আমি বাঁচাব। আমার ভালোবাসাটা তোমার আরও আগে বোঝা উচিত ছিল। আমি তোমার কোনো খারাপ চাই না, সোফিয়া।'

অনেকটা জোর করেই মাথা নাড়লাম আমি। তারপর একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মেজর শোয়ামব্যার্গার।

ভিলার বাইরে মূল গেটটা যখন বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। নিচে নেমে আমি বাথরুমে গেলাম। চাইছিলাম শরীর থেকে সবটুকু পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলতে। বাথটাবটা গরম পানিতে কানায় কানায় ভরে তাতে কিছুক্ষণ নিজেকে ডুবিয়ে শুয়ে থাকলাম আমি। গোসলের পানি এতটা উষ্ণ আর আরামের ছিল যে আমার চোখ থেকে তখন কয়েক ফোঁটা পানিও সেখানে পড়ল বৃষ্টির ফোঁটার মতো।

আমি জানতাম, এই লজ্জা আমাকে একাই বয়ে বেড়াতে হবে। সেলারের মানুষগুলো কোনো দিন জানবে না, কিসের বিনিময়ে আমি ওদের বাঁচাতে পেরেছিলাম। ওদের জীবনের মূল্য হিসেবে আমাকে কী বিকোতে হয়েছিল, সে কথা আমি ওদের কখনো বলতে পারিনি। ওরা শুধু জানল যে মেজর শোয়ামব্যার্গার ওদের করুণা করেছে।

একদিন বৃষ্টির মতো বোমা পড়ল ভিলার চারপাশে। তারপর রুশ সেনারা মুক্ত করল আমাদের। মেজর শোয়ামব্যার্গারকে বন্দী করে নিয়ে গেল ওরা। তারপর সেলারের ভেতর থেকে গুটিগুটি পায়ে বের হয়ে এল ক্লারা, ফাঙ্কা আর লাসারের মতো এক ডজন মানুষ। লাসারের পেটের ভেতর তখনো বেড়ে উঠছিল আরও একটা নতুন জীবন।

টেরনোপলের এক হাসপাতালে লাসার যেদিন মা হলো, তার ঠিক চার মাস পরেই জন্ম হলো রিটার। ওর ফুটফুটে মুখটার দিকে তাকিয়ে সব কষ্ট ভুলে গেলাম আমি। ওর হাসিতে মুছে গেল পেছনের সব ইতিহাস। তারপর রিটা যখন চিৎকার করে উঠল, তখন অচেনা এক কষ্টে ফেটে গেল আমার বুক।

আমি তখন কাঁদতে পারিনি, যদি পারতাম তাহলে হাসপাতালের চারপাশ বিদীর্ণ করে, রিটার সঙ্গে কাঁদতাম আমিও।

এক মিনিট

যুদ্ধের কয়েক বছর পর আমেরিকায় চলে যায় সোফিয়া নোভাক। ও পোল্যান্ডে থাকতে চেয়েছিল, প্রথমে গিয়েছিল কসওয়াভা গোরায়, তখন রিটা ছিল কোলে, পাহাড়ের ওপর ছোট্ট বাড়িটা চেনার উপায় ছিল না, শুধু ধ্বংসযজ্ঞের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরনো ওই বাড়ি। তার ভেতর ঢুকে যাদের দেখল, তারা সবাই অপরিচিত, ততদিনে বাড়িটাও বেদখল। বাবা-মায়েরও খোঁজ করার চেষ্টা করল ও কিন্তু ওদের হদিস মিলল না কোথাও। গ্রামের কেউ একজন শুধু এতটুকু জানাতে পারল যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সোফিয়ার বাবা ওলেস নোভাক ওকে খুঁজতে নাকি র‍্যাডম শহরেও গিয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি কসওয়াভা গোরায়। বহু দিন ওদের অপেক্ষায় ছিল সোফিয়ার মা। তারপর বাড়ির সামনে যে ফসলের মাঠ আর পেছনে পাহাড়ি ঝরনা ছিল, তার সবই একসময় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তার কয়েক দিন পর সোফিয়ার দুই বোন আর ওর মাকে নাকি শেষ দেখা গিয়েছিল ইক্রেনের কোনো এক জঙ্গলের ভেতর। শুধু এতটুকু শোনা গেল যুদ্ধের পর গ্রামে ফেরত কিছু লোকজনের মুখে।

ওদের কি জন্তু জানোয়ারে খুবলে খেয়েছে, নাকি শত্রু সেনারা হত্যা করেছে অথবা ওদের কি বন্দী করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নাকি তীব্র শীতে খাবারের অভাবে জঙ্গলের ভেতর ওরা মৃত্যুর কাছে নিজেদের বিসর্জন দিয়েছে, সে খবর সোফিয়াকে গ্রামের কেউ দিতে পারেনি। কেউ বলতে পারেনি, ওলেস নোভাক কোথাও বেঁচে আছে কি না, তাকে কি কোনো বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, নাকি যেদিন সে র‍্যাডম গিয়েছিল সেদিনই সে বোমা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিল ফুটপাতে, নর্দমার পাশে !

সোফিয়া নোভাক তারপর কসওয়াভা গোরা থেকে ফিরে গিয়েছিল র‍্যাডম শহরে। শুধু রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াল কয়েক দিন, কোথায় খুঁজবে ও বাবাকে, নার্স হওয়ার জন্য ও যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সেখানেও গিয়েছিল, তখনো সেটা ছিল একটা ধ্বংসস্তূপের মতো। সেখান থেকে লুভোভ হয়ে ও আবার ফিরে এল টেরনোপল। ওখানেও সে থাকতে পারল না। পথেঘাটে, দোকানপাটে মানুষেরা ওর দিকে আঙুল তুলে দেখাত, সোফিয়াকে ওরা ডাকত 'নাৎসি মিস্ট্রেস।'

পোল্যান্ডের কোথাও জায়গা হলো না সোফিয়া নোভাকের। নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, নিজের শহর সবকিছুই নিমেষে অচেনা হয়ে গেল তার। সোফিয়া একজন মানুষও খুঁজে পেল না, যে ওকে একটু আশ্রয় দিতে পারে। ক্লারা, ফাঙ্কা আর লাসারেরও খোঁজ করেছিল ও, কিন্তু কোথাও ওদের কোনো চিহ্ন ছিল না।

টেরনোপলে ফিরে আসার পর প্রথম কয়েক দিন ও মেজর শোয়ামব্যার্গারকেও খুঁজতে চেষ্টা করেছিল।

আমেরিকায় নিজের ছোটখাটো একটা ব্যবসা চালু করেছিল সোফিয়া নোভাক। ও থাকত ক্যালিফোর্নিয়ায়। একটা বিয়েও করেছিল ওখানে। ওর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল স্বামী কনরাড বাওয়ার। লোকটা ছিল জার্মান কৃষক। ও সব জানত। সোফিয়া ওকে ওর জীবনের পুরো কাহিনিটাই খুলে বলেছিল, বলেছিল কসওয়াভা গোরায় ওলেস নোভাকের ছোট্ট সংসারের কথা, র‍্যাডমে প্রথম বোমা পড়ার কাহিনি, জঙ্গলে তাকে খুবলে খাওয়ার পর রুশ সেনারা ওকে কীভাবে মৃত্যুর জন্য বরফের স্তূপের ওপর ফেলে গিয়েছিল, তারপর বলেছিল এসএস কারখানা থেকে ভেরমাক্টের এক মেজরের রক্ষিতা হয়ে ওঠার কাহিনি। এসব শুনতে শুনতে সোফিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছিল কনরাড। তারপর বিয়ে এবং বিয়ের বছর পাঁচেকের মধ্যেই গুস্তাভ বাওয়ারের জন্ম।

আমেরিকায় থাকতেই সোফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল ক্লারার। ও থাকত মিডওয়েস্টে। ক্লারা খোঁজ দিয়েছিল ফাঙ্কার। তখন থাকত জার্মানির উত্তরে স্লেশউইগহোলস্টেইনে, একেবারে ডেনিশ সীমান্তের কাছে, ফ্লেন্সবুর্গ শহরে। ওদের মধ্যে শুধু ক্লারার সঙ্গেই একবার দেখা হয়েছিল সোফিয়া বাওয়ারের।

তারপর একদিন হুট করে মারা যায় সোফিয়া। সকালে নাশতার পর ও যখন কফির জন্য দুধ তৈরি করছিল, তখন বুকের ওপর হাত দিয়ে বসে পড়ল সোফিয়া। আর দাঁড়াতে পারল না। ওর পাশে শুধু কনরাড ছিল। রিটা ও গুস্তাভ ছিল স্কুলে। ওকে হাসপাতালে নেওয়া হলো কিন্তু সেটা ছিল চিকিৎসকদের মুখে শুধু মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

সোফিয়া মারা যাওয়ার বছর তিনেক পর রিটা ও গুস্তাভকে সঙ্গে নিয়ে জার্মানি ফিরে আসে কনরাড বাওয়ার। ওদের বাড়ি ছিল জিন্ডেলফিঙ্গেনে। ওখানে চাষবাস শুরু করে কনরাড। বছর দশেকের মাথায় সেও মারা যায় ক্যানসারে।

এতটুকু আমি গুস্তাভের মুখে শুনেছি। রিটা আমাকে কিছুই বলেনি। আমিও ওর কাছে কখনো কিছু জানতেও চাইনি। শুধু অপেক্ষা করেছি ও যদি নিজে থেকে কখনো কিছু বলে। আমি এখনো বুঝতে পারি না ও কেন আমাকে ওর গল্প বলেনি। বাল্টহাসার স্ট্রাসেতে ও শুধু একবার শুরু করেছিল কিন্তু কখনো সেটা

নিয়ে ও আর এগোতে পারেনি, বা এগোতে চায়নি, কোনটা ঠিক, তাও আমি জানি না আসলে।

রিটার বেশির ভাগ কাহিনি আমি গুস্তাভের কাছে শুনেছি। আমি জানিনা ও কেন আমাকে ওর বোনের গল্প বলেছে। আমাদের বিয়ের কথা ও জানত কি না, এটাও আমি কখনো বুঝতে পারিনি। গুস্তাভই আমাকে জানাল রিটা কেন হুটহাট করে ব্রাজিল, আমেরিকা আর আর্জেন্টিনা চলে যায়। রিটা নাকি কাজ করত সাইমন ভিজেনথাল সেন্টারে। পলাতক যুদ্ধাপরাধীদের সন্ধানে গবেষণা করত এই সংস্থা, করত গোয়েন্দাগিরিও। যেসব নাৎসি কর্মকর্তা যুদ্ধের পর এখানে ওখানে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করত এই ভিজেনথাল সেন্টার।

গুস্তাভ বলল রিটা এবার স্পেনে গেছে আরিবের্ট হাইমের খোঁজে। সেন্টারের কাছে খবর ছিল ডক্টর হাইমকে নাকি দেখা গেছে স্পেনের বিভিন্ন স্থানে। সে থাকত রোজেস শহরে। কখনো তাকে দেখা যেত বাজারে, কখনো কফি শপে। একবার নাকি সে ইবিজা দ্বীপের কোনো একটা হোটেলেও উঠেছিল। তাকে ধরতে স্পেনিশ পুলিশের বহু অভিযানও এর আগে ব্যর্থ হয়েছে।

আরিবের্ট হাইম ছিল জার্মানির জাকসেন হাউজেন ও বুখেনভাল্ড এবং অস্ট্রিয়ায় মাউটহাউজেন বন্দিশিবিরের কুখ্যাত ডাক্তার। আডল্ফ আইখমানের ডান হাত ছিল ও। বন্দীদের কাছে সে পরিচিত ছিল 'ডক্টর ডেথ' বা 'বন্দিশিবিরের কসাই' হিসেবে। অ্যানেসথেশিয়া না দিয়েই ও অপরাশেন করত, নানা রকম বিষের ককটেল ইঞ্জেকশনে ভরে ঢুকিয়ে দিত বন্দীদের শরীরে, হৃৎপিণ্ডে পেট্রল পুশ করত, তারপর স্টপওয়াচ দিয়ে দেখত পুরোপুরি মৃত্যু হতে কতটা সময়ের প্রয়োজন একজন সুস্থ মানুষের, সুস্থ মানুষের শরীর থেকে কিডনি ও ফুসফুস বের করে ল্যাবরেটরির ডেস্কে তা সাজিয়ে রাখত আরিবের্ট হাইম।

যুদ্ধের পরপরই মার্কিন সেনাদের হাতে বন্দী হয়েছিল ড. ডেথ। তবে তার নিষ্ঠুর বর্বরতার কথা প্রকাশিত হওয়ার আগে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। তার কয়েক বছর পর যখন ডক্টর হাইমকে গ্রেপ্তারের তোড়জোর শুরু হয়, তখন সে পালিয়ে যায় তার বাডেন-বাডেন গ্রাম থেকে। ওখানে সে একটা হকি ক্লাবের সদস্য ছিল। তবে পরিচয় গোপন রাখতে টিমের ছবি তোলার সময় সে নিজেকে লুকিয়ে রাখত। নাৎসীযুদ্ধাপরাধের দায়ে বার্লিনের একটি আদালত তার অনুপস্থিতিতে তাকে একবার সাজাও দিয়েছিল।

পরে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া এই দুটো দেশ তার ওপর হুলিয়া জারি করে। ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বিলি করে ছবি আর ঘোষণা করে পুরস্কার।

ভিজেনথাল সেন্টারের কাছে খবর ছিল ডক্টর হাইম তখন বসবাস করত স্পেনের সমুদ্রের উপকূলবর্তী কোনো একটা গ্রামে, এক শিল্পী দম্পতির সঙ্গে, ওরা তাকে আড়াল করে রাখত, বিনিময়ে ওদের অর্থ দেওয়া হতো। জার্মান

সরকারের তরফে স্পেনের পুলিশকে একসময় জানানো হলো যে ডক্টর হাইমের এক ছেলে নাকি বার্লিনের কোনো একটা ব্যাংক থেকে ওই দম্পতির অ্যাকাউন্টে তিন লাখ ইউরো ট্রান্সফার করেছে। কাগজে-কলমে বলা হয়েছে ওই শিল্পীর আঁকা ছবির মূল্য হিসেবে এই অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, কিন্তু সন্দেহ ছিল ভিজেনথাল সেন্টারের। কারণ ওরা ঘন ঘন ডেনমার্ক যেত আর পুলিশ সন্দেহ করত ওখানে ছদ্মনামে একটা টেলিফোন লাইন নেওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে ডক্টর হাইম ওর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

রিটাদের কাছে খবর ছিল নব্য নাৎসিরা ডক্টর হাইমকে ওখানে আশ্রয় দিয়েছে।

শুধু সোফিয়া বা শুধু রিটার কথা নয়, গুস্তাভ আমাকে বলেছিল ক্যাসানোভার কাহিনিও। সেদিন আমরা ঝাড়ু দিচ্ছিলাম গাছতলায়, পাতায় পাতায় ছেয়েছিল ওই উঠোন, তখনই গুস্তাভ আমাকে বলল নোভার গল্প। সেটাও এক অবিশ্বাস্য অসাধারণ কাহিনি। যুদ্ধের সময় সোফিয়া যে ঘোড়ার গাড়িতে টেরনোপলের এসএস কারখানা থেকে ইহুদি বন্দীদের জঙ্গলে রেখে আসত, যে ঘোড়ার গাড়িতে ও খাবার আর কম্বল পৌঁছে দিত অরণ্যে পালিয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছে, সেই ঘোড়াটারই এক নাতি ছিল এই ক্যাসানোভা।

রিটা জিভেলফিঙ্গেনে ফিরে এল বেশ কয়েক দিন পর। স্পেন নাকি কোলন থেকে এসেছিল, সেটা ও আমাকে বলেনি। কিন্তু রিটার আসার কয়েক সপ্তাহ আগে পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটল এই বাড়িতে : বলা নেই, কওয়া নেই আরেক পুরুষের কোমর জড়িয়ে গ্রাম থেকে একদিন পালাল গুস্তাভের বান্ধবী জিলকে। তারপর রাতের পর রাত, দিনের পর দিন মদের নেশায় চুর হয়ে থাকল গুস্তাভ বাওয়ার। মাতাল গুস্তাভকে পিঠে নিয়ে দৌড়ানোর সময় একদিন আছাড় খেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল নোভা। ঘাড় ভেঙে ওখানেই মৃত্যু হলো ওর।

শিশুর মতো চিৎকার করতে করতে কান্নায় ফেটে পড়ল রিটা, ওর সঙ্গে কাঁদল জিভেলফিঙ্গেনও, সপ্তাহ খানেকের মতো বাড়িতে ছিল ও, যে কদিন ছিল, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেনি, জলে উপচানো ছলছল করা দুটো চোখে ও শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কোলনে ফিরে যাওয়ার আগে রিটা আমার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিল। ওটা ছিল তালাকের নোটিশ। সাদা একটা কাগজে দুটো প্যারাগ্রাফ শেষ করতে আমার এক মিনিটও লাগেনি কিন্তু এত দীর্ঘ এক মিনিট আমার জীবনে এর আগে কখনো আসেনি।

জ্যোৎস্নার চাঁদ

এয়ার হোস্টেজ মাইকে ঘোষণা করল আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা জিয়া বিমানবন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি। প্লেনের যাত্রীরা তখন একটু নড়েচড়ে বসল, একটু আগেও যারা এক প্রস্থ খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর একটা-দুটা করে জানালা খুলতে শুরু করল। আমার পাশে ঘুমিয়ে ছিল রিটাও। ও বসেছিল জানালার কাছে। একটা চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল ওর শরীর। চাদরের রংটা ছিল আধা পাকা পেয়ারার মতো। ওর কানের মধ্যে হেডফোন লাগানো। ইএমএসে কোনো একটা ছবি দেখছিল রিটা। এয়ার হোস্টেজের ঘোষণার পর থেকে স্ক্রিনটা ফ্রিজ হয়ে আছে।

রিটার মুখটাকে শিশুর মতো লাগছিল। ও যেভাবে ঘুমায়, তখনো ঘুমাচ্ছিল সেভাবে। ঠোঁটের ডান দিকের কোনায় একটু খানি ফাঁক হয়ে আছে। মাথাটা বাম কাঁধের ওপর শোয়ানো। সারাটা পথ জেগেছিল রিটা। সেই ফ্রাংকফুর্ট থেকে। ও খুব উত্তেজিত ছিল বোর্ডিং পাসটা নেওয়ার পর থেকে, কত প্রশ্ন জমা হয়েছিল ওর মনে, আমরা কোথায় উঠব, কোথায় কোথায় যাব, কী কী করব ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঢাকায় যাওয়া উপলক্ষে রিটা কত কী হই হুল্লোড় করল শেষ একটা সপ্তাহে : সালোয়ার কামিজ কিনল, বাংলাদেশের ম্যাপ কিনল, সাপের কামড়ের কথা ভেবে কিনল এক শিশি কার্বলিক এসিড, ন্যয়মার্কটে বইয়ের দোকান থেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করল বাংলাদেশের ওপর পর্যটনের একটা বই। দিন নেই, রাত নেই রিটা শুধু এই বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল : সুন্দরবনের একটা খালের ভেতর দিয়ে ছুটছে একটা স্পিডবোট, কটকার কাছে খালের কোনো এক পারে কয়েকটা হরিণ, সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্তম্ভগুলো আড়াআড়ি করে একটা ছবি, তারপর একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখ, পাটের আঁশ মাথায় নিয়ে হাঁটছে রুগ্ন এক চাষি, ওর দাড়ির গোছাও পাটের মতো সাদা, মহাখালির সাততলা বস্তিতে কয়েকটা ছেলেমেয়ে, ন্যাংটাই বলা চলে, একসঙ্গে খেলছে, তার নিচে লেখা 'ডি গ্লুকলিশে মেনশ ডের ভেল্ট', ওরা নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ !

মশা প্রতিরোধের জন্য রিটা লোশন কিনল, যেদিন আমাদের ফ্লাইট ছিল তার আগের দিন ও ডাক্তারখানায় গিয়ে বেশ কয়েকটা টিকা নিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে এল ওর বাম হাতের পুরুষ্ট ডানা।

রিটার শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে জানালার ঢাকনাটা তুলে দিলাম আমি। তীব্র একটা আলো তেরচা হয়ে ঢুকল বিমানের ভেতর। বাইরে উজ্জ্বল নীল আকাশ। প্লেনটা তখন উড়ছিল মেঘের ওপর দিয়ে। খুব কাছ দিয়ে ভেসে গেল মেঘেদের দল। গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলাম আমরা এখন ঠিক কোথায় উড়ছি। মনিটরে দেখা যাচ্ছিল প্লেনটা আফগানিস্তানের সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানের এক কোনা ছুঁয়ে ভারতের ভেতর ঢুকছিল। নিচের দিকে তাকিয়েও বোঝা গেল না কিছু। সবুজ নেই কোথাও, নেই পানিও, মনে হলো শুধু কালো কালো পাথর বিছানো।

বাইরেটাও একেবারে ফাঁকা, খাঁ খাঁ করছিল, এই আকাশটাও যেন ইয়োরোপের আকাশের চেয়ে আলাদা।

বিমানটা যখন ফ্রাংকফুর্টের আকাশে ডানা মেলল, তখন আমাদের আশপাশে উড়ছিল আরও কয়েকটা প্লেন। কোনোটা আমাদের নিচ দিয়ে, কোনোটা বহু দূরে একটা খেলনার মতো, আবার কোনোটা আমাদের পাশ দিয়ে আড়াআড়ি উড়ছিল। আকাশটাকে মনে হচ্ছিল একটা অ্যাকুরিয়ামের মতো, যেন সেখানে অনেকগুলো লাল কমলা মাছ পরিষ্কার নীল পানিতে সাঁতার কাটছে।

একবার ভাবলাম, রিটাকে ডেকে তুলি। ও এই আকাশটা দেখুক। আরেকবার ভাবলাম, না থাক আরেকটু ঘুমাক। জানালা দিয়ে আলোটা তখন ওর মুখে এসে পড়ছিল।

হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। এই অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। এটা ছিল দেশে ফেরার অনুভূতি। আজ কতগুলো বছর আমি দেশের বাইরে। কত হাজার দিন, কত হাজার রাত আমি নাখালপাড়ায় হাঁটিনি। পরমতলায় মায়ের কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াইনি। ঢাকার রাস্তায় রিকশায় হুড ফেলে বসিনি। শীলার সঙ্গে এই শহরেই আমার শেষ দেখা হয়েছিল।

আমাদের পরিকল্পনাটা ছিল এরকম : আমি নাখালপাড়ায় গিয়ে উঠব আর রিটা উঠবে সোনারগাঁও হোটেলে, সময় করে আমরা দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার ও বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনে যাব, ওকে নিয়ে যেতে হবে শাঁখারী বাজারেও, পদ্মায় যেখানে ইলিশ ওঠে, সেখানে। রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে আর সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে, নিয়ে যেতে হবে চুকনগরেও। এগুলো নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। ভেবে রেখেছিলাম ট্যুরিস্ট গাইড হয়ে সব সময় আমি

ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকব। কিন্তু ও যে জন্য বাংলাদেশে এসেছে, সেটা হলো পরমতলার মাটিতে পা রাখা, পরমতলার বাতাসে নিশ্বাস নেওয়া, সেটা কীভাবে সম্ভব, আমি তো নিয়ে যেতে পারব না ওকে, আমার মাথার ওপরে তখনো ঝুলছিল হুলিয়া, আমি না হয় ঢাকায় ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারব কিন্তু পরমতলায় ? ওখানে তো প্রত্যেকটা গাছপালা, প্রত্যেকটা মাঠ, ফসলের জমি, প্রত্যেকটা খালবিল আমাকে চেনে !

কখনো ভেবেছি, অন্তত একবার হলেও রিটাকে নাখালপাড়ায় নিয়ে যাব আমি, আব্বা-আম্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, বলব ও জার্মান ট্যুরিস্ট, আসার সময় বিমানে পরিচয় হয়েছে, তারপর রুমানা যদি ওকে পরমতলায় নিয়ে যায়, তাহলে ওরা যাবে।

আমার এই দেশে যাওয়ার কথা আমি কাউকে বলিনি। এর পেছনে ছিল অনেকগুলো কারণ। ওরা আমাকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে চলে আসতে পারত, তখন রিটাকে নিয়ে পড়তে হতো ঝামেলায়, আর খুব বেশি জানাজানি হয়ে গেলে আমার জন্যও হয়ত সেটা নিরাপদ হতো না।

রিটা যখন চোখ মেলল, বিমানটা তখন দিল্লি পার হচ্ছে। বকের মতো মাথাটা উঁচু করে ডিমের মতো গোল জানালা দিয়ে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল ও। কী দেখল, জানি না, তবে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু পাখা ও প্রপেলর। আমার দিকে তাকিয়ে রিটা জানতে চাইল, আর কতক্ষণ লাগবে ঢাকায় পৌঁছাতে।

আমি বললাম, কুড়ি মিনিটের মতো। তারপর রিটা গা থেকে চাদরটা খুলে ভাঁজ করল। হেডফোনটা নামাল মাথা থেকে। স্যান্ডেলে পা গলাল। উঠে গেল বাথরুমে। রঙিন সালোয়ার কামিজের কারণে সবাই মাথা ঘুরিয়ে দেখছিল রিটাকে। ওরা হয়ত রিটাকে আমার স্যুভেনির ভাবছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল রিটা, মাথা আঁচড়াল, গলায় মালা পরল, তারপর এয়ার হোস্টেজ যখন ওর হাতে ল্যান্ডিং কার্ডটা দিল, ও খুব কষ্ট করে বলল, 'দন্যভাদ আপনাকে।' ঢাকায় যাওয়ার টিকেট কেনার পর থেকে ও আমার কাছে কয়েকটা বাংলা শব্দ শেখার চেষ্টা করেছিল। তার কয়েকটা ছিল : 'সুপ্রভাত' 'স্লামালেকুম' 'ভাড়া কত' 'ঠিক আছে' 'আচ্ছা' এরকম আরও কিছু শব্দ।

বিমানটা যখন হাঁসের মতো পা বের করে রানওয়েতে নামছিল, জানালা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বাংলাদেশের মুখ, বহু বছর আগে যে দেশ থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার খুব শীত করছিল তখন, বিমানের ডানায় লাগছিল ঢাকার উতল হাওয়া। রাস্তার ধুলোবালি আর পেট্রলের গন্ধ পাচ্ছিলাম বিমানের ভেতর। রানওয়ের ডান পাশে ছিল একটা গর্তের মতো। ওখানে কানায় কানায় উপচে পড়ছিল পরিষ্কার বৃষ্টির পানি। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফুটেছিল লাল

শাপলা ফুল। তখনই বুঝতে পারলাম, আমি ফিরে এসেছি স্বদেশের মাটিতে। এটা সেই দেশ, যার জন্য যুদ্ধ করেছিল আমার পিতা, এটা সেই দেশ আমার মায়ের রক্তে লাল হয়ে আছে যার মাটি।

ইমিগ্রেশন পার হতে খুব বেশি সময় লাগল না আমাদের। বিদেশি পাসপোর্টের লাইন ওই ভোরে খুব একটা লম্বা ছিল না। মেরুন রঙের রাইজেপাসটা উল্টেপাল্টে দেখল ওরা। তারপর চোখ কুচকে তাকাল, কারণ ওটা মিলছিল না আমার গায়ের রঙের সাথে, তারপর রিটার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি দিতেও ভুলল না অনেকে।

বিমানবন্দরটা আগের মতোই আছে। লাগেজের জন্য অপেক্ষা করতে হলো দীর্ঘ সময়। যখন লাগেজ এল ওটা ছিল কাটা। ভেতরের কিছু জিনিস উধাও। এয়ারপোর্টের বাইরের চেহারায়ও খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। আমাদের নেওয়ার জন্য ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলো কাড়াকাড়ি করল। ঠোঙার মতো মুচড়ানো ক্যাব দেখে ঠোঁট উল্টে গেল রিটার। সোনারগাঁওয়ে যখন পৌঁছালাম, তখন ওরা ভাড়া চাইল ডলারে। আসার পথে রাস্তায় ছিল ওই একই ভিড়। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িটা যখন থামছিল, জানালায় আঙুল ঠুকে কখনো রজনীগন্ধার তোড়া, রান্নাঘরের লুছনি, হাতপাখা, অরুন্ধতী রায়, কদমফুল অথবা দ্য ইকোনমিস্ট বিক্রি করতে এল বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা, আবার কখনো ভিক্ষা চাইল ঢোলপেটের শিশু।

ডাবল বেডের একটা রুম নিল রিটা। হোটেলের কম্পিউটারে আমার নাম দেওয়া হলো আবদুস সেলিম। ঠিকানা দেওয়া হলো জিন্ডেলফিঙ্গেনের। ঘরটা ছিল বেশ বড় এবং দুধের মতো সাদা। রুমটার পূর্ব দিকে, দেয়াল থেকে দেয়াল আর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ছড়ানো বিশাল জানালা। ওখান থেকে গোটা হাতিরঝিল দেখা যেত। তখন ছিল বর্ষার শেষ সময়। ঝিলটা পানিতে কানায় কানায় ভরা ছিল। এক কোনায় বাঁশের মাচার ওপর ছিল কয়েকটা বস্তি ঘর। তার পেছনে একটা রেললাইন। জানালার কাচ খুলে দিলে ট্রেনের ঝিকঝিক আওয়াজ শোনা যেত।

জানালার এক পাশে ছিল শাটল ডোর, তার ওপাশে ছোট্ট একটা বারান্দা।

গোসল করল রিটা। মাথার চুল মুছতে মুছতে ও জানতে চাইল, 'কখন যাবে তোমাদের বাড়িতে ?'

'কী জানি রিটা, ঠিক বুঝতে পারছি না এখনো', বললাম আমি।

'কেন ?' জানালা দিয়ে ও তাকিয়েছিল হাতির ঝিলের দিকে।

আমি বললাম, 'জানি না। একবার মনে হচ্ছে এখনই, আবার ভাবছি রাত হলে তারপর যাই। পাড়ার লোকেরা পুলিশে খবর দিয়ে দিলে জার্মান পাসপোর্ট তো আমাকে লুকাতে পারবে না।'

'তাহলে তুমি নাখালপাড়ায় যেয়ো না। আমার সঙ্গে হোটেলেই থাক।'

রিটা তখন ওর বড় লাল ব্যাগটার ভেতর থেকে একটা গাউন বের করল। চাপাল শরীরে। তারপর বিছানায় কাত হয়ে বলল, 'এখন আমি একটু ঘুমাব। ফ্রেশ হয়ে আমরা বেরোব বিকেলে।'

ওয়ালেট থেকে পকেট ক্যালেন্ডার বরে করে মনে মনে আমি একটা পরিকল্পনা করছিলাম। কবে, কখন, কোথায় যাওয়া যায় তার একটা ছক কষছিলাম আমি। ভাবছিলাম রিটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে নেওয়ার কথা। আমাদের হাতে ছিল মাত্র দুটো সপ্তাহ। কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না আমি। যখন মোটামুটি একটা হিসাব দাঁড় করিয়েছি, তাকিয়ে দেখি রিটা জানালার দিকে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ভেজা চুলগুলো হালকা গোলাপি রঙের একটা তোয়ালের ভেতর গোল করে বাঁধা।

রিটা ঘুম থেকে উঠল বিকেলের দিকে। হালকা কিছু খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। পান্থপথের মোড় থেকে আমরা একটা রিকশা নিলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গেছে ঢাকার রাস্তায়। শিশুপার্ক পার হয়ে আরও একটু সামনের দিকে এগিয়ে কোনো একটা জায়গা রিকশা থামিয়ে নিচের হারিকেনটা জ্বালিয়ে দিল রিকশাওয়ালা। তারপর রমনা পার্ক, প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট, কার্জন হল, দোয়েল চত্বর হয়ে আমরা রিকশা ছেড়ে দিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটে। কিছুক্ষণ বসলাম শহীদ মিনারের বেদীতে।

তারপর একটা স্কুটার নিলাম সোজা নাখালপাড়ায়। সোনারগাঁও মোড়ে রিটাকে নামিয়ে দেওয়ার পরেই বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটানোর শব্দ হতে লাগল। বহু দিন পর আমি ফিরছি লিচুবাগানের গলিতে।

স্কুটারটা যখন পুরনো এয়ারপোর্টের ওখান দিয়ে ঢুকে ডান দিকে ড্রাম ফ্যাক্টরির ওখানে মোড় নিল, তখনই একটা আতঙ্ক এসে চেপে ধরল আমাকে। ভাবছিলাম হঠাৎ আমাকে দেখে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে বাড়ির সবার, ওরা কী মনে করতে পারে আমাকে।

সরু রাস্তাটাও ওই আগের মতোই আছে। খানাখন্দে ভরা, এখানে-ওখানে ইট, বালি, সিমেন্টের বস্তা স্তূপ করে রাখা, এলোমেলোভাবে এখানে-ওখানে রিকশা দাঁড় করানো, এই রাস্তায় রিকশায় করে শেয়ারে ফার্মগেট হয়ে আমি কলেজে যেতাম, মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকত খাতা সেলাইয়ের ভুর হাতে নিয়ে, পাঙ্চার করত রিকশার চাকা, ওদের মাস্তানির দৌড় ছিল এই দুষ্টু রিকশা পর্যন্ত, কিন্তু বখাটে ট্রাকের কাছে ওরা বিড়াল হয়ে থাকত, হরতালের দিনেও এই রাস্তায় রিকশা চলত, এই রাস্তা দিয়েই টেম্পু নিয়ে পুলিশ এসেছিল বাড়িতে, দুই পাশে ডালপুরি আর হালিমের হোটেলগুলোতে আগের মতোই বাজছে হিন্দি গান, 'বিছমিল্লাহ' হোটেলের মাথায় আঁকা খাসি ও মোরগটা আগের

মতোই মোটাতাজা, প্রায় রাস্তার ওপর বসানো চুলায় বড় একটা কড়াইয়ে লোকগুলো ভাজছে সকালের ভাজি, ওরা তখন রাস্তায় নাকও ঝাড়ছে।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সবাই। আব্বা-আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বারান্দায় লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে আমাকে প্রথম দেখল রুমানা। ওর চোখগুলো ফেটে বেরিয়ে আসছিল তখন। তারপর দৌড়ে চলে গেল ভেতরে। কলাপসিবল গেটের তালা খুলল। ওর পেছনে পেছনে এল আব্বা, তার পেছনে আম্মা ছিলেন কিন্তু সবার আগে আম্মাই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, কাঁদতে লাগলেন তিনি। মাথায় ও পিঠে খামচাতে খামচাতে বললেন, 'কী হয়েছে, বাবা ?'

আমি কিছু একটা বলতে চাইছিলাম কিন্তু সেটা গলার কাছে এসে আটকে ছিল। আমার চোখ দিয়েও তখন ঝরছিল পানি।

দরজার মুখেই অনেক সময় কেটে গেল আমাদের। একসময় আব্বা বললেন, 'আগে ওকে ভেতরে এনে বসাও।'

আম্মা ফুঁ দিচ্ছিলেন আমার মুখে। আর বিড়বিড় করে সুরা পড়ছিলেন। তারপর বললেন, 'কোনো বিপদ হয়েছে, আসিফ ?'

আমি বললাম, 'না আম্মা। বিপদ হবে কেন ? আমি কি তোমাদের কাছে আসতে পারব না নাকি ?'

আব্বা বসেছিলেন সোফায়। এক কোনায় দাঁড়িয়েছিল রুমানা। ওর মুখে কোনো কথা ছিল না। ওর গাল দুটো ভেজা। আম্মা হাত ধরে টেনে নিয়ে আমাকে সোফায় বসালেন। তারপর আমাকে জাপ্টে ধরে বসে রইলেন তিনি। আব্বার মুখে তখনো কোনো কথা ফুটল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা সবাই কেমন আছ ?'

কারও মুখ থেকে কোনো জবাব এল না, আম্মা আরও জোরে কাঁদতে লাগল। এই ঘটনায় আমি খুব বেশি অবাক হইনি। কারণ এরকম একটা কিছু যে হবে, সেটা আমি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। রুমানা তখন একটা মগে পানি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এই মগ আমার চেনা। আমারই মগ। বিদেশে চলে যাওয়ার বছর তিনেক আগে আমার জন্মদিনে এটা উপহার দিয়েছিল শীলা। মাটির তৈরি। হাতলটা মিকিমাউসের লেজের মতো বাঁকানো।

আমি যখন মগটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম, তখনই মুখ খুললেন আব্বা। বললেন, 'আসার আগে কি আমাদের জানানো যেত না ?' ওনার চোখেমুখে একটা চোরাহাসি লুকানো ছিল কিন্তু সেটা তিনি শিক্ষকের রাগ দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছিলেন।

'আপনাদের সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম', আমি বললাম।

কেউ কোনো কথা বলল না তখন। ততক্ষণে রুমানা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আম্মা ব্যস্ত হয়ে গেলেন রান্নাঘরে। আব্বা সারাক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সোফায়।

খাওয়ার টেবিলে যখন বসলাম, তখনই দেখলাম মাকে। আমার মুখোমুখি দেয়ালে ঝুলছিলেন তিনি। এত দিন পর আমাকে দেখে বাড়ির সবার মুখই নানা প্রশ্নে ছেয়েছিল, সবার মধ্যেই কত কী পরিবর্তন হয়েছে, আম্মার পান খাওয়া দাঁতগুলো আরও কালো হয়েছে, আব্বার চশমার কাচ আগের চেয়ে আরও ভারী, আগের তুলনায় রুমানা এখন আরও বেশি নারী কিন্তু কোনো ভাবান্তর ছিল না আমার মায়ের মুখে। অবিকল সেই একইরকম আছে তার মুখ। আমার দিকে তাকিয়ে আগে যেমন করে হাসতেন, এখনো ঠিক একইভাবে তাকিয়েছিলেন আমার প্লেটের দিকে। তার চোখের মনিতে কাচের মতো পরিষ্কার মন ভুলানো হাসি।

অনেক রাত পর্যন্ত ড্রইং রুমে বসে গল্প করলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর আব্বা চলে গেলেন ঘুমাতে। আমি বললাম আমার পাসপোর্ট পাওয়ার কথা, রুমানা জানতে চাইল আমার রান্নাবান্নার কাহিনি, ওর কটা রেসিপি আমি চেষ্টা করেছি, আমি বললাম জিন্ডেলফিঙ্গেনে আমার নতুন চাকরির কথা, আম্মা জানতে চাইলেন আর কত বছর আমি বিদেশে থাকব, রুমানা জানতে চাইল কত দিন ঢাকায় থাকব, আমার লাগেজ কোথায়, তারপর আমি যখন রিটার কথা বললাম আম্মা আমার বিয়ের কথা পাড়লেন, বললেন, দুয়েকটা মেয়ে তিনি দেখেও রেখেছেন, এখন আমাকে দেখানো হবে, আর পছন্দ হলে অ্যাংগেজম্যান্টটাও সেরে ফেলতে চান তিনি।

আমি তখন মনে মনে কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। বললাম, 'আমি ঢাকায় এসেছি ওই জার্মান মহিলার সঙ্গে। তিনি একজন পর্যটক। আমার কাজ হলো তাকে বাংলাদেশের কয়েকটা জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো। আমি হলাম তার গাইড।'

'আসিফ ভাইয়া', সেই অতি পুরনো কিন্তু চির নতুন ওই ডাক রুমানার, 'ওনাকে আমাদের বাড়িতে একবার নিয়ে আসবে না ?' ও জানতে চাইল।

আমি বললাম, 'দেখি...'

আম্মা চলে যাওয়ার পর ও বলল ধুমধাম করে শীলার বিয়ে হওয়ার কথা। বলছিল ফিসফিস করে। চুপ করে রইলাম আমি। তারপর ও জানতে চাইল শীলার চিঠির প্যাকেটের কী হবে। রুমানাকে ওটা ফেলে দিতে বললাম আমি। ও অবাক হলো না।

তারপর আমি ঘুমাতে গেলাম কিন্তু ঘুম হলো না। সকালে টিউবওয়েল চাপার শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু সেই শব্দটা হলো না। অপেক্ষা করছিলাম ব্যাঙ ডাকার মতো কারও গলা পরিষ্কার করার কিন্তু সেটাও শোনা গেল না এত দিন পর। সবকটা ঘরে সারা রাত শুধু শোনা গেল খুটখাট শব্দ, হয়ত ওই রাতে নাখালপাড়ার এই বাড়িতে আমরা চারজনই জেগে ছিলাম।

আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করলাম সারা দিনের জন্য। প্রথমে গেলাম রায়ের বাজার বধ্যভূমি, ওখান থেকে সাভারে, জাতীয় স্মৃতিসৌধে। রিটাকে বললাম, এই বধ্যভূমিতেই পাওয়া গিয়েছিল বদিউজ্জামান, শাহজাহান ও কামরুজ্জামানের লাশ, ওরা ছিল তিন ভাই, স্বাধীনতার মাত্র একদিন আগে, ১৫ই ডিসেম্বর, আলবদর, রাজাকাররা তাদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। ওকে বললাম ঢাকার গ্রিনল্যান্ড কোম্পানির চিফ একাউন্ট্যান্ট দেলোয়ার হোসেনের কথা, যিনি রায়ের বাজার থেকে সেদিন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৪ তারিখ সকালে শান্তিবাগের বাসা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আরও কয়েকজন ছেলেকেও ধরেছিল আশপাশের এলাকা থেকে। তারপর ওদের একটা বাসে তুলল, শার্ট খুলে ওদের চোখ বাঁধা হলো, হাত বাঁধা হলো পেছনে, বাসটা আরও কয়েকটা জায়গায় থামল, ওখানে আরও কিছু ছেলেকে ওঠানো হলো, তারপর একটা ঘরে নিয়ে রাখা হলো ওদের, আরও কিছু মানুষ ছিল ওখানে, গভীর রাতে শোনা গেল মানুষের চিৎকার তারপর ওদের আবার বাসে উঠানো হলো, একসময় ওই লোকগুলোকে বাস থেকে নামানো হলো, লাইনে বসানো হলো, ওখানে ছিল বড় একটা বটগাছ, তার সামনে বিশাল একটা বিল, মাঝেমধ্যে পুকুরের মতো, গভীর অন্ধকারে বেয়নেট দিয়ে জল্লাদেরা শুরু করল তাদের হত্যালীলা, হাতের বাঁধন খুলে একসময় তিনি জোরে দৌড়াতে শুরু করলেন, পেছনে গুলির শব্দ হলো, ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুকুরে, নিজেকে সারা রাত লুকিয়ে রাখলেন কাদার ভেতর, তারপর সাঁতার কেটে বিল পার হয়ে সকালে উঠলেন বস্তির একটা ঝুপড়ির ভেতর, ওখান থেকে পরদিন ফিরে এলেন ঢাকায়।

রায়ের বাজারেও অনেকক্ষণ ধরে ছবি তুলল রিটা। এত ছবি তুলল যে ক্যামেরার রিল শেষ হয়ে গেল। আমিন বাজারের কাছে গাড়ি থামিয়ে একটা স্টুডিও থেকে ফিল্মের কয়েকটা রিল আর ব্যাটারি কিনল রিটা। তারপর গাড়িটা যখন ব্রিজ পার হয়ে শো শো করে ছুটতে লাগল, তখন আমি ওকে শোনালাম শামসুর রাহমানের কবিতার বাকি অংশটা :

'...ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের
সারিবদ্ধ দাঁড়
করিয়ে নিমিষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি
ঝরালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না।
হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে
ক্যাম্পাসে বাজারে
বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে,
আমি তো তোমাদের জন্যে অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।
আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের।'

সাভার থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ যানজটের কবলে পড়ল আমাদের গাড়ি। এই যট শুরু হয়েছিল আরিচা থেকে। ঢাকার গাবতলী পর্যন্ত। রাস্তার সামনে অথবা পেছনে কোনো দিকেই সরছিল না কোনো গাড়ি। সবকিছু যেন একটা জায়গায় স্টিল হয়ে আছে। আমাদের সামনে-পেছনে যতগুলো গাড়ি ছিল, তার বেশির ভাগই ছিল ট্রাক। ওগুলোর ওপরে দড়ি দিয়ে বাঁধা বিশাল বিশাল সব গরু। তখন ওর কপাল কুঁচকে ছিল। মুখে ছিল বিরক্তির রেখা। রিটার যে কয়েকটা মুখ আমার মনের গভীরে এখনো খোদাই হয়ে আছে, এই ছবিটাও ছিল সেগুলোর একটা।

দিনের বেলায় আমি রিটার সঙ্গে কাটাতাম। ওকে নিয়ে যেতাম এখানে-ওখানে, রাতে এসে ঘুমাতাম নাখালপাড়ায়। চুকনগর থেকে ফেরার পরদিন ওকে নিয়ে গেলাম আমাদের বাড়িতে। ঘরে ঢুকেই ও আম্মার পা ছুঁয়ে সালাম করল। এই জিনিসটা রিটা কোথায় শিখল আমি জানি না। ও খুব আনন্দ করল ওই রাতে, গল্প করল রুমানার সঙ্গে, অত রাতে আব্বা কোত্থেকে ডাব কিনে আনলেন কে জানে, উনি ভাবলেন এই ফল দেখে রিটা হয়ত অবাক হবে, তারপর উনি ওকে বোঝাতে লাগলেন এটা কেমন করে নারকেল হয়। বললেন জার্মান ফুটবল, ফ্রানৎস বেকেনবাওয়ার আর এডমুন্ড হুসেরলের ফেনোমেনোলজি দর্শন ওনার কত প্রিয়, কিন্ডারগার্টেন, রুকসাক ও ব্লিৎসক্রিগের মতো আর কী কী শব্দ বাংলা ভাষাতেও চালু হয়েছে।

ফেরার সময় আম্মা রিটাকে জড়িয়ে ধরল, ওর হাতে তুলে দিল আটপৌরে একটা সুতি শাড়ি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আব্বা, সব সময় যেরকম থাকেন,

শুধু বললেন, ‘আউফভিডারজেন।’ ছেলে জার্মানি থাকে বলে এরকম দুয়েকটা শব্দও তিনি শিখে নিয়েছিলেন।

স্কুটারে বসে রিটা আমাকে জানাল, ওরা পরমতলায় যাচ্ছে পরশু দিন সকালে। ওকে নিয়ে যাবে রুমানা। একটা গাড়ি নিয়ে সকালে যাবে, ফিরবে সন্ধ্যার আগেই। আব্বা-আম্মাকে কিছু জানানো যাবে না। আমার কাজ শুধু একটাই। সকালে আমি যখন নাখালপাড়া থেকে হোটেলে যাব, তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব রুমানাকেও। বাড়ির লোকেরা জানবে যে ও সারা দিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা বেড়াতে যাব বুড়িগঙ্গায় আর সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরীতে।

রিটা পরমতলায় গেল কিন্তু যে মানুষটা ফিরে এল সে আর রিটা ছিল না, ওর মধ্যে তখন অনেক পরিবর্তন। ঢাকায় ফেরার পরপরই আমাদের সুন্দরবন যাওয়ার কথা ছিল। গাইড ট্যুরের একটা নৌকা বুক করা ছিল আগে থেকে, কিন্তু রিটা বলল ও নাকি আর সেখানে যাবে না। শুধু সুন্দবরন নয় আর কোথাও যাবে না রিটা। ও চায় যেটুকু দেখা হয়েছে, ওটুকুই ওর বাংলাদেশ হয়ে থাকুক। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, ওর কী হয়েছে, ও কেন হঠাৎ এমন মত বদল করল, কেন ও আর কোথাও যেতে চাইছে না। জানতে চাইলাম, ‘পরমতলায় কি খারাপ কিছু হয়েছে ?’ ও বলল, ‘না।’ আমি জানতে চাইলাম, ‘তাহলে ?’ ও বলল, ‘কিচ্ছু না।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাহলে যে তিন দিন হাতে আছে, ওই তিন দিন কী করবে তুমি ?’ জবাবে ও কিছু বলল না আমাকে।

‘তাহলে ?’

‘তাহলে কী ? এক কথা কেন বারবার জিজ্ঞেস করছ, আসিফ ? আমি তো তোমাকে আটকে রাখছি না। তোমার কোথাও যাওয়ার থাকলে তুমি যাও।’

বুঝতে পারলাম আমার আসল নামটা ও রুমানার কাছ থেকে জেনেছে। এ জন্যই কি রিটা রাগ করেছে আমার ওপর ? এতে রাগ করার কী আছে ? মানুষের কি একটার চেয়ে বেশি নাম থাকতে পারে না ? আর একজনের সব কটা নাম তো সবার জন্য না। তাহলে ? আমিও তো পারতাম রিটার ওপর রাগ করে থাকতে। ও তো কখনোই আমাকে বলেনি যে ওর নাম আসলে ছিল রিটা নোভাক। সোফিয়া নোভাক ওর মা। আমি তো ওকে কখনো বুঝতেও দিইনি যে ওর ইতিহাসের সবটাই এখন আমার জানা। আমি অবশ্য জানি না, রিটা আমার ওপর রাগ করে আছে কি না। এগুলো ছিল আমার আন্দাজ। তাহলে রুমানা কি ওকে শীলার কথা বলেছে ? বললেই বা কী ? আমার কি কোনো প্রেম থাকতে পারে না ? রিটাও তো কখনো বলেনি যে ও আমাকে ভালোবাসে ? নাকি রুমানা ওকে বলে দিয়েছে যে মা আমার জন্য মেয়ে দেখছে ? বললেই বা কী, আমি তো আর দেখছি না, আর দেখলেই বা কী, ও তো আমাকে অনেক আগেই তালাক দিয়েছে !

আমি ছুটে গেলাম নাখালপাড়ায়, রুমানার কাছে জানতে চাইলাম পরমতলায় ওরা কী কী করেছে। রুমানা যা বলল, সেগুলো ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমি জানতাম, একাত্তরের যেসব গল্প ও আমার কাছে শুনেছে, সেগুলোই সে নিজের চোখে দেখতে চাইবে। ওরা গিয়েছিল সেফারা বাজারে। দাঁড়িয়েছিল বটগাছটার গোড়ায়। দুধওয়ালার বাড়িতেও নাকি গিয়েছিল রিটা। আর ফেরার আগে গিয়েছিল মতিউর রহমানের বাড়িতেও।

আমাদের বাড়িতেই ও ছিল বেশির ভাগ সময়। ঘরের কোথায় গর্তটা ছিল, কোথায় মা আমাকে নিয়ে পালিয়েছিল, কোন ঘরে রুকা পাগলিকে বন্দী করে রাখা হতো, কোন দাওটা দিয়ে ও চেয়ারম্যানকে কুপিয়েছিল, এসবই নাকি দেখতে চেয়েছিল রিটা। উঠোনের যে জায়গাটা মায়ের রক্ত শুষে খেয়েছিল, ওখানে গিয়ে কতক্ষণ বসেছিল রিটা, বসেছিল পুকুরের ঘাটেও, যেখানে মা আমাকে গোসল করাত। আর সব শেষে যখন ওরা ফিরে আসছিল পরমতলা থেকে, তখন ওরা গিয়েছিল মায়ের কবরের কাছে। ওখানে ও দাঁড়িয়েছিল নীরবে। রুমানা তখন নাকি ওকে কাঁদতেও দেখেছে।

'আসিফ ভাইয়া', রুমানা ডাকল আমাকে।

আমি বললাম, 'হু...'

'উনি যে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলেন, সেই রুমালটা আমি তোমার কাছে দেখেছিলাম।'

'কোনটা ?'

'শীলা আপার দেওয়া।'

'ওহ্।' আমি না জানার ভান করলাম।

'ওটাতে লাল রক্ত দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম ওনার নাক দিয়ে বুঝি রক্ত পড়ছে। উনার মুখটা যখন ভালো করে দেখতে গেলাম, তখনই ওই রুমালটা চোখে পড়ল।'

'তোদের কি কোনো সমস্যা হয়েছিল ওখানে ?'

'না তো।'

'মতিউর রহমানের বাড়িতে তোদের কি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছে ? কেউ আমার কথা জানতে চেয়েছে ?'

'বাড়িতে কেউ ছিল না, ভাইয়া। শুধু একজন কেয়ারটেকার ছিল।'

রিটার কী হয়েছে, আসলেই কিছু বুঝতে পারলাম না তখনো। আর তো তিনটা দিন। তারপর আমরা ফিরে যাব জিন্ডেলফিঙ্গেনে। আমিও কিছু বললাম না রিটাকে। রিটাও বলল না আমাকে। পরের দুটো দিন আমার কাটল নাখালপাড়ায়। আব্বার কাছে শুনলাম আমার মামলার কাহিনি, আপাতত ওটা স্থগিত হয়ে আছে, বিচারকের সঙ্গে নাকি মোটামুটি রকমের একটা দফারফাও

হয়েছিল, তিন লাখ টাকা দিলে পুরোপুরি খালাস করে দেবে আমাকে, তবে এর কতটুকু সত্য, সে বিষয়ে তিনি খুব বেশি নিশ্চিত নন, কারণ সবটাই হয়েছিল মুহুরির মাধ্যমে। আমাকে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন মুহুরির কাছে।

আমি বললাম, 'এবার আর হবে না, আব্বা। এখন তো সময়ও নেই হাতে। পরের বার দেখা যাবে।'

তারপর তিনি জানতে চাইলেন, জার্মানিতে আমি আসলে কী করি, ওখানে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আমি চাইলে আরও লেখাপড়া করতে পারব কি না, এসব। দেশ ছেড়ে পালানোর সময় আব্বা যা কিছু বলেছিলেন, এবার বললেন তার চেয়েও বেশি। সেবার শুধু বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি কী আর বলব, তুমি তো যথেষ্ট বড় হয়েছ, যা ভালো মনে করবে, তুমি সেটাই করো, আমি শুধু একটা কথাই বলব, তুমি সব সময় তোমার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবে।'

আব্বার এই কথাটা পরে আমি সজল আর রফিককে বলেছিলাম। সজল আমার চোখ বরাবর তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর বাপ স্বাস্থ্য বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, সেটা কি তুই জানিস ?'

আমি বলেছিলাম, 'কী ?'

'তোর বাপ তোকে কনডমের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।' তারপর হাসিতে ফেটে পড়ছিল ওরা দুজনেই।

পরের দিনও রিটা হোটেলে থাকল। সন্ধ্যার পর আম্মার সঙ্গে দেখা করতে বাসায় এলেন মোটামতো একজন মহিলা। ওনারাও নাখালপাড়াতে থাকেন। ওনার সঙ্গে ছিল চুল বেণি করা একটা মেয়ে। ও পড়ত ভিকারুন্নিসায়। মেয়েটার নাম ছিল শাহানা। ওর মুখটা পরোটার মতো। চার কোনা।

আমাদের ফেরার কথা পরশু। এর মধ্যে খুব জ্বর উঠল রিটার। একশোরও বেশি। তারপর একসময় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল ওর শরীর। রিটা চাইছিল আমি যেন ওর সঙ্গে থেকে যাই হোটেলে।

পরদিন খুব ভোরে আমি বিদায় নিলাম নাখালপাড়া থেকে। এবার কান্নায় ঘর ভাসাল রুমানা। আঁচলে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন আম্মা। আব্বা দাঁড়িয়ে ছিলেন তার পেছনে। স্কুটারটা যখন ভটভট শব্দে স্টার্ট নিল, স্টার্ট নেওয়ার পর ইঞ্জিনটা গো গো করে গোঙাতে লাগল, আমার বুকের ভেতরটা তখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ৩০০/এ বাড়িটা পেছনে ফেলে আসতে। আগেরবার এতটা খারাপ লাগেনি। আমি ভেবেছিলাম, এই বাড়িটা, এই পাড়াটা আর এই প্রিয় শহর হয়ত আমাকে ভুলে গেছে, মনে করেছিলাম আমিও ভুলে গেছি ওদের।

কিন্তু বুকের ভেতর দলা পাকানো কান্না আমাকে মনে করিয়ে দিল, আমরা আসলে কেউ কাউকে ভুলিনি।

ওদিন সকাল থেকে আমরা হোটেলেই ছিলাম। ওর জ্বরটাও কমে এসেছিল দুপুরের পর। চব্বিশ ঘণ্টায় আমরা মোট চারবার নিচে নেমেছিলাম। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের সময়, আরেকবার সন্ধ্যার কিছু আগে রিটা যখন হোটেলের শপ থেকে পিতলের একটা রিকশা, কাঠের একটা নৌকা, আর পাট দিয়ে তৈরি বর ও কনের একজোড়া পুতুল কিনেছিল, তখন।

ওদিন আমরা শুয়ে-বসে গল্প করে কাটিয়েছি। আর টিভি দেখে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইংরেজি খবর কখনো মিস করত না রিটা। খবরের সময় ও কি যেন খুঁজত। তখন খুব অস্থির দেখাত রিটাকে। ওর চোখগুলো বড় বড় হয়ে থাকত। খাড়া হয়ে থাকত কান। আমি কথা বললে ও বিরক্ত হতো। রাতের খবরে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের পর যখন মতিউর রহমানকে একটা ব্রিজ উদ্বোধন করতে দেখাল, বিছানা থেকে উঠে বসল রিটা। তখন ওর পা দুটো গুটানো। কোলের ওপর একটা বালিশ চেপে ধরা।

খবর যখন শেষ হলো, ও আমাকে পরমতলার কথা বলল। বলল এই গ্রামে একটা কাজ শুরু করতে হবে আমাকে। টাকাপয়সা দিয়ে যতটুকু পারে সাহায্য করবে রিটা। আমি বললাম 'কী কাজ ?'

'একটা সেন্টার খুলতে হবে।'

'কিসের সেন্টার ?'

'সাইমন ভিজেনথাল সেন্টারের মতো একটা সেন্টার। মতিউর রহমানের মতো যুদ্ধাপরাধীরা যত খুন করেছে, ধর্ষণ করেছে, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালিয়েছে, এই সেন্টার সেসব অপরাধের ইতিহাস তৈরি করবে।' কিছুক্ষণের জন্য রিটা থামল, তারপর আবার বলতে লাগল, 'ওটা শুরু করতে হবে পরমতলার থেকে।'

হঠাৎ এই সেন্টার খোলার কথা ওর কেন মনে হলো, জানতে চাইলাম আমি। ও বলল, 'হঠাৎ নয়, আসিফ, এটা আরও আগেই খোলা উচিত ছিল।'

'কেন ?'

'তোমাদের গ্রামে যখন গেলাম, দেখলাম অনেকেই রুখসানা বেগমের কথা জানে না। যারা ওকে চেনে, তারাও ওকে চেনে শুধু উন্মাদ হিসেবে। একাত্তরে কী হয়েছিল, তার কিছুই ওরা বলতে পারল না। অবশ্য এদের তখনো জন্ম হয়নি বা ওরা তখন ছিল শিশু।'

হাসলাম আমি।

'এই ছেলে, হাসছিস কেন তুই ?' রিটা চোখ লাল করে তাকাল।

'রুখসানা বেগমের কথা তাও তো কেউ কেউ জানে, রিটা। কিন্তু তুমি কি জিজ্ঞেস করে দেখেছিলে দুধওয়ালার কথা ?'

'হু করেছি। গ্রামের কেউ ওকে চেনে না।'

'আর মতিউর রহমান ?'

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিটা। তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের এক কোনায় হালকা একটা নীল আলো জ্বলছিল। শ্যান্ডেলিয়ারটা নেভানো। বাইরের আকাশে জোছনা ফুটেছে। সোনালি রঙের একটা আলো হাতির ঝিল বিলের পানিতে ছড়িয়ে আছে দুধের সরের মতো। ওই আলোতে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা নৌকা, দূরে কয়েকটা পাকা দালান উঠছে, আরও দূরে মগবাজার, তার পেছনে বাড্ডা খিলক্ষেত আর রামপুরার ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি, জ্যোৎস্নার আকাশে টেলিভিশন সেন্টারের উঁচু টাওয়ারে বিন্দু বিন্দু লাল বাতি।

বিলের দিকে তাকিয়ে ও বলল 'সেটাই তো আমি মানতে পারছি না, আসিফ।'

'কেন পারছ না, তুমি ?'

'মতিউর রহমান নাকি মুক্তিযোদ্ধা ছিল !'

আরও জোরে হেসে উঠলাম আমি। বললাম, 'কে বলল তোমাকে ?'

'কে আর বলবে ? গ্রামের মানুষ।'

'ওরা শুনেছে, মতিউর রহমান নাকি কুমিল্লায় যুদ্ধ করেছে। তোমার বাবাকে ওরা চেনে না, সেলিম।'

এই কথাটা শোনার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলাম আমি। বললাম, 'তোমার এই সেন্টার কে চালাবে, রিটা ?'

'কেন তুমি...'

'কীভাবে চালাব ? জিন্ডেলফিঙ্গেনে থেকে ?'

'সেটা আমি জানি না...দরকার হলে তুমি দেশে চলে এস।'

'সেটা কি সম্ভব, রিটা ?'

'কেন সম্ভব নয় ?'

'অনেক কিছুই ভাবা যায়, রিটা। অনেক স্বপ্নও আমরা দেখি। কিন্তু বাস্তবে সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

'তুমি না পার, কাউকে দিয়ে ব্যবস্থা করো। দেশে কি তোমার মতো লোক পাওয়া যাবে না ? যুদ্ধের কারণে একমাত্র তুমিই কি তোমার মাকে হারিয়েছ, সেলিম ?'

ওর এই কথাটা আমার দিকে বুলেটের মতো ছুটে এল। বুঝতে পারছিলাম রেগে যাচ্ছে রিটা। এ কারণে ও কখনো আমাকে আসিফ আবার কখনো ডাকছে সেলিম।

'আমি তো একবার চেয়েছিলাম, রিটা। তার পরিণতি কী হয়েছে, সেটা তো তুমি জান। তখন আমি আমার মাকে অপমান করেছি, লোকেরা এখন ওকে জানে খারাপ নারী হিসেবে, বাবাকেও আমি গ্রামছাড়া করেছি, তারপর পালাতে হয়েছে নিজেকেও। আমি এখন কে ? বলো তুমি, আমি কে ? কোথায় থাকি ? কী করি ? আমি তো তোমাদের বাড়িতে স্রেফ একটা চাকর...'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি কিন্তু তার আগে হঠাৎই রেগে গেল রিটা। জোরে চিৎকার করে উঠল। তারপর 'শাইসে কিড' বলে আমার গালে জোরে একটা চড় বসিয়ে দিল ও।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

রিটা তাকিয়েছিল জোছনাস্নাত হাতির ঝিলের দিকে। বিলের পানিটাকে তখন গলে যাওয়া সোনার মতো লাগছিল।

হোটেলের রুমে তখন স্তব্ধ নীরবতা। গোরস্থানে দাফন শেষ করে প্রিয়জনেরা যখন কবর পেছনে রেখে বাড়িতে ফিরে যায়, মসজিদে নামাজিরা যখন সেজদায় নত হয়, প্রার্থনার শেষে গির্জায় যখন শূন্যতা নেমে আসে, অপারেশনের আগে থিয়েটারের ভেতর যেমন স্তব্ধতা তৈরি হয়, তারপর রোগীর মেরুদণ্ড বেয়ে সাপের মতো সরসর করে নামতে থাকে ঠান্ডা ক্লোরোফর্ম, সেরকম নীরবতা।

রিটা তখন বসেছিল বিছানার কিনারে। দুহাতের তালুতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদছিল ও। কান্নার দমকে কাঁপছিল ওর পিঠ। আমি গিয়ে বসলাম ওর পাশে। তারপর ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওর কাঁধ। ওর কান্না থামল না তখনো, বরং কান্নাটা আরও ফুঁপিয়ে উঠল। আমি তখন উঠে এলাম বিছানা থেকে। বসলাম মেঝেতে। রিটার মুখোমুখি। ওর হাত দুটো সরিয়ে দিলাম মুখের ওপর থেকে। সারা মুখ ভিজে আছে চোখের পানিতে। ওর মুখটাকে তখন মনে হচ্ছিল কচুপাতার মতো। তার ওপরে কয়েক বিন্দু পানি টলমল করছে, মিশছে না, পড়ছে না, ভিজছে না কোথাও।

আমি তখন চুমু দিলাম রিটার কপালে। তারপর ওর চোখে। তারপর নাকে। তারপর ঠোঁটে। আমার ঠোঁট দুটো তখন রিটার মুখের ভেতর। রিটা ওর জিহ্বা দিয়ে আমার জিহ্বায় ছোবল মারতে চাইছে। আমি চাইছি ওকে কামড় দিতে। তারপর আমরা মিশে গেলাম আমাদের মগজে। আমরা ঢুকে গেলাম আমাদের শরীরে। অনেক বছর পর আমাদের শরীর পরস্পরকে চিনতে পারল। আমি ওর কাঁধ ছুঁয়ে দিলাম। বাহু, পিঠ, স্তন আর ত্বকের পরিচিত সেই গন্ধটা পেলাম বহু দিন পর। আবার শুনতে পেলাম রিটার নিশ্বাসের শব্দ। বহু রাত পর রিটা আবার আমাকে ঘোড়া বানাল। তারপর একসময় পিঠ বাঁকা করে লুটিয়ে পড়ল পেছনে।

তখন আমি দেখলাম রিটার কোমরের কাছে, নাভির একটু নিচে একটা ট্যাটু আঁকা, ওটা ছিল ঘোড়ার লম্বা একটা মুখ, দেখতে অনেকটা নোভার মতো।

তারপর আমরা শুয়ে রইলাম পাশাপাশি। কখনো আমার মাথাটা ওর বুকের ওপর। কখনো আমার পা দুটো ওর কোমরের কাছে। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল রিটা। কিন্তু ঘুমাতে পারছিলাম না আমি।

এই শহরে এটাই আমার শেষ রাত।

বিছানায় শুয়ে শরীরটা তুলে দিলাম ওপরে। একটা বালিশে হেলান দিয়ে বসলাম আমি। রিটার মুখটা তখন আমার বুক ও পেটের মাঝখানে। ওর চুলগুলো ছড়িয়ে আছে মাথার চারপাশে।

রিমোট কন্ট্রোলটা ছিল বেডসাইড টেবিলে। ওটা হাতে নিয়ে টিভি ছাড়লাম আমি। বিবিসিতে তখন খবর হচ্ছিল। কোথায় যেন বন্যায় মারা গেছে বহু মানুষ। উদ্ধার তৎপরতার ছবি দেখাল। চ্যানেল চেঞ্জ করলাম আমি। বিটিভিতে তখন চলছিল নজরুল সংগীতের একটা অনুষ্ঠান। প্রোগ্রামগুলোও সেই একইরকম, আগের মতোই, কয়েকটা ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজের মতো আসন। তার কোনো একটার ওপর বসে শিল্পীরা গান গাইছে। ওদের পেছনে শাড়ির মতো ঝুলছে কয়েকটা ফিনফিনে রঙিন পাতলা কাপড়।

টেলিভিশনের পর্দায় হঠাৎ চোখ আটকে গেল আমার। হাতটা তখন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল। আমার শরীর তখন পাথরের মতো, তার ওপর শুয়ে আছে রিটা। আর টেলিভিশনের পর্দায় তখন গান গাইছিল আফরোজা শীলা।

শীলাও ঠিক আগের মতোই আছে। অবিকল সেই একই মুখ। আগে যেমন ও মাথাটা ডান দিকে কাত করে গান গাইত, এখনো তেমনি কাত করে আছে। কপালের একপাশে ওর কাটা দাগটাও বোঝা যায় আগের মতোই। গানের ফাঁকে ফাঁকে ও যখন হাসে এখনো তার গালে আগের মতোই টোল পড়ে। সুরের সঙ্গে তাল মেলাতে একটা হাতের ওপর আরেকটা হাতের তর্জনী উঠছে নামছে, আগেও ওর এই আঙুলটা এরকম করে নাচত।

ওর গানটা শেষ হওয়ার পরই বন্ধ করে দিলাম টিভিটা। কিন্তু সুরের রেশটা তখনও ছিল। ওই রাতে কি গান গাইছিল শীলা, সেটা এখন আর মনে করতে পারি না, কিন্তু মনে আছে ওর সঙ্গে এভাবে দেখা হবে, সেটা আমি কোনো দিন কখনো ভাবিনি।

রিটার মুখটা বুকের ওপর থেকে আলতো করে সরিয়ে আমি উঠে গেলাম জানালার কাছে। ঢাকার আকাশে বাতিগুলো এলোমেলো। ছড়ানো-ছিটানো। অগোছালো। কোনো ছন্দ নেই ওখানে। জিন্ডেলফিঙ্গেন বা কোলনের আকাশে যেমন আলোগুলো কোথাও একটা লাইন ধরে আবার কোথাও বৃত্তাকারে জ্বলে এই শহরের বাতিগুলো ঠিক সেভাবে জ্বলে না। রাতের ঢাকার আকাশে কোথাও খুব বেশি আলো, আবার কোথাও খুব বেশি অন্ধকার।

হাতিরঝিলের পানিতে সরু রেখার মতো হালকা একটা ঢেউ। একটু আগে হয়ত ওখান দিয়ে বালুবাহী কোনো নৌকা গিয়েছিল। পানিটা এমনভাবে কাঁপছে, মনে হচ্ছিল ওখানে সোনা গলে গলে পড়ছে। তারপর একটা ট্রেন ছুটল কমলাপুরের দিকে। ওই আওয়াজ ধ্বনিত হলো শহরের আকাশে। জানালার কাচে এসে লাগল হুইসেলের শব্দ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। যেন খই ফুটছিল বিলের পানিতে। আর ছিল বৃষ্টির আওয়াজ। জানালার পাল্লা কিছুটা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছিল শরীরে। মনে পড়ল এরকম এক বর্ষণমুখর বিকেলে শীলা আমাকে রেখে এসেছিল পরমতলায়। তার পরেই বদলে গেল আমার জীবনের গতি।

একসময় বিছানা থেকে উঠে এল রিটা। নীরবে দাঁড়াল আমার পেছনে। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমার কোমর। তারপর মাথাটা বিছিয়ে দিল কাঁধের কাছে, আমার পিঠের ওপর। জড়াজড়ি করে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে। কোনো চুম্বন না, কথা না, শুধু বৃষ্টিস্নাত শহরের দিকে তাকিয়ে রইলাম দুজনে। বিলের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ হচ্ছিল সুরের মতো। ওপারে ভিজছিল ইট, বালু আর উঁচু উঁচু কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট। কোনো কোনো ফ্ল্যাটের জানালায় আলো জ্বলে উঠল। হয়ত বৃষ্টির পানি ঢুকছিল ঘরের ভেতর, ওরা জানালা বন্ধ করতে উঠেছে।

আকাশের গায়ে তখন একা একা ভিজছিল জ্যোৎস্নার চাঁদ। আমার মনে পড়ছিল বহু আগে শোনা একটা গানের কথা: 'টাকাপয়সা বাড়ি গাড়ি কিছু নেই আমার, কিন্তু আমি রুপা পেয়েছি রাতের তারার কাছে আর বিকেলের সূর্যের কাছে পেয়েছি সোনা।' ভাবলাম, আমি পেয়েছি রিটাকে। আর কী চাই আমার !

কখনো চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কখনো চোখ খুলে। রিটার চিবুকটা আমার কাঁধের ওপর। ওটা ছিল অপূর্ব এক রাত। হালকা বাতাস ছিল বৃষ্টির গায়ে। ওই রাতে বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরিনি। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়। আমি রিটাকে আর রিটা আমাকে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলাম রাতের আকাশের তলায়। কলকল শব্দে রাতভর বৃষ্টি হলো অঝোর ধারায়।

ওই রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রিটাকে আমি যতটা ভালোবেসেছিলাম, অতটা ভালো আমি ওকে কখনোই বাসিনি।

অনেক রাত পর্যন্ত আকাশে ভেসে বেড়াল বর্ষার কালো মেঘ, নিচে বৃষ্টির পানিতে চুপসে ছিল বস্তির ঘরগুলো। একাত্তরে এটা ছিল পালপাড়া বস্তি। পঁচিশে মার্চের রাতে এইরকম বৃষ্টির মতো গুলি হয়েছিল এখানে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে

গিয়েছিল সবকটা ঘর। রিটাকে বললাম বিপিন বাবুর কথা। এই বস্তিতে রিকশার পাদানিতে পড়েছিল ওর রক্তাক্ত লাশ।

ঝুপড়িগুলোর পশ্চিম কোনায় বিদ্যুতের খাম্বার সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা দুয়েকটা রিকশা তখনো ভিজছিল।

বৃষ্টিটা যখন আরও বাড়ল, ঘরে ঢুকে আমরা বাতি জ্বালালাম। ব্যাগেজ গুছাতে গুছাতে ভোর হলো। সকাল ছয়টায় নাশতা শেষ করে যখন রাস্তায় নামলাম, তখন শহরটা সয়লাব হয়েছিল বৃষ্টির পানিতে। কোথাও কোথাও ফুটপাতও ডুবে ছিল জলের তলায়। রাস্তাঘাটে পানি থই থই করছে। এখানে-সেখানে বৃষ্টির পানি ঢুকে বিকল হয়ে পড়েছে গাড়ির ইঞ্জিন। ড্রাইভাররা বনেট খুলে চেষ্টা করছে সারাতে। কলমিলতা বাজারের কাছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা পানির ওপরে ফুটবল খেলছিল। আমরা যখন এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছালাম তখন সাড়ে সাতটার মতো। বোর্ডিং পাস পেলাম সাড়ে আটটার দিকে। তার আধঘণ্টা পর উড়োজাহাজ উড়ল আকাশে। রিটা সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকল নিচে। আমাদের নিয়ে বিমান ছুটল পশ্চিমে। আর পেছনে পড়ে রইল প্লাবিত বদ্বীপ।

একজোড়া চোখ

জিন্ডেলফিঙ্গেনে ফিরে আসার পর আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে গেল রিটা। ওর সঙ্গে দেখা হতো খুব কম। একদিন হুট করে ছেড়ে দিল পোস্ট অফিসের চাকরিটাও। গুস্তাভের কাছে শুনলাম, রিটা নাকি বাল্টহাসার স্ট্রাসের বাড়িটাও ছেড়ে দিয়েছে। ও এখন কোলনেও থাকে না। খুব একটা আসে না গ্রামের বাড়িতেও। আরিবের্ট হাইমকে খোঁজার কাজে সে খুব ব্যস্ত ছিল তখন, ড. ডেথকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ভিজেনথাল সেন্টার, ওদের কাছে ছিল নানা ধরনের খবর, কেউ বলছিল আরিবের্ট হাইমকে দেখা গেছে মিশরের কায়রোতে, আবার কারও মতে ও তখনো লুকিয়ে ছিল স্পেনে।

আমিও আর চাইছিলাম না রিটাদের ওখানে থাকতে। জীবনটা খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল, ওটা ছিল গেম্যুজে লেবেন, জীবনের দুইশো ভাগই ছিল নিরামিষ, লাঙভাইলিশ, নুন-চিনি-ঝাল-টক কিছুই ছিল না, কিন্তু ছিল পানসে একটা জীবন, নিজেকে মনে হতো ফার্নিচারের মতো, কেনো উদ্দেশ্য ছাড়া দিন শুরু হতো, শেষও হতো বিনা কারণে। রাতগুলো ছিল খুব সাদামাটা। স্বপ্ন দেখার আনন্দ-উত্তেজনা কিছুই ছিল না, ছিল না স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার বেদনাও। শুধু ছিল অন্ধকারের ভেতর কাঠের গুঁড়ির মতো ঘুমানো, ঘুমানো আর ঘুমানো।

যেটুকু সময় ঘুম আসত না, ওটুকু সময় শুধু জেগে থাকতাম, হাজারো চিন্তা গুলোর মতো এসে ঝাঁঝড়া করে দিত আমাকে, তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে হতাশার চাষবাস করতাম আমি।

ওখানে আর কিছুতেই ভালো লাগছিল না আমার। সবকিছুতে অরুচি ধরে গিয়েছিল। রিটা বাওয়ার, গুস্তাভ বাওয়ার আর এই জিন্ডেলফিঙ্গেন গ্রাম থেকেও পালাতে চাইছিলাম আমি।

তত দিনে গুস্তাভ আরেক বান্ধবী নিয়ে ওর জীবন আবার জমিয়ে ফেলেছে। এই মেয়েটা ছিল আরও অনেক বেশি গৃহিণী। ও নিজের হাতে রুটি বানাত। ব্রকলি, পিলৎস, স্পিনাট আর সুইবেল দিয়ে তৈরি করত নানা রকমের তরকারি, দুপুরের পর বানাত কেক, রোদ উঠলে ঘরের জিনিসপত্র বের করে ঝাড়পোছ

করত। কাজ না থাকলে ও খেলত কিটির সাথে। কিটিকে ও ডাকত মাইন জোন। নিজের ছেলের মতো ওকে ও গোসল করাত, খাওয়াত, ঘুম পাড়াত।

সারা দিন ও ঘরেই থাকত। সন্ধ্যার পর গুস্তাভকে নিয়ে মাঝেমধ্যে যেত থিয়েটারে। জিন্ডেলফিঙ্গেনে তখন চলছিল ব্রেখট ভোখে। পুরো সপ্তাহ ধরে মঞ্চস্থ হচ্ছিল শুধু বের্টল্ট ব্রেখটের নাটক, মুটার কুরাজ উন্ড ইরে কিন্ডার, মান ইস্ট মান আরও কী কী। আশপাশের গ্রাম থেকেও তখন এসেছিল নাটকের দল।

নাটক দেখে অনেক রাত করে ওরা ঘরে ফিরত। ওদের ফেরার আগে ঘুমিয়ে পড়তাম আমি। বাইরের দরজা খোলার খুটখাট শব্দে ঘুম ভাঙত আমার। তারপর আর ঘুমাতে পারতাম না, বাকি সময়টা বিছানায় ছটফট করতে হতো, তারপর জানালার ওপাশে যখন চেনা সূর্যটা উঠত, কোথাও কোনো খামারে শোনা যেত মোরগ-গরু-ভেড়া-শূকর কিংবা ঘোড়ার ডাক, তখনই বিছানা ছাড়তাম আমি।

আমি চেষ্টা করছিলাম কোলনে ফিরে যেতে। ঢাকা থেকে ফেরার পথে এই ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলাম রিটাকেও। ও তখন হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। আমি ভেবেছিলাম, সোনারগাঁও হোটেলে বর্ষণমুখর ওই রাতের পর রিটা হয়ত আমাকে জড়িয়ে রাখবে, কিন্তু রিটা তা করেনি, বরং এই জিন্ডেলফিঙ্গেনেও আমাকে একা ফেলে রেখে ও যেন কোথায় পালিয়েছে।

বেশ কিছু চাকরির জন্য আমি আবেদন করেছিলাম কোলনে। এর মধ্যে কয়েকটা পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যেই চিঠি পেতাম ওদের কাছ থেকে। ব্রিফের শুরুতে লেখা থাকত চাকরি দিতে না পারার কারণে ওদের অনুতপ্ত হওয়ার কথা আর শেষ লাইনটায় থাকত আমার জন্য শুভ কামনা। এই চিঠিগুলোর জন্যই অপেক্ষা করতাম আমি। আর ভাবতাম একদিন কোলনে ফিরে যাব, হয়ত রফিক আর সজলের সঙ্গে আবার দেখা হবে, শনিবার সকালে আমরা কাঁচা বাজারে যাব, টিপ বোতামওয়ালা সুন্দরীকে দেখব, রবিবার বিকেলে হাঁটতে বের হব রাইনের তীরে, সার্কাস দেখব ডোমের সামনে, আবার চড়ব ১৫ ও ১৬ নম্বর ট্রামে।

পিওনিয়ার স্ট্রাসের দুই পাশের বাড়িগুলো মাঝেমধ্যে আমি স্বপ্নে দেখতাম, প্রত্যেকটা বাড়ি আমার মুখস্থ ছিল, ডান দিকে বেজোড় আর বাম দিকে ছিল জোড় নম্বর, মুখস্থ ছিল বাড়িগুলোর জানালা, কোন জানালায় কী রকমের পর্দা, কোনটা উঠানো আর কোনটা নামানো থাকত, রাস্তার পাশের কোনো ঘরগুলোয় ছিল খাওয়ার টেবিল, কোনো ঘরে শোপিস অথবা বইয়ের আলমারি আর কোনো ঘরে সারাক্ষণ চলত টেলিভিশন। কেন জানি না, আমি সব সময় স্বপ্ন দেখতাম জোমারের কোলন, ফ্রুলিঙয়ের পিওনিয়ার স্ট্রাসে, শহরের অলিগলি তখন ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকত, রঙিন একটা ছবির মতো, আমরা যখন স্কুলে পড়ি, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে যাই শাহীন স্কুলে, তখন এরকম ছবির ম্যাগাজিন আসত আব্বার কাছে, আমাদের নাখালপাড়ার বাড়িতে, মাসে একবার আসত, আসত ডাকে সুদূর মস্কো

শহর থেকে, পাতাগুলো ছিল পিচ্ছিল, মনে হতো ওগুলোর গায়ে তেল মাখানো, নাম ছিল উদয়ন, ওখানে পাতার পর পাতাজুড়ে থাকত স্বপ্নের মতো সুন্দর কিছু ছবি, ওই সব পাতা ছিঁড়ে আম্মা নতুন ক্লাশের ওঠার পর আমাদের বইয়ের মলাট বেঁধে দিতেন।

স্বপ্নগুলো আমার মাথার ভেতর তালগোল পাকাত।

আমি স্বপ্নে দেখতাম ২১ পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িটার দরোজার সামনে রিটার সাইকেলটা দাঁড় করানো, এই রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে শীলা, ওর গায়ে পাকা টাঞ্জারিনের রঙের মতো সালোয়ার কামিজ, রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, ওখানে একটা গোরস্থান, সেখানে পাইন গাছের সারি, পিওনিয়ার স্ট্রাসের ডান পাশে মুদি দোকানটার পরেই দেখতাম কলাপসিবল গেটের ৩০০/এ বাড়িটা, অথবা লিচুবাগানের গলি, আমি আর রিটা ওই রাস্তায় একটা রিকশা থেকে নেমে ২১ নম্বর বাড়িতে ঢুকছি।

ওই সামারেই আমি চিঠি পেলাম ডয়েচে বানের কাছ থেকে। আমার চাকরি হলো বানহফে। জয়েন করার জন্য আমাকে তিন মাসের সময় দিল ওরা। প্রথমে এক মাসের ট্রেনিং। তারপর পুরোদমে কাজ। চাকরিটা ছিল পার্মানেন্ট।

রিটার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম পরের দুই মাস। ও এল না একবারও। খোঁজও পাওয়া গেল না ও কোথায় আছে, কী করছে বা কখন আসবে। তখন গুস্তাভের সঙ্গেও ওর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

জিন্ডেলফিঙ্গেন থেকে আমি পালালাম, যখন দাঁত ও নখ আরও ধারালো করে শীত আবার নেমে এলো গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর, রাস্তার পাশের গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে উঠল, হাড়ের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে হু হু করে এল ঠান্ডা বাতাস, যে কয়েকটা মৃতপ্রায় পাতা তখনো গাছের ডালে মরণ কামড় দিয়ে কোনো রকমে দুলছিল, মৃদুমন্দ ওই বাতাসে নিঃশব্দে ঝড়ে পড়ল সেগুলোও।

আমিও পালালাম কোলনে।

প্রথম দিন তুষার পড়ছিল শহরে। শুরু হয়েছিল দুপুরের কিছুটা আগে, গুঁড়ি গুঁড়ি, কিন্তু বিকেলের আগেই পুরো শহরটাকে মনে হতে লাগল সাদা একটা চাদরে ঢাকা। খুব আরাম লাগছিল তখন, নিশ্বাস নিতে পারছিলাম বুক ভরে, মনে হচ্ছিল বহু দিন পর আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরতে পেরেছি, এই শহরেই রিটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এখানেই ওকে বিয়ে করেছিলাম আমি, এই শহরেই ঝরেছিল আমার রক্ত, বুঝতে পারিনি কীভাবে কীভাবে এই শহর আমার কাছে হয়ে উঠেছিল নাখালপাড়ার মতো।

আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে শুরু করল আমার জীবন। নয়টা-পাঁচটা অথবা পাঁচটা-একটা কিংবা একটা থেকে নয়টা ঘুরেফিরে এরকম নানা শিফটে কাজ

করতাম আমি। প্রথমে গিয়ে বসতাম কাউন্টারে। তারপর আমার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াত যাত্রীরা। তারপর ডাংকে শ্যোন, বিটে শ্যোন বলতে বলতেই আমার শিফট শেষ হয়ে যেত।

আমি ভাবতাম সজল আর রফিকের সঙ্গে যদি দেখা হতো, ওরা যদি কখনো এসে দাঁড়াত কাউন্টারের কাচের ওপারে, আমি ওদের খুঁজতাম মনে মনে, কেউ একজন বলেছিল রফিক এখন থাকে ইটালির সিসিলিতে, মাঈনুদ্দিনের সঙ্গে, ওর নাকি সংসারও হয়েছে ওখানে, এই খবরগুলো আমি পেতাম কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

এবার কোলনে আসার পর কয়েকটা বাংলাদেশি পরিবারের সঙ্গে আমার সখ্য হয়েছে। ছুটির দিনে আমি ওদের বাসায় বেড়াতে যেতাম। মাঝেমধ্যে ওরাও আসত। ঢাকা থেকে টোনাটুনির মতো ছোট্ট একটা পরিবার তখন নতুন এসেছিল কোলনে। ভদ্রলোক ছিলেন সাংবাদিক, কাজ করতেন ডয়েচে ভেলের বাংলা বিভাগে। একসময় ওই পরিবারের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বড় মাছের তরকারি, গুঁড়ো মাছের চরচরি, পুঁইশাক দিয়ে ইলিশ, পুলি অথবা চিতই পিঠা, রাজশাহীর আম কিংবা লিচু এরকম নানা অজুহাতে যাওয়া হতো ওই বাড়িতে। সারাক্ষণ রান্না করতেন ভাবি আর ভাই বাংলাদেশে কত বড় অফিসার ছিলেন কথায় কথায় শুধু সেসবের গল্প করতেন।

পরের গ্রীষ্মের আগে আমার জীবনে ঘটল আরও একটা ঘটনা।

দিনটা ছিল শুক্রবার, অফিস থেকে ছুটি নিলাম আমি, সেদিন খুব ঠান্ডা থাকলেও উজ্জ্বল রোদ ছিল আকাশে, দেখে বোঝা যেত না এত শীত থাকতে পারে বাতাসে, সাপের মতো ওটা লুকিয়ে ছিল রোদের আড়ালে, ওই ঠান্ডাটা কামড় বসাত ভেতরে, মনে হতো শরীরে সুঁই ফুটছে, একসময় শরীর অবশ হয়ে আসত, জমে যেত উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, নিজেকে মনে হতো ডিপ ফ্রিজের চৌকোনা বরফের মতো।

সকাল বেলা বাড়িতে এল ওই সাংবাদিক পরিবার। আরও কয়েকজন বন্ধুও এল। এল আমার পুরনো বাড়িওয়ালা হেরমান গ্র্যোটেও, ফ্রাউ গ্র্যোটে গিয়েছিলেন বাভারিয়ায়, ছেলের কাছে বেড়াতে। একসময় বাড়িটা গিজগিজ করতে লাগল মানুষে, উপচে পড়ল করিডোরের দেওয়ালে টাঙানো ওভারকোট হ্যাংগার।

সেদিন গান্ধী রেস্তোরাঁ থেকে অর্ডার দিয়ে আনা হলো দুপুরের খাবার ও কয়েক কেজি মিস্টি। পাঞ্জাবি-পাজামা পরে ঘরের এক কোনায় বসে রইলাম আমি।

তারপর আরও একবার বিয়ে হলো আমার।

টেলিফোনের ওপাশে শাহানা যখন 'কবুল' বলল, লাইনের ঘড়ঘড় আওয়াজের কারণে কিনা জানি না, নাকি ওর কান্নার দমকের পেছনে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল না। এখন আর সেটা মনে নেই, কিন্তু মনে আছে ওই দিন আমার মনের পুকুরের তল থেকে বারবারই ভুস করে ভেসে উঠছিল রিটার পলক না পড়া চোখ।

আমি যখন ওকে একাত্তরের কাহিনি শোনাতাম ওই জোড়া চোখে সেগুলো ভেসে উঠত ছবির মতো। ওর চোখের ভেতর দিয়ে আমি দেখতে পেতাম মুক্তিযুদ্ধের ওই মানুষগুলোর সব দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ-বেদনা আর ঘৃণা। লোকে বলে চোখ নাকি মনের আয়না। এরকম স্বচ্ছ আয়না পৃথিবীতে রিটার চোখ ছাড়া আর কোথাও ছিল না।

মেজরের কথা

এরপর রিটার সঙ্গে আমার কিছু চিঠি চালাচালি হয়েছিল। আমি লিখতাম জিন্ডেলফিঙ্গেনের ঠিকানায়। হুটহাট করেই পেতাম ওগুলোর জবাব। ওর প্রথম চিঠিটা আসতে একটু সময় লাগল। কিন্তু মনে আছে, শেষ দুটো চিঠি পেয়েছিলাম এক সপ্তাহের ভেতর। ওর চিঠিগুলো ছিল সাদা কাগজে, কালির কলমে লেখা। খুব এলোমেলো করে লেখা ছিল সেগুলো। লেখার মধ্যে খুব একটা যত্নআত্তি ছিল না। মনে হয় খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা। লাইনগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হতো, কাত হয়ে থাকত সেদিকে। বাচ্চাদের পার্কে একদিকে হেলে থাকা সি স'র মতো। বানানেরও কোনো মা বাপ ছিল না। ও যে বানান জানত না, চিঠি পড়ে কিন্তু সেটা মনে হতো না। শব্দের ভেতর ও অক্ষর ড্রপ করত। হয়ত খুব দ্রুত লিখত বলে এরকম হতো, নাকি মা সোফিয়া নোভাকের মতো ওরও আলঝেইমার হয়েছিল, ফলে লেখার সময় হাত কাঁপত, আমি তা কখনো জানতে পারিনি। তবে খামটা থাকত খুব সুন্দর। আরও সুন্দর ছিল খামের ওপর লাগানো স্ট্যাম্পগুলো। ওর কয়েকটা চিঠি এখনো আছে আমার সংগ্রহে :

প্রিয় রিটা,

তুমি আমাকে সোফিয়া নোভাকের গল্প বলেছ কিন্তু কখনো বলনি যে উনি তোমার মা। কেন বলনি, সেটা আমি জানি না। রুখসানা বেগমের পুরো কাহিনি আমি তোমাকে বলেছি। তার কোনো কিছুই আমি তোমার কাছ থেকে আড়াল করিনি। সোফিয়া নোভাকের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক গোপন রাখার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে, সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি কিন্তু এর যুৎসই কোনো উত্তর আমি কখনোই পাইনি। সেটা জানার জন্যও আমি তোমাকে আজ এই চিঠি লিখতে বসিনি। আমি শুধু ভাবছিলাম, মেজর শোয়ামব্যার্গার কি এখনও বেঁচে আছে ? তার সম্পর্কে কোনো তথ্য তোমার কাছে আছে কি না।

যদি পার জানিও।

ফিল গ্রুসে

সেলিম

মাইন কিড,

সুন্দর চিঠিটার জন্য শুরুতেই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। বহুদিন পর কোনো প্রিয়জনের কাছ থেকে এরকম হাতে লেখা চিঠি পেলাম। ওটা পেয়ে খুব অবাক হয়েছিলাম আমি। মনে করতে পারছি না ঠিক কবে কার কাছ থেকে আমি শেষবারের মতো এরকম কোনো চিঠি পেয়েছি। পিওন যখন চিঠিটা হাতে দিল, ভাবছিলাম কে কোত্থেকে কেন চিঠি লিখল আমাকে। সত্যি করে বলি, তোমার কথা আমার কিন্তু একবারও মনে আসেনি।

যাক আসল কথায় আসি। ভুলে যেয়ো না, মেজর শোয়ামব্যার্গার কিন্তু আমার পিতাও। আগামীতে যাতে অভিযোগ করতে না পার, তাই তোমাকে আগাম জানিয়ে দিলাম।

উনার বিষয়ে আসলে আমি খুব বেশি কিছু জানি না। জানার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। মেজরকে খুঁজতে গিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু কোথাও তার নাগাল পাইনি। আমি এখনো তাকে খুঁজছি।

ওর বিষয়ে কে কতটা জানে, সেটাও তোমাকে বলতে পারব না। তবে মার কাছে তার কথা কিছু শুনেছি। শুনেছি রোমান হলারের কাছেও। রোমানের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে ওর মা লুকিয়েছিল মেজরের ভিলায়। আর রোমান বেড়ে উঠছিল ওর মায়ের পেটে। আমার আর ওর জন্ম খুব কাছাকাছি সময়ে। শুনেছি যুদ্ধের পর মেজর শোয়ামব্যার্গার যখন জার্মানিতে ওর গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলেন ওর নিজের লোকজনই নাকি ওকে খুব বেশি ভালোভাবে নেয়নি। তাকে অনেকটা একঘরে করে রাখা হয়েছিল। গ্রামের লোকজন ওর ভূমিকার কথা কতটুকু জানত বা কীভাবে জানল সেটাও আমি বলতে পারব না।

তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, ওর কথা আমি কিন্তু বহু পরে জেনেছি। আমার মা কখনো বলেননি যে উনি আমার জন্মদাতা পিতা। মার কাছে তিনি ছিলেন কখনো হের মেজর, আবার কখনো শুধুই ভেরমাক্টের একজন অফিসার। প্রকৃত সত্যটা আমি যখন জেনেছি, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, রোমান হল্যারও আমাকে ওর খোঁজ দিতে পারেনি, আমি নিশ্চিত করে জানি না, তিনি বেঁচে আছেন কি না, থাকলে কোথায় আছেন বা কীভাবে আছেন।

শুনেছি গ্রামের বাড়িতে থাকতে না পেরে মেজর নাকি রোমান হল্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর সে চলে যায় ওদের ওখানে। ছোট্ট রোমান ওকে 'দাদু' ডাকতে ডাকতে বড় হয়েছে। অবশ্য রোমানও গোটা কাহিনিটা জানত না, জানত না মেজর শোয়ামব্যার্গার কেন ওর মাকে তার ভিলায় লুকিয়ে থাকতে দিয়েছিল, এর বিনিময়ে আমার মাকে কী মূল্য দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়,

শুনেছি পরে হলারের পরিবারের পক্ষ থেকে পুরস্কারের জন্য মেজর শোয়ামব্যার্গারের নাম পাঠানো হয়েছিল ইয়াদ ভাশেমেও।

ইয়াদ ভাশেমের পক্ষ থেকে যখন সোফিয়া নোভাকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো,তখন আমার মা ওদের জানাতে বাধ্য হলেন মেজরের সমস্ত দয়া ও সাহসের পেছনে লুকিয়ে ছিল আরও ঘটনা। তারপর বীর পুরুষদের ওই তালিকা থেকে ওর নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল।

মেজর কখনো আমার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি, তার এই মেয়ের কথাও সে জানত কি না, তা-ও আমি হলফ করে জানি না, কিন্তু নিশ্চিত করে জানতাম যে আমার মা কখনো তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেনি, আরও পরে এটাও বুঝতে পেরেছি যে সোফিয়া নোভাক খুব যত্ন করেই তার এই পরিচয়টা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।

আমার বা তার নিজের সঙ্গে মেজরের যোগাযোগ হোক, সেটা সে কখনো চায়নি।

তোমার মতো আমারও অনেক প্রশ্ন ছিল এই লোকটাকে নিয়ে। আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, এই প্রশ্নগুলো আমি তাকে করতে পারতাম। একসময় আমার বিশ্বাস ছিল যে সোফিয়া নোভাকের গোটা কাহিনি আমি জানি, কিন্তু এখন বুঝতে পারি, যেগুলো আমি জানি না সেগুলো জানার আর কোনো উপায়ও নেই আসলে।

আমি নিজেই যেখানে জানি না, সেখানে এর বেশি কিছু তোমাকে কীভাবে জানাব !

ভালো থেক।

রিটা নোভাক

লিবে কচুরিপানা,

জবাবের জন্য শুরুতেই তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তুমি কোথায় আছ, কী করছ, তার কিছুই আমি জানি না। জানতেও চাই না। কিন্তু তুমি যে এর মধ্যে সময় করে চিঠির জবাব দিয়েছ, সেজন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাহলে তুমি বলছ, রোমান হলার মেজরের বিষয়ে জানতে কিছু পারেন। তোমার কাছে কি ওর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো নম্বর আছে ? ওরা কোথায় থাকে ?

তুমি বলেছ মেজর সম্পর্কে তোমার খুব বেশি কিছু জানা নেই। কিন্তু তুমি কি আমাকে একটা কথা বলবে, মেজর শোয়ামব্যার্গারকে তুমি নিজে কীভাবে দেখ ? লোকটা কেমন ? ভুলে যাও যে তুমি তার মেয়ে, শুধু মেজর শোয়ামব্যার্গার হিসেবে তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী ?

আমি তোমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছি, কারণ আমি নিজে একটা বড়সড় ধন্দের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছি। কয়েকটা মানুষের জীবন বাঁচাতে ওই লোকটা তোমার মাকে সাহায্য করেছে, আবার এই লোকটাই তোমার মায়ের শরীরের জন্য তার ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে। এটা কি শুধু শরীরের জন্যই, নাকি একজন সাহসী মেয়ের জন্য তার মনে কোনো ভালোবাসাও ছিল ? সেও কি একজন যুদ্ধাপরাধী ? সোজা কথায়, এই মেজর একটা খারাপ, না ভালো লোক ? তোমার কী মনে হয় ?

এই প্রশ্নগুলো তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি আগে থেকে মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমাকে এগুলো জানতে হবে। খুবই জরুরি। এগুলো আমাকে ঘুণপোকার মতো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, রিটা।

আমি দুঃখিত যে তোমাকে এখন এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি এমন একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, যেখান থেকে আমাকে বেরোতেই হবে।

আমাকে উদ্ধার করো। প্লিজ রিটা।

তোমার কিড

শাইসে কিড,

তোমার প্রশ্নগুলো আমাকে অনেক চিন্তায় ফেলেছে। এগুলোর জবাব নিয়ে আমি বহুবার ভেবেছি। ভাবতে ভালোও লেগেছে। আর এ কারণেই এত দ্রুত আমি তোমার এই চিঠির জবাব দিচ্ছি। প্রশ্নগুলোর কারণে আমি মোটেই কষ্ট পাইনি বরং তুমি যে নিঃসঙ্কোচে জানতে চেয়েছ সেজন্য আমি তোমার প্রশংসাই করব। এই কাজটা আমরা সবাই করতে জানি না।

আমার ধারণা, রোমান হলার এসব প্রশ্নের কিছু জবাব দিতে পারত। কিন্তু আমার জানা নেই, ও ঠিক কোথায় আছে। তার পুরনো একটা নম্বর আমার কাছে ছিল, তবে সেটা এখন আর কাজ করছে না। আমি যত দূর জানি, সে জার্মানিতেই আছে। সে হয়ত তার দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারত, ও তো বয়সে খুব তরুণ এবং মেজরকে তার 'দাদু' জেনেই ও বড় হয়েছে। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, রোমান এবং তার বাবা মা এরা কেউ জানত না, শেষ পর্যন্ত ও যে কারণে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখতে পারল, তার জন্য আমার মাকে কী মূল্য দিতে হয়েছে। তারা শুধু জানে যে মেজর ওদের ছেড়ে দিয়েছে, সে ছিল অনেক দয়ালু, অথবা মেজর ওদের করুণা করেছে। আমার মায়ের সঙ্গে রোমান হলারের দেখা হওয়ার পর ওরা জানল যে এই গল্পের পেছনে আছে আরও অনেক কাহিনি।

এখন সে মেজরকে কীভাবে দেখে, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই। সেটা ও-ই ভালো বলতে পারত, তবে আমার ধারণা, হের শোয়ামব্যার্গারের জন্য তাদের মনে একটা ভালো জায়গা থাকলেও থাকতে পারে। কারণ আমার মাকে সে যা কিছু করতে বাধ্য করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত ও তো সবাইকে বেঁচে থাকার সুযোগও দিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কী হয়, ওর মতো অবস্থানে কেউ থাকলে সে সোফিয়া নোভাককে প্রথমে ধর্ষণ করত, তারপর সবাইকে হত্যা করত।

তুমি জানতে চাইছ যে মেজর একজন বীর নায়ক নাকি যুদ্ধাপরাধী। আমার মনে হয় সে তার কোনোটাই না। তবে এটা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন প্রশ্ন। এর উত্তরটা এত সহজে দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আমি তোমাকে বলেছি, মেজরের নাম যাতে ইয়াদ ভাশেমে না যায় সেজন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন আমার মা। তিনি সেটা থামাতেও পেরেছিলেন। কারণ এই পুরস্কারের জন্য মেজর যোগ্য ছিলেন না। তিনি যা কিছু করেছিলেন, তার পেছনে ওর নিজের একটা স্বার্থ ছিল, যা থেকে তিনি নিজেও লাভবান হয়েছেন। তার নিজের চাওয়া পূরণ করেছেন, যদিও তার ফলে অনেকগুলো জীবন বেঁচে গিয়েছিল, এটাও সত্য। বিনিময়ে সে আমার মাকে তার সঙ্গে ঘুমাতে বাধ্য করেছিল। তার মানে কি সে একজন যুদ্ধাপরাধী ? তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। হয়ত যুদ্ধাপরাধী, আবার হয়ত না। তবে আমি যেটা জানি তা হলো মেজর এমন একজন মানুষ যে তার ক্ষমতার সুযোগ নিয়েছিল। নারীর শরীরের জন্য সে তার অবস্থানকে ব্যবহার করেছিল। এরকম ঘটনা সবখানেই ঘটে। তার মতো লোক পৃথিবীর সবখানেই আছে। দুঃখজনকভাবে তুমি যদি কাজের জায়গার কথা বল, অফিস-আদালত-সরকার আর স্কুল কলেজের কথা বল, এমনকি গির্জাতেও এ ধরনের লোক তুমি পাবে। এটা হলো মানসিক বৈকল্য। এটাকে যুদ্ধাপরাধ বলা হবে কি না, সেটা আমি ঠিক জানি না। তবে আমি যেটা বুঝতে পেরেছি, বা বলতে পার, আমার একটা উপলব্ধি হলো, মেজর সত্যি সত্যি আমার মাকে ভালোবেসেছিলেন এবং তার এই ভালোবাসাটাই হয়ত সে যা করেছে তাকে যৌক্তিক হিসেবে দেখার একটা কারণ হতে পারে।

তোমার প্রশ্ন হলো সে ভালো না খারাপ। এটা আসলে অত সহজ কোনো প্রশ্ন নয়। উত্তর তো আরও কঠিন। এ ধরনের প্রশ্ন কখনো হয় না। আমার মনে হয় তুমি কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বা কোনো একটা ঘটনার দিকে তাকাবে তারপর ওই লোকটা ভালো কিংবা খারাপ সারা জীবনের জন্য ওর গায়ে একটা তকমা লাগিয়ে দেবে, তা সঠিক হবে না। আমার জীবন থেকে আমি এটাও শিখেছি, ভালো মানুষ হওয়া এবং ঠিক কাজ করার মধ্যেও আছে অনেক তফাৎ।

কেউ একজন ভালো কাজ করলেই সে ভালো মানুষ হয়ে যাবে, সেটাও নিশ্চিত নয়। মানুষ অনেক ভালো বা ঠিক কাজ করতে পারে, যার পেছনে হয়ত খারাপ কোনো উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। অথবা তার নিজের স্বার্থের জন্যও সে ওই কাজগুলো করতে পারে। আবার স্বার্থ থাকলেই যে খারাপ, তাও নয়। ওই মানুষের মনের ভেতর কী ছিল বা আছে, সেটা জানতে পারা আসলেই খুব কঠিন। তোমার সঙ্গে আমার যা কিছু হয়েছে, যত কিছু, একেবারে শুরু থেকে, তাতে তুমি আমাকে ভালো, না খারাপ বলবে ? আমার মনের ভেতর আসলে কী ছিল, সেটা কি তুমি কখনো জানতে পেরেছ ? সেটা শুধু জানি আমি।

মেজর শোয়ামব্যার্গারের বিরুদ্ধে আমার মায়ের কোনো অভিযোগ ছিল না। তার সম্পর্কে ওর কোনো খারাপ ধারণাও ছিল না। সে তাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দিয়েছিল। মন থেকেই মেজরকে মুক্তি দিয়েছিল তার কৃতকর্মের জন্য। আর এ কারণে আমার মা তিক্ততামুক্ত একটা জীবন যাপন করতে পেরেছে। এবং তার বাকি জীবনের আরও যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, সুখের সুযোগ ছিল, সেটাকেও সে স্বাধীনভাবে দেখে যেতে পেরেছে।

তুমি কি তোমার মায়ের সঙ্গে আমার মাকে মেলাতে চাইছ ? আমার মনে হয় সোফিয়া নোভাকের গল্পের সঙ্গে রুখসানা বেগমকে মেলানো ঠিক হবে না। দুটো একেবারেই আলাদা কাহিনি। তোমার মায়ের কাছে কোনো বিকল্প ছিল না। হয়ত সেটা সোফিয়া নোভাকের ছিল। সে যদি মেজরের সঙ্গে বিছানায় যেতে রাজি না হতো, কী হতো তাহলে ? ওই লোকগুলো সব মারা পড়ত। মারা পড়ত সে নিজেও। সোফিয়ার কাছে জীবন অনেক বড় ছিল। আবার এমনও তো হতে পারত যে মেজরের চাওয়া পূরণ করার পরেও ওদের মরতে হলো ? প্রশ্নের এই জট কি কেউ খুলতে পারবে, সেলিম ? আমরা হয়ত খুব সহজেই বলে দিতে পারব, ওই রাতে কী ছিল সোফিয়া নোভাকের মনে। কিন্তু মেজর শোয়ামব্যার্গার আসলে কী চেয়েছিল, সেটা কি আমরা নিশ্চিত করে জানি ?

আশা করব তোমার উত্তরটা তুমি পেয়েছ।

ফ্রাউ রিটা

রিটা,

তোমার এই চিঠির কোনো জবাব আমার কাছে নেই। কী লিখব, জানি না। শুধু তুমি বল যে মেজর শোয়ামব্যার্গারের কী বিচার হওয়া উচিত ?

আলেস গুটে,

তোমার ঘোড়া

প্রিয় সেলিম,

কোনো দ্বিধার ভেতরে ছুড়ে ফেলতে আমি তোমাকে ওই চিঠি লিখিনি। আমি বুঝতে পারছি তোমার প্রশ্ন। আমি ভেবেছিলাম এর উত্তর হয়ত আমি ইতিমধ্যেই দিতে পেরেছি।

আমার মা কখনো মনে করত না যে মেজর একটা শয়তান। তিনি আমাকে বলতেন, লোকটা শুধু তার নেতাদের নির্দেশ অনুসরণ করত। এর বাইরে তার কিছু করার ছিল না। যেদিন সে জানতে পারল তার বাড়িতেও মানুষ লুকিয়ে আছে, তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে অক্ষরে অক্ষরে ডের ফ্যুয়েরারের নির্দেশ পালন করে আসছিল। কিন্তু তার পরেই সে তার পথ বেছে নিল। নির্দেশ না মানার সিদ্ধান্ত নিল মেজর, যার শাস্তি হিসেবে তাকেও হয়ত জীবন দিতে হতো।

আমি যেটা বারবার বলছি, সেটা হচ্ছে এগুলো খুব সহজ প্রশ্ন নয়। এর কোনো হ্যাঁ বা না জবাব নেই। যুদ্ধের সময় ওই ভিলাতে আমি থাকিনি। এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতাও আমার নেই। মা আমাকে যেটুকু বোঝাতে পেরেছেন, তা হলো হের মেজর শোয়ামব্যার্গারকে যদি কখনো যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার করা হতো, তাহলে সোফিয়া নোভাক তাকে অভিযুক্ত করত না কখনো।

আমার মা বলত লোকটার জন্যই শেষ পর্যন্ত অতগুলো মানুষ বেঁচে গেল। এমনকি জন্ম নিতে পারল একজন শিশুও। তাদের সামনে খুলে গেল ভবিষ্যতের দরোজা। আমার মা বিশ্বাস করতেন, যেখানে জীবন, সেখানেই আশা। তিনি আমাকে বহুবার বলেছেন, 'এই কাজটা যদি আমাকে আবারও করতে বলা হয়, অন্তত জীবন রক্ষার প্রয়োজনে, তাহলে আমি ওই কাজটা আবারও করব।'

আমি জানি না, এই কথাগুলো থেকে তুমি তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে কি না। তোমার জন্য এটা হয়ত কঠিন। কারণ তোমার বুকের গভীরে তুমি বয়ে চলেছে সীমাহীন এক কষ্টের কাহিনি। রুখসানা বেগমের পরিণতির জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ; আবার তোমার আরেকটা কষ্টের কারণ হলো এর জন্য যারা দায়ী, তাদের কখনো বিচার হলো না।

আবারও বলছি, তোমার মা এবং আমার মায়ের ঘটনা একেবারেই আলাদা। অপরাধের বিষয়টাও এখানে এক পাল্লায় তোলা ঠিক হবে না।

তবে আমি নিশ্চিত করে জানি যে সত্যের জয় একদিন হবে। তবে সেটা এমনি এমনি হবে না, সেলিম। ওটা হাওয়া থেকে আসবে না। এ জন্য তোমাদের লড়াই করতে হবে। কষ্ট করতে হবে। মতিউর রহমানের বিচারের জন্য তোমাদের কাজ করতে হবে। এই কাজগুলো তোমাদের আরও আগে করা উচিত ছিল। কিন্তু আগে হয়নি তো কী হয়েছে ? এখন করবে। তোমরা দলিল সংগ্রহ করো। সাক্ষ্য নাও মানুষের। আদালতের ওগুলো লাগবে বিচারের সময়। তোমরা

তৈরি হও, সেলিম। যেভাবে পারি, আমি তোমাদের সাহায্য করব। শুধু তোমরা আমাকে জানিয়ো।

আমার বিশ্বাস এই বিচার একদিন হবেই। সেদিন পৃথিবীতে যারা দোজখ নামিয়ে এনেছিল, তাদের বিচার না হলে রুখসানা বেগম, সোফিয়া নোভাক, কী রোমান হলার অথবা আমার শাইসে কিড কিংবা আমি, আমরা কি কাউকে ক্ষমা করব ? করব না, করতে পারব না। বিচার না হলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না, সেলিম, ক্ষমা করবে না আমাদের ভবিষ্যৎও। এই বিচার আমাদের দরকার, দরকার তোমার, দরকার আমার, আমাদের সবার।

এই চিঠিটার নিচে সই করেনি রিটা। ও কিছুই লিখেনি। যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল চিঠিটা। কলমের কালি শেষ হয়ে গেলে, অথবা হাতের কাছে আর কোনো সাদা কাগজ খুঁজে না পাওয়া গেলে, অথবা বিদ্যুৎ চলে গেলে, লেখা শেষ না করেই যেমন ওঠে যায় লেখক, এটা ছিল সেরকম অসমাপ্ত এক চিঠি এবং শেষ চিঠি। এরপর আমি ওকে দুটো চিঠি দিয়েছি কিন্তু তার কোনোটারই জবাব আসেনি, ওর সঙ্গে আমার আর কখনো কথা হয়নি, দেখাও নয়।

রিটার সঙ্গে যোগাযোগের আরও একটা সুযোগ আমার খুব দরকার ছিল।

সংসারযাপন

শাহানার ভিসুম প্রসেস হতে সময় লাগল সাত মাসের মতো। ও জার্মানি এল তার এক মাস পর। মাঝখানের সময়টা আমরা শুধু কথা বলেছি। কথার পর কথা। কথামালা দিয়ে রচনা করেছি আমাদের ঘরের ভিত, সংসারের দরজা ও জানালা। শব্দ ও নিশ্বাসের ভেতর দিয়ে আমি শাহানাকে আর শাহানা আমাকে চিনতে পেরেছে, আমাদের মাঝখানে কখনো কখনো থাকত নীরবতা, নীরবতা বোঝার ক্ষমতা আমি পেয়েছিলাম রিটার কাছ থেকে। রিটা বলত, 'তোমার নীরবতা যে বুঝতে পারে না, সে তোমার কথাও বুঝবে না কখনো।'

আমরা কথা বলতাম প্রত্যেক দিন। ও-ই ফোন করত, প্রথম দিকে কথা হতো খুব কম, শুরুতে হয়ত সপ্তাহে একবার, তারপর দুবার, একসময় দুটো কলের দূরত্ব কমে আসতে লাগল কিন্তু বেড়ে গেল একেকটা কলের সময় । আমার ফোনগুলো ছিল প্রয়োজনের, হয়ত রান্না করছি, শাহানাকে ফোন করে জানতে চাইলাম কোরমায় এক চামচ চিনি দেব কি না, জানালা দিয়ে হয়ত তাকিয়ে আছি বাইরে, হঠাৎ শীলার কথা মনে হলো, আর ভাবনার মাটিতে শীলাকে কবর দিতে ফোন করলাম শাহানাকে, জানতে চাইলাম ওর বৃষ্টি ভালো লাগে, না তুষারপাত। হয়ত ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি, ও ফোন করে জানতে চাইল, আমার শেষ রাতের স্বপ্নের কথা, আমি হয়ত স্বপ্নে বাল্টহাসার স্ট্রাসে কিংবা জিভেলফিঙ্গেনের বাড়িতে নগ্ন রিটাকে দেখেছি কিন্তু শাহানাকে বললাম স্বপ্নের উড়োজাহাজে ভোর রাতে ও উড়ে এসেছিল কোলনে, তখন ওর পরনে ছিল বিয়ের লাল বেনারসি শাড়ি।

আমি আর শাহানা ছিলাম দুই মহাদেশে কিন্তু আমাদের মাঝখানে ছোট্ট ওই ফোনটা ছিল পরস্পরকে দেখার জানালা।

একটা দিনের কথা আমার এখনো মনে আছে, সারা দিন বাইরে ছিলাম , বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হলো সেদিন, ঘরে ঢোকার আগে চাবি বের করার জন্য যখন পকেটে হাত দিয়ে শুনতে পেলাম চিৎকার করে ফোন বাজছে ভেতরে, অনবরত, রিসিভারটা তুলে 'সেলিম' বলার পরও ওপাশে কোনো

আওয়াজ ছিল না, ভাবলাম রং নাম্বার কি না, কয়েকবার শাহানার নাম ধরে ডাকলাম, কেউ সাড়া দিল না ওপাশে, তারপর শুধু কান্নার শব্দ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, সাত সমুদ্র আর তেরো নদীর ওপাড়ে শাহানা তখন হু হু করে কাঁদছিল।

হয়ত ও সারা দিন আমাকে ফোনে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, অস্থির হয়ে গিয়েছিল আমাকে না পেয়ে, পরে বুঝতে পেরেছি সেদিনের ওই কান্নার পর আমিও শাহানাকে একটু একটু ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম।

এই কলগুলো ছিল খুব লম্বা, বলার মতো তেমন কিছু থাকত না আমার, শুধু খাওয়ার ফিরিস্তি দিতে হতো আমাকে, কিন্তু শাহানার ফোন ছিল ঘটনা বহুল : সকালে ঘুম ভাঙা দিয়ে শুরু হতো, তারপর কলেজে যাওয়ার জন্য যে দুজন বান্ধবী ওদের বাসায় আসত, তার মধ্যে কাকে বেশি সুন্দর লাগছিল, ওরা তিনজন কীভাবে রিকশায় উঠল, কে বসল ওপরে, রাস্তায় কোন ছেলে মোটরসাইকেলে ওদের ওভারটেক করার সময় কোন বান্ধবীর দিকে কীভাবে তাকাল, কোন স্যার সাদা প্যান্টের নিচে সেদিন লাল আন্ডারওয়্যার পরে ক্লাসে এসেছিলেন, ফেরার পথে গাউছিয়া মার্কেট থেকে এক ডজন চুড়ি কেনার সময় দোকানদার কীভাবে ওর হাত চেপে দিয়েছিল, টেম্পুর বাচ্চা হেলপারকে পেছনে ঝুলতে দেখে ওর কতটা কষ্ট হলো, তারপর রাতে খাবারের পর কোন নাটক হলো টিভিতে, কখনো কখনো ও নাটকের কাহিনিও বলতে শুরু করত, তারপর সুবর্ণা মুস্তাফাকে জিন্সের স্কার্টে কেমন লাগছিল, এসব গল্প করত শাহানা । ওর ছিল একটা চ্যাটার বক্স।

ওর এই বকবকানি থেকে অবশ্য লাভ হয়েছিল আমার। আসার আগেই আমি ওকে বুঝতে পেরেছিলাম, অন্তত কিছুটা হলেও, যেমন : ও চায়নিজ ফুড ভালোবাসে, বিশেষ করে থিক থাই স্যুপ, পছন্দ করত চকমকে জড়িদার কাপড়, হুমায়ূন আহমেদের বই ওর প্রিয় ছিল, ও খুব বাচ্চা ভালোবাসত, টাই-স্যুট পরা স্বামীর সঙ্গে ও চাইত এখানে ওখানে বেড়াতে।

এসব বলত শাহানা। শুনতাম আমি। কখনোসখনো প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি। শাহানা শুনেনি। ও শোনার মেয়ে ছিল না। ছিল বলার। ওর কথা শোনার জন্য দুদিন পর পর আজিয়েন প্যাভিলিওন থেকে কলিং কার্ড কিনতে হতো আমাকে। ওই নাম্বারে ফোন করলে একটা মেয়ে আমাকে প্রথম স্বাগত জানাত। তারপর ঢঙ করে বলত পিন নাম্বার দিতে। ওর গলা শুনতে শুনতে এরকম হয়েছিল যে কখনো কখনো ওর কণ্ঠকে আমার মনে হতো শাহানার গলা।

শাহানার দাবি ছিল আমার সব কথা বলতে হবে ওকে। শুধু এখনকার কথা নয় বলতে হতো অতিতের কাহিনিও। বলত আমাদের মধ্যে কোনো কিছু লুকানো থাকবে না, আমরা জানব একে অপরের অন্ধকারের কাহিনিও, পরস্পরের কাছে আমরা হব শুধু দুটো খোলা বই।

শাহানা খুব গভীর করে জানতে চাইত, আমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছি কি না, আমাকে উসকে দেওয়ার জন্য ও একদিন বলল, কোনো এক নাজমা আপার ছেলের সঙ্গে নাকি ওর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, ওই ছেলে থাকত সুইডেনে, ডক্টরেট করছিল। তারপর ও অপেক্ষা করছিল প্রতিশোধ হিসেবে মুখ ফসকে আমি কিছু বলে ফেলি কি না, তার জন্য। আমি তখন বললাম, 'ছোট্ট বেলায় আমারও কিন্তু একবার বিয়ে হয়েছিল।'

অবাক হলো শাহানা। ফোনের ওপাশে নীরবতা। তারের ভেতর দিয়ে আসছিল শুধু হিসহিস শব্দ। শীতকালে শক্ত করে লাগানো জানালার ফাঁক দিয়ে আসা বাতাসের মতো।

'ওমা ! কী রকম বিয়ে ? কার সঙ্গে ?' ও জানতে চাইল।

আমি বললাম, 'আমার খালাতো বোনের সঙ্গে, খাদিজা।'

'কোথায় ?'

'গ্রামের বাড়িতে। পরমতলায়।'

'কীভাবে বিয়ে হলো তোমাদের ?'

'আমার ছোট খালা ছিলেন এই বিয়ের ঘটক। মা মারা যাওয়ার পর আমাকে পালতেন তিনি। একদিন বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন ওই খালা। লাল-নীল পাতলা কাগজ তিন কোনা করে কেটে দড়িতে আঠা দিয়ে লাগিয়ে উঠানের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ঝুলানো হলো, সব বাচ্চাদের দাওয়াত দেওয়া হলো, এই বিয়েতে বড়রা নিষিদ্ধ ছিল, উঠানে ভাঙা হলো বাতাসার হাঁড়ি, পুকুর থেকে মাছ ধরা হলো, প্রত্যেক বাড়ি থেকে আনা হলো মুঠো মুঠো চাল, পুকুরের পশ্চিম পারে কাঠ পুড়িয়ে রান্না হলো, তারপর খাবার বাড়া হলো কলাপাতায়।'

ফোনের ওপাশে হাসতে হাসতে শাহানা জানতে চাইল, 'তোমার ওই বউ এখন কোথায় ?'

বললাম, 'চানপুরে। ওর স্বামী একজন হাতুড়ে ডাক্তার। খাদিজা এখন এক হালি বাচ্চাকাচ্চার মা।'

ফোনের স্পিকার ফাটিয়ে হেসে উঠল শাহানা। তারপর বলল, 'ফান না আসিফ, আমি জানতে চাইছি, সত্যি সত্যি তুমি কখনো কারও প্রেমে পড়েছ কি না।' আমি এড়াতে চাইলে ও আমার ভেতর জ্বালা ধরানোর জন্য বলল, ও যখন ক্লাস নাইনে পড়ে তখন ওরা থাকত মতিঝিল কলোনিতে, ওখানে কোনো একটা ছেলে ওর জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকত, পরে ছেলেটা নাকি বিষও মুখে দিয়েছিল। ইঁদুর মারার বিষ।

শাহানা তার পরও শীলা বা রিটার কথা জানতে পারেনি। ওর সঙ্গে আমার দাম্পত্য জীবনের ওটাই ছিল প্রথম কোনো কিছু গোপন করে রাখা।

শাহানার এই চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গেই সংসার করছিলাম আমি। ভারচুয়াল সংসার। ঢাকা থেকে ও আমাকে শাসন করত। আমার সঙ্গে ন্যাকামো করত। ধমক দিত। আহ্লাদ করত। আদর চাইত। হয়ত গোলাপি শার্ট পরেছি, ওর কথায় সেটা খুলে ফেলতে হতো, কিংবা শুধু ডাল ও আলু ভর্তা দিয়ে রাতের খাবার সেরে ফেলতে চেয়েছি; কিন্তু ওর নির্দেশে রান্না করতে হতো চিকেন, ও আমাকে বলে দিত আজ বাজার থেকে কী কী আনতে হবে। কখন, কোথায় কাকে ফোন করতে হবে, বিদ্যুৎ কিংবা টেলিফোন অথবা গ্যাস কোন কোন বিল এখনো বকেয়া।

আমার সবকিছু ওর মুখস্থ ছিল।

শাহানা যখন আমার কাছে এল, তখন ও শুধু রক্তমাংসের একজন নারী। আমার কাছে ও তখন শানু।

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফ্রাংকফুর্ট থেকে নিয়ে এলাম ওকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওর শরীর আবৃত ছিল গহনায়, হাতের কনুই ছুঁয়ে রিনঝিন করে বাজছিল চুড়ি, লাগেজ বেল্ট থেকে স্যুটকেস টেনে নামাতে গিয়ে তার কয়েকটা ভেঙেও ফেলেছে। হাত-পা ছিল মেহেদি দিয়ে সাজানো, লাতাপাতার মতো নকশা, যেমন আঁকা থাকে হলুদের দিনে বিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে, গহনার ভারে মাটিতে নুয়ে পড়ছিল শাহানা।

নাখালপাড়ায় শাহানাকে যেরকম দেখেছিলাম, হুবহু সেরকমই আছে শানু। ওর চোখ দুটো আগের মতোই উজ্জ্বল ও টলটলে। মুখটা এখনো চার কোনা। হাসলে ওর দুটো চোখই হাঁসের বাচ্চার চোখের মতো ছোট হয়ে আসে। যখন হাঁটে, তখন চারপাশে একটা ছন্দের মতো হয়। শাহানা বেশ জায়গা নিয়ে হাঁটে। পরিবর্তন যা হয়েছে, সেটা শুধু ওর হাঁটা, বসা কিংবা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, আর চাহ নিতে। শাহানা এমন চোখ করে তাকায়, যেন ও আমার বহু দিনের চেনা, এমন মুখ করে হাসে, যেন কয়েক যুগ আগে থেকে ও আমার বউ।

আসার পরপরই ও দখল করে নিল আমাকে, শানু নির্দেশ করত, আমি পালন করতাম। একসময় ওর কাছেও আমি হয়ে উঠলাম পুতুলের মতো। একদিন সকালে চুমু খাওয়ার পর ও খুব বিরক্ত হলো। তারপর টেনেহিঁচড়ে দাঁড় করাল বাথরুমের আয়নার সামনে। ও আমার গোঁফ ফেলে দিল। আমার জুলফি কানের লতি ছাড়িয়ে গিয়েছিল, ও সেটা কেটে ছোট করল, আমি সিঁথি করতাম বাম থেকে ডানে, ও সেটা নিয়ে গেল ডান থেকে বামে।

সকালে কাজে যাওয়ার আগে ও নিজের হাতে বেঁধে দিত টাইয়ের নট, গুছিয়ে দিত ব্যাগ, জুতা মুছে দিত, টিফিন বক্সে খাবার ভরে দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাত। তারপর মাথার চুল আঁচড়ে, সেজেগুঁজে, খাবার সামনে নিয়ে অপেক্ষায় থাকত আমার ফিরে আসার। অনেক কিছু রাঁধতে পারত শাহানা।

হাজার পদের তরকারিতে গিজগিজ করত টেবিল। এই রান্নাই ছিল ওর একমাত্র বিনোদন, আমি যখন কাজে থাকতাম, ওর সময় কাটত কিচেনে।

প্রথম দিকে ওকে মার্কেটে নিয়ে যেতে হতো, নিতে হতো ডাক্তারের কাছেও, মোটামুটি সবকিছুর জন্যই ও আমার ওপর নির্ভর করত।

একা কোথাও যেতে চাইত না শাহানা। আমি নিয়ে গেলে ও যেত। কোথাও একা যেতে ভয় পেত শানু। আস্তে আস্তে কোলনের সব জায়গাতে নিয়ে গেলাম ওকে, নিয়ে গেলাম শনিবারের কাঁচা বাজার আর আলডিতেও, যাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্য বাল্টহাসার স্ট্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি, রিটা তখন ওখানে থাকত না, আমার মনে হতো ও হয়ত আশপাশে কোথাও থাকে, রাস্তার ওই মোড়ে দাঁড়াতাম কিন্তু কখনো চাইতাম না রিটার সঙ্গে ওর দেখা হোক, পিওনিয়ার স্ট্রাসেতেও নিয়ে গেলাম ওকে, কোনো এক রবিবার সারা দিন কাটালাম সু ফ্লোরার বোটানিশে গার্টেনে, ওখান থেকে ক্যাবল কারে উড়ে গেলাম রাইনের ওপারে।

বছর খানেকের মধ্যেই আগাগোড়া বদলে গেল শানু, কেউ বলত না যে ও সবে দেশ থেকে এসেছে, বেশ মুটিয়ে গেল, মুখটা পরোটা থেকে হয়ে উঠল পামকিনের মতো। গ্যোয়েটে ইন্সট্যুটে ভাষা শেখার পর ওর ভয় কেটে গেল, তখন ও একাই টেলিফোনের বিল দিতে পারত, ব্যাংকে যেতে পারত, ঘুরতে পারত মার্কেটে। ভাষা চালু হতে বেশি সময় লাগল না শানুর, কারণ ও ছিল চটপটে, লজ্জা বা সঙ্কোচ ওর কিছুই ছিল না, রেলগাড়ির মতো ছুটত ওর কথা, ক্লাসে যা কিছু শিখত, সেটা ব্যবহার করার সুযোগ ও কখনো হাতছাড়া করত না। বাচ্চারা যেভাবে কথা বলতে শেখে, সেভাবেই কথা বলত, যা বলার দরকার নেই সেটাও বলত, বলত জড়তা কাটাতে, হয়ত কোথাও কোনো কাজের জন্য গেল, প্রথমে বলত মাইনে নামে ইস্ট শাহানা, তারপর বলত ইশ কমে আউস বাংলাদেশ, তারপর যখন বলত ইশ বিন আইন ফ্রেমড, তখন অন্যরা হাসতে হাসতে ডেস্কের ওপর লুটিয়ে পড়ত। বলত তুমি যে একজন বিদেশি, সেটা না বললেও আমরা বুঝতে পারি ফ্রাউ সেলিম।

আমাদের প্রথম বাচ্চা শাদাব হওয়ার আগে শাহানা একটা চাকরিতে ঢুকল, ও ছিল কাউফফ্রাউ, মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের সেলসগার্ল। কয়েক দিনের জন্য ওর আম্মাকে নিয়ে আসা হলো ঢাকা থেকে। আর দ্বিতীয় সন্তান শৈলীর জন্মের মাস খানেক পরেই আব্বা মারা গেলেন।

আব্বার মৃত্যুর পর আমি দেশে যেতে পারিনি। দুই বছরের শাদাব আর কোলের শৈলীকে একা সামাল দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শাহানা সবাইকে নিয়ে দেশে যেতে চেয়েছিল কিন্তু খরচের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত সেটাও বাতিল করতে হলো। প্রথম কয়েক দিন আমার তেমন কষ্ট হলো না। বুঝতে পারলাম না, আমি ঠিক কী হারিয়েছি, কাকে হারিয়েছি। ফোনেই সব খবর পেতাম ঢাকা

থেকে, রাতের খাবারের পর বই পড়ছিলেন তিনি, শুয়েছিলেন ইজি চেয়ারে, তাঁর দুই হাতে ছিল প্লেটোর সংলাপ, হঠাৎ বুকের ব্যথায় শরীর কুঁকড়ে গেল তাঁর, বইটা নাকি ধরা ছিল মুখের ওপর, চশমাটা পড়েছিল মেঝেতে, তারপর ফোন করা হলো মহাখালীর কাছে মেট্রোপলিটন হাসপাতালে, রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে গলিতে ঢুকল অ্যাম্বুলেন্স, কিন্তু নাবিস্কোর মোড় পার হওয়ার আগেই মারা গেলেন তিনি। সকাল সকাল গোসল দেওয়া হলো, জানাজা পড়ানো হলো নাখালপাড়া জামে মসজিদে, তারপর লাশ নিয়ে যাওয়া হলো পরমতলায়, চিরনিদ্রায় তাকে শুইয়ে দেওয়া হলো মায়ের কবরের ডান পাশে।

আব্বা মারা যাওয়ার কয়েক দিন পর বুঝতে পারলাম, আমার পৃথিবীটা ধীরে ধীরে কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। এক এক করে চলে গেল সবাই। কাউকে ধরে রাখতে পারলাম না আমি। শৈশবেই আমার মা চলে গেলেন, তারপর আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম শীলাকে, শীলাও মিলিয়ে গেল হাওয়ায়, জড়িয়ে ধরলাম রিটাকে, ঝড়ো বাতাসে সেও ছিটকে পড়ল ঝরা পাতার মতো, তারপর আব্বাও চলে গেলেন, মাথার ওপরের শেষ ছাতাটাও তুমুল বৃষ্টিতে ভেঙে তছনছ হয়ে গেল।

সেই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এল প্রকৃতি, প্রথমে শানু, তারপর ঘর ভরিয়ে দিতে এল ফুটফুটে দুই ছেলেমেয়ে। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার দুই রকমের অনুভূতি হতো : কখনো মনে হতো প্রকৃতি কত মহান, বিপর্যয়ের সময় কী পরম মমতায় মানুষকে সে আপন করে নেয়, একে একে ভরিয়ে দেয় শূন্য ঘর, মানুষের যখন দুঃখ হয়, প্রকৃতি তখন বর্ষার বৃষ্টির মতো কাঁদে, খুশির সময় ছেয়ে থাকে ফুল ও ফসলে। আবার কখনো কখনো মনে হয়, প্রকৃতির মতো নিষ্ঠুর আর কিছু নেই পৃথিবীতে, ভূমিকম্পে একটা শিশু যখন মাটিতে মিশে যায়, তখনো ধ্বংসস্তূপের এখানে-ওখানে ফুটে থাকে লাল গোলাপ, বন্যার তোড়ে যখন ভেসে যায় সংসারের থালাবাটি, তখনো পানিতে শাপলা ফুল ফোটে। একাত্তরের ওই নয় মাসে শত্রুরা যখন একটার পর একটা বাড়ি পুড়িয়ে ছাঁই করে দিয়েছিল, তখনো পাকা ধানে মৌ মৌ করছে লিলুয়া বাতাস, বুলেটে বুলেটে যখন ঝাঁঝড়া হলো দুধওয়ালার বুক, রুখসানা বেগম যখন চিৎকার করতে করতে হায়েনাদের গ্রাস থেকে বাঁচতে চেয়েছিল, তখনো পাশের নদীতে বয়ে গেছে স্রোত, পানিতে ডিগবাজি খেয়েছে মাছ, বাড়ির পেছনে গাছটায় সুর করে ডেকেছে পাখি, আঙিনায় ফুটেছে লাল, হলুদ ও বেগুনি ফুল।

আমার ক্ষত সারিয়ে দিতে খুব বেশি সময় লাগল না পৃথিবীর। দুই বাচ্চা নিয়ে তখন আমাদের ব্যস্ত সংসার। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমরা সপে দিয়েছি শাদাব ও শৈলীর পেছনে। ওদের গোসল করানো, কাপড় পরানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো এসব করতে করতেই শেষ হয়ে যেত আমাদের দিন ও রাত। মাঝেমধ্যেই আমার রিটার কথা মনে হতো। মনে মনে ওকে খুঁজতাম আমি।

ভাবতাম রিটার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হতো, যদি এমন হতো যে রিটা জিন্ডেলফিঙ্গেনে যাবে, টিকিট কাটার জন্য কোলন হাউপ্ট বানহফে দাঁড়িয়ে আছে কাউন্টারের সামনে, তিন-চারজন যাত্রীর পেছনে দেখা যাচ্ছে ওর মুখ, ওর হাত ট্র্যাগারের হ্যান্ডেল ধরা, গোড়ালির কাছে পা ক্রস করে দাঁড়িয়ে আছে রিটা, ও যেভাবে দাঁড়ায়, আর আমি কাচের এপাশে কম্পিউটারের পর্দায় দেখছি কোথায় সিট খালি, কোন ট্রেন কটায় কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে, তারপর সেটা প্রিন্ট করছি, কাচের তলায় গোলমতো ছিদ্রটার ভেতর সেটা বাড়িয়ে দিয়ে পরের যাত্রীর দিকে তাকিয়ে বলছি 'বিটে জের।' তারপর রিটার পালা যখন আসবে, তখন কী করব আমি ? আমি কী তাকে 'গুটেন টাগ' বলে স্বাগত জানাব ? জানতে চাইব ও কোথায় যেতে চায় ? কেন জানতে চাইব ? আমি তো জানি ও কোথায় থাকে, ট্রেনের টিকিট কাটা মানেই কি বাড়িতে যাওয়া ? আর কিছু জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে আমার ? জানতে চাইব সে কোথায় থাকে ? আমার সঙ্গে কেন ও যোগাযোগ রাখেনি ? তাকে কি বলব আমার নতুন সংসারের কথা ?

আমি এসব ভাবতাম, ভাবতাম আর ভাবতাম। ওটা ছিল ভাবনার দুনিয়া। ভাবতে ভালো লাগত আমার। রিটা বাস করত শুধু ওই ভাবনার জগতে, আমার সাহস ছিল না বাস্তবে ওর মুখোমুখি হওয়ার। অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে রাখত অচেনা একটা ভয়। ভয় রিটাকে ছিল না, ছিল শানুকে। ও যদি রিটার পরিচয় জানতে চায়, তাহলে কতটা মিথ্যা বলতে পারব আমি ? কতটা লুকাতে পারব আর কতটা পারব সত্যের প্রকাশ ঘটাতে ? ভয় হতো, ও যদি কিছু আঁচ করে ফেলে, যদি শুনতে পায় কিছু !

একবার ঘুমানোর আগে, শাহানা তখন সবেমাত্র দেশ থেকে এসেছে, আমাদের কোল তখনো খালি, মনে করতে পারছি না শারীরিক মিলনের ঠিক আগে, না পরে, ও আমার কাছে জানতে চেয়েছিল কোনো জার্মান মেয়ের সঙ্গে আমার কখনো সেক্স হয়েছে কিনা, আমি রাগ দেখিয়েছিলাম ওর সঙ্গে, কৃত্রিম রাগ, শানুর দিকে পিঠ দিয়ে শুয়েছিলাম, অনেকটা সময়, তারপর ও টেনে ঘুরিয়ে দিল আমাকে, ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, আমি ওকে ডাকলাম, 'শানু', তারপর বললাম, 'আমি যাকে পাব না, চির জীবনের জন্য যে কখনো আমার হবে না, আমাকে স্পর্শ করার অধিকার অথবা আমাকে ছোঁয়ার সুযোগ তাকে আমি কখনো দেব না।'

শাহানার ডান হাত তখন আমার কোমরে। ওর পা দুটো আস্তে আস্তে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরছে আমাকে। আমি তখন ওকে বললাম, 'শানু, আমি তোমাকে পেয়েছি, চির জীবনের জন্য তুমি আমার, শুধু আমার, একমাত্র তুমিই আমাকে পাবে।' শাহানা তখন দুহাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। শীতে কেঁপে উঠলাম আমি।

খালি গায়ে ভেজা স্যুয়েটার পড়লে যেরকম অনুভূতি হয়, আমার শরীরেও তখন সেরকম অনুভূতি হলো।

শাহানার সঙ্গে সংসার জীবনে ওটাই ছিল আমার প্রথম মিথ্যা, প্রথম অভিনয়।

এই সত্য-মিথ্যায় চলছিল আমাদের সংসারযাপন। আমি খুশি, খুশি শাহানাও, মাঝখানে বাচ্চারা সুপার গ্লুর মতো জড়িয়ে রেখেছিল আমাদের, ওরাও খুশি। শাহানা যখন শৈলীকে গোসল করাত, আমি শাদাবের দাঁত ব্রাশ করে দিতাম। শৈলীর গায়ে যখন শানু ম্যাসেজ করত, শাদাবকে নিয়ে আমি খেলতাম কম্পিউটার গেম। টম অ্যান্ড জেরি দেখতাম টেলিভিশনে। শৈলীর ন্যাপি বদলের সময় আমি শাদাবকে হামলেনের বাঁশিওয়ালার গল্প বলে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করতাম। শহানা যখন শৈলীকে চেকআপের জন্য হেলথ সেন্টারে নিয়ে যেত আমি শাদাবকে নিয়ে যেতাম সাঁতার শেখার পুলে। শাদাব যখন আমার গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, শৈলী তখন শানুর বুকে মুখ গুঁজে দুধ টানত। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে শানু এগিয়ে আসত আমার কাছে, তারপর মেলে ধরত নিজেকে।

এক রাতের কথা আমার এখনো মনে আছে। সেদিন কী যেন হয়েছিল, সন্ধের পর থেকে মাথার ভেতর শুধু ঘুরপাক খাচ্ছিল রিটার মুখ। একসময় এগিয়ে এল শানু। আমি বাধা দিলাম ওকে। বাধা পেয়ে ও ঘনিয়ে এল আরও। ওর মাথা আমার কাঁধে। ডান স্তন পড়ে আছে আমার বুকের ওপর। শানুর ডান পা আমার কোমরের ওপর উঠানো। ওর এই পা-টা মনে হলো পাথরের মতো ভারী। ভাবছিলাম, এই ভার আর কত কাল বহন করতে হবে আমাকে। শানু চাইছিল ভার হালকা করতে, কিন্তু আমি ছিলাম ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত। একসময় ও সরিয়ে নিল নিজেকে। চুপ করে শুয়ে রইল আমার দিকে পিঠ দিয়ে। আমি ডাকলাম ওকে। সাড়া দিল না শানু। তারপর গড়িয়ে পড়লাম ওর ওপাশে। আমি বললাম, 'কী হয়েছে তোমার ?'

ওর চোখে টলটল করছে পানি।

'তুমি আমাকে ভালোবাস না, আসিফ।'

'কে বলল তোমাকে ?'

'তুমি আমাকে আগের মতো জড়িয়ে ধর না।'

'কীভাবে বুঝলে ?'

'আমি যখন তোমাকে চাই, তুমি পড়ে থাক কাঠের গুঁড়ির মতো...'

তারপর আমি ওর ঘনিষ্ঠ হলাম। শুয়ে পড়লাম শানুর শরীরের ওপর। কিছু বলল না ও। আমি ওর সারা গায়ে চুমু দিলাম। শানু বাধা দিল না আমাকে। আমি ঢুকে গেলাম ওর ভেতর। এবার শানু পড়ে রইল পাথরের মতো। তারপর আমি গড়িয়ে পড়লাম একপাশে। শাহানা ওর ডান দিকে কাত হলো আর আমি জানালার দিকে পাশ ফিরে শুলাম। এর বেশি আমি আর কী করতে পারতাম ওই রাতে !

ফেরার ভাবনা

আমি রিটাকে ভুলতে চাইতাম। বহু দিন পারিনি। দাম্পত্য জীবনের শারীরিক চাওয়া-পাওয়ার সময়ে ও এসে হাজির হতো । হয়ত আমি আর শাহানা নগ্ন হয়ে শুয়ে আছি, মাঝখানে পড়ে আছে রিটা, ওর পরনে বন্দিশিবিরের পোশাক। কখনো কখনো আমি শুনতে পেতাম ঘরের ভেতর কে যেন 'ঘোড়া ঘোড়া' বলে চিৎকার করছে। তারপর জোরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো শব্দ হতো। ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম আমি। ঠান্ডায় অবশ হয়ে আসত শরীর। আমার এই আচরণে অবাক হতো শাহানা। আমি ঘুমাতে চেষ্টা করতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকার পরও ঘুম আসত না চোখে, কিন্তু মনের দুয়ারে বারবার এসে উঁকি দিত রিটা, দুই কান চেপে ধরে রাখতাম আমি, তার পরও ওর নিশ্বাসের শব্দটা বন্ধ হতো না, হাতের তালুতে ঢেকে রাখতাম দুই চোখ, কিন্তু চোখের ভেতর ভাসত রিটার মুখ। মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে ধ্বসে পড়তাম, তখন আমার মনে হতো রিটা আমার জীবনে এসেছিল রূপকথার ওই ব্যাঙের মতো। ও চুমু খেল আমাকে আর আমি পরিণত হলাম রাজকুমারে। ওই রাজকুমারের ঘরে এখন দুই বাচ্চা নিয়ে শাহানা।

রিটার ভালোবাসা ধুঁয়ে-মুছে আমি চাইছিলাম শাহানার ভালোবাসায় জড়াতে, শীলাকে পেছনে ফেলে যেমন ডুবে গিয়েছিলাম রিটার ভেতর, আমি ভাবতাম ভালোবাসাটা কেন কচুপাতার ওপর জমে থাকা বৃষ্টির পানির মতো হয় না, যতক্ষণ ভালোবাসা থাকবে, ততক্ষণ পানির বিন্দুটা মার্বেলের মতো পাতার ওপর গড়াগাড়ি খাবে, আর যখন ওটা পাতার ওপর থেকে পিছলে টুপ করে পড়ে যাবে, তখন মুছে যাবে ভালোবাসা। ভালোবাসাটা আসলে টিস্যুর ওপর পানি পড়ার মতো, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, তারপর যখন শুকাবে, ওটা আর আগের মতো হবে না কখনো।

আমার আর শানুর মধ্যেও ভালোবাসাবাসির কমতি ছিল না। দু-একটা রাত ছাড়া আমাদের দাম্পত্য জীবনে খুব একটা অভিযোগ ছিল না ওর। অনুযোগ ছিল না আমারও। আমি দূরে সরতে চাইলে ও আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরত। শাহানার এই ভালোবাসা ছিল আমার সকল ক্ষতের ওপর লাগানো মলমের মতো।

জীবন বিমার বিজ্ঞাপনের মতো তখন আমাদের সুখী পরিবার। সবাই মিলে আমরা এখানে-ওখানে বেড়াতে যেতাম। শৈলীকে প্যারাম্বুলেটরে বসিয়ে আমরা ঘুরতাম সুপার মার্কেটে, পুশ চেয়ারের হাতল থেকে ওর মাথার ওপরে ঝুলত প্লাস্টিকের রঙিন একটা বই, ক্ষুধার্ত এক শুয়োপোকার গল্প, বেশির ভাগ সময় শৈলী ঘুমাত আর যতক্ষণ জেগে থাকত পুরোটা সময় ও তাকিয়ে থাকত বইটার দিকে, হাত পা ছুড়ে ও ওটা ধরতে চাইত, শাদাব তখন স্কুটার চালাত, কখনো ও আমাদের সামনে থাকত আবার কখনো আসত পিছু পিছু, যেখানেই যেতাম লোকজন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকত, একবার এক পাগল উঠল বাসে, শানু বাচ্চাদের নিয়ে যেখানে বসেছিল, ও দাঁড়াল তার ঠিক সামনে, তারপর কখনো শৈলীর গাল ছুঁয়ে কখনো শাদাবের চুল টেনে বারবার বলতে লাগল 'জের শ্যোন, জের শ্যোন, এত কালো চুল তুমি কোথায় পেয়েছ, ভোভারবার ভোভারবার, শানুকে জিজ্ঞেস করছিল, 'তুমি নিশ্চয়ই ওদের নিয়ে গর্বিত', কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর আবার বলল, 'তুমি হলে সেক্সি কিডের মা, এই স্পার্ম তুমি কোথায় পেয়েছ ?' তারপর অনুমতি নিয়ে ওদের কয়েকটা ছবিও তুলল, আমি বুঝতে পারছিলাম লোকটা ছিল পুরোপুরি মাতাল, ওর বান্ধবীকে ইমপ্রেস করতেই বাসের ভেতর ও এরকম করছিল, ঠোঁটের কোনায় হাসি ঝুলিয়ে রাখলেও ভেতরে ভেতরে রাগে ফোঁস ফোঁস করছিল শানু, বাড়িতে ফিরে ও প্রথম বাচ্চাদের চোখেমুখে থুতু ছিটাল, তারপর সুরা-কালাম পড়ে ফুঁ দিল শরীরে।

নাখালপাড়ার মতো আমার কোলনের সংসারেও এই ফুঁ-টু চালু ছিল। ফুঁ দিত শানু। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ফুঁ দিয়ে বের হতো। ঘরে ফিরেও ফুঁ দিত। আমি বিশ্বাস করতাম না ওসবে কিন্তু আমার কোনো আপত্তিও ছিল না।

শাদাব, শৈলী আমরা সবাই শানুকে ঘিরেই ঘুরপাক খেতাম কোলনের জীবনে।

রোদেলা দিনে আমরা হাঁটতে যেতাম রাইনের তীরে, ফেরার সময় কিছুক্ষণের জন্য ডোমের সামনে গিয়েও দাঁড়াতাম, কোলনটা যদি একটা বৃত্ত হয়, তাহলে এই জায়গাটা ছিল তার কেন্দ্রের মতো, ওখানে কালো বেটে মতন লোকটা মাটিতে শুয়ে নাকের ছিদ্র দিয়ে ওপরের দিকে এমনভাবে পানি ছুড়ত যে ওকে ফায়ার হাইড্রেন্টের মতো মনে হতো, শাদাব ওকে বলত তিমি মাছ, আরেকটা লম্বা চিকন মতো লোকও এক চাকার সাইকেলের ওপর কখনো বসে অথবা শুয়ে কিংবা দাঁড়িয়ে আগুন নিয়ে খেলত, ওসব দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যেত আমাদের। বাড়িতে ফেরার আগে আমরা যেতাম বানহফের পেছনে আজিয়েন কর্নারে। বেগুন, শিম, ধনেপাতা আর কাঁচামরিচ কিনত শানু, ওখানে তখন সালোয়ার-কামিজও উঠতে শুরু করেছিল, জামাগুলো ধরে ধরে দেখত শাহানা। কেনাকাটা শেষ করে দোকান থেকে যখন বেরোতাম রাস্তায়, চার-পাঁচটা বাংলাদেশি ছেলে জটলা হয়ে আড্ডা দিত, লিচুবাগানের গলির মুখের মতো, উঁকি

দিয়ে সেখানে সজলকে খুঁজতাম আমি, শুনতাম ওরা নাকি তুর্কি ছেলেদের সঙ্গে দাও-কুড়াল নিয়েও মারামারি করত।

শৈলীর জন্মের পরের বছর কোলনে যখন কার্নিভাল হলো, আমরা সবাই গিয়েছিলাম মিছিলে। সাপের মতো বিশাল লম্বা এক মিছিল। এর শুরু ছিল কিন্তু শেষ ছিল না। বাড়ির সামনে দিয়ে গেল মানুষের ঢল। ওখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। শানু সাজল হরিণ, শাদাব হলো বিড়াল, শৈলী খরগোশ আর আমি হলাম জলদস্যু, যার একটা চোখ কালো রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। সারা দিন আমরা মিশে ছিলাম মিছিলের স্রোতে, বিকালে যখন বাসায় ফিরলাম, তখন আমাদের দুজনের চার হাতে মোট চারটা ব্যাগ, তার ভেতর উপচে পড়ছিল কয়েক কেজি শোকোলাডে।

ছুটির দিনে আমরা বেড়াতে যেতাম দূরে কোথাও। কখনো চলে যেতাম আরেক শহরে, উঁচুনিচু পাহাড়ি শহর আখেনে অথবা কার্ল মার্ক্সের ট্রিয়ারে। লম্বা ছুটি পেলে যেতাম অন্য কোনো দেশে। একবার গেলাম সিসিলি, রফিকের ওখানে। রফিকও বিয়ে করেছে, ওর সংসার তখন সিনেমার মতো সাজানো। ওর তিনটা বাচ্চা, একটা ছেলে, দুটো মেয়ে। নিজে একটা কিয়স্ক দিয়েছে, ভাবিও কাজ করেন ওখানে। ঢাকায় দুটো ফ্ল্যাট করেছে, শাড়ি আর সোনা-রুপার গহনায় বউকে মুড়িয়ে রেখেছে রফিক।

আড়ালে ও একবার রিটার কথাও জানতে চেয়েছিল। শুধু ও জানত আমাদের বিয়ের কথা। আমি বললাম, 'কবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। পোশায় না দোস্ত।' তারপর ও বলল, 'দেশি বউ না হলে কি চলে, দেশি জিনিসের মজাই আলাদা।' এটুকু বলে কয়েক দফায় হাসল রফিক, হাসলাম আমিও। শাহানা কয়েকবার ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে। আড়চোখে ও শাসন করল আমাকে।

আমার মতো শানুও বেড়াতে ভালোবাসত, ছোটখাটো এরকম অনেক মিল ছিল আমাদের, আবার ছিল খুটখাট অমিলও। শানু উঁচু মোটা শক্ত বালিশে শুতে চাইত কিন্তু আমার লাগত পাতলা নিচু নরোম বালিশ। ও পছন্দ করত হেনশেন আমি রিভফ্লাইশ, বসন্তকালে ফুলের গন্ধে আমি উতলা হতাম কিন্তু বাতাসে ভেসে আসা ফুলের রেনুর ছোঁয়ায় শাহানার চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠত। ওর ছিল হে ফিভার। আমাদের দুজনের ভেতর মিল পাওয়া গেলে আমি খুশি হতাম আর অমিলের সময় রিটার সঙ্গে তুলনা করতাম শানুকে। কেন করতাম জানি না। আপনাআপনি চলে আসত ওটা। ওকে ভুলেও গিয়েছিলাম, আবার মনেও রেখেছি। তুমুল এক সঙ্গমের পর রিটা শুনতে চাইত একাত্তরের যুদ্ধের কথা। আমি বলতাম ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ সকালে সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে একটা পরিবারের লাশ নর্দমার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার কথা, রিটা বলত ঘোড়ার গাড়ির ভেতর বন্দীদের লুকিয়ে কীভাবে গভীর জঙ্গলে রেখে এসেছিল সোফিয়া নোভাক। কিন্তু শাহানা বলত কবে ও শেষবারের মতো টেলিফোন করেছে বাড়িতে, ওর ছোট ভাই ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় জি ফাইভ

পেয়েছে, ওকে কীভাবে আনা যায় বিদেশে, আমার শাশুড়ির ডায়াবেটিস এখন কতটা বেড়েছে, ঢাকার কোনখানে ফ্ল্যাটের দাম পার স্কয়ারে কত হয়েছে অথবা কারওয়ান বাজারের জলপাইয়ের স্বাদ কোলনের কালো কিংবা সবুজ অলিভের চেয়েও কতখানি টাটকা, কিংবা বলত আজিয়েন পাভিলিওয়নে গত সপ্তাহে ইলিশ মাছ আসেনি কারণ ফ্রাংকফুর্টে বিমানের ফ্লাইট হয়ে পড়েছে অনিয়মিত।

শাহানা যখন এসব বলত, আমি তখন দেশে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম পরমতলায় আমার ছোট্ট সংসার, গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে আমি মাস্টারি করি, সেফারা বাজারের কাছে নতুন একটা স্কুল খুলেছি রুখসানা বেগমের নামে, ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ের কলকাকলিতে মুখর হয়ে থাকে স্কুল, শাদাব আর শৈলীও পড়ে ওখানে, সকালে জাতীয় সংগীতের সময় ওরাও বুক টান করে দাঁড়ায় পতাকার তলে, বুক ভরে শ্বাস নেয় শিশুরা, দুধওয়ালার স্মৃতিস্তম্ভের সামনে মাথা নত করে দাঁড়ায় বাচ্চারা, চিৎকার করে গান গায় ওরা, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

আমি ফিরে যেতে চাইতাম আমার সোনার পরমতলায় আর ভাবতাম পশ্চিমে আসা বিমানের টিকেট কেন সব সময় ওয়ান ওয়ে হয়।

আমি স্বপ্নে দেখি পুকুরের পূর্ব পাশের মাচা আবার ছেয়ে গেছে লাউ ফুলে। শিমুলগাছের মাথা টকটকে লাল। পরমতলা আবার হয়ে উঠছে পরমতলার মতো। কচুরিপানার ফুল ফোটে আছে চারপাশে। আমার মা আছেন বাড়িতে। দুধওয়ালা কলসি হাতে ছুটছেন আড়ঙের দিকে। নাড়া ক্ষেতে আবার হাডুডু খেলা হচ্ছে। বাবা বিআইত্যার দলে। নৌকার ছইয়ের নিচে আমরা সবাই বসে আছি। গলুইয়ে শৈলী। ওর পা দুটো নৌকার দুদিকে ছড়ানো। পানিতে ছুঁয়ে আছে ওর পা। জলের ওপর রেললাইনের মতো সমান্তরাল রেখা পেছনে ফেলে ছুটছে নৌকা। শাদাব বসেছে কুঁজো আব্বাস খার সঙ্গে। লগি মারছে ওরা। আমি আর শানু ভেতরে বসেছি। আমাদের সামনে পাতা একখানা রঙিন গামছা। তার ওপর কিছু গুড় ও মুড়ি।

স্বপ্ন দেখতাম একসময় এই গ্রামে আবার ফিরে যাব আমি। এই মাটিতেই একদিন বিচার হবে মতিউর রহমানের।

তারপর আমার স্বপ্নে হানা দিতে লাগল সর্ষে ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে থাকা পরমতলা। তুলা গাছটার নিচ দিয়ে গাঙের দিকে ছুটে যাওয়া সরু রাস্তাটা। ওই গাছটায় ছিল জিন-পরির বাসা। মায়ের শাড়ি দিয়ে বানানো মোটা কাঁথায় শরীর মুড়িয়ে ওই রাস্তা দিয়ে রাতের অন্ধকারে আমি ফিরছি বাড়িতে। কলাগাছের পাতাগুলো আয় আয় বলে ডাকছে আমাকে। কাঁথার নিচে আমার কোলের ভেতর ঘুমিয়ে আছে একটা মেশিনগান। গাঙের ওপারেই আমাদের বাড়ি। সামনে রঙধনুর মতো বাঁকানো একটা সাঁকো। বাঁশের। আমি ওটা পার হচ্ছি। মাঝখানে পৌঁছে হঠাৎ দেখি বাঁশটা কাটা । আমি পড়ে যাচ্ছি নিচের পানিতে...নিচে হা করে আছে অসংখ্য কুমির...কোলের মেশিনগানটা জেগে উঠল তখনই...

শেকড়ের কাছে

শাহানা দেশে ফিরতে চায়নি। ও রাজি ছিল না কিছুতে। কারণ হিসেবে শানু বলত শাদাব ও শৈলীর ভবিষ্যতের কথা। ওদের লেখাপড়া ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তার অজুহাত দিত ও। এসব শুনিয়ে ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করত। খুব একটা কাজ হতো না ওসবে। সবার ওপর ছিল আমার জেদ। পাশাপাশি আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, আমাদের তথাকথিত সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। চালাকি করে বাচ্চাদের ধর্ম কর্মেরও ভয় দেখিয়েছিলাম ওকে : যদি মানুষ না হয় ওরা, আঠারো হওয়ার পর যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, জার্মান কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনে, বিদেশে থেকে থেকে যদি মুসলিম জঙ্গি হয়ে যায়, বড় হলে ওরা যদি না তাকায় এই বুড়ো-বুড়ির দিকে, যদি ওরা কোরান শরিফ বিশ্বাস না করে, 'হালাল মানুষ' না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ওসবে কান দিচ্ছিল না শানু। ও তখন ক্যানাডা, লন্ডন কিংবা আমেরিকায় মুভ করার কথা বলত। ও যুক্তি দেখাত, ওসব দেশে প্রচুর বাঙালি ও মুসলমান, ওখানে কোনো অসুবিধা হবে না। জবাবে আমি বলতাম, নাইন ইলেভেনের হামলার পর মুসলমানদের অবস্থা ভালো না, মোঃ নাম নিয়ে ওরা কোথাও চাকরি পাবে না, ও ছিল নাছোড়বান্দা, আমি তখন ভঙ্গি করতাম অসহায়ের মতো, নতুন করে কিছু শুরু করার সাহস ও শক্তি কোনোটাই আমার ছিল না। ও কোলনে ঘড়ি ধরে ট্রাম আসার কথা বলত, বলত ঝকঝকে পরিষ্কার রাস্তাঘাটের কথা, আর বেশি দিত নিরাপত্তার অজুহাত কিন্তু শাদাব যেদিন বাস্কেটবল মাঠ থেকে ফিরে শৈলীর সঙ্গে আর্শলক আর ফিকেন ফিকেন বলে মুখ ভেঙচিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে লাগল, সেদিন রাতে বিছানায় আমার ঘনিষ্ঠ হতে হতে শানু জানতে চাইল, আমরা কবে ফিরে যাব 'তোমার সোনার বাংলাদেশে।'

কথাটা বলার সময় শাহানা কাঁদছিল নীরবে।

ঢাকায় ফেরার পরও বুকের ভেতর থেকে টের পাইনি যে আমি দেশে ফিরেছি। অনেক বদলে গেছে এই শহর। খুব অপরিচিত মনে হলো নিজেকে। খিলক্ষেতের কাছে দুমড়ানো মুড়ির টিনের মতো ট্যাক্সিটা যখন ফুটওভার ব্রিজ পার হলো, মনে হলো এই নগর আমি চিনি না। অথচ একসময় এই শহরের সবকিছু আমার মুখস্থ ছিল শৈশবের ছড়ার মতো। আগন্তুকের মতো মনে হলো

নিজেকে। এই শহর এখন যানজটের শহর। স্থবির-অচল হয়ে আছে সবকিছু। মনে হচ্ছিল এটা যেন ঢাকা-টঙ্গী হাইওয়ের একটা স্থির ছবি। কোথাও কিছু নড়ছে টড়ছে না। মুড়ির ডিব্বার মতো মানুষে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে বাস-মাইক্রোবাস, যেন উপচে পড়ছে, একদল যাত্রী পঙ্গপালের মতো বাসের দরজায় হামলে পড়ছে, দু-একজন হয়ত উঠতে পারছে আর যারা পারছে না, তারা অপেক্ষা করছে পরেরটার জন্য, রাস্তাগুলোও গাড়িতে ঠাসাঠাসি, পুরো শহরটাই যেন একটা বাসস্ট্যান্ড। এয়ারপোর্ট থেকে মহাখালি ওভারব্রিজ পার হতে সময় লাগল এক ঘণ্টার বেশি। রাস্তাগুলো মৃত সড়কের মতো কিন্তু তার দুই পাশে চকচক করছে রঙিন বিলবোর্ড, যে ছেলেমেয়েগুলো ওখানে মোবাইল ফোন কানে লাগিয়ে কথা বলছে, ওরা আসিফ না শীলা না, ওদের শানু বলেও মনে হয় না, ওরা নতুন জেনারেশন-ডিজুস।

এবার আমরা সারা জীবনের জন্য ফিরেছি। এখন একরকম লাগছে। এর আগে প্রত্যেক বছর আমরা দেশে গিয়েছি। তখন অন্যরকম লাগত। আমরা যেতাম গ্রীষ্মকালে, শাদাবের স্কুল যখন লম্বা সময়ের জন্য ছুটি হতো, তখন। টানটান একটা উত্তেজনা থাকত সেসময়। এটা গোছাও, ওটা ঢোকাও। এই কেন, ওই নাও। আর এখন অন্যরকম সবকিছু, কেমন বিষণ্ন ও মলিন, এবং ম্যারম্যারে।

প্রত্যেকবার দেশে আসার আগে হুলুস্থূল সব কাণ্ড করত শাহানা। বাচ্চাদের দুই বাহুতে এতগুলো টিকা দিত যে ওরা খুব কাহিল হয়ে পড়ত। ঢাকায় রওনা করত জ্বর নিয়ে। যে কয়েকটা দিন আমরা দেশে থাকতাম, শানুর ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। নানা রকমের হুকুম ছিল ওর : কলাবাগানের ফুটপাতে বসে ফুচকা খাওয়া যাবে না, ওগুলো নাকি জন্ডিসের ডিব্বা, ছোঁয়া যাবে না রাস্তার ফল, ওগুলো ক্যামিকেল দিয়ে পাকানো, বাজারের মাছ খাওয়া যাবে না, কারণ ওগুলোর গায়ে ফরমালিন, দাঁত ব্রাশ থেকে শুরু করে গোসলও করতে হবে ফোটানো পানিতে, ওয়াসার পানিতে কেঁচো আর মলম পার্টির কারণে সন্ধের পর সিএনজিতে চড়ার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা ছিল ওর।

দেশে ফেরার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ খুব হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল শানু। গরমে ও যখন খুব হাসফাঁস করত, তখন জার্মানির ঠান্ডার কথা বলত, বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট সয়লাব হয়ে গেলে বলত অবিরাম তুষারপাত সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবনের কথা, পত্রিকায় হয়ত কোথাও ধর্ষণ বা এসিড ছুড়ে মারার খবর ছাপা হলো, অথবা রাস্তার পাশে বস্তার ভেতর পাওয়া গেল কয়েক টুকরা লাশ, ওটা হাতে নিয়ে দৌড়ে এল আমার কাছে, তারপর পাতাটা মুখের সামনে ধরে বলল, 'এসব কি কোনো সভ্য দেশে হতে পারে, আসিফ !' সব সময় একটা আতঙ্কের গুহায় বাস করত শানু, বাচ্চারা কখন গাড়ির নিচে চাপা পড়ে, কখন ডেংগু বাধায় মশারা, লোডশেডিংয়ের কথা বলত, জবাবে আমি ওকে কিছুই বলিনি, ব্যাট করত

শানু , আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম বাউন্ডারি রোপের ওখানে, বলতে বলতে একসময় ও চুপ করে যেত, তখন শুরু হতো আমার পেটানোর পালা।

আমি যেসব ছক্কা মারতাম, সেগুলোর মধ্যে ছিল নিজের শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে থাকা, নিজেদের মায়ের মুখের ভাষা আর সবচেয়ে বড় কথা হলো নিজের দেশে জীবন কাটানো।

শানু তখন অভিমান করত। বলত, 'আমি তোমার বউ, তোমার সন্তানদের মা কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাস না, আসিফ।' আমি হাসতে হাসতে ওকে খোঁচা দিয়ে বলতাম, 'তোমার জন্য আমার প্রেম ফরমালিনে ভেজানো, ক্ষয় থাকবে অনন্তকাল।' খোঁচায় কাজ হতো কি না, জানি না, ও না রেগে যেত, না হাসত, তবে কেমন করে যেন তাকাত, ওর চোখ দুটোকে মনে হতো ফরমালিন দেওয়া মাছের চোখের মতো ম্লান ও পাংশু।

জমানো টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনলাম ঢাকায়। শানু চেয়েছিল ধানমন্ডির লেক ঘেঁষে একখানা ছায়াঘন নিরিবিলি বাড়ি। ডেভেলপাররা কয়েকটা বাড়িও দেখিয়েছিল আমাদের। কিন্তু ওগুলো ছিল 'জার্মানফেরত সেলিমের' নাগালের বাইরে। আমি চাইছিলাম নাখালপাড়ায়। পাড়াটা দেখতে এখন অদ্ভুত রকম। অলিগলি আগের মতোই চিকন। এখনো রিকশা আর টেম্পু চলে খানাখন্দে ভরা সরু ওই গলিতে, কিন্তু রাস্তার দুই পাশে কিছুক্ষণ পর পর উঠেছে বিশাল বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট। গোটা রাস্তায় একটার পেছনে আটকে থাকে আরেকটা প্রাইভেট কার, তার পেছনে সারাক্ষণ ভোস ভোস করে গোঙায় টেম্পুর ইঞ্জিন।

লুকাসের মোড়ে যে দোকানটা সারি সারি সিমেন্টের বস্তার পেছনে ঢাকা পড়ে থাকে, তার পাশে বসানো হয়েছে এটিএম মেশিন। দাড়িওয়ালা জীর্ণ হাড়-জিরজিরে এক বুড়ো সারাক্ষণ পাহারা দেয় ওখানে। লোকটা ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারে না। হোমিওপ্যাথির ডাক্তারখানাটার উল্টোদিকে উঠেছে ডোনার কেবাব, ফ্রাইড চিকেন ও পমেস ফ্রাইটসের দোকান 'ইট অ্যান্ড গো।' তার পাশে সরু একটা গলির ভেতর বসানো হয়েছে বিশাল একটা সুপারমার্কেট। ট্রলি নিয়ে ওখানে বাজার করে ডায়াবেটিসে ক্ষয়ে যাওয়া নাখালপাড়ার মেদবহুল গৃহিণীরা।

নিশ্বাস ফেলারও জায়গা নেই এই পাড়ায়। আকাশ আড়াল হয়ে গেছে পাঁচতলা-ছয়তলা বাড়ির ছাদ আর পানির ট্যাংকের ওপর বসানো মোবাইল ফোনের টাওয়ারের পেছনে। কোথাও কোনো বাড়ির আঙিনাতেও এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ছোট্ট একটা পেয়ারা অথবা হাস্নাহেনা কিংবা শিউলি ফুলের গাছ। চারদিকে শুধু ইট আর ইট, সিমেন্টের পর সিমেন্ট, লোহার গ্রিলের পর গ্রিল আর বালুর পর বালু।

সবখানেই গিজগিজ করছে বাড়িঘর। যে দুয়েকটা টিনের একচালা বাড়ি তখনো ছিল, সেগুলোও ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেখানে উঠছে ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট,

সারাক্ষণই শোনা যায় পাইলিং করার শব্দ, ঘর ঘর করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছে মিক্সার মেশিন। একটা বাড়ির গা-ঘেঁষে উঠছে আরেকটার দেয়াল। দুটো বাড়ির মুখোমুখি জানালা। মাঝখানের দূরত্ব এক হাতেরও কম, স্বামী ও স্ত্রী যদি আলাদা দুটো বাড়িতে আলাদা হয়ে থাকে তার পরও তাদের দাম্পত্য জীবন কোনোভাবে ব্যাহত হবে না।

তার পরও আমার এই পাড়াতে থাকতে ভালো লাগত।

শাহানার সঙ্গে পরে একটা রফা হলো। নাখালপাড়ার সীমান্তঘেঁষে কেনা হলো সাড়ে আঠারো শো স্কয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। জায়গাটা নিরিবিলি, প্রশস্ত সড়ক, ওখানে রিকশা চলে না, বাচ্চারা ক্রিকেট খেলে না রাস্তায়। ওটা ছিল নাখালপাড়া থেকে বের হয়ে যাওয়ার মুখে, ব্যাংকার্স রোতে। কেউ জিজ্ঞেস করলে শাহানা নাখালপাড়া বলে না, বলে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পেছনে। ওখানে ফ্ল্যাটের দামও ছিল বেশি, আমার একার টাকায় ওটা কেনাও সম্ভব ছিল না, শানুর কাছে যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তার সবটাই ও উপুড় করে ঢেলে দিল এই ফ্ল্যাটটার পেছনে, তারপর ও বাড়িটা নিজের মতো করে সাজাল, পছন্দ করে টাইলস কিনল, হাতিরপুলে রাস্তার পাশে দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়াল দিনের পর দিন, বাথরুমে লাগাল জার্মান ফিটিংস, দেয়ালটেয়াল ভেঙে বড় করল কিচেন, সেখানে মার্বেল ও গ্রানাইটের ওয়ার্কটপ বসাল, কাজ করাল সেগুন কাঠের দরোজায়, শোওয়ার ঘরের দেয়াল ঢেকে দিয়ে ক্যাবিনেট বানাল, ওপরের দিকে বড় বড় পাল্লার দুই পাশে রাখল দুটো খোলা জায়গা, ওখানে রাতের তারার মতো আলো জ্বলত, শাহানা বেশকিছু শোপিস রেখেছিল ওখানে, আইফেল টাওয়ার, আমস্টার্ডামের ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি, লন্ডনের বিগবেন আরও কত কী। শাহানাকে কিছু না বলে ওখানে শীলার চিরুনি আর রিটার নাট ক্র্যাকারটাও রেখে দিয়েছিলাম আমি, চিরুনিটা এখন অকেজো, অনেকগুলো দাঁত ভাঙা, ক্র্যাকারটারও দরকার পড়ে না কখনো, তার পরও শাহানা কোনো দিন কিছু বলেনি আমাকে, হয়ত বুঝতে পারেনি, বাড়ি সাজাতেই ব্যস্ত ছিল শানু, ফ্ল্যাটের এখানে-ওখানে ঝুলিয়ে দিল ফ্রেমে বাঁধানো বিশাল বিশাল ছবি : রাতের আকাশের নিচে রাইনের ওপর আলো ঝলমল লোহার সেতু, আকাশ ছুঁই ছুঁই কোলন ক্যাথিড্রাল, একটা ছবিতে শাদাব ও শৈলীর মাঝখানে বিশাল মোটা এক স্নোম্যান, ওর নাকটা গাজর দিয়ে বানানো আর গলায় মাফলার, আরেকটা ছবিতে আমি ও শানু, আমরা দাঁড়িয়ে আছি পরস্পরের কোমর জড়িয়ে, পেছনে সমকামীদের টাগ ডের ক্রিস্টোফার স্ট্রাসের রঙিন মিছিল।

শানুর হাতের ছোঁয়ায় ছবির মতো সুন্দর হয়ে উঠল বাড়িটা।

শাদাবকে ভর্তি করা হলো উত্তরার কাছে টার্কিশ হোপে, ওখানে যেতে লাগে এক ঘণ্টার মতো, আমি দিয়ে আসি সকালে, নিয়ে আসে শানু অথবা ওর দাদু। সকালের দিকে নাখালপাড়ার একটা কিন্ডার গার্টেনে বাচ্চাদের পড়ায় শাহানা। স্কুলের সবাই ওকে ডাকে জার্মান ম্যাডাম।

আমি বলি ফ্রাউ শাহানা।

ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করছি আমি। ব্যবসাটা জার্মানির সঙ্গে। কোলনে বাংলাদেশি যত দোকান ছিল, ওগুলো চলত ইন্ডিয়ান শপ হিসেবে, ওদের সঙ্গে কথা বলে এসেছিলাম আমি। কয়েকটা দোকান বনে আর কয়েকটা বার্লিনে, ওগুলোতে শাকসবজি আর মাছ সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আমার। ব্যবসাটা খুব একটা খারাপ চলছে না, কিছু টাকা আবার আমি শেয়ার বাজারেও খাটিয়েছি।

প্রথমেই মোটা একটা টাকা খরচ করতে হলো উকিল ও আদালতের পেছনে। ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কয়েক দিন পর কোর্টে সারেন্ডার করলাম আমি। সব ব্যবস্থা করল শানু। ভালো একজন উকিল ধরা হলো। প্রথম আবেদনে জামিন হলো না। তারপর চলল তদবির, তদবির, তদবির। লতায়-পাতায় আমার এক চাচা শ্বশুর সরকারের একজন মন্ত্রী। শাশুড়িকে নিয়ে কয়েকবার তার কাছে ধরনা দিল শাহানা। উনি কোর্টের পেশকারকে ফোন করে দিলেন। ওই পেশকার একসময় ছাত্রলীগ করত। মধ্যস্থতা হলো ওর মাধ্যমে। বিচারককে দিতে হলো দুই লাখের মতো। কথামতো নির্ধারিত দিনে যখন টাকা নিয়ে যাওয়া হলো, সেদিন ফিরিয়ে দেওয়া হলো শানুকে। কারণ তার ছেলে তখন খুব অসুস্থ ছিল। বলা হলো বাচ্চা সুস্থ হলে নাকি জামিন হয়ে যাবে। আমার বদলে বিচারপতির বাচ্চার জন্য দিনরাত দোওয়া করতে লাগলেন আম্মা, ওই সন্তানের দ্রুত সুস্থ না হয়ে উঠায় এক মাসেরও কিছু বেশি আমাকে কাটাতে হলো জেলখানায়।

এখন অনেকটাই সমস্যামুক্ত জীবন, শুধু কয়েক মাস পর পর হাজিরা দেওয়ার ঝামেলা।

তারপর ঢাকায়ও শুরু হলো আমার মুখস্থ ঘ্যানঘ্যানে জীবন। সকালে যাই শাদাবের স্কুলে। ওখান থেকে ফেরার পথে মহাখালীতে বাজার করি। তারপর যাই মতিঝিলে। শেয়ারের উত্তেজনায় কখন যে দুটো বেজে যায় বুঝতেও পারি না। তারপর চলে যাই আমার অফিসে, কারওয়ান বাজারের কাছে। তখন কোলনের দোকানওয়ালারা জেগে উঠতে শুরু করে। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ি কাজে। বাসায় যখন ফিরি, তখন রাত নয়টার মতো বাজে। খাওয়ার টেবিলে খোঁজ নেই বাচ্চাদের। টেলিভিশনে দশটার খবর দেখি। এগারোটার দিকে ঢলে পড়ি বিছানায়। শানু যখন ঘনিষ্ঠ হয়, তখন ঘড়ির কাঁটা চলে যায় বারোটার ওপারে।

শানুর সঙ্গে এই সম্পর্কটাও হয়ে উঠল রুটিনের মতো। শুধু হওয়ার জন্য হওয়া। সেখানে উত্তেজনা থাকে কিন্তু শিহরণ থাকে না। শরীর থাকে অথচ হৃদয় থাকে না। শেষ থাকে কিন্তু অপেক্ষা থাকে না। অথচ এর সবই ছিল বাল্টহাসার স্ট্রাসের চারতলায়। ওটা ছিল বুনো। সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। গড়ে উঠত আবার। তলিয়ে যেত জলের অতলে। আবার ভেসে উঠত কোথাও। যা কিছু আমাকে পেছনে টেনে রাখত, সেগুলো ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেত।

এই জীবনটা কোলনের মতো ক্লান্তিকর ছিল না, তবে মনে হয় আমার এই জীবনযাপন হয়ে উঠতে লাগল শুধু একটা প্রয়োজন, সত্যি কথা বলতে বাচ্চাকাচ্চা আর পরিবারের কাছে শানু ছিল গ্লু অথবা নিউক্লিয়াস আর আমি ছিলাম নিছকই একটা মিস্টার মানিব্যাগ।

আমাদের ফিরে যাওয়ার মাস কয়েক আগে নির্বাচন হলো দেশে। পরমতলার আসনে বিপুল ভোটে হেরে গেল মতিউর রহমান। তার দলের ভরাডুবি হলো দেশের সবখানে। নতুন সরকারের কাছে দাবি উঠল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। সরকারও এই বিচারের অঙ্গীকার করল। প্রস্তাব পাশ হলো সংসদে। বিচারের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হলো। এই বিচার যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল না প্রচলিত ফৌজদারি আইনে হবে, তা নিয়ে চারদিকে বিতর্ক শুরু হলো। কেউ বলল, যুদ্ধাপরাধীরা যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য এয়ারপোর্ট আর সীমান্তের বন্দরগুলোকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলছে, সরকার সময় নষ্ট করছে। পাকিস্তানের দিক থেকে নাকি চাপ আছে ঢাকার ওপর। চাপ আছে সৌদি আরব থেকেও। সরকার বলছে কোনো চাপ নেই। বিচার যাতে স্বচ্ছ আর আন্তর্জাতিক মানের হয়, তার জন্য খুব কৌশল করে সরকারকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। এ নিয়ে প্রতিদিনিই পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে। কলামের পর কলাম। গভীর রাতে টেলিভিশনে চলছে একটার পর একটা টক শো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এই আলোচনা যখন তুঙ্গে, ঠিক তখন মে মাসের এক শুক্রবারে আমরা সবাই গেলাম পরমতলায়। আমি, শানু, শাদাব ও শৈলী। সঙ্গে আম্মাও ছিলেন। ড্রাইভারের পাশে ছিলাম আমি, ওরা পেছনে। পথে দফায় দফায় বমি করল শাদাব। শানুর কোলে শৈলী বসেছিল চুপচাপ। এই প্রথম ওরা যাচ্ছিল ওদের দাদির কবরের কাছে।

সেফারা বাজারে ছেড়ে দিতে হলো গাড়ি। তারপর বাঁশের পুল পার হয়ে রাস্তায় পা ফেলতেই হঠাৎ শির শির করে উঠল শরীর আর তখনই বুঝতে পারলাম, বহু দিন পর আমি দেশে ফিরেছি। পায়ের তলায় খুব উষ্ণ আর নরম মনে হলো পরমতলার মাটি। বহু বছর পর আজ আবার পা রাখলাম সেই পুরনো মাটিতে। আমি এখন সেই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে আমার পিতৃপুরুষেরা ঘুমিয়ে আছেন। এটা সেই গ্রাম, যেখানে গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, রুখসানা বেগমের সঙ্গে আব্বার বিয়ে হয়েছিল। এটা সেই গ্রাম, যেখানে বৈঠকখানায় খড় বিছানো মাটির ওপর অজানা কোনো এক বর্ষণমুখর রাতে ভূমিষ্ট হয়েছিল আসিফ। আমি আবার সেই গ্রামে ফিরেছি, যার পুকুরের তলায় আমার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি বিয়েও করেছিলাম এই গ্রামে। পশুদের সঙ্গে লড়াই এর ফাঁকে ফাঁকে এই মাটির রাস্তা দিয়েই রাতের অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে মায়ের কাছে ফিরে আসতেন আমার

মুক্তিযোদ্ধা পিতা। আমি এখন সেই মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছি, যা ভিজে লাল হয়ে গিয়েছিল আমার মায়ের রক্তে।

অসাড় হয়ে পড়ছিল আমার শরীর।

আমি এখন সেই পরমতলায়, যে গ্রাম আমার মাকে ভুলে গিয়েছিল। এটা সেই মাটি, যেখানে খুনিরা আমার মায়ের শরীর খুবলে খেয়েছিল। তারপর তাঁকে ওরা পাগল বানাল। তারপর কবরের ভেতর ঢুকতে দিল শেয়াল। আমাকে তাড়াল দেশ থেকে। ভেবেছিলাম এই পরমতলা হয়ত ভুলে গেছে আমাকেও। কিন্তু মায়ের কবরের কাছে শিমুলগাছটার তলায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, পরম মমতায় আমাকে জড়িয়ে ধরল পুকুরের ওপার থেকে বয়ে আসা শো শো বাতাস। বুঝতে পারলাম, সোনার পরমতলা আমাকে ভোলেনি।

বাচ্চারা জানতে চাইল, এটা কার কবর। একটা কবর দেখিয়ে শানু বলল, 'তোমার পাপার আব্বুর।' 'পাশেরটা কার ?' শাদাবের প্রশ্ন।

আমি বললাম, 'আমার মায়ের।'

আম্মাকে জড়িয়ে ধরে শাদাব চিৎকার করে উঠল, 'পাপা তোমার আম্মু তো এখানে।' শাদাবের কাঁধে টান দিয়ে ওকে সরিয়ে নিল শানু।

কবরের ওপরে ঘাসগুলো জঙ্গলের মতো হয়ে আছে। আমি বসলাম কবরের মাথার কাছটায়। হাত দিয়ে ধরলাম মাটিতে। বরফের মতো ঠান্ডা। গুটিয়ে গেল লজ্জাবতী গাছ। নুয়ে পড়ল ওর বেগুনি ফুল। ওগুলো কেটে কেটে সাফ করলাম আমি। নতুন করে মাটি ফেললাম ওখানে। বাঁশ কেটে বেড়া দেওয়া হলো চারপাশে। ওখানে নতুন ঘাস লাগানো হলো। পরিষ্কার করা হলো চারপাশের জংলি আগাছা। লাগিয়ে দিলাম কয়েকটা ফুলগাছ। কবর দুটো তখন ভেজা ভেজা। নতুন কবরের মতো।

আগে ছিল একটা কবর। এখন এক জোড়া।

সেবার আমরা পরমতলায় ছিলাম দুই রাত। ফেরার সময় কবরের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করা হলো। সূর্যটা তখন খুব কড়া, গনগনে রোদ, ঠিক মাথার ওপর। শাদাব আর শৈলী একটু দূরে জাঙ্গালের ওপর খুটি দেওয়া একটা ছাগলকে খাওয়াতে চেষ্টা করছিল কাঁঠালপাতা। তিনবার সূরা ফাতিহা আর একবার সূরা ইয়াছিন পড়ল শানু। তারপর যখন হাতের দুটো পাতা একসঙ্গে লাগিয়ে আমরা সবাই দোয়া পড়ছিলাম, তখন শুনতে পেলাম হাতের তালুর নিচে আম্মার চাপা কান্নার শব্দ।

এরপর থেকে আমি সপ্তাহে একদিন পরমতলায় যেতাম। কখনো আমার সঙ্গে থাকত শাদাব আবার কোনো কোনো সপ্তাহে শৈলী।

শহীদ রুখসানা স্মৃতি পাঠাগার আবার চালু করার উদ্যোগ নিলাম আমি। বাজারে আটার কলের দোকানটার কাছে একটা ঘর ভাড়া করা হলো। মুক্তিযুদ্ধের দুয়েকটা বই দিয়ে চালু হলো লাইব্রেরিটা। রিটার জন্য মুক্তিযুদ্ধের গল্প লিখে রাখতাম যে ডায়েরিতে, সেটাও রাখলাম ওখানে। মুরাদনগর কলেজের সুমন এই পাঠাগারের দায়িত্ব নিল। ওর সহযোগিতায় আবার শুরু হলো পরমতলা' ৭১ গড়ে তোলার কাজ। আমরা ঠিক করলাম, এবার কাজ করব নীরবে। স্বাধীনতার যুদ্ধে মতিউর রহমানের কি ভূমিকা ছিল, তার একটা ইতিহাস রচনা করতে হবে আমাদের। সাক্ষ্য নিতে হবে পরমতলার মানুষের। যেসব মুক্তিযোদ্ধাকে খুন করা হয়েছে, যাদের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে, লুটতরাজ করা হয়েছে, ধর্ষণ করা হয়েছে, সেসবের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। ঠিক করলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যখন শুরু হবে, তখন এই দলিল আমরা জমা দেব সরকারের কাছে।

এই কাজে শানু সহযোগিতা করে না, বরং ও অখুশি। শানুর আশঙ্কা এতে আরও বেশি বিপদ হতে পারে। ও চায় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। ঝামেলাহীন সংসার। কন্ট্রাসেপটিভের বিজ্ঞাপনের মতো সুখী একটা পরিবার। আমি যেদিন পরমতলায় যাই, সেদিন গুম ধরে বসে থাকে শানু। বারবার ফোন করে জানতে চায়, কখন ফিরব ঢাকায়। ফেরার পর পরমতলা নিয়ে ও কিছু জিজ্ঞেসও করে না। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শাদাব ও শৈলীকে বলি, আমার সোনার পরমতলার গল্প। তখন লোডশেডিং হয়। অন্ধকারে ডুবে যায় নাখালপাড়া। শাদাব জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো পাপা ?'

আমি বলতাম, 'কারেন্ট চলে গেছে।'

'কারেন্ট কী বাবা ?'

'বিদ্যুৎ।'

'কোথায় গেছে কারেন্ট ?'

ও মনে করত বিদ্যুৎটা হেঁটে হেঁটে অন্য কোথাও গেছে, আবার চলে আসবে। ঠিক এক ঘণ্টা পর আলো ফিরত বাড়িতে, মাঝখানের সময়টা চোখ বন্ধ করে আমি শুয়ে থাকতাম অন্ধকারের ভেতর। ভাবতাম, শীলা তো আমাকে পরমতলায় দিয়ে আসত, রিটাও বলত ওখানে কাজ শুরু করার কথা, তাহলে শানু অন্যরকম হলো কেন ? শীলা আর রিটা যদি বউ হতো, তাহলে কি ওরাও এরকম করত ?

মনে আছে, বউ জিনিসে বিশ্বাস ছিল না সজলের। ও বিশ্বাস করত বান্ধবী, বান্ধবী, বান্ধবী। সজল বলত, 'কলম্বাস বিবাহিত হলে আমেরিকা আবিষ্কার হতো না কখনো।' আমরা প্রশ্ন করতাম, 'কেন ?' উত্তরে সজল বলত, 'একবার ভেবে দেখ তো, কলম্বাস আবিষ্কারের নেশায় ঘরের বাইরে ছুটছে আর পেছন থেকে ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাচ্ছ তুমি, আমাকে নিয়ে যাও সঙ্গে, তুমি কখন ফিরবা ?' ওর এই সব কথায় আমরা গড়াগড়ি খেতাম বিছানায়, কখনো সোফায়

অথবা কার্পেটে। আমাদের হাসির দমকে খলবল করে ওঠত ২১ পিওনিয়ার স্ট্রাসের বাড়িটা।

এভাবেই কাটছে আমার দিন। ঢাকায় আর পরমতলায়। ভাবি, দেশে ফিরে আসার পর আসলেই কি আমি সুখী আর কতটা খুশি ? শাহানা যে খুশি নয় সেটা তো ও গোপন করেনি। ও শুধু আমাকে অনুসরণ করেছে। এরকম কত কিছু হিসাব করি আমি। মিলিয়ে দেখি, কতটা ভালো আছি দেশে। নিজেকে প্রশ্ন করি, ভালো থাকাটাই কি বড় কথা ? আর কতটা খারাপ আছি এখানে ? এই তুলনাটা খুবলে খুবলে কুড়ে কুড়ে খায় আমাকে। একটা সময় ছিল, যখন রিটাকে তুলনা করতাম শীলার সঙ্গে। আর এখন শানুকে বসাই রিটার পাশে। ঢাকাকে দাঁড় করাই কোলনের সম্মুখে। একটা সময় এই তুলনা হয়ে উঠল অসহনীয় যন্ত্রণার মতো।

আমার এখনো মনে আছে, সজল বলত, 'নদীর দুই তীর দেখা কখনো ভালো না।'

সকালে নাশতা খাওয়ার পর পেপার পড়ছিলাম আমি। ওই টেবিলটায়, ওই চেয়ারে, যেখানে আব্বা বসতেন একসময়, এখন আমি বসি। ভেতরের পাতায় যেখানে বিদেশের খবর ছাপা হয়, সেখানে হঠাৎ দেখলাম আরিবের্ট হাইমের মৃত্যুর খবর। জার্মান টেলিভিশন নাকি নিশ্চিত করেছে, সতেরো বছর আগে ও কায়রোতে মারা গেছে। ওখানকার একটা হোটেলে ছদ্মনামে বসবাস করত আরিবের্ট হাইম। ওর কোনো সংসার ছিল না কিন্তু ওখানকার বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে ও পিংপং খেলত। ওরা তাকে ডাকত আঙ্কেল তারেক। ওর একটা ব্রিফকেস পাওয়া গেছে হোটেলে। ভেতরে তার পাসপোর্ট ছিল। ওকে খোঁজার জন্য বিভিন্ন কাগজে যে খবর ছাপা হয়েছে, তার কিছু ক্লিপিংসও ছিল ব্রিফকেসের ভেতর। খবরে বলা হলো, মৃত্যুর পর ওকে নাকি কায়রোর 'আজিমপুর গোরস্থানে' দাফন করা হয়েছিল।

স্টোরিটা ছাপা হয়েছে দুই কলামে। খবরটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দেওয়া আছে ভিজেনথাল সেন্টারের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি। ফ্রাউ বাওয়ার বলছেন, 'আরিবের্ট হাইম যে কায়রোতে থাকত, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার মৃত্যুর খবর নিয়ে আমাদের মনে এখনো যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।'

নাখালপাড়ায়, সকালের নাশতার পর, আব্বার চেয়ারে বসে খবরের পাতায় রিটার নামটা দেখব, সেটা আমি কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। এরপর কয়েকটা দিন আমি স্বাভাবিক থাকতে পারিনি। বারবার পড়েছি খবরটা। শুরু থেকে পড়তে চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রথম লাইনটা শেষ না করেই চলে গেছি শেষের উদ্ধৃতিতে, যেখানে রিটার নাম লেখা। কাগজের ওপর ঝুঁকে গিয়ে দেখেছি, আসলেই কি এটা রিটা। নামের বানানটা কি ওরা ঠিক করে লিখেছে। নাকি এটা অন্য কেউ।

কাঁচি দিয়ে কেটে পেপার কাটিংটা রেখে দিলাম ওয়ালেটের ভেতর।

বুঝলাম রিটার হাত থেকে আমার মুক্তি হলো না ঢাকাতেও। ভালো হলো না আমার স্বপ্ন দেখার রোগ। রিটাকে আমি কখনো কখনো পরমতলায় দেখি। পাঠাগারের চেয়ারে হেলান দিয়ে ও ম্যাগাজিন পড়ছে। শীলাকেও স্বপ্নে দেখি আমি। দ্রাখেনফেলসে ও আর আমি একটা চাদরের ওপর বসে ড্যোনার কাবাব খাচ্ছি।

একদিন রাতের খাবারের পর বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। ঢালা বর্ষার মতো। টেলিভিশন দেখছিলাম আমি আর শানু। কী একটা নাটক হচ্ছিল কোনো একটা চ্যানেলে। ধারাবাহিক। বিজ্ঞাপন বিরতির সময় চ্যানেল বদলালাম আমি। বিবিসিতে তখন দেখাচ্ছিল জার্মানির একটা খবর। নাৎসি যুদ্ধাপরাধী ডেমিয়ানুকের বিচার শুরু হয়েছে মিউনিখের আদালতে। কয়েক দিন আগে অ্যামেরিকা থেকে তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে জার্মানির কাছে। নাৎসি ক্যাম্পে কাজ করার কারণে ওর নাগরিকত্ব বাতিল করার পর তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে জার্মানি। ডেমিয়ানুক ছিল সবিবর বন্দিশিবিরের রক্ষী। ওখানে আটাশ হাজারের মতো ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল।

ড্রইং রুমের সোফায় বসেছিলাম আমি আর শানু। বারান্দা দিয়ে ঠান্ডা একটা বাতাস আসছিল ঘরের ভেতর। মোটামুটি সবগুলো বাতি ছিল নেভানো। চারপাশে দেয়ালে ছড়িয়ে আছে টেলিভিশনের পর্দার আলো। আমার পাশে বসে আছে শানু। বিছানায় যেতে ও বারবার ডাকছিল আমাকে। সাড়া না পেয়ে একসময় ও নিজেই আমার পাশে এসে বসল। আমি বসে ছিলাম হেলান দিয়ে। সোফায় পুরোপুরি শরীর এলিয়ে। আমার পা দুটো সোজা টি-টেবিলটার কাচের ওপর। গোড়ালির কাছে কাঁচির মতো ক্রস করে রাখা। শানুর দুটো পা-ও আমার হাঁটুর ওপর। আড়াআড়ি। ওর পা দুটো ছিল খুব ভারী। ওর বাম হাতটা আমার কোমরে জড়ানো আর মাথাটা আমার বাম কাঁধের ওপর। ঠান্ডায় একটু একটু কাঁপছিল শানু।

ডেমিয়ানুকের বিচার যখন শুরু হলো, তখন আদালতের বাইরে জড়ো হয়েছিল কয়েকশো মানুষ। ওর শাস্তির দাবিতে তারা স্লোগান দিচ্ছিল। গোপন করব না, বিক্ষোভকারীদের ওই ভিড়ে সেদিন রাতে আমি রিটাকে খুঁজেছি।

ঝরাপাতা

তারপর কোনো একদিন বিবিসির খবরে দেখলাম আউশভিৎস থেকে চুরি হয়ে গেছে শিবিরের ফটকের ওপর লাগানো আরবাইট মাক্ট ফ্রাই লেখাটা, আমস্টার্ডামে তুমুল বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় উপড়ে পড়েছে আনে ফ্রাঙ্কের বাড়ির সামনে দেড়শো বছরের পুরনো চেস্টনাট গাছটাও।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় যে রাতে খুনিদের ফাঁসি হলো, পরমতলা থেকে তার পরদিন ফোন এল সুমনের, দুপুরের দিকে, মোবাইলে ফোন করে ও জানাল জার্মানি থেকে এসেছে একখানা চিঠি। ওটা রাখা আছে পাঠাগারে। আমি জানতে চাইলাম, কিসের চিঠি। কার চিঠি। খুব বেশি কিছু বলতে পারল না ও।

'আসিফ ভাই, চিঠিটা খুব অদ্ভুত রকমের' সুমন বলল।

'কী ধরনের ?' জানতে চাইলাম আমি।

'খামের ওপরে লেখা আবদুস সেলিম। আপনার নাম ভুল লিখেছে ওরা।' সুমন হাসছিল।

ওর হাসির জবাবে আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। আমি বুঝতে পারছিলাম চিঠিটা জার্মানি থেকে এসেছে কিন্তু কার চিঠি কোনো ধারণা ছিল না। আমি তখন মতিঝিলে স্টক এক্সচেঞ্জের অফিসে। ঢাকায় শেয়ারের দাম সেদিন খাড়া হয়ে পড়ছিল।

ফোনটা কেটে দিয়ে তখনই রওনা হলাম পরমতলার দিকে। বাড়িতেও কাউকে কিছু বলিনি। মতিঝিল থেকে বের হয়ে টিকাটুলির মোড়ে পৌঁছে ড্রাইভারকে শুধু বললাম, 'দেশে চলো।'

খামের ওপর লাগানো একগাদা স্ট্যাম্প। সবগুলোয় ব্রান্ডেনবুর্গ টুয়েরের ছবি। উঁচু উঁচু থামের ওপর চারটা তেজি ঘোড়া নিয়ে ছুটছে দেবী ভিক্টোরিয়া। খামের মাঝখানে টাইপ করে লেখা প্রাপক : আবদুস সেলিম। মাতা : শহীদ রুখসানা বেগম। গ্রাম : পরমতলা। সেফারা বাজার। বাংলাদেশ। এই এতটুকুই।

প্রিয় সেলিম,

আমি জানি না, এই চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছাবে কি না। আমি জানতাম না, তুমি জার্মানি ছেড়ে চলে গেছ। তোমার খোঁজে আমি কোলনেও গিয়েছিলাম। পিওনিয়ার স্ট্রাসের ২১ নম্বর বাড়ির লোকেরা কোনো খোঁজ দিতে পারল না তোমার। বহু জায়গায় যোগাযোগ করে জানতে পেরেছি, তুমি আর এখানে থাক না। ধারণা করছি, তুমি হয়ত তোমার দেশে ফিরে গেছ। তাও আমরা নিশ্চিত করে জানি না। এটা শুধু অনুমান। চিঠিটা তুমি পাবে, এই বিশ্বাসেই তোমাকে লিখতে বসেছি।

বহু কষ্টের পর খামের ওপর যতটুকু লেখা অতটুকু ঠিকানাই জোগাড় করতে পেরেছি। এখন তোমার কাছে চিঠিটা ভালোয় ভালোয় পৌঁছালেই খুশি।

আমি জানি না খবরটা তোমাকে কীভাবে দেব। তুমি জানলে হয়ত কষ্ট পাবে যে গত মাসে রিটা মারা গেছে। তোমার ঠিকানাটা পেতে পেতে এত সময় চলে গেল। রিটার একটা স্যুটকেসের ভেতর একটা বইয়ের পাতায় লেখা ছিল তোমার গ্রাম আর মায়ের নাম। এটুকুও যদি আগে পাওয়া যেত, তাহলে এই দুঃসংবাদটুকু তোমাকে বহু আগেই জানাতে পারতাম।

রিটার মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কী এক অভিমানে হঠাৎ করে আমাদের ছেড়ে ও চলে গেল। এর আগে নোভার মৃত্যুর যন্ত্রণা তো তোমাকেও সইতে হয়েছে। এখন এই কষ্টটা বহন করছি আমি একা।

সাও পাওলোতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে রিটা। একটা গাড়ি ফলো করছিল ও। রিটার ধারণা, ওই গাড়িতে ছিল আরিবের্ট হাইম। একসময় ওটা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল। স্টিয়ারিংটা ঢুকে গিয়েছিল ওর ফুসফুসের ভেতর। তার পরও রিটা বেঁচেছিল এক সপ্তাহের মতো। খবর পাওয়ার পর আমি ছুটে গেলাম ব্রাজিলে। ও তখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল। আমরা ওকে দেশে এনে চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার অবস্থা এতটাই সঙ্গীন ছিল যে ডক্তাররা রাজি হলো না কিছুতেই।

শেষ কয়েকটা দিন কোনোভাবে বেঁচেছিল আমার বোন। বেঁচেছিল মানে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। কোনো কথা বলতে পারত না ও। রিটার মুখে সব সময় লাগানো থাকত অক্সিজেন মাস্ক। ও শুধু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাত। আর কিছু একটা বলতে চাইত।

রিটা যেদিন মারা গেল তার আগের দিন সন্ধ্যায় হাতের ইশারায় ও আমার কাছে একটা কাগজ আর কলম চাইল। লিখে লিখে আমরা কথা বললাম। দুয়েকটা বিষয়। ওর হাত খুব কাঁপছিল। তোমাকে এক লাখ ইউরো দিতে চায় রিটা। এটাই ওর সারা জীবনের সঞ্চয়। আমাকে শুধু বলেছে, তোমার কী এক অসমাপ্ত কাজের জন্য এই টাকাটা ও দিতে চায় তোমাকে। তার পরদিন দুপুরের দিকে আমাদের ছেড়ে চেলে গেল রিটা।

চিঠিটা পেলে আমাকে জানিও এই অর্থটা আমি তোমার কাছে কীভাবে পৌঁছাতে পারি।

রিটা ঘুমিয়ে আছে জিনোডলফিঙ্গেনের গোরস্থানে। উঁচু ওই টিলাটার পেছনে। ওর জন্য আমরা খুব সুন্দর একটা জায়গা পেয়েছি। রিটা শুয়ে আছে গোরস্থানটার একেবারে পশ্চিম সীমান্তে, যার পাশেই সরু একটা খাল। ওখানে কয়েকটা চেরি গাছ লাগানো। সামারে ওর কবরের ওপরটা ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকবে, ফলের সময় ঢাকা থাকবে ঝরা পাতায় আর শীত কালে শুভ্র তুষারে।

সেলিম, তুমি তো জান, রিটার জন্ম যুদ্ধের সময়। ওর জন্ম হয়েছিল নরকে, ও ছিল নৃশংসতার পরিণতি। কিন্তু সারাটা জীবন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ওর কবরে আমরা একটা এপিটাফ বসিয়েছি। ওখানে লেখা আছে : 'বাতাসে সুবাস ছড়াও তুমি যুদ্ধের ফুল।'

তুমি যদি কখনো আস, তাহলে একবার দেখে যেয়ো রিটাকে। ওর মৃত্যু হয়নি। শীতকালের ঝরাপাতার মতো ও শুধু ঘুমিয়ে আছে জিন্ডেলফিঙ্গেনের মাটিতে। তুমি দেখে নিয়ো সেলিম, রিটা আবার ফিরে আসবে, সবুজ পাতারা যেমন কুঁড়ি মেলে বসন্তের শুরুতে...

বিস বাল্ড,
গুস্তাভ, জিন্ডেলফিঙ্গেন, জার্মানি।

চিঠিটা ভাঁজ করে রাখলাম পকেটে। আমার ভেতর তখন ভাঙচুর চলছিল। মনে পড়ছিল রিটার চোখ। ওর নাক-চুল-ঠোঁট। ওর কাঁধ, ওর চিবুক। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না রিটা বাওয়ারের মুখ। যতবার ওর মুখচ্ছবিটা মনে করতে চেষ্টা করলাম, আমার সামনে ততবারই ভেসে ওঠতে লাগল হয় শীলার সবুজ শাড়ি, নয়তো সোফিয়ার হাতে বেতের ঝুড়ি কিংবা আমার মা রুখসানা বেগমের মাথায় বিন্দু বিন্দু জল অথবা জিন্ডেলফিঙ্গেনের মাঠে ওপর দিয়ে কোথাও ছুটছে ক্যাসানোভা। ওরা আর কেউ নেই আমার জীবনে। একে একে হারিয়ে গেছে সব। শুধু আমি আছি।

রিটার মুখখানা একটুখানি মনে করার জন্য ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম আমি। আর যখন পাঠাগার থেকে বের হলাম, তখন অঝোরে কাঁদছিল পরমতলা। মাঠ-ঘাট-পুকুর-কবর আর গাছপালা ভিজিয়ে এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে আমার কান্না কেউ দেখতেও পারেনি।